সূচিপত্র।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পক্ষ।

যে অবধি ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যও সাকার ও নিরাকার এই দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই অবধি এক নূতন যুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ঈশ্বরের দ্বৈতবাদ আছে, মনুষ্যেরও তাহা ঘটিয়াছে। এই দ্বৈতবাদীরা বলেন, "তুমি আমি প্রত্যেকের ভিতর, আর একটি করিয়া তুমি আমি আছে। সেটী দেখা যায়, সেটী সাকার মনুষ্য, আবার তাহার ভিতর সেটী আছে, সেটী নিরাকার মনুষ্য। কেহ সেটীকে দেখিতে পায় না, সেটীও কোন কার্য্য করে না, অথচ সেটী আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।" শাস্ত্রকারেরা, ধর্ম্মযাজকেরা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে। তুমি জানিতেছ না, তুমি বুঝিতেছ না, তোমার ভিতর আর একজন আছে, তাহার নাম আত্মা।

দ্বৈতবাদীরা আরও বলেন যে, মৃত্যুর পর নিরাকার মনুষ্য প্রকাশ পায়; সেই নিরাকার অবস্থায় সুখ দুঃখ সকলই ভোগ করিতে হয়। আমি যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাই, উত্তম বস্ত্র পরিব, চন্দন মাখিব, পুষ্পহার গলায় দিব, সিংহাসনে বসিব, অপ্সরার গীতি শুনিব, আহার নিদ্রার ত কথাই নাই। তখন শরীর নাই থাকুক, এ সকল শারীরিক সুখভোগের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না। আর যদি নরকে যাই—এই লেখার পর তাহাই সম্ভব—তাহা হইলে নানা বর্ণের অনন্ত অগ্নি আমার নিরাকার দেহকে দগ্ধ করিবে, আমি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিব, ডাক্তার পাইব না, ঔষধ পাইব না, ফোস্কা গালিতে একটা আত্মীয়ও পাইব না। যদি স্বর্গে যাইতে

না পাই, আর নরকেও স্থান না হয়,—ইদানী শুনিতেছি, "নরকে নাকি স্থানাভাব হইয়াছে, আমিও সেই ভরসায় কলম ধরিয়াছি—যদি স্বর্গে যাইতে না পাই, নরকেও স্থান না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমি এইখানেই থাকিব, তখন দেহ থাকিবে না, কাজেই তোমরা আমায় দেখিলে প্রেত বলিয়া ভয় পাইবে।

এইরূপ আবার বস্ত্র, চন্দন, পুষ্প, সকলের আত্মা আছে, নতুবা তাহারা স্বর্গে যায় কিরূপে? যদি সেখানে তাঁতিরা গিয়া তাঁত বোনে, মালিরা গিয়া মালঞ্চ করে, তাহা হইলে সেখানে ঢাকাইধুতি, বেনারসি চেলি জন্মিতে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেখানে যদি তাঁতি, মালি প্রভৃতি ইতরজাতিরা যাইতে না পায়, বা যাইয়া যদি তন্তুবয়ন করিতে না পায়, তাহা হইলে বস্ত্র কোথা হইতে আইসে? কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের এই পুরাতন বস্ত্রের আত্মারা স্বর্গে গিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব আত্মা যে কেবল আমাদের আছে, এমত নহে। কড়িগুলির আত্মা আছে, বৈতরণী পার হইবার নিমিত্ত যে কয়েক কড়া কড়ি আমরা পাইয়া থাকি, যদি তাহাদের আত্মা না থাকে, তাহা হইলে এরূপ কড়ি আমাদের সঙ্গে দিবার ফল কি? কড়ি সবায় পড়িয়া থাকে, এ অবস্থায় বুঝিতে হইবে কড়ির আত্মারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়, অন্ততঃ পারঘাটা পর্য্যন্ত।

রহস্য এক্ষণে এই পর্য্যন্ত। আমরা বলিতেছিলাম যে, যে অবধি মনুষ্যর সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে, সেই অবধি নূতন কল্প আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবধি প্রথম ধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বাবধি ধর্ম্ম গঠিবার কিছু কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল। ভয় মনুষ্যের স্বভাবতঃ প্রবল—সেই ভয় হইতে দুই এক দেবতার কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্নি দেবতা, কেন না হাত পুড়ায়, বায়ু দেবতা, কেন না ঘর ভাঙ্গে, বরুণ দেবতা, কেন না জলে ভাসায়, ইহাদের পূজা করা উচিত। তাহা হইলে এ সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। এইরূপে সামান্য মত ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইতেছিল। স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল কথার সৃষ্টি তখন হয় নাই। কাজেই ধর্ম্ম কেবল ঐহিকী ছিল। লোকের চরিত্রও তখন পৈশাচিকবৎ ছিল—ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দ্দম, ভল্লুকের ন্যায় পররক্তপ্রিয়, দয়া, দাক্ষিণ্য একেবারে নিরহিত; এরূপ প্রকৃতি অগ্নি বায়ু দেবতার দ্বারা উদ্দীপ্ত ব্যতীত দমিত হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

তাহার পর মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে, এই অনুভব ভারতবর্ষে প্রথমে উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্রই নূতন এক ধর্ম্ম স্বতঃ উপস্থিত হইল। মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে এই

কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে ম্লেচ্ছ যবন বানর ও রাক্ষস ছিল, তাহারা থামিবে কেন? দলপতি নিজে তাহাদিগকে থামাইতে গেলেন; কিন্তু গিয়া দেখেন, রাক্ষসেরা রাজপরিবারস্থ সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। দস্যুদলপতি তখনও তাহাদের থামিতে বলিলেন, একে রাক্ষস তাহাতে মদ খাইয়া লুঠে উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার কথা তাহারা কেন শুনিবে, তাহারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন দলপতি বাহুবলে তাহাদিগকে নগরবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়াই তাহারা যবন ম্লেচ্ছ ও বানরের সহিত মিলিত হইয়া ভীমপরাক্রমে দস্যুশিবির আক্রমণ করিল। দলপতি কষ্টে শিবিরমধ্যে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন বাল্মীকি বীণাহস্তে "ভাই ভাই" গাইতেছেন, সমস্ত দস্যুদল শুনিয়া কেবল কাঁদিতেছে,—নিঃশব্দে সহস্র যোদ্ধা কাঁদিতেছে। নরহত্যা যাহাদের ব্যবসায়, জীবিকা, তাহারা সকলেই কাঁদিতেছে—অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। সমবেত রাক্ষসাদি যে আক্রমণ করিতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই। রাক্ষসেরা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল, বাল্মীকির গান আরও উচ্চ হইল, [illegible] পূর্ণ হইল। মানবহৃদয়ের [illegible] পূর্ণ হইল। [illegible] [illegible] আসে মোহিত হইয়া [illegible] বাল্মীকির গান [illegible] বাল্মীকির গান হইয়াছিল, আজি সমস্ত দস্যুদলের সেই ভাব হইল। কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি রাক্ষস, কি বানর সব মোহিত, দয়া সকল হৃদয়ে প্রবল হইল। গানে কেমন বলিতেছে "ওরে রে যা করেছিস্, করেছিস্, আর করিস্ নে, দেখ দেখি, তোর যদি এমনি হয়, তুই কি করিস্। সকলেই মানুষ তো? তোর শরীর যেমন রক্তমাংসময় সবারই তেমনি। মনে কর, যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়, কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হস্, আর অন্যের মস্তকে তরবারি আঘাত করিস্। আপন পরিবারের প্রতি নজর দিলে সইতে পারিস্ না; কিন্তু পরের পরিবারের প্রতি কত অত্যাচার করিস্। আহা! একবার মনে মনে কর দেখি যে তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসেই কাটিস্, কিন্তু একবার মনে কর দেখি যে তোর নিজের ছেলের ও রকম হলে কি হয়?" শ্রোতৃগণ ফুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, "রক্ষা কর ওগো! উপায় বলিয়া দেও।" আবার গান চলিল, "সব ভাই ভাই বল, সবাই আপন, পর কেহ নাই। যম ছাড়া শত্রু আর নাই, সবাই মানুষ, শীতে তোমার যেমন, সবারই তেমনি। গ্রীষ্মে তোমার ঘাম হয়, সবারই তেমনি। বর্ষায় জলে তুমি ভিজ, সবাই সেইরূপ ভিজে। [illegible] তোমার আর মানুষে ভেদ নাই। [illegible]

একবার এক প্রাণ হও, আমি তোমার তুমি আমার হও। এক সুর সবার, সবার এক পৃথিবী সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চাঁদে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তবে প্রাণ কেন দুই থাকে?" গানে যে কত বলিতেছে, কে বলিবে, কতক্ষণ যে গাইল, কে বলিবে? দীন কবি বাল্মীকির গান কতক্ষণ ব্যাখ্যা করিবে?

গানের ফল এই হইল, সকল দস্যু বেশত্যাগ করিয়া বাল্মীকির পায়ে জড়াইয়া পড়িল। দস্যুদলপতি গুহকচণ্ডাল পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে পা ছুঁইতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি দেবতাও নহি, অবতারও নহি, রাজাও নহি, তোমরাও যাহা, আমিও তাহাই। আমার পায়ে পড়িলে কি হইবে, দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, আর করিও না। জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া সৎপথে জীবন কাটাও সুখী হইবে।"

এই বলিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবাসীদিগের ভক্ত(?) বণিকগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ষুকাণা, কাহারও অস্থিতে গাত্রদাহ হইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করিয়া, কেহ অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় শিশু সন্তান বুকে করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইল, রাজবংশ থাকিলে যাইয়া [illegible] লুটিয়াছে, অরাজক রাজ্যে বাস করা [illegible] ভাবিয়া [illegible] তথায় যাইতেছে। বাল্মীকি উহাদের দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমাদের কীর্ত্তি দেখ।" বলিতে বলিতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সকলেই দেখিয়া শোকে অনুতাপে [illegible] ক্ষোভে বিষণ্ণ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। বাল্মীকি বলিলেন, "যাও উহাদের ফিরাইয়া লইয়া এস।" সকলে উহাদের নিকট গেল, যাইবামাত্র নগরবাসিগণ আবার আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইল। ডাকাইতেরা তখন বুঝিতে পারিল, দুষ্টলোকে সত্য কথা বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না। তাহারা বাল্মীকিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিল; বাল্মীকি যে দস্যু নন তাহা উহারা জানিবে কি প্রকারে?

যাহা হউক বাল্মীকি উহাদিগকে ফিরাইলেন, এবারও আপনগানে বাল্মীকি এমনি মিষ্ট তান ধরিয়া উহাদের নিকট এমনি করুণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, উহাদের চিত্ত দয়ার্দ্র হইল; উহারা বাল্মীকির কথায় নগরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু অরাজক দেশে বাস করা অন্যায় এজন্য উহারা বাল্মীকিকে রাজা হইতে অনুরোধ করিল। বাল্মীকি রাজা হইলেন না, কিন্তু তিনি দস্যুদলপতি গুহক চণ্ডালকে রাজা করিয়া দিলেন। গুহকের রাজ্যে সমবেত সমস্ত ম্লেচ্ছ যবন বানর রাক্ষস একত্র সুখে বাস করিতে লাগিল, আর [illegible] সুখী হইলেন। কিন্তু [illegible]

অনুভবের সঙ্গে; ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এ সকল আনুষঙ্গিক কথা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল; একে একে তাহা সমুদায় অনুভব হইয়া নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। যে ব্যক্তি আত্মবাদ স্বীকার করিল, তাহাকেই সেই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। পৃথিবীর যাবতীয় বিচক্ষণ জাতি প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একে একে সকলেই এই আত্মামূলক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষ হইতে মিসররাজ্যে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার হয়, তথা হইতে য়ুনানীদেশে গৃহীত হয়। মুষা এই ধর্ম্ম মিসরদেশ হইতে আপন দেশে লইয়া যান। মুষা হইতে পরম্পরা যীশুখ্রীষ্ট* এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাহার পর মহম্মদ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে কাজেই তাঁহাদের উপাসকগণ, ইংরেজ, ফরাশিস, দিনামার, ওলন্দাজ, আরবী, পারসীক প্রভৃতি সকলেই এই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।

ধর্ম্মটী অতি সহজ। আত্মা স্বীকার করিলেই আপনা আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা ইহার অনুভব হইয়া যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া এই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। মৃত্যুর পর আত্মা কি করে?

উত্তর। ঐহিকে যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করে।

প্র। কি ফল? কোথায় থাকিয়া তাহা ভোগ করে?

উ। স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করে, নরকে থাকিয়া দুঃখভোগ করে।

প্র। কোন কার্য্যের ফল সুখ, কোন কার্য্যের ফল দুঃখ?

উ। বিচারকর্ত্তা যে কার্য্য ভাল বলেন সেই কর্ম্মের ফল সুখ। বিচারকর্ত্তা যে কার্য্য মন্দ বলেন, সেই কর্ম্মের ফল দুঃখ।

প্র। বিচারকর্ত্তা কে?

উ। তাঁহার নাম ঈশ্বর, তিনিই পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন।

প্র। কোন কার্য্য তিনি ভাল বলেন, কোন কার্য্য তিনি মন্দ বলেন?

উ। তিনি তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

প্র। কাহার নিকট কি প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর লইয়া তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই মূল এক, কেবল এই স্থান হইতে পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে। এই পার্থক্য সামান্য। মূলধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাদ্বারা কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সচরাচর লোকেরা যে গুরুতর বৈষম্য দেখে, তাহা প্রথমতঃ উপদেষ্টা সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়তঃ আচারসম্বন্ধে।

---

* অনেকে বলেন যে যীশুখ্রীষ্ট আত্মা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সে কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয়। Gospel of St. Matthew Chapter X. P. 28 দেখ।

যে কার্য্য ঈশ্বরের প্রীতিকর, তাহা তিনি কাহার নিকট বলিয়া দিয়াছেন এই লইয়া প্রথম তর্ক। হিন্দুমতানুসারে ঈশ্বর আকাশবাণী দ্বারা] পাপ পুণ্য বলিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টানমতানুসারে স্বয়ং আংশিক অবতারস্বরূপ মনুষ্যমধ্যে আসিয়া বলিয়া দিয়াছেন। মুসলমান মতানুসারে মহাম্মদের নিকট ঈশ্বর দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। বেদব্যাস বা শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ বা যীশুখ্রীষ্ট যিনিই ঈশ্বরবাক্য প্রচার করিবার ভারগ্রহণ করিয়া থাকুন, কেহই মূলধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেহই বলেন নাই যে, আত্মা নাই, মৃত্যুর পর সকল ফুরায়। কেহই বলেন নাই যে, স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা। কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্য নাই, কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর নাই। যদি কেহ তাহা না বলিয়া থাকেন, তবে মূলকথার পার্থক্য কই হইল? দেশভেদে বা সময়ভেদে স্বতন্ত্র উপদেষ্টা সম্ভব, উপাসকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উপদেষ্টার অমানুষিক পরিচয়ও সম্ভব। উপদেষ্টা কে বা কিরূপে তিনি নিজে উপদিষ্ট হইলেন, কেবল এই কথা লইয়া যে উপাসকদের ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাদের পক্ষে এই বৈষম্য অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। যাহারা মূলধর্ম্ম চিনে নাই, তাহারা কেবল উপদেষ্টা চিনিয়াছে। কাজেই উপদেষ্টা লইয়া তাহারা দলাদলি করে। তাহাদের বিবাদ ধর্ম্ম লইয়া নহে, কর্ম্ম লইয়া নহে, কেবল দলপতি লইয়া।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া দ্বিতীয় তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্র না থাকায় সৃষ্টিবিবরণ লিখিবার ভার ধর্ম্মশাস্ত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। সৃষ্টি কেহ দেখে নাই; কিন্তু সকল দেশেই এ সম্বন্ধে একটা না একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত হয়, নূতন ধর্ম্মের সহিত সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত হয় ত সেই সকল প্রবাদের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু এই সকল সংগৃহীত প্রবাদের সঙ্গে মূলধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি অল্প। যদি বল একটি প্রকাণ্ড অণ্ড বা ডিম্ব এক সময় পরমেশ্বর প্রসব করিয়াছিলেন; সেই ডিম তিনখণ্ড করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল হইয়াছিল; এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জড়জঙ্গম সকল বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা বলিলে "আত্মা পরকালে ফলভোগী" এ কথার অন্যথা কি হইল? অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় ভাসিতে ছিলেন, অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই জলময় ছিল, সেই জলের উপর ঈশ্বর পরিপ্লবভাবে ছিলেন; তাহা হইলে আত্মা পরকালে ফলভোগী এ কথার কিরূপে অন্যথা হইল? যে সকল সামান্য লোকেরা ধর্ম্মগ্রন্থের কেবলমাত্র

গ্রন্থ চিনিয়াছে, ধর্ম্ম চিনে নাই, তাহারাই এই সকল প্রবাদপার্থক্যকে ধর্ম্মপার্থক্য মনে করে।

আচার লইয়া তৃতীয় বৈষম্য। এই পার্থক্য সম্পূর্ণ সম্ভব। দেশভেদে স্বতন্ত্র আচার, স্বতন্ত্র ব্যবহার প্রচলিত হইয়া পড়ে। উত্তপ্তদেশে নিত্য অবগাহন তৃপ্তিজনক; লাপ্লাণ্ডদেশের ন্যায় শীতপ্রধানদেশে তাহা অতি কষ্টকর; কাজেই উত্তপ্তদেশে নিত্যস্নান আচারস্বরূপ হইয়া পড়ে; শীতপ্রধানদেশে তাহা হয় না। এই স্থলে উত্তপ্তদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে যদি নিত্যস্নানের ব্যবস্থা থাকে, আর শীতপ্রধানদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে তাহা না থাকে, তাহা হইলে সামান্য লোকেরা ইহা গুরুতর বৈষম্য বিবেচনা করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ধর্ম্মগত বৈষম্য নহে। স্নান আহার ধর্ম্মান্তর্গত হইতে পারে না। যদি কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা বিবেচনা করেন যে, স্নানের দোষ গুণ পরকাল পর্য্যন্ত পৌঁছে, তাঁহার উপদেশ কেবল অতি সামান্য লোকেরা গ্রহণ করে। এরূপ অবিবেচক ধর্ম্মবেত্তা অনেক ছিলেন। কোন্ কার্য্য ঈশ্বরের প্রীতিকর তাহার উপদেশ দিতে গিয়া দুই একজন বা নির্ভয়ে সার কথা বলিয়াছেন, নতুবা অধিকাংশ উপদেষ্টারা কুসংস্কারাবৃত স্বদেশবাসীদের মন রক্ষা করিয়াছেন। এইজন্য আচারগত বৈষম্য থাকিয়া গিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন দাড়ি রাখিলে ঈশ্বর বড় প্রীত হন। কেহ বলিয়াছেন, আহার লইয়া ঈশ্বরের বড় পীড়াপীড়ি। কেহ বা খাওয়া পরার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঈশ্বরের পারিতোষিক লইয়া আরও মতান্তর আছে; কেহ বলেন, তাঁহাকে পুষ্পচন্দন দিলে, তিনি বড় স্নিগ্ধ হন। কেহ বলেন, তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি বড় খুসী হন। কেহ বলেন, তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিলে বড় আপ্যায়িত হন; কেহ বলেন, তাঁহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিলে, তিনি চিরবাধিত হন। কেহ কেহ আবার তাহা স্বীকার করেন না। এইরূপে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু এ সকল নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কথা ছাড়িয়া যখন তাঁহারা মূলকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সকলেই একমত। মনুষ্যের পৈশাচিক প্রবৃত্তি সংশোধন করিবার নিমিত্ত সকলেই আত্মসংযম একবাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন, স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া পরোপকার সাধন করিবে। আত্মক্লেশ স্বীকার করিয়া পরহিত সাধন করিবে। ইহাই ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্য। মিথ্যাকথায় পরের অনিষ্ট সম্ভব, এইজন্য সত্যবাদী হইবে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে, অন্যের অনিষ্ট হয় এইজন্য জিতেন্দ্রিয় হইবে। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইলে স্বর্গ নিশ্চয়। এইরূপ মূলনীতি সম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই।

যে সকল কার্য্যে ঈশ্বরের প্রীতিসাধন

হয় বলিয়া মূলধর্ম্মে সকল দেশেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, এই উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বরের প্রীতিসাধন এ ধর্ম্মের যত উদ্দেশ্য হউক না হউক, মনুষ্যমধ্যে ভ্রাতৃভাবসংবদ্ধ করা এই ধর্ম্মের বিশেষ উদ্দেশ্য, অথবা সমাজসূত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া যাহাতে সমাজের আভ্যন্তরিকশক্তি ক্রমে বিকাশ পায় তাহার সহায়তা করা এই মূলধর্ম্মের উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যক্তিগত দোষ সংশোধিত হইলে, শেষ সমাজগত দোষের অপনয়ন হইবে। আত্মামূলক ধর্ম্মদ্বারা কয়েক হাজার বৎসর অবধি ব্যক্তিগত দোষের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আর পূর্ব্বমত পৈশাচিক প্রবৃত্তি নাই, সামান্য ব্যক্তিগতদোষ কোন কোন অংশে পূর্ব্বমত থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ পৈশাচিকত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহাই বলিতেছিলাম, যে পর্য্যন্ত আত্মানুভব হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নূতন যুগোৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

আত্মা অনুভব প্রথম কে করিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, যিনিই করুন তিনিই মনুষ্যের মহাগুরু ছিলেন। তিনি যে বীজমন্ত্র দিয়াছেন তাহার শক্তি অসীম। এই বীজ উচ্চারণ মাত্রেই মনুষ্যত্বের প্রথম দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক কাল হইবে মানবস্রোত এই দ্বার দিয়া বহিতেছে। দ্বিতীয় দ্বারে পৌঁছিতে বিলম্ব আছে। যে মহাগুরু দ্বিতীয় দ্বারের বীজমন্ত্র দিবেন তিনি এক্ষণে বহু দূরে। প্রথম বীজের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে শেষ হয় নাই। সে কার্য্য পরপ্রিয়তাসাধন। তাহা সংসাধিত হইলে সমাজের আশ্চর্য্য শক্তি পরিস্ফুট হইবে। পরপ্রিয়তা সংসিদ্ধ করিবার নিমিত্তই এই নূতন ধর্ম্ম, এতদ্‌ভিন্ন ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই ধর্ম্ম এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। মুসলমান ধর্ম্ম বল, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বল, যে ধর্ম্মই বল কেবল নামভেদ মাত্র, সকল ধর্ম্মই আত্মামূলক। আত্মা হেতু স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল উত্থাপিত হইয়াছে; আত্মা হেতু ক্রিয়া কলাপের প্রয়োজন হইয়াছে। এই আত্মা হিন্দুর আবিষ্কৃত অতএব আত্মামূলক ধর্ম্ম যে আকারে যেখানে প্রচলিত থাকুক সে সকলকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া নামকরণ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংস্কার সূচনা।

আত্মামূলক ধর্ম্মের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। ইহকালের কার্য্যফল পরকালে ভোগ করিতে হয় বলিয়া এ সংসারে অনেক সৎকার্য্য হইয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপিও হইতেছে। কিন্তু প্রশংসা এই পর্য্যন্ত।

যিনিই যাহা বলুন, কোন ধর্ম্ম সত্য

সত্যই পারত্রিক নহে। সমাজের মঙ্গল-সাধনার্থ সকল ধর্ম্মই প্রণীত হইয়াছে, কেবল তান্ত্রিক অভিধেয় পৈশাচিক ধর্ম্মের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব সম্বন্ধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি কাহারও হিংসা করিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি সাধ্যমত তাহার উপকার করিবে; তোমার বামগণ্ডে চড় মারিলে, তুমি দক্ষিণগণ্ড বাড়াইয়া দিবে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিবে, সকল ধর্ম্মের এই একরূপ উপদেশ। ইহার উদ্দেশ্য কেবল সামাজিক ভিন্ন পারত্রিক নহে। অর্থদান, অন্নদান প্রভৃতি সৎকার্য্য এই সংসারের জন্য, দয়া দাক্ষিণ্য এইখানেই উপকারক।

নীতিশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য। উভয় শাস্ত্রের একই উপদেশ। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞতা শিখায়, ধর্ম্মশাস্ত্র সে বিষয়ে বরং কিছু বিরোধী। নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ যে অন্যের হিতসাধন কর, ভালই, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনার হিত বিস্মৃত হইও না। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ যে আপনার হিত বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের হিতসাধন কর। ধর্ম্মশাস্ত্র বলে মিথ্যাকথায় বড় পাপ, কেন না অন্যের অনিষ্ট করে। নীতিশাস্ত্র বলে মিথ্যাকথা বড় দোষ, কেন না আপনার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। এইজন্য নীতিশাস্ত্র একটু স্বার্থপর, ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা একেবারে নহে, অন্ততঃ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ দেখিয়া বিচার করিলে, এইরূপই বোধ হয়। কিন্তু ফল বিবেচনা করিতে গেলে, তাহার বিপরীত বোধ হয়। স্বার্থপরতা দ্বারা স্বার্থপরতা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। লোকের ভাল করিলে তোমার আপনার ভাল হইবে, এই প্রলোভন বাক্য এই ধর্ম্মের প্রধান দোষ। কেবল আপনার প্রতি দৃষ্টি কর, আপনার মঙ্গল চেষ্টা কর, কিসে তোমার আপনার পরকাল ভাল হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা কর, অনবরত এই পরামর্শ যে ধর্ম্মের মূল সে ধর্ম্ম আলোচনায় স্বার্থপরতা কাজেই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণকার লোকেরা কিছু স্বার্থপর বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ধর্ম্মই হয় ত তাহার হেতু। অনেকে বলেন যে, বয়স হইলে আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি, আবার ইহাও শুনা যায় যে, বয়স হইলে মনুষ্যেরা কিছু ধর্ম্মপ্রিয় হয়; উভয় কথাই সত্য কি না জানিতে গেলে, জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, লোকে অগ্রে স্বার্থপর হইয়া পরে ধর্ম্ম-প্রিয় হয়; কি অগ্রে ধর্ম্মপ্রিয় হইয়া পরে স্বার্থপর হয়? কেন না দেখা যায় স্বার্থপরতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা একাধারে সচরাচর থাকে, যাহারা স্বভাবতঃ কিছু স্বার্থপর, তাহাদের স্বার্থস্পৃহা যে এই ধর্ম্মে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবে, ইহা এক

প্রকার বুঝা যায়। এইজন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরা বড় ধর্ম্মপরায়ণ হয়; অথবা বলুন ধার্ম্মিকেরা বড় স্বার্থপর হয়। উভয় কথাই সম্ভব। প্রচলিত আত্মামূলক ধর্ম্মের পন্থাদোষে এই সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

এই স্বার্থপর ধর্ম্মের আর এক নাম সকাম ধর্ম্ম। এক্ষণে সকল ধর্ম্মই আত্মামূলক এই জন্য সকল ধর্ম্মই সকাম। একসময় হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বড় গৌরব। অদ্যাপিও আমরা সৎ কর্ম্মের পর "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ মস্তু" বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কথায় মাত্র,মনে জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ এমন অবিবেচক হইবেন না, আমাদের সৎকার্য্যের ফল অবশ্য তিনি আমাদেরই দিবেন। এক্ষণে এই সকাম ধর্ম্মের বিদ্বেষী অনেকে হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন আমাদের হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক।

সচরাচর যেরূপ সময়ে ধর্ম্মসংস্কার হইয়া থাকে বাঙ্গালায় যে সেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত নহে। সামাজিক অত্যাচার ধর্ম্মসংস্কারের এক প্রধান হেতু; বাঙ্গালায় এক্ষণে সে অত্যাচারের বড় বাড়াবাড়ি নাই, অতএব সেদিকে আশাও নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সামাজিক অত্যাচারে জন্মিয়াছিল। তান্ত্রিক কালে বাঙ্গালা ভয়ানক নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। আমরা এক্ষণে সকলেই চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম স্পষ্ট গ্রহণ করি বা না করি কিন্তু পাকত সকলেই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মরা রাগ করিবেন নতুবা বলিতাম তাঁহারাও বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রেমধর্ম্মের শাখাবলম্বী। এক্ষণে বাঙ্গালির যাহা কিছু আছে তাহা চৈতন্যপ্রসাদাৎ। চৈতন্যের দ্বারা সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকুক, অথবা সমাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় চৈতন্য উপস্থিত হইয়া থাকুন সে মীমাংসা এক্ষণে অনাবশ্যক। যে অবস্থায় চৈতন্যদেব ধর্ম্মপ্রচার করেন এক্ষণে বাঙ্গালার সে অবস্থা নহে, অন্যান্য দেশে যে অবস্থায় ধর্ম্মসংস্কার হইয়াছিল এক্ষণে সে অবস্থাও বাঙ্গালার নহে। অতএব সামান্যত দেখিতে গেলে এক্ষণে বাঙ্গালায় ধর্ম্মসংস্কারের সম্ভাবনা নাই অথচ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালায় ধর্ম্মসংস্কারের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে।

পূর্ব্বে সকল দেশে সকল সমাজে লোকে কেবল মাত্র একটি করিয়া ধর্ম্ম দেখিতে পাইত বা একটী ধর্ম্মেরই দুই চারিটি শাখা প্রশাখা দেখিত। ইদানীং নানা ধর্ম্ম একত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই জন্য ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি সকল দেশেই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। নানা ধর্ম্ম একত্র দেখিবার ফল বাঙ্গালায় কিছু বিশেষ ফলিয়াছে। মনুষ্যের প্রকৃতি এক, তবে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র কেন? এ কথা বাঙ্গালার প্রায় অনেকেই আপনা আপনি আলোচনা করিয়া থাকেন। এই কথার অন্তর্গত

আরও অনেক তর্ক মনে উপস্থিত হয়। স্বর্গ এক, তবে পাপপুণ্য স্বতন্ত্র কেন? মাংসভোজন এক ধর্ম্মে পাপ, অপর ধর্ম্মে তাহা নহে কেন? জগতের স্রষ্টা এক, কিন্তু ধর্ম্মের স্রষ্টা স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কেন? এইরূপ আলোচনা যে করে তাহার মনে প্রচলিত ধর্ম্মসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। অনেক বাঙ্গালির মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্মসংস্কার আপনাআপনি আরম্ভ হইয়াছে।

এই সংস্কারের সংস্কারক নাই, এবারকার কে চৈতন্যদেব, জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ নাই, যত্ন নাই, উদ্যোগ নাই, অথচ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক নাই, ধর্ম্মপ্রচারক নাই, কোন গ্রন্থ নাই, অথচ চারিদিকে ইহার কার্য্য হইতেছে।

যাঁহারা এই সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায় বদ্ধ নাই, তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত কোন নামকরণ হয় নাই; কিন্তু এই স্থলে তাঁহাদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতে হইতেছে বলিয়া, তাঁহাদের আপাততঃ বঙ্গপন্থী নাম দেওয়া হইতেছে; তাঁহাদের আপত্তি থাকে, তাঁহারা অন্যনাম গ্রহণ করুন।

এক্ষণে কি কি বিষয়ের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা কঠিন নহে। মূল সংস্কার ঈশ্বরের প্রকৃতিসম্বন্ধে। পুরাতন ধর্ম্মের যেরূপ মত বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, তাহাতে ঈশ্বর মনুষ্যাকৃতি বলিয়া সাধারণতঃ বিশ্বাস ছিল; বিদেশীরা বাঙ্গালায় আসিয়া প্রতিমা দেখিয়া কতই উপহাস করিতেন; মনুষ্যের আকার হইতে ঈশ্বরের আকার কল্পনা করা কতই অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইত। তাঁহারা তখন এক পৈঁঠা উঠিয়াছিলেন, আর একটি পৈঁঠা উঠিতে তাঁহাদের বাকি ছিল। তাঁহারা আকৃতি ছাড়িয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতি গড়িতেন; অদ্যাপি তাঁহাদের মধ্যে সেই রীতি চলিতেছে। মনুষ্যের মত ঈশ্বর দয়াময়; বরং কিছু বেশী। তিনি মনুষ্যের মত রাগান্ধ, কিছু হয় ত বাড়াবাড়ি। তিনি মনুষ্যের মত প্রশংসাপ্রিয়, এই জন্য তাঁহার স্তব পূজার বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। বঙ্গপন্থীদিগের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা মনুষ্যের আদর্শ হইতে ঈশ্বরের প্রকৃতি অনুভব করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা হয় ত অন্যান্য মতাবলম্বী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। খ্রীষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন, হিন্দু বলুন সকল মতেই প্রকৃতিতে ঈশ্বর মনুষ্যের মত। সকল মতেই ঈশ্বর দয়াবান্, কেন না আমরা দয়াবান্। সকল মতেই ঈশ্বর ক্ষমাবান্, কেন না আমরা ক্ষমাবান্। সকল মতেই ঈশ্বর দণ্ডধারী, কেন না আমরা লোকের দণ্ড করি।

আমরা প্রশংসাপ্রিয়, কিন্তু ঈশ্বরও যে সেইরূপ প্রশংসাপ্রিয় ইহা কোন

কাজেই বঙ্গপন্থীরা বিশ্বাস করেন না। তুমি বড়, তুমি অতি বড়, তুমি যাহা মনে কর, তাহাই করিতে পার, এই বলিলে ঈশ্বর যে আপনাকে বড় জ্ঞান করেন বা তাহাতে বিশেষ পরিতৃপ্ত হন এ কথা বঙ্গপন্থীদিগের নিকট অতি অগ্রাহ্য। এই জন্য তাঁহাদের সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, পূজা প্রেয়ার নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রশংসা করিয়া পরকাল হাত করিলাম মনে করিতে চাহেন না।

ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা লোকে তাহা করে না। তাহা করাইবার নিমিত্ত তিনি আপনি আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিম্বা নায়েবস্বরূপ আপনার পুত্রকে কি কোন দোস্তকে কখন কখন পাঠাইয়া থাকেন, এ কথা বঙ্গপন্থীর নিকট অতি অগ্রাহ্য। যাঁহার নিয়মে সকল হইয়াছে, সকল চলিতেছে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম বাঁধিতে অক্ষম এ কথা শুনিলে বঙ্গপন্থীরা হাসেন।

যে নিয়মের বলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকা হইতে রসগ্রহণ করিতে শিখিল, সে নিয়মদ্বারা মনুষ্য কিছুই শিখিতে পারিল না বলিয়া আকাশবাণীর আবশ্যকতা হইয়াছে বা সেই জন্য তুলটে ঈশ্বরের আদেশ লেখার আবশ্যকতা হইয়াছে এ কথায় বঙ্গপন্থীরা উপহাস করেন। তাঁহারা বেদ, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বর আদিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না।

যাহা সংক্ষেপে বলা গেল, তাহাই যথেষ্ট। বঙ্গবাসীর ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকুক, তাঁহাদের মূল সূত্রের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ তাঁহারা অবতার অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ কিছুই মানেন না, ধর্ম্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় বলেন। তৃতীয়তঃ অর্চ্চনা বন্দনা, স্তব স্তুতি, পূজা প্রেয়ার তাঁহারা সকলই বৃথা বলেন। তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে কেবল এই তিনটি সূত্র স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, আর কয়েকটি সূত্র অস্পষ্টভাবে কিঞ্চিৎ অন্তরে আছে। তাহার একটি এই যে, পরকালের দণ্ডবিধি আইন মিথ্যা অর্থাৎ স্বর্গ নরক মিথ্যা, পাপ পুণ্য মিথ্যা। আর একটি আরও অস্পষ্ট—আরও দূরে আছে, সেটী বোধ হয় এই; মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনা হইতে ক্রমে ঘুচিবে। ধূমকণার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়া সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলে সেইরূপ কি একটা হইবে তাহার অনুভবও অদ্যাপি হয় নাই, কাজেই নামকরণও হয় নাই।

পূর্ব্ববিশ্বাসের এই যে সকল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা ভাল কি মন্দ আমরা সে সম্বন্ধে এক্ষণে কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি। ইহাকে ধর্ম্মসংস্কার যদি বলা না যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। আমাদের এই বলিবার ইচ্ছা যে, এইটি ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কুর। পাঁচছয়শত বৎসর পূর্ব্বে তান্ত্রিক-

র্বে আত্মার কল্পনাদ্বারা নূতন ধর্ম্ম উদ্ভা-
বিত হইয়াছিল; সেই কল্পনা হইতে
র্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল
চলিত হইয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালায়
হার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্ব-
রের প্রকৃতি মনুষ্যের মত নহে; এই
কথাদ্বারা স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এ
সকল ভাসিতে বসিয়াছে।

বঙ্গপল্লীর সংখ্যা বাঙ্গালায় এক্ষণে
নিতান্ত অল্প নহে।

সমাজ সংগঠনতত্ত্ব।

"সমাজ কাহারও কৃত নহে; কিন্তু
আপনা আপনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"
যেমন মনুষ্যের শরীর বা অন্য কোন
প্রাণীর শরীর অথবা কোন উদ্ভিদ
জন্মিলে পর আপনাআপনি বৃদ্ধি হইতে
থাকে, কোন ব্যক্তি তাহাদিগের বৃদ্ধি-
সম্পাদন করে না; তদ্রূপ সমাজের
বর্দ্ধন এবং উন্নতি কাহারও চেষ্টা
বা যত্নসাপেক্ষ নহে, কিন্তু আপনা-
আপনি হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা যেমন
বস্ত্রবয়ন করে, অথবা কোন শিল্পকর্ম্ম
করে, তদ্রূপ কেহ সমাজের বৃদ্ধিসাধন
করে না। বস্ত্রাদির রচনা কৃত্রিম,
মনুষ্যের কার্য্য, স্বতঃসম্পাদিত নহে।
কিন্তু সমাজের রচনা স্বাভাবিক, স্বতঃ-
প্রবৃত্ত; মনুষ্যের কার্য্য নহে। যে
সকল জাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণ করিয়া
বেড়ায় এবং যাহাদের লোকের সংখ্যা
অতি অল্প এবং যাহাদের কোন গ্রামে
বা নগরে কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই,
[illegible] জাতি বলি।
এইরূপ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে সমাজ-
বন্ধনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হয় নাই।
ইহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিত হইয়া,
কোন গ্রামে বা নগরে কোন নির্দ্দিষ্ট
বাসস্থানে বাস করিতে জানে না, এবং
সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু সভ্য-
জাতিদিগের মধ্যে ভিন্নভাব দৃষ্ট হয়।
সভ্যজাতিরা বহুসংখ্যক লোক একত্র
মিলিত হইয়া অবস্থিতি করিতে ভাল-
বাসে। এই একত্র অবস্থানের নাম
সমাজবন্ধন। যে সকল জাতির মধ্যে
সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা-
রাই আমাদিগের আলোচনার বিষয়।
যে সমস্ত লোক মিলিত হইয়া একটি
সমাজ হইয়াছে, তাহাদিগকেই আমরা
সেই সমাজের লোক বলিব। সেই
সমাজ বলিলেই আমরা তাহাদিগেরই
কথা বলিতেছি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে
দেখা যাউক, আমরা ইতিপূর্ব্বে যে বাক্যটি
সংকোচেবর্ণ চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছি, তাহা

কতদূর সত্য। যে জাতির মধ্যে সবে সমাজের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের লইয়া আমাদের প্রস্তাব। এই সমাজ ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট ও উন্নত হইবে। এই বৃদ্ধি ও উন্নতি কাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়? ইহা কৃত্রিম, কোন ব্যক্তি-কর্তৃক সম্পাদিত; না ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত? আমরা বলি, সমাজ কাহার কৃত নহে, ইহা আপনা আপনি সংগঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজ কি চেতন পদার্থ যে, আপনার বৃদ্ধিসাধন আপনি করিবে। সমাজ কেবল কতকগুলি লোকের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং ইহার বৃদ্ধি বা উন্নতি মনুষ্যের হস্তে নিহিত, মনুষ্যের সম্পাদ্য এবং কৃত্রিম। এরূপ আপত্তি করিলে আমরা বলিব যে, আমাদিগের প্রতিপক্ষেরা আমাদিগের কথার অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই। অতএব আমরা আমাদিগের মত আরও বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইলে, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ আপনাদিগকে এক-শাসনসূত্রে বদ্ধ করিতে পারে এমন কোন শাসনশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করে। তাহারা বলে যে, আমাদের পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, যাহাতে একজনের সুখ হইবে, তাহাতে হয় ত আর একজনের দুঃখ হইবে, এবং পরস্পরের [illegible] [illegible] স্বার্থহানি হইলে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইবে। গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে আর আমাদের একত্র অবস্থিতি করিবার সম্ভাবনা কোথায়, তাহা হইলেই আমাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে এবং সকলকে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে আদেশ দিতে পারে, এমন একজনকে আমাদের কর্ত্তা করা উচিত। ইঁহার হস্তে আমরা আমাদের সমাজের নিয়ন্ত্রী শক্তি দিব এবং ইনি সেই ক্ষমতা দ্বারা আমাদিগকে আদেশ-পালনে বিমুখ দেখিলে উচিত দণ্ডবিধান পূর্ব্বক উচিত পথে আনিতে পারিবেন। এই প্রকারে সমাজের উন্নতির মূলপত্তন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিকে সমাজ চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাঁহাকে সমাজের লোকেরা রাজা বলে। সমাজবন্ধনের প্রারম্ভেই রাজার হস্তে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, না করিলে সমাজ চলে না এবং উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অতএব সমাজের প্রথম অবস্থায় একজন নেতা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইঁহারই আদেশমত সমস্ত হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইবে এবং তাহাতেই সমাজের উন্নতি হইবে। কিন্তু সামাজিক উন্নতি যত অধিক হইতে থাকিবে, ততই সমাজের সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ক্ষমতা রাজার হস্ত হইতে সমাজের লোকসাধারণের হস্তে যাইবে, এবং সর্ব্বশেষে সমাজের শাসন

প্রজাতন্ত্রপ্রণালীমতে প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর সূত্রপাত হইলে, প্রজারা আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে এবং ঐ সকল প্রতিনিধির উপরেই সমাজশাসনভার ন্যস্ত হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে এই যে ক্রমিক উন্নতি, ইহা কে করিল। ইহা কৃত্রিম, কোন বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত; না ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বসম্পাদিত। আমাদিগের প্রতিপক্ষেরা বলিবেন যে, ইহা প্রথমাবস্থায় রাজাকর্ত্তৃক সম্পাদিত, পরে সমাজের লোকসাধারণকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং সর্ব্বশেষে প্রজাদিগের প্রতিনিধিবর্গকর্ত্তৃক সম্পাদিত। কিন্তু রাজা কে? রাজা কেবল সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সর্ব্বসম্মতিতে সমাজশাসন ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন মনুষ্যমাত্র। রাজা সমাজের ইচ্ছক্রিত, তিনি সমাজের অধীন। তিনি এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না, যাহা সমাজের অনিষ্টকর, যাহাতে সমাজের অমঙ্গল ঘটিবে এবং যাহা সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের ইচ্ছানুকূল নহে। সেরূপ ব্যবস্থা করিলে, শীঘ্র তাঁহার লোপ করিতে হইবে; নতুবা তাঁহার ক্ষমতা নষ্ট হইবে। ইংলণ্ডে, অলিভার ক্রমওয়েল যে চিরদিনের জন্য নূতন সামাজিক অবস্থা সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং পূর্ব্বতন ব্যবস্থা সকল যে আবার তাঁহার মৃত্যুর পরে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, সমাজের বৃদ্ধি বা উন্নতি কৃত্রিম নহে, কোন মনুষ্যকর্ত্তৃক চালিত হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের যে সকল অভাব ও ইচ্ছা থাকে, তদনুসারেই সমাজের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইবে। সুতরাং সমাজের অভাব ও ইচ্ছা সমাজের উন্নতির নেতৃস্বরূপ। এই অভাব পূরণ এবং এই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সমাজ আপনিই চলিবে; অন্যের প্রবর্ত্তনার আবশ্যকতা রাখিবে না। সমাজ চলিবে বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, সমাজের অন্তর্ভূত লোকগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে, সমাজের উন্নতি স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বাভাবিক; পরসম্পাদিত বা কৃত্রিম নহে। এইরূপে সমাজ প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরপরবর্ত্তী অবস্থাতে উপনীত হইবে। যখন সমাজের লোকসাধারণের হস্তে সমাজশাসন, তখনও সমাজ নিজে চলিতেছে। আবার যখন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রতিনিধিবর্গের হস্তে সমাজরক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তখনও সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত, নিজ অভাব ও ইচ্ছার অনুসারে চলিতেছে। কোন সমাজেই সমাজ অপর কোন মনুষ্যের করায়ত্ত নহে। অপর কোন ব্যক্তিই সমাজকে নিজের মত করিয়া গড়িতে পারিবেন না। আমি এই জন্তুটি আমার মনের মত করিয়া গড়িতে পারি, এবং সেই রকম প্রস্তুত

কতদূর সত্য। যে জাতির মধ্যে সবে সমাজের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের লইয়া আমাদের প্রস্তাব। এই সমাজ ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট ও উন্নত হইবে। এই বৃদ্ধি ও উন্নতি কাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়? ইহা কৃত্রিম, কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত; না ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত? আমরা বলি, সমাজ কাহার কৃত নহে, ইহা আপনা আপনি সংগঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজ কি চেতন পদার্থ যে, আপনার বৃদ্ধিসাধন আপনি করিবে। সমাজ কেবল কতকগুলি লোকের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ইহার বৃদ্ধি বা উন্নতি মনুষ্যের হস্তে নিহিত, মনুষ্যের সম্পাদ্য এবং কৃত্রিম। এরূপ আপত্তি করিলে আমরা বলিব যে, আমাদিগের প্রতিপক্ষেরা আমাদিগের কথার অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন নাই। অতএব আমরা আমাদিগের মত আরও বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইলে, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ আপনাদিগকে এক-শাসনসূত্রে বদ্ধ করিতে পারে এমন কোন শাসনশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করে। তাহারা বলে যে, আমাদের পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, যাহাতে একজনের সুখ হইবে, তাহাতে হয় ত আর একজনের দুঃখ হইবে; এবং পরস্পরের কার্য্যদ্বারা পরস্পরের স্বার্থহানি হইলে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইবে। গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে আর আমাদের একত্র অবস্থিতি করিবার সম্ভাবনা কোথায়, তাহা হইলেই আমাদের সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে এবং সকলকে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে আদেশ দিতে পারে এমন একজনকে আমাদের কর্ত্তা করা উচিত। ইঁহার হস্তে আমরা আমাদের সমাজের নিয়ন্ত্রী শক্তি দিব এবং ইনি সেই ক্ষমতা দ্বারা আমাদিগকে আদেশ-পালনে বিমুখ দেখিলে উচিত দণ্ডবিধান পূর্ব্বক উচিত পথে আনিতে পারিবেন। এই প্রকারে সমাজের উন্নতির সূত্রপত্তন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিকে সমাজ চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাঁহাকে সমাজের লোকেরা রাজা বলে। সমাজ-বন্ধনের প্রারম্ভেই রাজার হস্তে সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রী ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, না করিলে সমাজ চলে না এবং উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অতএব সমাজের প্রথম অবস্থায় একজন নেতা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইঁহারই আদেশ মত সমস্ত হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইবে এবং তাহাতেই সমাজের উন্নতি হইবে। কিন্তু সামাজিক উন্নতি যত অধিক হইতে থাকিবে, ততই সমাজের সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ক্ষমতা রাজার হস্ত হইতে সমাজের লোকসাধারণের হস্তে যাইবে, এবং সর্ব্বশেষে সমাজের শাসন

প্রজাতন্ত্রপ্রণালীমতে প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর সূত্রপাত হইলে, প্রজারা আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে এবং ঐ সকল প্রতিনিধির উপরেই সমাজশাসনভার ন্যস্ত হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে এই যে ক্রমিক উন্নতি, ইহা কে করিল। ইহা কৃত্রিম, কোন বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত; না ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বসম্পাদিত। আমাদিগের প্রতিপক্ষেরা বলিবেন যে, ইহা প্রথমাবস্থায় রাজাকর্ত্তৃক সম্পাদিত, পরে সমাজের লোকসাধারণকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং সর্ব্বশেষে প্রজাদিগের প্রতিনিধিবর্গকর্ত্তৃক সম্পাদিত। কিন্তু রাজা কে? রাজা কেবল সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সর্ব্বসম্মতিতে সমাজশাসন ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন মনুষ্যমাত্র। রাজা সমাজের ইচ্ছাকৃত, তিনি সমাজের অধীন। তিনি এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না, যাহা সমাজের অনিষ্টকর, যাহাতে সমাজের অমঙ্গল ঘটিবে এবং যাহা সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের ইচ্ছানুকূল নহে। সেরূপ ব্যবস্থা করিলে, শীঘ্র তাঁহার লোপ করিতে হইবে; নতুবা তাঁহার ক্ষমতা নষ্ট হইবে। ইংলণ্ডে, অলিভার ক্রম্‌ওয়েল যে চিরদিনের জন্য নূতন সামাজিক অবস্থা সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; এবং পূর্ব্বতন ব্যবস্থা সকল যে আবার তাঁহার মৃত্যুর পরে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, সমাজের বৃদ্ধি বা উন্নতি কৃত্রিম নহে, কোন মনুষ্যকর্ত্তৃক চালিত হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের যে সকল অভাব ও ইচ্ছা থাকে, তদনুসারেই সমাজের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইবে। সুতরাং সমাজের অভাব ও ইচ্ছা সমাজের উন্নতির নেতৃস্বরূপ। এই অভাব পূরণ এবং এই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সমাজ আপনিই চলিবে; অন্যের প্রবর্ত্তনার আবশ্যকতা রাখিবে না। সমাজ চলিবে বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, সমাজের অন্তর্ভূত লোকগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে, সমাজের উন্নতি স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বাভাবিক; পরসম্পাদিত বা কৃত্রিম নহে। এইরূপে সমাজ প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরপরবর্ত্তী অবস্থাতে উপনীত হইবে। যখন সমাজের লোকসাধারণের হস্তে সমাজশাসন, তখনও সমাজ নিজে চলিতেছে। আবার যখন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রতিনিধিবর্গের হস্তে সমাজরক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তখনও সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত, নিজ অভাব ও ইচ্ছার অনুসারে চলিতেছে। কোন সমাজেই সমাজ অপর কোন মনুষ্যের করায়ত্ত নহে। অপর কোন ব্যক্তিই সমাজকে নিজের মত করিয়া গড়িতে পারিবেন না। আমি এই দ্রব্যটি আমার মনের মত করিয়া গড়িতে পারি, এবং সেই রকম প্রস্তুত

করিলে ইহা আমার কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই দ্রব্যের রচনা সুতরাং কৃত্রিম হইল, ইহা আমার কৃতি, ইংরেজিতে বলিব, ইহা আমার "ম্যানু- ফ্যাকৃচর" (Manufacture) কিন্তু প্রাণি- দেহ অথবা বৃক্ষাদির বৃদ্ধি কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; উহা আপনাপনি বাড়ি- বেই বাড়িবে, তুমি যত কেন উহার ব্যাঘাত কর না। এইরূপ বৃদ্ধিকে কৃত্রিম বলা যায় না, ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত। ইংরেজিতে ইহাকে "গ্রোথ" (Growth) বলিবে। এক্ষণে Manufacture এবং growth এই শব্দদ্বয়ের যে কি প্রভেদ তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর বুঝাইতে আমাদের সাধ্য নাই, আমরা তাঁহার নিকট হার মানিলাম। যিনি আমাদের অর্থগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের সঙ্গে আসুন। আর যিনি আমাদিগকে হার মানাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া আবার লজ্জিত না করেন। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন ইংরেজিতে বলে "Society is a growth and not a manufacture." এবং ইহাই আমরা পূর্ব্বে "সমাজ কাহারও কৃত নহে, কিন্তু আপনাপনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে" এই বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়াছি। সমাজবিজ্ঞানের চর্চ্চা আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প বলিয়াই আমাদিগকে এত লিখিতে হইল, নতুবা আমরা দুই পংক্তিতেই আমাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম, এবং পাঠকগণকে এত কষ্ট দিতাম না।

অনেক বলেন যে ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ইংরেজদিগের মধ্যে এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ (Sir James Mackintosh) জেমস্ ম্যাকিণ্টস সাহেব বলিয়াছিলেন যে "constitution are not manc, but grow" অর্থাৎ কোন শাসনতন্ত্রই অন্যের দ্বারা কৃত, বর্দ্ধিত এবং উন্নীত হইতে পারে না কিন্তু আপনা আপনি বৃদ্ধি এবং উন্নতিলাভ করে, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। আবার এখনকার ইংরেজেরা বলিবেন যে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ম্যাকিণ্টসের এই সত্যপ্রচারে সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইদানীন্তন অবস্থাতে এই সত্যের চমৎকারিতা থাকুক বা না থাকুক ম্যাকিণ্টসের সময়ে সমাজবিজ্ঞানের ততদূর উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই যে তখন এই সত্যে লোকমন আকৃষ্ট না হইবে। তখন সমাজে সাধারণ শিক্ষার অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে উপরিউক্ত সত্যের প্রচার দ্বারা লোকে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। সে সময়ে সকলেই সর্ব্বত্র কৃত্রিমপদার্থ দেখিতে পা-

ইত, কেহই স্বতঃপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধি স্বীকার করিতে চাহিত না। অর্থাৎ সকলেই manufacture মত মানিত, কেহই growth মত মানিত না। তাহাদিগের মধ্যে ইহাই প্রচলিত মত ছিল যে ঈশ্বর গ্রহগণকে স্বহস্তে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এরূপ বেগবিশিষ্ট করিয়াছেন যে তাহারা সূর্য্যের আকর্ষণানুসারে স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতে পারে। আমরা যেমন কোন কার্য্য করিয়া শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করিয়া থাকি, তদ্রূপ ঈশ্বরও পৃথিবীর সৃষ্টি,জলস্থলবিভাগ, জীবসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। আমরা যেমন মাটির পুতুল গড়িয়া থাকি, ঈশ্বরও তদ্রূপ মনুষ্যকে গড়িয়াছিলেন। যে সমাজে এই সকল মত প্রচলিত ও আদৃত ছিল, সে সমাজের লোকে ম্যাকিণ্টসের সত্যপ্রচারে আশ্চর্য্য হইবে তাহার বৈচিত্র কি? তাহারা মনে করিত যে হয় ঈশ্বর স্বয়ং সমাজকে উন্নতির পথে চালাইতেছেন, না হয় ব্যবস্থাপকদিগের রাজবিধি দ্বারা সমাজ চালিত হইতেছে, অথবা এতদুভয়ের দ্বারাই সমাজ বর্দ্ধিত ও উন্নীত হইতেছে। ম্যাকিণ্টস নূতন কথা বলিলে তাহারা কেন বিস্মিত না হইবে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান নাকরিবে।

সমাজ যে কৃত্রিমরূপে সজ্জিত ও লিত নহে তাহা এক্ষণে অনেকে বুতে পারিয়াছেন এবং অনেকেই বলিতেছেন যে এতদিন এ সত্য কেন প্রকাশ হয় নাই। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, ইতিহাস পাঠের অতি সামান্য ফল ফলিয়াছে। আমরা যদি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা দেখি, কিম্বা কি রূপে সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে কোন অলৌকিক ঘটনা অথবা কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিতে পারে না এবং ইহাই আমাদের প্রতীতি হইবে যে সামান্য স্বাভাবিক কারণ হইতেই সমাজের উন্নতি হইয়াছে। সমাজে পরিশ্রম বিভাগ এবং কার্য্যবিভাগ (division of labour) পর্য্যালোচনা করিলেই এই সত্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সমাজে কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ কৃষির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে এবং কতকগুলি লোক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কিছু রাজার আদেশে ঘটে না, তবে তাহারা নিজ নিজ অভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করে। কেহ কাহার মুখাপেক্ষা করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের আবশ্যকমত সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে সুতরাং কেহ কোন কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে না এবং কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না। কিন্তু সমাজবন্ধন

হইলে সমাজস্থ লোকেরা পরস্পরের মুখাপেক্ষা না করিয়া, পরস্পরের সাহায্য না লইয়া কোন ক্রমেই থাকিতে পারে না। ইহাই মনুষ্যের স্বভাব এবং এই জন্যই সমাজ আপনাআপনি উন্নত হয়। তাহারা আপনাদিগের মধ্যে সমুদায় কার্য্য বিভাগ করিয়া লয় এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করে। এইরূপে কার্য্য করিলে সকলেরই উপকার হয় এবং সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকে। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ও মিসরদেশে এই কার্য্যবিভাগপ্রণালী দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহাই সমাজের প্রকৃতি যে ইহার অন্তর্গত লোকেরা নিজ নিজ অভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পরস্পরের সহায়তা করিবে। ইহা কোন বাহ্য বল প্রয়োগ দ্বারা করাইবার নহে। এই কারণেই ইংলণ্ড দেশে সহস্র সহস্র লোক ম্যাঞ্চেষ্টারে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, ইয়র্কসারে পশমীর কাপড় তৈয়ার করিতেছে, ষ্টাফোর্ড সারে মৃত্তিকার ও কাচের বাসন নির্ম্মাণ করিতেছে, সেফিল্ডে ছুরি কাঁচি প্রস্তুত করিতেছে এবং বারমিঙহামে লৌহের জিনিসপত্র গড়িতেছে। ইহা কিছু কাঁহার হুকুমে তাহারা করিতেছে না, তবে নিজের অভাব পূরণার্থ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অভিলাষ সাধনে যত্নশীল, কেহই পরিশ্রমবিভাগ বা কার্য্যবিভাগের জন্য ব্যস্ত নহে, তথাপি সমাজে পরিশ্রমবিভাগ বা কার্য্যবিভাগ প্রচলিত হইতেছে এবং নিঃশব্দে ও অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যেমন বীজ হইতে কলা নির্গত হইলে কেহ তাহা লক্ষ্য করে না কিন্তু ঐ কলা নিঃশব্দে ও অলক্ষিতভাবে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ কার্য্যবিভাগ যখন প্রথমে সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল তখন কেহই ইহা জানিতে পারে নাই, কিন্তু এক্ষণে ইহা পূর্ণাবয়ব হইতেছে সুতরাং সকলের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। এই পরস্পরসাপেক্ষতা যদি সমাজে না প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে কি সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলিত? সমাজ এইরূপে সমবেত হইয়া কার্য্য করে বলিয়াই সকলের অভাবমোচন ও ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে। আজ যে সমাজের সর্ব্বত্র সুখস্বচ্ছন্দ বিরাজমান, উন্নতি পরিবর্দ্ধমান; তাহার প্রধান কারণ এই যে কাল আমরা স্থির করিয়াছি যে পরস্পরের সহায়তা করিব এবং সকলে সমবেত হইয়া সকলের উপকার সাধিব। কিন্তু যদি আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আর তাহা করিব না, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, অনেক ব্যক্তিকেই শমনভবন দেখিতে হইবে এবং সমাজের

সোণার মূর্ত্তি কালী হইয়া যাইবে। সমাজের এই সমস্ত অত্যাবশ্যক এবং প্রকাশ্য বন্দোবস্ত যদি স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন হয়, তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের গতি স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রবৃত্ত, অন্যচালিত নহে। সমাজের প্রধান প্রধান শৃঙ্খলাগুলি যদি স্বভাবাগত ও স্বতঃউৎপাদিত হইল, তবে অপ্রধান সামাজিক শৃঙ্খলাগুলিও যে স্বাভাবিক হইবে তাহার আর বিচিন্ত্য কি?

এস্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাজবিধি অর্থাৎ আইনকানুন দ্বারা যে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় growth না manufacture? পার্লেমেণ্ট মহাসভা, সুপ্রিম কৌন্সিল বা লেজিসলেটিব কৌন্সিল কতকগুলি বিধি প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং সকলকে সেই সকল ... পালন করিতে আদেশ দিলেন। ইহা দ্বারা সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, এবং সমাজ উন্নতিপথে পদার্পণ করিল। সমাজের এ বৃদ্ধি কৃত্রিম কি স্বাভাবিক, manufacture কি growth? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, আমরা যে সত্যামত সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ইহা তাহার প্রতিকূল তর্ক নহে, এই পরিবর্ত্তনসমূহও আমাদের মতের সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। যদি উক্ত পরিবর্ত্তন সকল চারি দিনের জন্য হয়, তবে সে ...ল পরিবর্ত্তনই নহে, এবং সমাজের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যদি ঐ সকল পরিবর্ত্তন বাস্তবিক এবং নিত্য হয়, অর্থাৎ প্রকৃতরূপে এবং চিরদিনের নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের কথা সত্য, যে হেতু ঐ সকলও সমাজের স্বকৃতি, রাজবিধির কার্য্যকারিতা নামমাত্র। ব্যবস্থাপকদিগের আদেশানুসারে ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যবস্থাপকদিগের উক্তরূপ আদেশ করিবার প্রকৃত কারণ কি? তাঁহারা সমাজের যেরূপ অভাব দেখিয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান জন্য ঐ সমস্ত আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং মূলে সেই সমাজের অভাব ও প্রবৃত্তি রহিয়াছে, সমাজের উপযোগী না হইলে কোন আইনকানুন প্রচলিত হইতে পারে না। সমাজস্থ লোকদিগের অভাব ও প্রবৃত্তি হইতেই যদি পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনসমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তবে সমাজই উহাদের প্রকৃত প্রবর্ত্তক কারণ, ব্যবস্থাপকগণ কেবল নামমাত্র প্রবর্ত্তক। অতএব সমাজের বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন ও উন্নতি যে সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তি হইতে প্রবৃত্ত হয়, কোন বাহ্য কারণে পরিচালিত হয় না, সে পক্ষ অব্যাহত রহিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীকৃত হইল। সমাজের গতি, বৃদ্ধি, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি যাহাই বল, সামাজিক অভাব ও ইচ্ছা সকলের মূলে। এই অভাব ও ইচ্ছা হইতেই সমাজের উপকারক ব্যবস্থা সকল প্রব-

সমাজের তুলনা করিলে আরও ভাল হইত। মনুষ্যের শরীর বা মনুষ্যের মনের সহিত সমাজের অঙ্গগত সাদৃশ্য স্বীকার করিবার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ের উপর অধিক লেখনীসঞ্চালন করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ ইহা গতানুশোচনা। শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে এই পর্য্যন্ত। প্লেটো সমাজের গঠন ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় কৃত্রিম বলিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির সাধারণতন্ত্রসমাজে ideal এই যে মনুষ্যেরা জ্ঞাতসারে এই সমাজ নির্ম্মাণ করে এবং তাঁহার মতে অন্যান্য সমাজও এইরূপ কৃত্রিমভাবে সংগঠিত হয়। এটীও ভ্রমাত্মক মত, তাহা আর পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না, কারণ আমরা পূর্ব্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া সমাজের স্বতঃপ্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক উন্নতি প্রমাণিত করিয়াছি। অতএব চর্ব্বিতচর্ব্বণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। প্লেটোর মত নির্দ্দোষ না হউক, তিনি যে এই চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং চিন্তাশীল সুধীবর্গের চিত্ত এ দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এই জন্যই তিনি আমাদিগের আন্তরিক বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। সমাজবিজ্ঞানশাস্ত্রের সূত্রপাত যে তাঁহার এই চিন্তা হইতে, উহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে?

প্লেটোর মত বুঝাইতে এতক্ষণ গেল, এখন আর একজন দার্শনিক (Hobbes) এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইনি প্লেটোর ন্যায় মনুষ্যমনের সহিত সমাজের তুলনা করেন নাই, মনুষ্যশরীরের সহিত সমাজশরীরের তুলনা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাজসংগঠন সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিবার প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছেন "যে সাধারণতন্ত্র সমাজ এবং মনুষ্যের শরীর একরূপ, সাধারণতন্ত্র সমাজকে একটী বৃহৎ কৃত্রিম মনুষ্য বলিলেও চলে। স্বাভাবিক মনুষ্যের আয়তন ও বল অতি অল্প, কিন্তু এই কৃত্রিমমনুষ্যের বল ও আয়তন অত্যন্ত অধিক, যে হেতু ইহা স্বাভাবিক মনুষ্যের রক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণতন্ত্র সমাজে আধিপত্য অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা প্রাণস্বরূপ, কারণ ইহা দ্বারাই সমস্ত সমাজের স্থিতি ও গতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া থাকে। প্রাণহীন হইলে মনুষ্যের শরীর অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সমাজেও শাসনশক্তির অভাব হইলে নানাবিধ গোলযোগ ঘটে। মাজিষ্ট্রেট, বিচারক এবং অন্যান্য শাসনকার্য্যনির্ব্বাহকেরা সমাজশরীরের গ্রন্থি স্বরূপ। পুরস্কার এবং দণ্ড সমাজের শিরাস্বরূপ, কারণ সমাজের গ্রন্থি এবং অঙ্গ সকল ইহাদের দ্বারা শাসনশক্তির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে। মনুষ্যশরীরে শিরা সকলের যে উপযোগিতা এবং উপকারিতা, সমাজে দণ্ড ও পুরস্কারের সেই উপযোগিতা এবং উপকারিতা। সমাজের ধনিকবৃন্দের ধনসম্পত্তি সমাজের বল-

স্বরূপ ; সমাজান্তর্গত ব্যক্তিদিগের সুখ ও শান্তিবিধান সমাজশরীরের কার্য্যস্বরূপ ; মন্ত্রিবর্গ (যাঁহারা সমাজের আবশ্যক কর্ত্তব্য সকলের উপদেশ প্রদান করেন,) সমাজশরীরের স্মৃতিশক্তিস্বরূপ ; ন্যায়পরতা এবং আইনকানুন, বিবেক ও ইচ্ছা স্বরূপ ; সমাজের মিল ও শান্তি, স্বাস্থ্যস্বরূপ ; সমাজবিপ্লব, পীড়াস্বরূপ ; এবং আভ্যন্তরিক যুদ্ধবিগ্রহাদি সমাজশরীরের মৃত্যুস্বরূপ।" Hobbes এই বিষয়টী যেরূপ বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ উপরি নিকৃষ্ট মর্ম্ম হইতে বুঝিতে পারিতেছেন। তথাপি আমরা original টি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"For by art is created that great Leviathan called a *Commonwealth* or *state*; in Latin *Civitas*, which is but an artificial man; though of greater staure and strength than the natural, for whose protection and defence it was intended, and in which the *sovereignty* is an artificial *soul*, as giving life and motion to the whole body; the *magistrates* and other *officers* of judicature and execution, artificial *joints*; reward and punishment, by which, fastened to the seat of sovereignty, every joint and member is moved to perform his duty, are the *nerves*, that do the same in the natural body; the *wealth* and *riches* of all the particular members are the *strength*; *salus populi*, the *peoples safety*; its business; *counsellors* by whom all things needful for it to know are suggested unto it, are the *memory*; *equity* and laws, an artificial *reason* and will; *concord*, health; *sedition*, *sickness*; *civil-war*, *death*." The works of Thomas Hobbes. Edited by Sir. William Molesworth, London.

সমাজরূপ প্রকাণ্ড কৃত্রিম মনুষ্য, যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনুষ্যসমূহদ্বারা নির্ম্মিত, এবং প্রকৃত মনুষ্যের তুলনা করিয়া গিয়া Hobbes সমাজশরীরের একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং উভয়ের সাদৃশ্য আনুপূর্ব্বিকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি এই চিত্র এবং প্লেটোর চিত্র ভিন্নপ্রকার ও পরস্পরবিরুদ্ধ, তথাপি আমরা হবসকেই অধিক প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছি। কিন্তু উভয়টিই অসঙ্গতিপরিপূর্ণ এবং আত্মবিরোধবিশিষ্ট। ইহাদের অংশগুলির পরস্পর মিল নাই, এক অংশ আর এক অংশের বিরোধী। যদি আধিপত্য বা শাসনশক্তি সমাজের প্রাণস্বরূপ হইল; তাহা হইলে মাজি-

ষ্ট্রেট প্রভৃতিরা কিরূপে গ্রন্থি হইতে পারেন, কারণ তাঁহারা ত শাসনকর্ত্তৃদিগের প্রতিনিধি ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যদিই মাজিষ্ট্রেটগণ গ্রন্থি হইলেন, তথাপি পুরস্কার ও দণ্ড কিরূপে শিরা হইল। সমাজশরীরের গ্রন্থিসকল যদি ব্যক্তি হয়, তবে শিরা সকল কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহারা ব্যক্তি হইতে পারিবে না। শিরা সকল সমাজের একশ্রেণীর লোক হওয়া উচিত। দণ্ড ও পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির স্থানীয় হইতে পারে না, বরং সেই ব্যক্তির অবস্থা হইতে পারে। এতদনুসারে দণ্ড এবং পুরস্কারকে শিরার সহিত তুলনা না করিয়া, শিরার অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই ভাল হইত। আর স্মৃতিশক্তি, বিবেকশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এই তিনটি মানসিকশক্তির সহিত সমাজের মন্ত্রিবর্গ ন্যায়পরতা এবং আইনকানুনের উপমা দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। এরূপ বিজাতীয় উপমা হইতে কোন ফললাভ নাই। মন্ত্রিবর্গ একদল সাধারণ কর্ম্মচারী, এবং অপর দুইটী কেবল ভাবমাত্র। উপমাগুলি কেবল মানসিকশক্তি, কিন্তু উপমেয়গুলির একটি কর্ম্মচারী মনুষ্য, এবং অপর দুইটি যে কি বলিব, তাহা বলিতে পারি না। অতএব এ উপমা সমীচীন নহে। আমরা প্লেটোর উপমার যে দুই দোষ দেখাইয়াছি, হব্‌সের উপমারও সেই দুইটি দোষ রহিয়াছে। Hobbes সমাজের কৃত্রিমতা অধিকতর স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন, "For by art is created &c." এবং ইহাদ্বারা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি সমাজসংগঠন সম্বন্ধে কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কেবল সমাজসংগঠন কৃত্রিম বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আরও বলেন যে, সমাজবন্ধন হইলে, সামাজিক লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে যে একটা বন্দোবস্ত (social compact) করে, তাহাও কৃত্রিম। তিনি এই বন্দোবস্তকে মনুষ্যসৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

প্লেটোর মত সমালোচন করিতে আমরা যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি; হব্‌সের মত সমালোচনাস্থলেও তাহাই বলিব। সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। সমাজকে মনুষ্যের মন বা শরীরের সহিত তুলনা করাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু সমাজকে নানানা যন্ত্র বা কলের মতন কৃত্রিম বলাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে: যেহেতু এই ভ্রমাত্মক মত জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে চালাইয়াছে। এই সকল ভ্রান্ত চিন্তারও বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহাদ্বারা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, সমাজের এবং মানবশরীরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বোক্ত দুইজন দার্শনিক পণ্ডিত এই সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে কৃত-

কার্য্য হন নাই বলিয়া, আমরা সাদৃশ্য অস্বীকার করিতে পারি না। জীবতত্ত্বের (Biology) আলোক তখন প্রকাশ হয় নাই। অধুনা বিজ্ঞানের প্রভাবে নিরূপণ করা যাইতে পারে যে, সমাজশরীর এবং প্রাণিশরীরের সাদৃশ্য কি। কোন জীবের শরীর কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উন্নত হয়, এবং সমাজ কিরূপে বৃদ্ধি ও উন্নতিলাভ করে, এই দুই বিষয়ের পর্য্যালোচনা আজ কাল অনায়াসে হইতে পারে। সে পর্য্যালোচনা আজ করিতে গেলে, পাঠক আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, এবং এক নীরস সমাজ সংগঠনতত্ত্বের উপর দুই ফর্ম্মা আর্টিকেল দেখিলে, হয় ত বঙ্গদর্শনের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া লইবেন। সমাজ সংগঠন বিষয়ে অনেক কথা বলিতে বাঁকি রহিল, এবং আর একদিন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমরা আজিকার মতন লেখনীকে বিশ্রান্ত করিলাম।

র স।
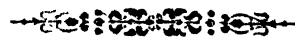
নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য।

একণে ইংলণ্ডে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৭৫খানি কথাগ্রন্থ। কেহ বা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, কেহ বা নীতি সংশোধনের নিমিত্ত, কেহ বা কোন পলিটিকেল উদ্দেশ্য সংসাধনের অভিপ্রায়ে, কেহ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-তত্ত্বসমূহ সাধারণের আয়ত্তীকৃত করিবার জন্য কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। আমাদের দেশের লেখকেরাও কমলিনী, কুমুদিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া, নানাপ্রকারের কথাগ্রন্থ বাহির করিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে কথাগ্রন্থ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

উপাখ্যান লিখিবার তিনটি প্রধান প্রণালী প্রচলিত আছে, যথা—নাটক, আখ্যায়িকা ও কথাগ্রন্থ। নাটকে শুদ্ধ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্ত্তা কহেন। সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য্য এই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অন্তরালে থাকিয়া, এই সকল ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন। আখ্যায়িকায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের প্রায় সাক্ষাৎ হয় না। কথাগ্রন্থ এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী। ইহার কিয়দংশে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্ত্তা কহেন; কিন্তু অন্য অন্য অংশে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং আমাদিগকে সমস্ত

বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। নাটক লেখা যত শক্ত হউক বা না হউক; নাটক সম্যক্‌প্রকারে বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কে কি চরিত্রের লোক, কিজন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইঁহারা ভিন্ন ভিন্নপ্রকারে কার্য্য করেন; সে সমস্ত বুঝিবার জন্য অনেক জ্ঞান, অনেক চিন্তার প্রয়োজন। কথাগ্রন্থলেখক এই জ্ঞান ও এই চিন্তার সম্বন্ধে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। গ্রন্থের যে যে অংশ আমরা বুঝিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তিনি সেই সেই অংশগুলি আমাদের নিকট অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং নাটক বুঝা অপেক্ষা কথাগ্রন্থ বুঝা অধিকতর সহজ হইয়া উঠে। যাহা সহজে বুঝা যায়, তাহাতে অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে পারা যায়। এইজনাই দেখিতে পাওয়া যায় যে,সকল দেশেই কথাগ্রন্থের সৃষ্টি হইলে আর নাটক বা আখ্যায়িকার সমধিক আদর থাকে না। আখ্যায়িকায় সমস্ত বস্তুই গ্রন্থকর্ত্তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন। সুতরাং নাটকে যেরূপ নাট্যোল্লিখিত ক্রিয়ার বা ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আখ্যায়িকায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আখ্যায়িকা অপেক্ষা নাটকে অধিকতর আমোদ আছে।

কথাগ্রন্থ নূতন সৃষ্টি। সংস্কৃতে অধিকাংশ গ্রন্থই কবিতায় লিখিত হইত। যে কয়খানি গদ্য গ্রন্থ আছে, তাহাদের অধিকাংশই আখ্যায়িকা। কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃতে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু, নাটক ও আখ্যায়িকামিশ্রিত কোন কথাগ্রন্থ সংস্কৃতে ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ইংলণ্ডেও কথাগ্রন্থের অতি অল্পদিনমাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডের উপাখ্যান সমস্ত আখ্যায়িকার প্রণালীতে লিখিত হইত। এই সকল আখ্যায়িকায় বড় বড় রাজার ও বীরপুরুষের বীরকীর্ত্তি সমস্ত বর্ণিত হইত। ইংলণ্ডে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু কেবল ডিফোর (De Foe) সময় হইতে বর্ত্তমান প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন, যে নাটক লিখিবার জন্য যেরূপ প্রতিভা বা ক্ষমতার প্রয়োজন, এক্ষণে মনুষ্যের আর সেরূপ ক্ষমতা বা প্রতিভা নাই। কথাগ্রন্থে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা অপেক্ষা, এই প্রতিভা অনেক অংশে ন্যূন। এইজনাই এক্ষণে আর নাটক লিখিত হয় না। মনুষ্যের প্রতিভা দিন দিন কমিতেছে, এক্ষণে ইহা কথাগ্রন্থ পর্য্যন্ত যাইতে পারে, নাটক পর্য্যন্ত যাইবার ক্ষমতা আর ইহার নাই। এই মতটি আমার সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সেক্ষপীয়রকে ছাড়িয়া দিলে যে সকল নাটককার অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে প্রতিভাসম্বন্ধে ফিল্ডিং, ডিকেন্স,

প্যাকারে প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট তাহা আমাদের বোধ হয় না। ফলতঃ কথাগ্রন্থ নাটকের ন্যায় সমান আমোদ প্রদান করে। নাটকে যে যে উপদেশ পাওয়া সম্ভব, কথাগ্রন্থেও সেই সেই উপদেশ পাওয়া যায়। তবে এক কথা এই যে, নাটক সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। কথাগ্রন্থ সকলে সহজে বুঝিতে পারে। এজন্য লোকে নাটকের আদর না করিয়া কথাগ্রন্থের আদর করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে যতদিন কথাগ্রন্থের প্রকাশ ছিল না, ততদিন নাটকের অতি সমাদর ছিল। কিন্তু কথাগ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অবধি নাটক ক্রমশঃ হতাদরই হইতেছে।

আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু হইতে কথাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগ্রন্থ ইংরেজি কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ। ইহাতে অনেক স্থলে ইংরেজি চরিত্র, ইংরেজি ভাব এমন কি ইংরেজি ভাষা পর্য্যন্ত* অনুকরণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাগুণে এই অনুকরণের মধ্যেও নানাপ্রকারের সৌন্দর্য্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পর হইতেই বাঙ্গালায় নভেলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরেজিতে রোমান্স। ইহা বীররসপ্রধান। ইহাতে যুদ্ধ,বিগ্রহ, রাজা, বীরপুরুষ, রাজকীর্ত্তি, বীরকীর্ত্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়। বাঙ্গালায় দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গাধিপপরাজয়, শতবর্ষ প্রভৃতি কথাগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থে প্রাকৃত ঘটনা সমস্ত বর্ণিত হয়। যে সকল ঘটনা আমরা আমাদের মধ্যে নিত্য দেখিতে পাই, সেইগুলি এইরূপ কথাগ্রন্থে আমাদের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাসিত হয়। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, স্বর্ণলতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

পাঠকের মনোরঞ্জন করা এই মাত্র পূর্ব্বে উপাখ্যান লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনা সমস্ত বিবৃত হইত। এখনও ইউরোপে যুদ্ধপ্রিয়তা কমে নাই। সুতরাং যুদ্ধবর্ণনা ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের প্রধান উপাদান। বাঙ্গালা কথাগ্রন্থ ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং বাঙ্গালা কথাগ্রন্থেও যুদ্ধাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে ডন্ কুইক্সটের প্রণালীর যুদ্ধপ্রিয়তা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। শীর্ণ বঙ্গীয়-

---

*দুর্গেশনন্দিনী "যদি সেই সময়ে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর চমকিত হইতেন না।" ইংরেজি অনেক নভেলে ঠিক এই ভাবটি এই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

যুবক আপনাকে জগৎ সিংহ বা হেমচন্দ্রের অবস্থায় উপস্থাপিত করে, এবং এইরূপে লোকের নিকট অতীব উপহাসাস্পদ হয়। "ভারত-উদ্ধার" লেখক এ বিষয়ের সাক্ষী। পাঠকের মনে পড়িতে পারে

"খঁটাইয়া দিব আজি পাষণ্ড ইংরেজে"

কিন্তু রোমান্স পাঠে যে এককালেই কিছুমাত্র লাভ নাই তাহা নয়। ইহাতে কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনাবশতঃ একরূপ অদ্ভুত আনন্দ জন্মে। যুবকেরা যে কি আনন্দের সহিত স্কটের "আইভান্‌হো" বা বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ করে, তাহা মনে হইলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিক। ইহার ফলবত্তা অতি অল্পই আছে। যাহা কিছু ফলবত্তা আছে, তাহাও বোধ হয়, অনিষ্টের দিকে। কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনা হওয়াতে বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাসতা হয়। এবং বস্তুর যথার্থ ব্যবহার না দেখিয়া, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব প্রভৃতি দেখিতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক অনেক কার্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। মনুষ্য আপনাকে অত্যন্ত উন্নত করিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে মাত্র, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তাহার নিজের বা সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, উপকারও হয় না, কেবল পদে পদে মনস্তাপ পায়।

কথাগ্রন্থের আলোচনায় লাভালাভের বিচার দেখিয়া হয় ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, নভেল, গল্পের বই। নদীর স্রোতের মত ইহাতে গড়াইয়া যাইব। ইহাতে আবার লাভালাভ দেখিব কি? ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হইবে, তাহাতে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত করিলে, ধান ভানিতে শিবের গীত করা হয়। যদি এই মতটি সত্য হয়, তাহা হইলে নভেলের সংখ্যা যে এত বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর বলিতে হইবে। নৃত্য, গীত প্রভৃতি যে সকল কলায় শুদ্ধ আমোদানুভব হয়, সংসারে তাহাদের নভেলের মত আদর নাই। প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা নৃত্য গীতে অতি অল্প সময় ব্যয়িত করেন। কিন্তু নভেল লেখায় বা নভেল পড়ায় অনেক মহা মহা পণ্ডিত আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যদি নভেল শুদ্ধ আমোদের বস্তু হয়, তাহা হইলে ইহার এত আদর কেন? এক্ষণে "ব্যবহারোপযোগিতা" লইয়া ইংলণ্ড একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছেন। সেখানে শুদ্ধ আমোদের বস্তুর এত আদর কেন? ফলতঃ, যদিও অনেক নভেল কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে সারবত্তা না থাকিলে, নভেল কখনই শিক্ষাবিষয়ে এত উচ্চ স্থান পাইত না। নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।

ইহাতে কেহ হয় ত আপত্তি করিবেন, যে "সত্য বর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য।

লাভালাভ বিচার তাহার উদ্দেশ্য নহে। এই পৃথিবীতে আমরা যে বস্তু যেরূপ দেখিতে পাই, সেই বস্তুটী যথাযথরূপে বর্ণিত করিলেই উপন্যাসলেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ফিল্ডিংএর টম্ জোন্স এই-রূপ নভেলের দৃষ্টান্ত। টম্ জোন্স যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। নভেল লিখিতে হইলে, এইরূপেই লেখা উচিত।" কিন্তু সত্য দুই প্রকার, আংশিক সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য। কোন উকীল যে কখন স্পষ্ট মিথ্যাকথা কহেন, এমত নহে। তিনি যতদূর বলেন, ততদূর সত্য। কিন্তু তিনি সমস্ত কথা বলেন না। মনে করুন,আপনি বলিলেন, "চোর সিঁধ দিল, ধরা পড়িল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিল, পথে কোন বিপদ ঘটিল না, বাড়ীতে আসিয়া অপহৃত ধন লইয়া সে গাড়ী, ঘোড়া করিল, সকলের নিকট সম্মানিত হইল।" যদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আপনি ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে আপনি সত্যের আংশিক বর্ণনা করিলেন। কারণ চোর অনেক সময় ধৃত হয়, জেলে যায়, বহুতর কষ্ট পায় এবং কখন কখন দ্বীপান্তরিত হয়। যেখানে সত্যের আংশিক বর্ণনা সেখানে নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা। কারণ সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া অতীব কঠিন। মিথ্যা বর্ণনা সকল সময়ে অবি-ধেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যার প্রায় কাহারও অনিষ্ট হয় না। কারণ লোকে অক্লেশে তাহার মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে। প্রণয় নভেলের পরম পদার্থ। এই প্রণয়ের বর্ণনা নভেলে নিম্নরূপে প্রকটিত হয়—"যুবক যুবতী উভয়ে অতীব রূপবান্, অতীব গুণবান্। যুবক পুরুষদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট, নারী যুবতীদিগের সর্ব্বোৎ-কৃষ্টা। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। যে কারণেই হউক উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিল। তাহার পর উভয়ে সংসারের সমস্ত বস্তু উপেক্ষা করিতেছেন, পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করিতেছেন, হয় ত কোন সময়ে উভয়ে কোন কোন অসৎ কর্ম্মও করিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পরে উভয়ের বিবাহ হইল।" এখানেই অনেক নভেলের সমাপ্তি হয়। যতদূর ইহাতে বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহাতে সকল কথা বলা হয় নাই। বিবাহের পর যুবক যুবতী অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, সংসারের অনেক প্রলো-ভন অনেক বিঘ্ন বিপদ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহারা আপন আপন পূর্ব্ব চরিত্র অনুসারে সুখী বা দুঃখী হইয়া জীবন অতিপাত করে। সুতরাং যাহারা যুবক যুবতীর বিবাহ দিয়াই নভেলের সমাপ্তি করেন, তাঁহারা মনুষ্য-হৃদয়ের একমাত্র অংশ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অপর সমস্ত অংশের মনোহারিত্ব কমাইয়া দেন।

আর এক কথা, কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা কি কোথাও নির্ব্বিবাদে

স্থিরীকৃত হইয়াছে। তুমি যাহাকে সত্য বল, আমি তাহাকে মিথ্যা বলি, তুমি যাহা স্বাভাবিক বল, আমি তাহা কাল্পনিক বলি।* তবে তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া মনে কর, শুদ্ধ সেইরূপ অনিশ্চিত সত্যের জন্য আমার সুখের আশা কেন হারাইব।

আর এক কথা, সত্য বলিতে হইবে কেন? সত্য বলায় লাভ আছে, অসত্য বলায় অনিষ্ট আছে। সুতরাং সত্যাসত্যের বিচার প্রকারান্তরে লাভালাভের বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, যে স্বভাববর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। রূশো এই স্বভাববর্ণনার প্রবর্ত্তক। মনুষ্য স্বভাবতঃ যেরূপ, তাহাই বর্ণনা করিতে হইবে। কেন? মনুষ্য স্বভাবতঃ অতি সুন্দর স্বভাবের বাহাত্ম করিলেও অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। সুতরাং এ স্থলেও লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে কিন্তু ইহাতে নানারূপ আপত্তি আছে। আমরা স্বভাবতঃ সুন্দর স্বভাব কি না তাহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। সে সকল তর্কের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে লাভালাভের বিচার কথাগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে রোমান্স পাঠে অধিক লাভ হয় না। ইহাতে কেবল কল্পনাশক্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় মাত্র। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে যে কিছু পরিবর্ত্তন জন্মে, তাহার অধিকাংশই অনিষ্টের দিকে। এ জন্যই এক্ষণে আর রোমান্সের সহিত সাধারণতঃ মনুষ্যের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ পাঠে কোনরূপ লাভ হয় কি না। আমাদের দেশের কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ ইংরেজী কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং আমাদের কথাগ্রন্থের লাভালাভ বিচার করিতে হইলে ইংরেজী কথাগ্রন্থ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ (আমরা ইহার নাম গার্হস্থ্য কথাগ্রন্থ রাখিলাম) পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজের অবস্থা অনুসারে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও পরিবর্ত্তিত হয়। যখন সমাজ ধর্ম্মপরায়ণ, তখন মনুষ্যের রচনায় ধর্ম্মের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন সমাজ অধঃপতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মনুষ্যের রচনাতেও এই অধঃপাতের লক্ষণ দে-

---

* সিজউইক্ লাভালাভ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন তুমি যাহাকে লাভ বল, আমি তাহাকে অলাভ বলি, আবার তুমি যাহাকে অলাভ বল, আমি তাহাকে পরম লাভ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যাসত্য বুঝিতে মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ বিসম্বাদিতা, লাভালাভ সম্বন্ধে, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

খিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড যখন ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত তখন "মিল্টন্" তাঁহার "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখেন। আবার যখন নীচপ্রকৃতি দ্বিতীয় চার্লস ফ্রান্সের উচ্ছৃঙ্খলতা ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করেন, তখন ড্রাইডেন তাঁহার "All for love" প্রভৃতি জঘন্য অপাঠ্য নাটক লিখেন। যাঁহারা এই সমাজস্রোতে গড়াইয়া যান, তাঁহারা পরবংশীয়দিগের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যাঁহারা সমাজের অবনতি দেখিয়া সমাজস্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজকে সুপথে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই সর্ব্বসাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র। যখন ড্রাইডেন, উইচাবলি, কন্‌গ্রিভ প্রভৃতি জঘন্য জঘন্য গ্রন্থ লিখিয়া সমাজকে উৎসন্ন দিতেছিলেন, সেই সময়ে জেরিমি কলিয়ার এইরূপ সমাজ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন।

এক্ষণে ইংলণ্ডে অর্থোপার্জ্জনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। গাড়ী, ঘোড়া, ঘর, বাড়ী, অলঙ্কার, পোষাক প্রভৃতি ভোগবিলাস সকলের একমাত্র ধ্যেয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে অনেকটা কঠোরহৃদয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে "চক্ষুলজ্জা যাঁর অর্থ নাশ তাঁর।" ইংলণ্ড অনেক দিন হইতে এই চক্ষুলজ্জার মাথা খাইতেছেন। কর্ত্তব্যাকার্য্যের জন্য (অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের জন্য) ইংলণ্ড সকল প্রকার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ইংলণ্ডে কঠোরহৃদয়তার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে এই কঠোরহৃদয়তার হ্রাস হয়, ইংলণ্ডের নভেলিষ্টগণ সেই চেষ্টা করিতেছেন। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে অন্ততঃ একজন কঠোরহৃদয় অর্থপিশাচ আছে। ইহারা সকলেই নানারূপ কষ্টে পড়িয়া শেষদশায় অত্যন্ত যাতনা পাইয়া, সকল লোকের নিকট অবমানিত হইয়া, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া, কেহ বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই রূপ চরিত্রবর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য কঠোরহৃদয়তার এই সকল ফল দেখিতে পাইয়া আর কঠোরহৃদয় হইতে চাহিবে না। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে আর একটী চরিত্র বর্ণিত আছে।* ইহাদের অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাদর। ইহারা স্বকীয় সহৃদয়তার বলে নানারূপ সুখসম্ভোগ করতঃ অবশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে মনুষ্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থের প্রতি অনাদর হইবে এবং কঠোরহৃদয়তার স্থলে কিঞ্চিৎপরিমাণে সহৃ-

* "নিকোলাস্ নিকল্‌বির" "র‍্যাল্‌ফ নিকলবি" ও "নিকলাস নিকলবির" কথা পাঠক মহাশয়ের মনে পড়িতে পারে।

হৃদয়তা আসিবে। ডিকেন্সের উপদেশ এই—"অর্থের লোভে কঠোরহৃদয় হইও না, কারণ তাহাতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া সহৃদয় হও কারণ তাহাতে পরিণামে অনেক সুখ পাওয়া যায়।" ইংলণ্ডের এক্ষণে যেরূপ সমাজের অবস্থা, তাহাতে ডিকেন্সের নভেল যে সেখানকার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গ-সমাজের অবস্থা, ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংলণ্ডে যাহা অতীব উপকারী, এখানেও যে তাহা উপকারী হইবে এরূপ আশা করা যায় না। ইংলণ্ড এক্ষণে লক্ষ্মীদেবীর বিহারভূমি। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় বিনিময়কার্য্য সম্পাদিত হয়। রাশি রাশি ধনের উপর বসিয়া ইংলণ্ড ধনের স্পৃহা একটু ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দেখাদেখি যদি তুমি আমি ধনস্পৃহা ত্যাগ করি, তাহাতে সংসারের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। কঠোরহৃদয়তা আমাদের দেশে প্রবল নয়। অর্থার্জ্জন স্পৃহা আমাদের দেশে বড় নাই। বৈরাগ্য আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষা সুতরাং আমাদের দেশে সহৃদয়তা কিছু কমাইয়া অর্থার্জ্জন চেষ্টা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ড যে পথে চলিতেছেন, এ বিষয়ে আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলা উচিত। অর্থার্জ্জনস্পৃহা ও সহৃদয়তা উভয়েরই দোষগুণ আছে। সমাজের অবস্থা অনুসারে কাহারও বা বৃদ্ধি কাহারও বা হ্রাস হওয়া উচিত।

পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তিটি পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, এদেশে সেই প্রবৃত্তিটি দমিত হওয়া প্রয়োজনীয়। আবার ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তিটী দমিত হওয়া আবশ্যক, আমাদের এখানে সেইটি পরিবর্দ্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রণয় কবিমাত্রেরই বড় আদরের বস্তু। কিন্তু প্রণয় লইয়াই নভেল লেখকদের ব্যবসা। কিন্তু এই প্রণয়ের ভাব ইংলণ্ডে একরূপ ও আমাদের দেশে অন্যরূপ। ইংলণ্ডীয়দের মতে প্রণয় হৃদয়ের কার্য্য। হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাস, অমনি তাহাকে ভালবাসিলাম। হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাসিও না, অমনি আমারও ভালবাসা বন্ধ হইল। আমার একজন স্বামী আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। কেন? আমার হৃদয় আমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দেয় না! হৃদয়ের কথা যে সকল সময়ে আমাকে শুনিতে হইবে তাহা নয়। হৃদয় আমাকে অনেক সময় অনেক অন্যায় কার্য্য করিতে

বলে। অপরের সময় হৃদয়, জল খাইতে বলে, অপরের টাকা ধার লইলে হৃদয় আর তাহা শোধ করিতে চায় না, ইত্যাদি। এ সকল সময়ে হৃদয়কে দমিত করিতে হইবে। কিন্তু প্রণয়ের বেলা হৃদয় যাহা বলিবে, তাহাই শিরোধার্য। শৈবলিনীর স্বামী উদার, মহান্ এবং সর্ব্বগুণান্বিত। শৈবলিনী তাঁহাকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে সম্মতি দিল না। শৈবলিনী অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল, কিন্তু হৃদয় রাজি হইল না। সুতরাং শৈবলিনী প্রতাপকে বিবাহের পরেও পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল। ইহাতে শৈবলিনীর দোষ হইল বটে, কিন্তু সে দোষ অতি অল্প। কেন অল্প? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলে নাই। কুন্দবেচারাও হৃদয়কে অনেক বুঝাইল। শুধু কুন্দ কেন? কুন্দ বুঝাইল, কমল বুঝাইল, সূর্য্যমুখী বুঝাইল। কিন্তু কুন্দের হৃদয় বুঝিল না।* ইহাতে যে কুন্দের দোষ হইল না, তাহা নয়। কিন্তু সে দোষকে যদি তুমি দোষ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুরহৃদয় পাষণ্ড। কেন কুন্দের হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিল!

পূর্ব্বের ভাবগুলি ইংরেজদের। ইংরেজের দেশে ইহা সম্ভব। কারণ বালিকাকাল হইতেই যুবতী প্রণয়সম্বন্ধে আপনাকে স্বাধীন দেখিতে পায়। তাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে পায়। ইহাতে তাহার সমাজে নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহের পর হইতে প্রণয়ের অঙ্কুর আরম্ভ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র কন্যা কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। আমাদের দেশে প্রণয় সমাজপ্রথার অধীন মাত্র। তোমার হৃদয়কে ইহাতে সমাজের বশে চলিতে হইবে। যেমন অন্য অন্যস্থলে, তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় তোমাকে অন্যের উপার্জ্জিত অর্থ বলপূর্ব্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশমতে চলিয়া থাক। প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা, মাতা যাঁহাকে স্বামী কি স্ত্রী বলিয়া আমার সম্মুখে উপনীত করিলেন, আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ের হৃদয়ে তাঁহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিব। যদি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, আমি সেই

* নগেন্দ্র নিজেই বলিয়াছিল, "আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, কিন্তু আমার হৃদয় বশ হইল না।"

পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদতলে মর্দ্দিত করিব, প্রয়োজন হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করিব না। রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, দুঃখে, সুখে ছায়ার ন্যায় উঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। সম্মুখে কি আছে দেখিব না, পার্শ্বে কি আছে দেখিব না। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বক্ষে করিয়া যাবজ্জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামীপদে মস্তক রাখিয়া জীবন কাটাইব।

ইহাই বঙ্গদেশের প্রণয়ের লক্ষণ। যাঁহারা হৃদয়ের প্রলোভনে মোহিত হইয়া ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহারা আমাদের দেশে ঘৃণ্য। ইংরেজদের মত তাঁহাদের দেশে সভ্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে প্রণয় বলিয়া আমাদের দেশে সভ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা সতীত্বকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বল মণি। ইংলণ্ডে কি জন্য পূর্ব্বোক্ত মতের আদর দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। জর্জ্জ ইলিয়ট্ হইতে সামান্য নভেল লেখক পর্য্যন্ত কি জন্য প্রণয়কে এই অপবিত্র আকারে চিত্রিত করেন, তাহা আমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না। ইংরেজেরা স্বাধীনতাপ্রিয়। বোধ হয় প্রণয়সম্বন্ধেও স্বাধীনতা আনিতে ইহারা ইচ্ছা করেন। আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু আমরা প্রণয়ের স্বাধীনতা চাই না। ড্রাইডেন বলিতে পারেন—"One to one was cursedly confined।" আমরা বলিব—"One to one was blessedly confined."

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল, যে ইংলণ্ডীয়েরা প্রণয়কে যে আকারে চিত্রিত করেন, আমাদের দেশে তাহা লাম্পট্যসূচক এবং অতীব ঘৃণাজনক। সতীত্বের বৃদ্ধিতে যে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রণয় হইতে এই সতীত্বটুকু বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রণয়সম্বন্ধে ইংলণ্ড আজিও সভ্যপদবীতে আরূঢ় হন নাই। কারণ যে, দেশ যত সভ্য হইবে, সে দেশে সমাজের আজ্ঞা ততই সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি ইংলণ্ডীয় প্রণয়ভাব আমরা অবিকল অনুকরণ করি, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে আমরা স্বদেশীয় সতীত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রণয়কে কেবল পশুভাবপূর্ণ বলিয়া মনে করিব।

যাঁহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, আমাদের দেশের অভাব সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করতঃ, সেই সমস্ত অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় নভেল লিখিবার প্রয়াস পাইবেন,

তাঁহাকে আমরা আমাদের যথার্থ হিতৈষী বলিয়া সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিব। আর যাঁহারা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাব সমস্তের অবিকল "তরজমা" করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই দেশের ধন্যবাদার্হ বলিয়া মনে করিতে পারিব না।
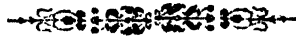
স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর।

প্রথম অবস্থায় লোকে আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত পদার্থ আপনি নির্ম্মাণ করিয়া লইত। তখন পরস্পর দ্রব্য বিনিময়ে যে কত শ্রমলাঘব হয়, তাহা লোকে জানিত না। ক্রমে যাহারা নিতান্ত কাছাকাছি থাকিত, তাহারা আপন প্রতিবেশীর সহিত আপন দ্রব্য বদলাইয়া লইত। রাম তাঁত বোনে, শ্যাম ধান রোয়, শ্যামের ধানে রামের পরিবার প্রতিপালন হয়, রামের কাপড়ে শ্যামের পরিবারের শীত নিবারণ হয়। হরি লোহার কর্ম্ম করে, কৃষ্ণ দুধের ব্যবসা করে, ব্রজ নাপিত। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, পাঁচ জনই আপন আপন কার্য্যদ্বারা আর চারিজনকে সাহায্য করে, এবং তাহাদের সহায়তায় নিজেরও চলে। এই গ্রাম আরম্ভ। ক্রমে হরি যদি এত লোহার অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে নিজগ্রামে তাহার প্রয়োজন হয় না। হরি কি করিবে? আপন গ্রামে যত প্রয়োজন তাহাই করিয়া বসিয়া থাকিবে, না বাহিরে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে।

যেমন এক সময়ে সকল লোকই আপন আপন দ্রব্য উৎপাদন করিত, তেমনি এক সময়ে সকল গ্রামই আপন আপন দরকারী জিনিস তৈয়ার করিয়া লইত। ক্রমে তাহারা দেখিল যে, পরস্পরের সহায়তা পাইলে সুবিধা হয়। হরিপুর দেখিল যে বিষ্ণুপুরে একজন কর্ম্মকার আছে, সে অল্প সময়ে অনেক লোহার অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে, তাহার নিজের গ্রামের যত দরকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সে তৈয়ার করে। সুতরাং হরিপুরের লোক বিষ্ণুপুরের হরির কাছ হইতে সস্তায় লোহার কাজ লইতে লাগিল। হরিপুরের কর্ম্মকার চাস করিতে লাগিল। এইরূপে একজন নাপিতে দুই গ্রামের চলিল। হয় ত হরিপুরের জমীতে অরহরের দাল বড় চমৎকার হয়। বিষ্ণুপুরের লোক অরহরের দাল চাস আর না করিয়া লোহার কাজ ও নাপিত

দিয়া অরহরের ডাল পাইতে লাগিল। দুইদলেরই কিছু কিছু সাশ্রয় হইল, শ্রম ও ব্যয় লাঘব হইল।

ক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সাহায্যকারী অনেকগুলি গ্রাম একত্র হইয়া একটী গ্রামসমবায় হইল। এই গ্রামসমবায়ের নাম জেলা বলিলাম, এই এক এক জেলার লোক আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই জেলার মধ্যে তৈয়ার করিয়া লয়। জেলার মধ্যে যে জায়গায় যে জিনিসটি ভাল হইতে পারে, সেখানকার লোক কেবল সেই জিনিসটীই তৈয়ার করে, অপর বস্তু তাহাদের প্রতিবেশবাসীদিগের নিকট আপন জিনিসের বদলে পায়। মনে কর, জেলার নাম বরিশাল। বরিশালের লোক দেখিল যে চাউল তাহাদের দেশে এত উৎপন্ন হয় যে, তাহারা চাউল অনায়াসে বাহিরে পাঠাইতে পারে। ঢাকার লোকও দেখিল যে তাহারা যত কাপড় তৈয়ার করিতে পারে তত কাপড় তাহাদের দরকার হয় না; সুতরাং তাহারাও কাপড় বিদেশে পাঠাইতে রাজী হইল। দুই দলই রাজী, বন্দোবস্ত হইল, ঢাকার লোকের চাল বরিশাল দিবে, বরিশালের কাপড় ঢাকা দিবে। আগে যেমন রামে ও শ্যামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এখন ঢাকা ও বরিশালে তাহাই আবার হইল। কিন্তু এবার বরিশালে যাহারা কাপড় তৈয়ার করিত তাহারা ও ঢাকায় যাহারা চাউল তৈয়ার করিত তাহারা প্রায় দুই তিন হাজার লোক। ইহারা কাজ পাইল না। ইহাদের দশায় কি হইবে! ইহাদের দিনকতক খুব ক্ষতি হইবে। বরিশালের তাঁতীদের মধ্যে যাহারা ভাল তাহারা ঢাকায় চলিয়া যাইবে, যাহারা মন্দ চাস করিবে। কতক অন্য অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, কতক এই হেঁপায় মরিয়াও যাইবে। ঢাকার চাসারাও কতক তাঁতীর কাজ শিখিবে, কতক অন্য ব্যবসায়ে যাইবে, কতক বরিশালে চলিয়া যাইবে। দুপাঁচজন না খাইয়াও মারা যাইবে। ঢাকা ও বরিশাল ত প্রথম হইতেই পরস্পরের কাপড় ও চাউল যত দরকার সবই দিতে পারিত; আর ঢাকায় তাঁতী বাড়িল, বরিশালে চাসা বাড়িল। ঢাকায় অনেক অধিক কাপড় হইতে লাগিল, বরিশালে অনেক অধিক চাউল হইতে লাগিল। লোকের সচ্ছল হইয়াও বাঁচিতে লাগিল। তখন লোকে শুনিল মালদহে উৎকৃষ্ট আম্র হয়, দেশের আম্র টক্ বিস্বাদ। অমনি ঢাকা ও বরিশাল দুই জায়গার লোকই মনস্থ করিল যে, আমাদের বাড়তি কাপড় ও চাউল দিয়া আইস খুব করিয়া আম্র ভক্ষণ করা যাউক। মালদহের লোকও দেখিল মন্দ নয়, অনায়াসে চাউল ও কাপড় মিলিবে; মালদহের চাসা ও তাঁতী সবাই নিজ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আমেরই বাগান তৈয়ার করিতে

গিল। ঢাকা ও বরিশালে যাহাদের আমের বাগান ছিল, তাহারা নিজ নিজ বাগান বেচিয়া আবার কাপড় ও চাউল তৈয়ার করিতে লাগিল। মালদহওয়ালারা দেখিল যে তাহারা ঢাকা, বরিশাল ও মালদহের লোককে পেট ভরিয়া আম্র ভক্ষণ করাইয়াও প্রতিবৎসরে ১২।১৩ লক্ষ আম বাঁচাইতে পারে, তখন তাহারা ভাবিল আম বৎসরে দুই মাস বই পাওয়া যায় না ; সম্বৎসর আম খাওয়া যায় ইহার কোন উপায় হয় না কি? ক্রমে বাহির হইল, যে,যদি আমের রস শুকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সম্বৎসর চলে। আর কাঁচা আম কাছাকাছি ৪।৫টি জেলা বইত দূরে পাঠান যায় না শুকাইয়া রাখিলে আরো অনেক দেশে পাঠাইতে পারা যাইবে। ঢাকা ও বরিশাল হইতে চাউল কাপড়ের সংস্থান হইতেছে, অন্য জায়গা হইতে আরও নানা জিনিস মিলিবে। ঢাকা বরিশালের তাঁতী ও চাসা আবার বাড়িয়াছে, তাহারা অন্য অন্য জেলায় আপন আপন কাপড় ও চাউল পাঠাইতে লাগিল। মালদহে আম শুকাইয়া আমস্বত্ব করা একটি নূতন আবিক্রিয়া হইয়াছে; ইহাদের তাহার আর প্রয়োজন নাই। এইরূপে স্বাধীন বাণিজ্যদ্বারা এই লাভ হইল যে, যে দেশের লোক যাহা সুবিধামত প্রস্তুত করিতে পারে, সে তাহাই প্রস্তুত করিতে লাগিল তাহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল। উৎপন্ন অধিক হইল। একটি নূতন আবিক্রিয়া হওয়াতে সম্বৎসর লোকে আমের স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। আর এক জেলার কতকগুলি লোক, ভিন্ন জেলায় সর্ব্বদা যাতায়াত করার দরুণ ইহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি হইল।

আমরা এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম যে ব্যবসায়ের জন্য বরিশালে কাপড়ের কারবার উঠিয়া গেল, ঢাকায় চাউলের চাস উঠিয়া গেল ও মালদহ হইতে দুই উঠিয়া গেল। বাস্তবিক তাহা হয় না, জীবনধারণোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু কখন একেবারে কোন বিস্তৃত ভূভাগ হইতে উঠিয়া যায় না। কিছু না কিছু পরিমাণে থাকিয়াই যায়। কিন্তু সে কথায় কোন আস্থা না করিয়া আমরা যেভাবে বলিয়া আসিতেছি সেই ভাবেই বলিয়া যাই।

মালদহে আম্র উদ্বৃত্ত হইল। বরিশালে ধান্য উদ্বৃত্ত হইল, ঢাকায় বস্ত্র উদ্বৃত্ত হইল। তখন এই তিন জায়গার লোক দেখিল এত জিনিস মিথ্যা অপচয় না করিয়া সমুদ্রের পারে বা হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরভাগে এ সকল প্রেরণ করিলে অনেক জিনিস পাওয়া যাইবে, যাহাতে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং তাহারা আপন আপন জিনিস লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ভ করিল। আরাকান বা উড়িষ্যায় যাইতে হইলে, বড় নৌকার প্রয়োজন সুতরাং বড় নৌকা প্রস্তুত

হইল, আরাকান হইতে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য আনিতে লাগিল। আরাকানওয়ালারা শিল্পকার্য্য বিস্তৃত করিয়া চাউলাদির জন্য কিয়ৎপরিমাণে বরিশালের উপর নির্ভর করিতে লাগিল আর নূতন জিনিস আমসত্ত্ব পাইতে লাগিল। দিনকতক আমসত্ত্ব খাইয়া তাহাদের সক গেল যে আম খাইতে হইবে। অনেক চেষ্টার পর আম্র preserve করিবার উপায় উদ্ভাবন হইল, আরাকানের লোক ইচ্ছা করিলে এখন আমও খাইতে পাইল।

এইরূপে ক্রমশঃ বাণিজ্য বিস্তার হইলে ক্রমে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সস্তা হয়, নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়া জড় জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যের পরিশ্রম কম হয়, বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব জাতির সহিত সহানুভূতি করিতে শিখে, জগৎ শুদ্ধ ভাই ভাই হইয়া দাঁড়ায়।

যদি জগৎ শুদ্ধ লোক বরিশাল ঢাকা ও মালদহের মত সোজা বুঝে, তবে যে দেশে যাহা সহজে উৎপন্ন হইতে পারে, সে দেশে তাহাই উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য। সকল লোকে সকল জিনিস সস্তা পায়। জগতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও লোকের সাংসারিক দুঃখ কমিয়া যায়। ইংলণ্ডের টাকা অনেক, ইংলণ্ডের লোক খুব পরিশ্রম করিতে পারে, ইংলণ্ড সভা ইংলণ্ডে নানাবিধ কলের প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং ইংলণ্ডের উচিত যে চাষবাস একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল নানাবিধ শিল্পের অনুশীলন করা। ফ্রান্সে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা জন্মে, উৎকৃষ্ট রেশম তৈয়ারি হয়, অতএব ফ্রান্সের উচিত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মদ্য ও রেশমের কাপড় সরবরাহ করা। ইতালীর লোক চিত্রকর্ম্মে অত্যন্তনিপুণ, ইতালীর জল ও বায়ু এবং ইতালীর নির্ম্মেঘ পরিষ্কার গগনমণ্ডল চিত্রকর্ম্মের অনেক সুবিধা করিয়া দেয়, অতএব ইতালীর উচিত কেবল চিত্রকর্ম্মে মনঃসংযোগ করা। ভারতবর্ষ ও ইউনাইটেড ষ্টেটে অপর্য্যাপ্ত উর্ব্বরা ভূমি আছে, অতএব ইহাদের উচিত কেবল চাসবাস করা, রুশিয়ায় অপর্য্যাপ্ত অনুর্ব্বরা ভূমি আছে সেখানে অনেক পশু পালিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের উচিত পশুপালনবৃত্তি অবলম্বন করা।

কিন্তু লোকের কেমন দুর্বুদ্ধি, তাহারা মনে করে তাহারা যতই বেশী খরচ করিয়া আপন আপন দেশে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবে ততই তাহাদের বাহাদুরী বেশী। ইংলণ্ডে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাওয়া যায়, প্রস্তুত করিতে হয় না। ফ্রান্স শুল্ক বহনের খরচ দিলে সেখান হইতে অপর্য্যাপ্ত লবণ পাইতে পারে। কিন্তু ছি! ইংলণ্ডের লবণ ফ্রান্স খাইবে! কখনই হইতে পারে না। ফ্রান্স প্রতি বৎসর এক কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ঘরে লবণ প্রস্তুত

করিয়া লইবে তথাপি নিতান্ত অল্প মূল্যে ইংলণ্ডের লবণ লইবে না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইংলণ্ডের লোক গিয়া কেন ফ্রান্সে লবণ বেচিয়া আসে না? তাহা হইবার জো নাই। ইংলণ্ড হইতে লবণ গেলেই তাহার উপর এত ট্যাক্স দিতে হয় যে বেচিয়া লোকসান বই লাভ হয় না। মনে কর ফ্রান্সে লবণ তৈয়ারি করিতে মণ করা দুই টাকা খরচ হয় ও ইংলণ্ড হইতে আনিতে চারি আনা খরচ হয়। তাহাতে ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন, যে ইংলণ্ড হইতে লবণ আসিলে শতকরা সাড়ে সাত শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। চারি আনার জিনিসে সাড়ে সাত সিকা ট্যাক্স। ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সে গিয়া হইল ২৵০ ইহার উপর ব্যবসায়দারদিগের মুনাফা আছে সুতরাং ফ্রান্সে ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সের লবণের দাম অপেক্ষা বেশী হইল; আর কেহ ইংলণ্ডের লবণ কিনিল না। এইরূপ নিজদেশে সব প্রকার শিল্পকর্ম্ম রক্ষার জন্য ট্যাক্স করার নাম নাম Protection অথবা রক্ষা কর। ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর তাবৎ দেশেই এইরূপ রক্ষা-কর প্রচলিত। অন্য দেশের জিনিস ইংলণ্ডে গেলে ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের জিনিস অন্য দেশে গেলেই ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা বেশী। এত বেশী যে ইংলণ্ড প্রায় প্রতিবৎসর খরচ খরচা বাদে ৯৭ কোটী টাকা বিদেশ হইতে সুদ পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, ইংলণ্ডের লোকের এমন ক্ষমতা আছে, যে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছুরী কাঁচি তুলার কাপড়, পাটের জিনিস, লোহার সবরকমের জিনিস, গরম কাপড়, ষ্টকিং কতক কতক কাঠের জিনিসও দিতে পারে। কিন্তু রক্ষা করের জন্য অনেক দেশে ইংলণ্ডের দ্রব্যাদি যাইবার জো নাই। ইউনাইটেড ষ্টেট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে বিদেশ হইতে কোন জিনিস আসিতে দিবেন না। এমন কি কুমারের জিনিসের উপর শতকরা ৪০ টাকা রাক্ষকর বসাইয়াছেন। লেডি ফসেট ইউনাইটেড ষ্টেটের রক্ষাকর সম্বন্ধীয় আহাম্মুকির এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ইউনাইটেড ষ্টেটের লোক যে পোষাক পরে, তাহার সূতার উপর ট্যাক্স, কাপড়ের উপর ট্যাক্স, সজ্জাবের কাপড়ের উপর ট্যাক্স, বোতামের উপর ট্যাক্স; এইরূপে সমস্ত জামাটির নিয়মিত মূল্যের উপর শতকরা প্রায় ৫০ টাকা দিতে হয়। নিম্নে লেডি ফসেটের সেই প্যারাগ্রাফটি অনুবাদিত হইল।

"আমেরিকানেরা যে পোষাক পরিয়া থাকে তাহার উপর ট্যাক্সের তালিকা। টুপি, টুপির রেশমে শতকরা ৬০ টাকা, ফিতার শতকরা ৬০ টাকা ধারে যে আলপাকা থাকে তাহাতে শতকরা ৫০ অথবা ৩৫, ভিতরের চামড়া ৩৫, মসলিন

এক বর্গ গজে ৭, আটা শতকরা ২৩ টাকা; কোট—কাপড়ে শতকরা ৫৫ রেশমে ৬০, আলপাকা ৫০, বোতাম এক পাউণ্ডে ২০ সেণ্টব্রেড এক পাউণ্ড ৫০, সেণ্ট, গলাবন্দে যে মকমল থাকে তাহাতে শতকরা ৬০ টাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রক্ষা করের জন্য পৃথিবীর যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রোফেসর ফসেট হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে শুল্ক লবণের রক্ষার জন্য ফ্রান্সকে প্রতি বৎসর ১ কোটী করিয়া টাকা লোকসান দিতে হয়, অর্থাৎ ইংলণ্ডের লবণে ও ফ্রান্সের লবণে দাম এত তফাৎ যে ফ্রান্সের লবণ কেনার দরুণ ঐ টাকা প্রজাদিগকে লবণের দামে, বেশী দিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই টাকা গবর্ণমেণ্ট পান সুতরাং রক্ষাকর একটি ট্যাক্স, প্রজাদিগের পকেট হইতে না আসিয়া বিদেশীয় বণিকদিগের পকেট হইতে আসে, বেশ ত। কিন্তু তাহা নহে। মনে কর ফ্রান্সে কোটী মণ লবণের দরকার, ফ্রান্সে ৭৫ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়, প্রতি মণের পড়তা বার আনা। ইংলণ্ড হইতে আসে ২৫ লক্ষ মণ এই ২৫ লক্ষ মণের উপর মনকরা ।॥০ আট আনা ট্যাক্স বসিল। গবর্ণমেণ্টের সাড়ে বার লক্ষ টাকা আদায় হইল। কিন্তু প্রজাদের দিতে হইল কত? ইংলণ্ডে কিছু লবণ এত সুস্তা নয় যে আট আনা ট্যাক্স দিয়া বার আনায় বিক্রয় করিতে পারে সুতরাং ইংলণ্ডের লবণ এক টাকা দুই আনায় বিক্রয় হইল। কিন্তু লবণের বাজারে কতক ১৷৴০ কতক ৸০ আনায় বিক্রয় হইতে পারে না সবই বিক্রয় হইল ১৷৴০। সুতরাং ফ্রান্সের লোককে আপনাদের ৭৫ লক্ষ মণে মণকরা ছয় আনা দাম অধিক দিতে হইল। আবার যদি ট্যাক্স না থাকিত তাহা হইলে হয় ত ইংলণ্ড হইতেই কোটী মণ লবণ আসিয়া দশ আনায় বিক্রয় হইত। মণকরা আট আনা অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ফ্রান্সের লোককে লোকসান দিতে হইল। গবর্ণমেণ্টে সাড়ে বার লক্ষ আদায়ে প্রজাদের দিতে হইল ৫০ লক্ষ লাভ হইল ফ্রান্সের জনকত ব্যবসায় দারের, সমস্ত প্রজার নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া কেন জন কতক ব্যবসাদারকে বক্‌সিস দেওয়া হইল।

আমাদের দেশে যে সকল কর আছে তাহার মধ্যে কেহই রক্ষাকর নহে। কারণ বিদেশীয় দ্রব্য আমাদের দেশে না আসুক, এ অভিপ্রায়ে কোন করই স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যাহার কিয়দংশ দেশে উৎপন্ন হয় ও কিয়দংশ বিদেশ হইতে আসে। এরূপ অবস্থায় যে অংশ বিদেশ হইতে আসে শুল্ক তাহার উপর কর বসাইলে যে অংশ দেশে উৎপন্ন

হয় তাহার অনেক সুবিধা হয়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী তাহাতে কিছু কম হইবার সম্ভাবনা। এক বাজারে এক জিনিস দুই দরে বিক্রয় হয় না। বিদেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয়, সুতরাং তাহার দাম অধিক, দেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয় না, তাহার দাম কম। বাজারে দুই আসিয়া পড়িল, দেশীয় ও বিদেশীয় দুইয়েরই সমান দাম হইল। দেশীয় জিনিসে লাভ হইল বেশী, বিদেশীয় জিনিসে লাভ কম। দেশীয় সওদাগারেরা দাম শতকরা দশ টাকা কমাইয়া দিলেন, তাঁহাদের জিনিস বিক্রয় হইল, বিদেশীয় জিনিস কেহ লইল না। যদি কখন এমন হয়, যে, দেশীয় জিনিস বাজারে নাই, তবেই বিদেশীয় জিনিস বিক্রয় হইবে; নচেৎ বিদেশীয়দিগকে লোকসান দিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় ওরূপ কর রক্ষাকর হইয়া উঠে; এই জন্যই ইংলণ্ডে দুই প্রকার বস্তুর উপর সমান ট্যাক্স বসান, ইংলণ্ডের মদ কতক দেশে, কতক বিদেশে জন্মে। দেশীয় মদের উপর একসাইস ও বিদেশীয় মদের উপর কষ্টম ডিউটি লওয়া হয়। অতএব ইংলণ্ডে রক্ষাকরের কোন কথাই নাই। আমাদের দেশে রক্ষাকর নাই। কিন্তু আমাদের দেশের কাপড় কতক দেশে তৈয়ারি হয়, কতক মাঞ্চেষ্টর হইতে আসে। মাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের আমরা শতকরা পাঁচ টাকা টেক্স লই। এইটি প্রাকৃতঃ রক্ষাকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা গর্ণমেণ্টে জানায়। গবর্ণমেণ্ট ঐ করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেন। অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৭কোটী টাকার বিদেশীয় কাপড় আমাদের দেশে আসে, তাহার কর হইতে পঁচাশি লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়; ঐ টাকার বিশলক্ষ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দেন। মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের কথায় গবর্ণমেণ্টের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু এরূপ কর উঠাইয়া দেওয়া যে উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কর যে রক্ষাকর তাহা ফসেট সাহেব তাঁহার Free Trade and Protection নামক গ্রন্থে শেষ পারাগ্রাফে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা রক্ষাকর হইলেও তিনি উহা উঠাইয়া দেওয়ার বিরোধী, কারণ তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের সময় ভাল নয়, উঠাইয়া দিলেই কোন নূতন কর লইতে হইবে সেটা বড় অত্যাচার হইবে। অতএব তাঁহার কথায় এই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের সময় হইলে শত কার্য্য ত্যাগ করিয়া আগে ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

আমরা উক্ত টেক্স উঠাইয়া দেওয়ার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী; কারণ উহাতে দেশীয় জিনিসের পর্য্যন্ত দর বাড়ান হয়। আর আমাদের মত এই যে, যে সকল দ্রব্য আবাল, বৃদ্ধ, ভদ্র, দরিদ্র সকলেরই

নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মূল্য যাহাতে কমে, তাহা গবর্ণমেণ্টের দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থায় যে কোন উপায়ে ঐ টেক্স উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রজাসাধারণের হিতচিন্তা গবর্ণমেণ্টের কাজ। যেটি যাহাতে হয়, গবর্ণমেণ্টের সেইটি করা সকলের আগে। ঐ টেক্স উঠাইয়া দিলে ৮৫ লক্ষ টাকা দরিদ্রপ্রজাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কারণ ধনীলোকে আজিও দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র (যাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছড়াইয়া পড়িলে যে চাসবাসের সুবিধা হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংরেজি সম্বাদপত্রওয়ালারা ঐ টেক্স উঠাইয়া দিবার সময় বড়ই চীৎকার করেন, তাঁহারা বলেন এরূপ করিলে বোম্বায়ে যে সকল তুলাকল হইয়াছে, তাহার ক্ষতি হইবে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রম কারণ বোম্বে যে সকল কল আছে, তাহারা ৮।১০ বৎসর কাজ চালাইতেছে। মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা তাহাদের অনেক সুবিধা। মাঞ্চেষ্টরকে এদেশ হইতে তুলা কিনিয়া বহনি খরচ করিয়া লইয়া যাইতে হয়; আবার বহনিখরচ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়। ইংলণ্ডে মজুরি বড় অধিক, এখানে মজুরি বড় কম। ভারতবর্ষীয় বাজারে মাঞ্চেষ্টর অপেক্ষা দেশস্থ বোম্বেওয়ালাদের প্রভুত্ব অধিক। বোম্বেওয়ালা ইংলণ্ড হইতে অল্প সুদে টাকা লইয়া এইখানে বসিয়া দুইবারকার বহনি বাঁচাইয়া, অল্প মজুরিতে যদি মাঞ্চেষ্টরকে ডরান, তবে তাঁহাদের ব্যবসায় না করাই ভাল।

মিল বলেন যে, যখন বিদেশে একটা কাজ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে, দেশে সেই কাজটা আরম্ভ করিতে হইবে, তখন তাহাকে রক্ষা না করিলে, বিদেশীয়দিগের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিবে কেন? এরূপ করা ফসেট সাহেব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না; কারণ তিনি বলেন, যাহাদিগকে একবার রক্ষা করা হয়, তাহারা চিরকাল "রক্ষাকর রক্ষাকর" বলিয়া চীৎকার করে, তাহারা আত্মনির্ভর শিখে না। আমরা ফসেটের যুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না; কারণ রক্ষা করা না করা রক্ষিতদের কথানুসারে ত হইবে না, তাহার জন্য একটা গবর্ণমেণ্ট আছে, গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন বুঝিবেন যে, রক্ষা আর উচিত নহে, তখন রক্ষা উঠাইয়া লইবে। অতএব প্রথম অবস্থায় মিলমতানুযায়ী হইয়া রক্ষা করা উচিত। এরূপ রক্ষা বোম্বেওয়ালারা ৮।১০ বৎসর পাইয়াছেন, এখন গবর্ণমেণ্ট যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন, তাহাদের আর রক্ষা চাওয়া অন্যায়।

আমাদের দেশীয় লোকেরও টেক্স উঠিয়া গেলে সুবিধা বই অসুবিধা নাই, সুতরাং দেশীয় সম্বাদপত্রওয়ালারা

যে কেন উহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াই রাছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহারা আজিও বোধ হয় গড্ডালিকা প্রবাহবৎ অগ্রণীর পথানুসরণ করেন।

নৈষধ সমালোচন।

সেক্ষপীয়র মিল্টন প্রভৃতি অদ্বিতীয় কবিগণের কৃপায় ইংরেজি সাহিত্যভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত রত্নে পরিপূর্ণ। এই সকল রত্ন নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, এক একটি এক একখানি কহিনূর। সামান্য রত্নের ত গণনা করা যায় না। শরৎকালের নৈশগগনের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় রত্ন চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্নের এত ছড়াছড়ি নাই বটে, কিন্তু কালিদাস ও ভবভূতির অনুগ্রহে কহিনূরের অভাব নাই, তবে সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইংরেজদিগের ভাণ্ডারে যেমন যে দরের রত্ন খুঁজিবে, তাহাই মিলিবে, আমাদিগের ভাণ্ডারে তেমনটি হইবে না; কহিনূরের নীচেই একেবারে ঘুঁটে। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি দুই একজনের পর প্রকৃত কবি আর আমাদের নজরে ঠেকে না। তবে কি আমাদের নজর কিছু উঁচু? তাহা নহে, বাস্তবিকই কবিনামের যোগ্য আর্য্যকবি অতি বিরল। কালিদাস প্রভৃতি যে দুই একজন আছেন, তাঁহাদেরও গ্রন্থ সেক্ষপীয়র ইত্যাদির ন্যায় সংখ্যায় অধিক নহে। আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের অভাব, দ্বিতীয় ম্লেচ্ছকর্তৃক বিলোপ। যে কারণেই হউক, ফলে আমাদিগের কবি ও কাব্য অতি অল্প। কুমার, রঘু, শকুন্তলা, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি কয়খানি কাব্য সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে এই প্রস্তাবে নৈষধের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা উচিত যে, বঙ্গীয় যুবকেরা বিশ্বনিন্দক বলিয়া খ্যাত; আমরা অদ্যকার সমালোচনাদ্বারা অনেক আয়াসে উপার্জ্জিত এই নামে কলঙ্ক করিতে চাহি না।

বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য সমধিক বিখ্যাত। বারাণসী, পুনা, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বৎসর বৎসর দলে দলে ছাত্র আসিয়া অদ্যাপি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। ভিন্নদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি এবং স্বদেশেও নৈয়ায়িকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। ন্যায়শাস্ত্র যে সবিশেষ গৌরবের বস্তু তাহার এক প্রমাণ এই, এতদ্দেশীয় যাবতীয় উপাধিই (বিদ্যানিধি, শিরোমণি প্রভৃতি কয়েকটি ব্য-

ণীত) ন্যায়শাস্ত্রঘটিত কোন না কোন শব্দ লইয়া রচিত; অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র না জানিলে কেহই পণ্ডিত নাম পাইবার যোগ্য নহেন। এবং নৈয়ায়িকদিগেরও এমন একটু অভিমান আছে যে, তাঁহাদের মত সূক্ষ্মবুদ্ধি অতি অল্প লোকের আছে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আমাদের বিবেচ্য নহে, আমরা প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিতেছিমাত্র। বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই পণ্ডিতদিগের নিকট নৈষধের বড় আদর; নৈষধের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরে না। বাস্তবিকও তাঁহাদের প্রশংসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নৈষধ একজন কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িকের রচিত। যিনি যে বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তাঁহার সেইটিই ভাল লাগে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রব্যবসায়ীরা যে কিজন্য নৈষধকে উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণনা করেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরিল না। ভট্টাচার্য্যমহলে নৈষধের এত আদর যে, ইহার প্রশংসার জন্য দুই তিনটী কবিতা চলিয়া গিয়াছে।* অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে এরূপ বলিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। কারণ তাঁহারা বলেন, "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং।" ইঁহারা কাব্যের লক্ষণ কি, কি কি গুণ থাকিলে কোন গ্রন্থকে কাব্য বলা যায়, তাহা জানেন না। ইঁহাদের মতে যাহাতে নূতন নূতন ভাব ও অলৌকিক বর্ণনা আছে, তাহাই কাব্য। যদি এই কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে আরব্য উপন্যাসের রচয়িতার ন্যায় উৎকৃষ্ট লেখক কোন কালে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নৈষধকার কবি নহেন, একজন নৈয়ায়িক, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃষ্টি নাই। কতকগুলি অসার অসম্ভব বিষয় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে, নৈষধে কবিত্বশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে ইহাতে লেখকের অসাধারণ ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে।

এই গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। নলদময়ন্তী, সাবিত্রীসত্যবান্ ও শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয় লইয়া বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস ও শ্রীহর্ষ উভয়ে একই পুস্তক অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উপাখ্যানভাগ লইয়া উভয়ের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে কে কিরূপ কবি। চিত্রকর আপণ হইতে রঙ্ কিনিয়া লইয়া সেইগুলি মিশাইয়া নূতন নূতন রঙ্ প্রস্তুত করে, এবং তাহাতে এরূপ সুন্দর ছবি আঁকে যে দেখিলে দর্শকের নয়ন জুড়ায়

* "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ।"
"নৈষধে পদলালিত্যং।"

ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়; সৎকবিও সেই-রূপ কোন পুস্তক হইতে উপাখ্যান লইয়া নিজ কল্পনোচিত ঘটনার সহিত মিশাইয়া এমন অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করেন যে, অধ্যয়ন করিলে পাঠকের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কালিদাস মহাভারত হইতে শকুন্তলার ইতিহাস লইয়া আপনি বুদ্ধিপ্রভাবে যে অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, আজি দুই হাজার বৎসর পরেও লোকে তাহা পাঠ করিয়া নিরুপম প্রীতি অনুভব করিতেছে। কিন্তু শ্রীহর্ষ সেই মহাভারত হইতে শকুন্তলা অপেক্ষা বরং অধিক মনোরম উপাখ্যান লইয়া যে কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে প্রীতি দূরে যাউক, প্রত্যুত বিরক্তি জন্মে। মহাভারতের নলোপাখ্যান অতি মিষ্ট; নলদময়ন্তীর প্রণয় অতি মধুর ও পবিত্র; সে প্রেমে শরীরের সংস্রব নাই, কেবল হৃদয়ই তাহার বিষয়; যখন নলরাজা কলির প্রভাবে বুদ্ধিভ্রংশহেতু নিজ জায়াকে একাকিনী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার মনের ভাববর্ণনা পাঠ করিলে মহাভারতকারকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, আবার তাহার কিঞ্চিৎ পরে স্বামীকর্ত্তৃক ত্যক্তা অসহায়া দময়ন্তীর বিলাপ পাঠ করিলে, কোন পাষাণহৃদয়ের নয়নদুটি হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত না হয়? স্তর উভয়ের মিলন কি সুখের! ফলতঃ ভারতের নলদময়ন্তী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। নৈষধকারের অঙ্কিত নলদময়ন্তীচিত্র ইহার ঠিক বিপরীত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নলদময়ন্তীর প্রণয় শরীরেই শেষ হইয়াছে; হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমরা সংস্কৃত পুস্তকাদিতে চক্ষুরাগের বর্ণনাই দেখিতে পাই কিন্তু নৈষধে আবার শ্রবণরাগ পাইলাম; লোকের মুখে ও হংসমুখে পরস্পরের রূপ ও গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়া নল ও দময়ন্তী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, হঠাৎ এমনি উৎকট বিরহব্যাধি উপস্থিত হইল যে, তজ্জন্য চিকিৎসক আনা আবশ্যক হইয়াউঠিল। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, সিঁধেলচোর সিঁধকাটী গড়াইবার জন্য এককুলা কড়ি রাত্রিশেষে কামার শালে রাখিয়া আসে, প্রভাতে কামার তাহা দেখিয়া সঙ্কেৎ বুঝিয়া সিঁধকাটী গড়ে ও সন্ধ্যাকালে রাখিয়া চলিয়া যায়। সিঁধেলচোর আসিয়া তাহা লইয়া যায়। চোরে কামারে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, অথচ মধ্যে মধ্যে সিঁধকাটি তৈয়ারি হয়। আমাদের নৈষধকারবর্ণিত প্রণয়ও ঠিক সেইরূপ। নায়ক নায়িকাতে দেখা শুনা নাই অথচ মধ্যে মধ্যে প্রেমবিরহ প্রভৃতি সকলি হইয়া গেল। কবিত্বশক্তিরপ্রভাব! হে আধুনিক বঙ্গীয়লেখকসমাজ! কেন তোমরা বৃথা গরীববেচারা বাঙ্গালিদিগকে বিবাহপ্রথার জন্য অন্যায় নিন্দা কর, কেন বল বরকন্যার বিবাহ না হইয়া আজি

কালি বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার বিবাহ হয়। দেখ সেকালেও এরূপ চলিত ছিল। মোট কথা আমাদের বিবেচনায় নৈষধবর্ণিত প্রেম অপকৃষ্ট প্রেম। এদিকে যে করুণরস আর্য্যগণের হৃদয়কন্দরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, যাহা আর্য্য-কবির জনবিমোহনকারিণী ঐন্দ্রজাল-বিদ্যা,, নৈষধে সেই করুণরসের একান্ত অভাব। যে অংশে এই শক্তি প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অবকাশ ছিল, নৈয়ায়িক কবি উপাখ্যান ভাগের সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নলকর্তৃক দময়ন্তী ত্যাগের বিষয় নৈষধে বর্ণিত হয় নাই। বিবাহানন্তর কন্যার পতিগৃহাগমন পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। এবং এই কারণেই এতাদৃশ প্রকাণ্ড গ্রন্থে ঘটনাসংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহা পাঠ করিতে বিরক্তি জন্মিয়া যায়।

সময়ের গুণে সকলি হয়! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় নিজগ্রন্থে বিবৃত করিয়া অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন, সে সকলও সময়ের ফল। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের হৃদয়ে সেই ভাবগুলি আবির্ভূত হইতেছিল, একজন পণ্ডিত জন্মিয়া সেইগুলি পুস্তকাকারে বা অন্য প্রকারে প্রকাশ করিলেন মাত্র। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, লোকে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বহুকাল হইতে মনে মনে উপায় চিন্তা করিতেছিল, শাক্যসিংহ জন্মিয়া তাহা সাধন করিলেন। তবে রুক্সর, বেকন, উইক্লিফ প্রভৃতির ন্যায় দুই একজন মহাত্মা সময়গুণকেও অতিক্রম করিয়া উঠেন সত্য; কিন্তু সেরূপ লোক জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে শ্রীহর্ষ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সেই সময়ের সমাজ নীতিসম্বন্ধে অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। নৈষধে এরূপ বর্ণনা অনেক আছে যাহা সুরুচির বিরুদ্ধ। স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদিগের উক্তিতেও এরূপ কদর্য্যভাব লিখিত হইয়াছে যে, তাহা ভদ্রলোকের অপাঠ্য! ষোড়শ সর্গে দময়ন্তীর সখীগণের পরিহাস বর্ণনা পাঠ করিলে, আমাদের কথা সঙ্গত কি না, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই সকল বর্ণনা সমাজের হীনাবস্থার পরিচয় দিতেছে। বাস্তবিকও ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত না বলিয়া আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, শ্রীহর্ষ ইহাদের মধ্যে একজন। শ্রীহর্ষ যে বঙ্গীয় কবি তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়।*

* চতুর্দ্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করিলে পুরসুন্দরীরা উলুধ্বনি করিল।

সাধারণতঃ কাব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম, যাহাতে হৃদয়ের ভাবগুলি স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়, ঘাত প্রতিঘাত প্রদর্শন যাহার উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর কাব্যই উৎকৃষ্ট কাব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে স্বভাববর্ণনামাত্র থাকে, ইহাতে কোন একটি বস্তু লইয়া তাহার প্রকৃতি, কার্য্য ও তাহা হইতে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, এই সমুদায় বর্ণিত হয়। ইহা মধ্যম শ্রেণীর কাব্য। অনেকে বলেন, নৈষধকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে নৈষধ মধ্যমশ্রেণীর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার বর্ণনাগুলি অতি চমৎকার; এরূপ নূতন নূতন ভাব আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

" নৈব নবেভ্যঃ পুরস্থন্দরীণাম্ক্লৈককলুলুরবনিরুচ্চচার।

বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি বিবাহে উলু দিবার প্রথা নাই। পশ্চিমাঞ্চলে উলুর পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক যে মঙ্গল গান করিয়া থাকে তাহাকে সংস্কৃতভাষায় ধবল কহে। পশ্চিমবাসী নৈষধের টীকাকার নারায়ণ লিখিয়াছেন।—" বিবাহাদ্যুৎসবে স্ত্রীণাং ধবলাদিমঙ্গলগীতিবিশেষো গৌড়দেশে উলুলুরিত্যুচ্যতে।" নৈষধের অন্যান্য স্থল হইতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইহার লেখক বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। এই বিষয়ে বঙ্গদর্শনে একটি প্রস্তাব বাহির হয় তাহা দেখিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন যে শ্রীহর্ষ বঙ্গবাসী বটেন।

শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবিষয়ক একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া তদীয় মাতুল সাহিত্যদর্পণকার মম্মট তাঁহার অতিবুদ্ধি কিছু কমাইবার জন্য তাঁহাকে মাষকলাই খাইতে উপদেশ দিলেন। ভাগিনেয় মাতুলের পরামর্শে এই উৎকট ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নিয়ত মাষকলাই খাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে একদিন হিতৈষী মামা আসিয়া দেখিলেন ভাগিনে নিবিষ্টমনে মাষকলাই চিবাইতেছেন। দেখিয়া বলিলেন "বাপু হে কি হচ্চে?" ভাগিনেয় বলিলেন "অদ্যৈব শেমুষীনাশমাষ মশ্নাম্যহর্নিশং।" মামা বলিলেন "হাঁ হইয়াছে, আর তোমায় মাষকলাই ভোজন করিতে হইবে না।" ভাগিনের তখন বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছিল, মামার কথাটা সমজে উঠিতে পারিলেন না। মামা তখন বুঝাইয়া দিলেন, "যদি তোমার পূর্ব্বের মত বুদ্ধির প্রখরতা থাকিত তাহা হইলে তুমি 'অহর্নিশং' না বলিয়া 'অ[illegible]' বলিয়া অনুপ্রাস করিতে পারিতে।" ভাগিনে কিছু নির্বুদ্ধি হইয়া না গেলে বোধ করি মামাকে মাষকলাই খাইতে বলিতেন। মামা ভাগিনে সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধ রচনা করিয়া কেমন হইয়াছে দেখিবার জন্য মামাকে দিলেন। মামা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "দেখ বাপু, যদি বইখানি কিছু আগে লিখিতে তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হইত।" ভাগিনে কহিলেন "কিসে?" মামা কহিলেন "তাহা হইলে আমার দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণ খুঁজিতে হইত না।" সমালোচনটী মন্দ করা হয় নাই। এই ঘটনাটী পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বে কি পরে হইয়াছিল তাহা আমরা বিশেষ অবগত নহি।

শতাধিক শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নহে তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি কবি বা যিনি কাব্য বুঝেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই যে ইহা কবিত্বশক্তি অভাবের অন্যতম প্রমাণ।

নৈষধকার যে এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে কি তাঁহার কোন গুণই দেখিতে পাওয়া যায় না? সকলই কি অসার? জগতে কোন বস্তুই অমিশ্রিত নহে, কেবল দোষ বা কেবল গুণ কোথাও দেখা যায় না; নৈষধকারের পক্ষেই কি কেবল এই কথাটি বিপরীত হইল? তাহা নহে। ইহাতে অবশ্যই কোন না কোন গুণ আছে। আমরা এতক্ষণ কেবল নিন্দা করিয়াছি, এক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। আমরা যে নিন্দা করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা করিব তাহা নহে; নৈষধকার যতটুকু প্রশংসা পাইবার যোগ্য, ততটুকু তাঁহাকে দিব। নৈষধের ভাষা অতি চমৎকার, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কোথাও একটু ময়লা নাই। পাঠ করিলেই মনে হয় ইহার ভিতর কত ভাবই আছে। ভাষা কোন স্থানেই গ্রাম্যতা দোষে দূষিত হয় নাই, সর্ব্বত্রই উন্নত ও মধুর। দোষের মধ্যে কিছু কঠিন, সহজে অর্থবোধ হয় না। আর যে পরিশ্রমে অর্থটুকু বাহির করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ পুরস্কার হয় না, কারণ পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভাব অতি অল্প আছে। সেলি প্রভৃতির লেখাও অবিশদ, কিন্তু তাহাতে বস্তু থাকাতে পরিশ্রমের সাফল্য হয়, নৈষধে সেটুকু হয় না এই তফাৎ।

নলকর্ত্তৃক ধৃত হংস জীবনে নিরাশ হইয়া যে বিলাপ করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় নৈষধকার চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিক তাহাতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি আছে।

সপ্তদশ সর্গের মধ্যভাগে চার্বাক মত বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটী সমস্ত পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ। ইহা শ্রীহর্ষের ক্ষমতা প্রকাশের প্রকৃত বিষয় এবং ইহাতে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি চার্ব্বাক্‌দিগের মত এত বিশদরূপে ও এরূপ গাঢ়যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে তাহা খণ্ডন করা অতি দুষ্কর। দেবতারা যেরূপে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে তাহা অপ্রমাণ করা অসাধ্য। এই মত পাঠ করিলে আরও বুঝা যায় যে তদানীন্তন সমাজ শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সেবাকে পরম সুখ মনুষ্যজীবনের সার উদ্দেশ্য মনে করিত। Epicurean মত যেরূপ ক্রমে হীনদশায় উপস্থিত হইয়াছিল, চার্ব্বাক্ মতও এই সময়ে সেইরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে নৈষধবর্ণিত নলরাজা একজন বিলাসী ইন্দ্রিয়াশক্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছেন। উৎকৃষ্ট হৃদয়ের গুণ তাঁহার কার্য্যে প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীহর্ষের আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি অনুকরণ করেন নাই। ভালই হউক আর মন্দই হউক সকল ভাবই নিজের, অন্যের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। কল্পনার বলে নূতন ভাব সৃষ্টি করিতে গিয়া, অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। মাঘ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার চুরি নাই।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৪ সংখ্যা।

বঙ্গোন্নয়ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার বায়ু।

বাঙ্গালিরা যে পঞ্জাবী, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী ও অযোধ্যাবাসীদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আহারের দোষে তাহাদের পুষ্টিবর্দ্ধন হয় না। কেহ কেহ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক আচারের দোষ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলের কথা যে অনেকদূর সঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রম যে, তাঁহারা অপ্রধান কারণকে প্রধান কারণ বলেন। বাঙ্গালার বায়ুই বাঙ্গালিদের দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। বেহারের গো, অশ্ব, মেষ ও ছাগ যাহা ভক্ষণ করে, বাঙ্গালার গবাদি তাহাই ভক্ষণ করে; তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের নিয়ম নাই; তবে কেন বাঙ্গালার গবাদি বেহারের গবাদি অপেক্ষা দুর্ব্বল?*

---

* বাঙ্গালার ঘাসে জলভাগ অধিক আছে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহাও বায়ুর দোষে। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত পশুই দুর্ব্বল, কিন্তু শার্দ্দূল, গণ্ডার ও বন্যমহিষ অতিশয় বলবান্। ইহার কারণ কি বলা সুকঠিন। সুন্দরবনের জ্বরজবায়ুতে কি ব্যাঘ্রের কোন অনিষ্ট হয় না? ডাক্তার ফেরার বলেন যে, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের বল আফ্রিকার সিংহের বল অপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কিঞ্চিৎ অধিক হইবে; সুতরাং ব্যাঘ্রকে পশুরাজ বলা যাইতে পারে। ১৮৫৭ সনে ইংলণ্ডে একটী পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের সহিত একটী ব্যাঘ্রের যুদ্ধ হয়, সিংহ হত হয়। (Darwin's Descent of man & Sexual selection, 2nd edition, P. 521.) দুই একটি দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্যাঘ্র সিংহ অপেক্ষা বলীয়ান্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, কারণ ইহা সম্ভব যে হত সিংহ ব্যাঘ্রাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বা পীড়কাতর

বাঙ্গালা গ্রীষ্মপ্রধানদেশ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসের শুভ ফল এই যে সূর্য্যের প্রসাদে আহারের দ্রব্যাদি অনায়াসলব্ধ, অল্প যত্নেই শরীররক্ষা হইতে পারে, শীতনিবারণ জন্য মৃদঙ্গারাদির প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়; অশুভফল এই যে সর্প ও শ্বাপদজন্তুর ভয় অধিক, এবং ওলাউঠা ও জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব। তবে শীতপ্রধানদেশ অপেক্ষা কাশাদি ফুস্ফুসের রোগ অনেক কম।

অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বায়ুর উষ্ণতা মানবপ্রকৃতির তেজস্বিতাহ্রাসের যেমন কারণ বলেন, বস্তুতঃ তাহা তেমন প্রবল কারণ কি না সন্দেহ। আরবস্থানের বায়ু যেমন উষ্ণ, এমন উষ্ণবায়ু প্রায় কোন দেশেই নাই, অথচ আরবদের ন্যায় তেজস্বী জাতি বিরল।† উইলিয়ম ওয়েষ্ট গার্থ ও সামুয়েল্ মস্মান্, যাঁহারা অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনির বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ঐ দেশে অদ্যাপি ওলাউঠারোগ প্রবেশ করিতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মে তথাকার উপকূলেও তাপাংশ একশতের অধিক হয়।

তাপের সহিত অধিকপরিমাণে জলীয় পরমাণুর সংযোগ হইলে যেমন অনিষ্ট হয়, কেবল তাপে তেমন হয় না।

বাঙ্গালার বায়ু উত্তপ্ত বলিয়া দুষ্ট নহে, প্রচুর বাষ্পপূর্ণ বলিয়া দুষ্ট। এরূপ বায়ু বৃক্ষাদির পক্ষে ভাল; কিন্তু জীবজন্তুর পক্ষে ভাল নহে।

বাঙ্গালার ভূমি সাগরপৃষ্ঠ হইতে অত্যল্প উন্নত। নীচদেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। তথাকার বায়ু নিশ্চয়ই বাষ্পদুষ্ট এবং অস্বাস্থ্যকর হইবে। হলণ্ড শীতপ্রধানদেশ; এবং ওলন্দাজগণ ভূমি শুষ্ক করিতে অতিশয় যত্নশীল; তথাপি দেশ নীচ বলিয়া, তথাকার বায়ু বিলক্ষণ বাষ্পময়, এবং তথায় পালাজ্বর, কাশ ও বাতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বস্থানেই জ্বর বিরাজমান রহিয়াছে, তবে

ছিল। তবে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, কিরূপে বাঙ্গালার প্রায় সকল জীব দুর্ব্বল, কেবল ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও বন্যমহিষ প্রবল।

† আরবদের দিগ্বিজয়ের কথা সকলেই জানেন; তবে তাহাদের স্বদেশরক্ষা যেমন প্রশংসনীয়, দিগ্বিজয় তেমন প্রশংসনীয় নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানি যে তিনদেশের দর্পে এক্ষণে পৃথিবী কম্পিতা, এই তিনদেশই শত্রুসৈন্যকর্ত্তৃক পুরাকালে জিত হইয়াছিল; আরবস্থানের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই—Arabia has been celebrated from time immemorial as the seat of in dependence and pastoral simplicity, and it is perhaps the only country in the world which until it was lately overrun by the troops Mahomed Ali was never profaned by foreign conquest. *Account of Arabia by David Buchanan & William Platt.*

যেখানে অনেক বিল, যেখানকার নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ও যেখানকার জলপ্রণালী ভাল নহে, সেখানে কিছু অধিক; আর যেখানকার ভূমি কঙ্করময় বা বালুকাময় ও শুষ্ক ও যেখানকার জলপ্রণালী ভাল, সেখানে কিছু কম।

ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন যে, যদিও সাধারণতঃ বরুণের কার্য্যে ভূমির অবনতি এবং অগ্নির কার্য্যে ভূমির উন্নতি হয়, তথাপি যেখানে অগ্নির কার্য্য প্রতীয়মান হয় না, সেখানেও ভূমির উন্নতি দেখা গিয়াছে। বথ্‌নিয়া উপসাগরের তট ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়াছে, তাহা পবন বা অগ্নির কার্য্য নহে। যদি ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ঐ কারণে বঙ্গভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অধিকতর উন্নত হয়, তবেই দেশের মহামঙ্গল হইবে। মনুষ্যের আয়াসে অধিকদূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে জলনিঃসরণের উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে, যেখানে স্রোতস্বতী নদী আছে, তথাকার বিলের জল, খাল কাটিয়া নদীতে আনিতে পারিলে, এবং অন্য উপায়ে ভূমির আর্দ্রতার হ্রাস করিতে পারিলে কতক দূর কার্য্য হয়।

হুগলী ডানকুনীর জলা হইতে খাল কাটিয়া গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজাবর্গের উপকার করিয়াছেন, উত্তর বাঙ্গালার রেলওয়ে দ্বারা তত উপকার হইতেছে কি না সন্দেহ। যাত্রিবর্গের সুবিধা ও বাণিজ্যের সুবিধা মঙ্গলময় বস্তু বটে; কিন্তু স্বাস্থ্যের নিকটে তাহা কিছুই নহে। ক্রমশঃ

শ্রীতা, প্র, চ।

তর্কপ্রণালী।

(THE SUBJECTIVE AND THE OBJECTIVE METHOD.)

দার্শনিক প্রবন্ধ দেখিলেই বঙ্গীয় পাঠক তাহাতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন দর্শন ঢেঁকির কচ্‌কচি, দর্শনপাঠে কিছুমাত্র লাভ নাই ইত্যাদি। যদি দেখিতাম, যে বঙ্গীয় পাঠক দর্শনে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে মনঃসংযোগ করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার এ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যিনি রামকান্তের বিবাহ, শ্যামকান্তের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অসার প্রবন্ধ পড়িয়া সময় সময়ব্যয় করেন, তাঁহার মুখে দর্শনের অসারতাসম্বন্ধে কোন কথা সহ্য করিতে পারি না। ফলতঃ বঙ্গীয় পাঠক কিজন্য দর্শনে উপেক্ষা করেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহার অভিনিবেশ অতি অল্প, তাঁহার

শরীর দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। যে সকল প্রবন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র মনঃসংযোগের প্রয়োজন, যে সকল প্রবন্ধ অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পাঠ করিতে পারা যায় না, তিনি সে সমস্ত পড়িতে নিতান্তই নারাজ। সুতরাং দর্শন কেন, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি যাহা কিছু চিন্তাবত্তার পরিচায়ক সে সমস্তই তাঁহার চক্ষুঃশূল।

গ্রাহক যেখানে যে প্রকারের, বিক্রেয় দ্রব্যও সেখানে সেই প্রকারের হইয়া থাকে। ইংরেজপটিতে গোস্ত মটন ইত্যাদি বিক্রয় হয়, বাঙ্গালিপটিতে বিক্রয় হয়, কচু, কলা, শাক,মূলা ইত্যাদি। যে দেশে পাঠক যেপ্রকারের, লেখকও সেই প্রকারের হইয়া থাকেন। এই জন্যই বাঙ্গালালেখকদের মধ্যে অসার অথচ মনোরঞ্জন প্রবন্ধ অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সারগর্ভ তত্ত্বসমূহকে মনোহর আকারে উপস্থাপিত করিতে পারেন এরূপ প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা অল্প। সুতরাং তত্ত্বশিক্ষা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালিরা যে আজিও এ কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই, ইহা আমার বলিতে ইচ্ছা হয় না। " ইচ্ছা হয় না বলিয়াই বঙ্গীয় পাঠকের উপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠরূপ কষ্টবিধান করিতে সাহসী হইলাম।

তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য প্রধানতঃ দুইটি প্রণালী কল্পিত হইয়াছে। একটির নাম দার্শনিক বা আনুমানিক প্রণালী,* অন্যটির নাম বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষপ্রণালী। এই দুইটী প্রণালী কি, এই দুইটীর পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ, ইহাদের মধ্যে কোনটী ঠিক্‌, কোনটী ভুল প্রভৃতি প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য মীমাংসা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রণালীদ্বয়ের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন একদিন চন্দ্রমণ্ডল হইতে দুইটি পুরুষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা নানা বস্তু দেখিতে দেখিতে (পৃথিবীর সকল বস্তুই তাঁহাদের নিকট নূতন) এক ঘড়িওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন। ঘড়ি তাঁহাদের নিকট এক নূতন দ্রব্য। যদি এই দুই পুরুষের মধ্যে একজন দার্শনিক ও অন্যে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপ তর্ক করিবেন, নিম্নে তাহা দর্শিত হইতেছে।

---

* Subjective method—আনুমানিক প্রণালী
or
Metaphysical method—দার্শনিক প্রণালী.

Objective method—প্রত্যক্ষ প্রণালী
or
Scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী

দার্শনিকপ্রণালীর প্রযোক্তা (সংক্ষেপে আমরা ইহাকে দ বলিয়া উল্লেখ করিব) বলিবেন ঘড়িটি একপ্রকার জীব। উহার দুইটি কাঁটা তাঁহার নিকট দুই-খানি হাত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ঘড়ির অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রটি তিনি উহার হৃৎকোষ বলিয়া মনে করিবেন। ঘড়ি-হইতে যে অনবরত টুকটাক্ শব্দ নিঃসৃত হয় তাহাকে তিনি উহার শ্বাসপ্রক্ষেপের শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। মধ্যে মধ্যে যে ঘড়ির টুং টাং শব্দ হয় সেই তিনি ইহার ক্রন্দনধ্বনি বলিয়া মনে করিবেন। এইরূপে, জীব বলিলে আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, ঘড়িতে তাহাদের কতকগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি উহাকে এক জীব বলিয়া অভিহিত করিবেন।†

কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিকপ্রণালীর প্র-যোক্তা (আমরা ইহাকে সংক্ষেপে ব বলিয়া ডাকিব,) তিনি বলিবেন "হাঁ ইহা জীব বলিয়াই অনুমান হইতেছে। সাবধানে খুলিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কল, দড়ি ইত্যাদি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বোধ হইবে যে ঘড়ি জীব নহে। উহা একপ্রকার কলমাত্র।

দ এবং ব এই উভয়ের মধ্যে কাহার মীমাংসা নির্ভুল ? আমরা সকলেই জানি ঘড়ি একপ্রকার কল। সুতরাং এস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু অনেক স্থলে এইরূপ মীমাংসা করা অতীব দুরূহ হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ বিবৃত করিতেছি।

প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় প্লাঞ্চেট লইয়া বড় ধুমধাম হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন, এবং এখনও করেন, যে প্লাঞ্চেট ভূতের কাণ্ড। প্লা-ঞ্চেটে ভূত ভবিষ্যৎ জানা যায়। কাহার প্রপিতামহের নাম কি, কাহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কোন সালে জন্মগ্রহণ করি-য়াছেন প্রভৃতি প্রশ্ন প্লাঞ্চেটকে জিজ্ঞাসা

† একজন চাসা ঘড়ির মধ্যে একপ্রকার কীটের অবস্থিতি আশঙ্কা করিয়া ঘড়িটি মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেও কীটের শব্দ থামিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পদাঘাতে উহা চূরমার করিয়া ফেলে।

পারিতেছে; সুতরাং প্লাঞ্চেট ভূত বলিয়া সহজেই অনুমিত হইত।

কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তর্ক করিতেন, তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, প্লাঞ্চেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া তাঁহারা কোনরূপ মীমাংসা করিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, যে প্লাঞ্চেট এইরূপে নির্ম্মিত যে ইহার উপর অল্প চাপ পড়িলেই ইহার চাকা ঘুরিতে থাকে; তখন যাঁহারা প্লাঞ্চেট ধরিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের ভাব সমস্ত তাঁহাদের অজ্ঞাতে উহা হইতে বাহির হইয়া পাকে। ব্রাহ্ম প্লাঞ্চেট ধরিলে ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া লেখা বাহির হয়। আবার হিন্দুতে প্লাঞ্চেট ধরিলে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া লেখা বাহির হয়। আবার নিরক্ষর ব্যক্তি প্লাঞ্চেট ধরিলে কোন প্রকারের লেখাই বাহির হয় না। এই সকল দেখিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রযোক্তারা মীমাংসা করেন, যে প্লাঞ্চেটের নির্ম্মাণকৌশল আছে বটে, কিন্তু ইহা ভূত নহে।

এস্থলে দ ও ব ইহাদের মধ্যে কাহার মীমাংসা নির্ভুল ঠিক করিয়া বলা যায় না। অন্ততঃ এ বিষয়ে সাধারণের ঐকমত্য নাই। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আজিও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীতে প্রভেদ কি। দার্শনিক প্রণালীতে কোন এক বস্তু দেখিয়া তদ্বিষয়ে অনুমান করিয়া লওয়া হয়, যাহাতে সেই অনুমানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অনুমানটী অনুমেয় বস্তুর সহিত মিলিল কি না তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বস্তু দেখিয়া যে অনুমানটি করা হয়, সেইটির সহিত বস্তুটী সম্পূর্ণরূপে মিলিল কি না, তাহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি অনুমানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে না মিলে, তাহা হইলে ঐ অনুমানটি ছাড়িয়া দিয়া অন্য একটি অনুমান প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে যতক্ষণ না অনুমানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে ততক্ষণ কোনরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয় না।

কোন এক বস্তু দেখিয়া তদ্বিষয়ে অনুমান করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। দার্শনিকপ্রণালী এই অনুমানটি পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন; তিনি ঐ অনুমানের অঙ্গপারিপাট্য সম্পাদন করেন। তিনি কখনই অনুমানের বাহিরে যান না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অনুমানটীকে বস্তুর সহিত বিশেষরূপে মিলাইয়া দেখেন। গণিতের আকারে প্রকাশ করিলে, এই প্রণালীকে দুইটি নিম্নলিখিতরূপে সজ্জিত করা যাইতে পারে।

দার্শনিকপ্রণালী = বস্তুর দর্শন + অনুমান

বৈজ্ঞানিকপ্রণালী—বস্তুর দর্শন+অনুমান+বস্তুর সহিত অনুমান মিলিল কি না তদ্বিষয়ক পরীক্ষা।

পৃথিবীর আদিকাল হইতে মনুষ্য অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে। কি অসভ্য অবস্থায়, কি সভ্য অবস্থায় সকল সময়েই মনুষ্য সকল কার্য্যেই অনুমানের আশ্রয় লইয়া আসিতেছে। যখন মনুষ্য অতি অসভ্য ছিল তখন পৃথিবীতে কর্ম্মক্ষমতার অধিকতর প্রয়োজন ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ডশরীর, বিপুলতেজস্ক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে, পর্ব্বতগুহায়, বৃক্ষকোটরে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। প্রতিদিন প্রতিদিনে আহারের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিতে হইতেছে। যখন জীবিতচেষ্টা (struggle for existence) এত প্রবল, তখন অনুমান অতি অপরিপকরূপ হইত। মেঘ ডাকে কেন, মেঘের মধ্যে এক হাতী আছে সেই হুঙ্কার করিতেছে। ফুল ফুটে কেন, বনে এক বনদেবী আছেন, তিনি সমস্ত কলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন। মনুষ্যের বিপদ্ হয় কেন, এক দেবতা আছেন, তিনি এই সকল বিপদে মনুষ্যকে ফেলিয়া থাকেন; এইরূপে সকল প্রশ্নের সমস্যা এক এক কথায় পাওয়া যাইত। যে সকল প্রশ্নের অনুমান খাড়া করিতে এক এক মহাপণ্ডিতের সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তখন এক কথায় সে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইত। অমুক জিনিস কেন ওরূপ হইল; একজন দেবতা উহা ওরূপ করিয়া দিয়াছেন।

যখন মনুষ্যের জীবিতচেষ্টা কিছু কমিল, যখন বন্যজন্তু সমস্ত মনুষ্যের বশবর্ত্তী হইল, যখন অসভ্য অবস্থার অনিশ্চিত জীবনের পরিবর্ত্তে মনুষ্যের জীবন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিততর হইল, তখন অনুমানের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্ত হইল। পূর্ব্বে এক এক কথায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এখনও তাহাই হইতে লাগিল; কিন্তু এখন অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে প্রমাণের যোগ দেখা যাইতে লাগিল। এই সকল প্রমাণ অনেক সময়ে অতি বিচিত্র প্রণালীর হইত। একজন দার্শনিক বলিলেন, সংখ্যাই সমস্ত বস্তুর আদিকারণ, সকল বস্তুই হয় এক বা তদধিক সংখ্যার অন্তর্ভূত। কেহ বলিলেন, অগ্নিই সমস্ত বস্তুর আদি, কেন না অগ্নির নিজের দাহিকাশক্তি আছে। এইরূপে যাহার যে ইচ্ছা হইত, সে সেইরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিত। ইহাতে এই ফল হইল, যে ক্রমে অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

"অন্ধকারে ডেলা ফেলার" মত এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন কোনটা কখনও সত্যও হইয়া পড়িত। কিন্তু

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অসার ও অযৌক্তিক হইত। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল; যেমন পথ পরিষ্কার না থাকিলে, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, ঠিকপথে গেলেও তাহা ঠিকপথ বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ তর্কপ্রণালী অবিদিত থাকাতে তত্ত্বনির্ণয় সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল।

এই সময়ের মধ্যে কত প্রকারের কত মত যে আবিষ্কৃত হইল তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে। যেমন বর্ষাকালে প্রাঙ্গণোপরি একটির পর আর একটি বুদ্বুদ উত্থিত হয়, প্রত্যেক বুদ্বুদটি ইহার পূর্ব্ব বুদ্বুদ অপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল, কিন্তু সকলগুলিই কিয়ৎকালের মধ্যে জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ একজন দার্শনিকের পর অন্য দার্শনিক আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। আজি ব্রাউন সমস্ত জগৎকে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত দর্শনের ভ্রম প্রতিপন্ন করিলেন। কালি হ্যামিল্টন আসিয়া বলিলেন, ব্রাউন যাহা কিছু বলিয়াছেন সমস্তই ভ্রান্ত। পরশ্ব মিল আসিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, হামিল্টনের সমস্ত কথাই ভ্রান্ত। এইরূপে বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে নূতন নূতন দর্শন বাহির হইতে লাগিল। জন্মকালে সকল দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর এক জন দার্শনিক আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেন, যে পূর্ব্বের দর্শন সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। সুতরাং সহজেই লোকের মনে বিশ্বাস হইত যে দর্শন অপ্রয়োজনীয়। যাহাতে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় না, তাহাতে লোকে কেন আদর করিবে?

মনুষ্য যতই সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিল, ততই তাহাদের চিন্তাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত ও পরিশুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আর যে সে প্রমাণ মনুষ্যের গ্রাহ্য হইত না। পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহা অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রমাণের দোষ গুণ বিবেচিত হইতে লাগিল। কোন প্রমাণটি ভাল, কেন ভাল, অন্য অন্য প্রমাণের দোষ কি প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল। পরে যখন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যখন বিদ্যাশিক্ষা শুদ্ধ জনকতক লোকের মধ্যে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিল না, যখন আপামর সাধারণেই বিদ্যার রসাস্বাদ ও আলোচনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তখন প্রমাণ প্রয়োগের প্রণালীও উন্নততর হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে ডেকার্ট (Des Cartes) জন্মগ্রহণ করিলেন।

ডেকার্ট প্রমাণের আবশ্যকতা বুঝিলেন। তাঁহার নিকটে সকল বস্তুরই প্রমাণের আবশ্যকতা আছে ইহা প্রতীয়মান হইল। জগদীশ্বর আছেন, মন

াছে, আমি আছি প্রভৃতি যে সকল ্রশ্নের তুমি আমি কোনই প্রমাণ দেখিতে পাই না, ডেকার্ট সেইগুলি নিয়মমত, রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিলেন। ডেকার্টের জগদীশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

জগদীশ্বর আছেন।

কারণ—জগদীশ্বরসম্বন্ধে যে ভাবটি আমাদের মনে আছে, সেইটি জগদীশ্বরই তথায় সেই প্রকারে রাখিয়াছেন।

যদি বল—ঐ ভাবটি আমি নিজেই আমার মনে রাখিয়াছি, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া উহা বিনষ্ট করিতে পারি না কেন? যে ভাবটি আমি নিজে প্রস্তুত করিতে পারি সেই ভাবটি আমি নিজেই বিনষ্টও করিতে পারি।

সুতরাং—প্রমাণ হইল যে জগদীশ্বরের ভাবটি জগদীশ্বরই আমাদের মনে রাখিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইল, যে ঐ ভাবটী নিজে প্রস্তুত করি নাই।

সুতরাং—জগদীশ্বর আছেন।

এইরূপ প্রমাণ ঠিক হইল কি না আমরা সে বিষয়ের তর্ক করিতেছি না। আমরা শুদ্ধ দেখাইতেছি যে, ডেকার্ট প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অতিসুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। পূর্ব্বে জগদীশ্বর আছেন বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে আর তাহা হইত না। এক্ষণে রেখাগণিতের ন্যায় প্রমাণপ্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইল। প্রমাণ প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু মনই প্রমাণের সত্যাসত্যতার বিষয়ে একমাত্র বিচারকর্ত্তা রহিল। নক্ষত্রসকল বৃত্তাকারে ঘুরিয়া থাকে। কেন? আমরা মনে মনে জানিতে পারি যে বৃত্তই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র। মন আরও বলে, যে জগদীশ্বরের কোন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং নক্ষত্র বৃত্তাকারে ঘুরিয়া থাকে।

এইরূপে ডেকার্ট অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রমাণ করিলেন। আমি আছি, কারণ আমার মন বলে যে যাহা কিছু চিন্তা করিতে পারে তাহাই আছে; আমি চিন্তা করিতে পারি, সুতরাং আমি আছি। প্রমেয় যাহাই হউক না কেন, বাহ্যজগতের কথাই হউক বা অন্তর্জগতের কথাই হউক সকলস্থলেই মন একমাত্র বিচারকর্ত্তা। যে প্রশ্নই উত্থিত হউক না কেন, মন তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবে। ফ্রান্সে ডেকার্ট এই মত প্রচার করিলেন। তাহার পর ইউরোপের অন্য অন্য দেশে তাঁহার এই মত প্রচলিত হইতে লাগিল। ডেকার্ট, ম্যালব্রাঞ্চ, স্পিনোজা, লায়েবনিজ্‌ ফিক্টী, ক্যাণ্ট, সেলিং, হেগিল প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতেরা ডেকার্টের এই মত সম্প্রসারণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জর্ম্মানিতে এই মত অতি প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে ইহা ফ্রান্সে অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। এই মতের প্রণালীকে

আমরা দার্শনিক প্রণালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যখন ডেকার্ট ফ্রান্সে পূর্ব্বমত প্রচার করেন, তখন বেকন (Bacon) ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বেকন বলিলেন মনের বিচার কোন কাজের নয়। বস্তু দেখিয়া শুদ্ধ মনে মনে বিচার করিলে বস্তুর তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারা যায় না। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বস্তুটি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। বস্তুটী স্বচক্ষে দেখিয়া, উহার সহিত ঐ প্রকারের অন্য পাঁচটী বস্তু মিলাইয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে। যখন তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন আবার উহার সহিত বস্তুর সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তত্ত্বনির্ণয়কালে যাহা যাহা স্থির হয়, যদি বস্তুতে ঠিক সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তবেই তত্ত্বের উপর নিঃসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে। মনে করুন, যেন স্থির করিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার কারণ কি? বেকন উপদেশ দিবেন, যে, যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া হইয়াছে সেখানকার প্রধান খাদ্যসম্বন্ধে, জলনালীসম্বন্ধে, বৃক্ষসমূহের অবস্থানসম্বন্ধে, গৃহনির্ম্মাণের কৌশলসম্বন্ধে প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের পর ...ষটী বিশেষ বিশেষ বিষয় সকল ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশেই বিদ্যমান, সেই কয়টীর সহিত জ্বরের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে ঐ সকল বিষয়সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন কোন দেশ আছে কি না। এইরূপ নানাবিধ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারা যাইবে ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ কি। ডেকার্ট হইলে হয় ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেন যে, যে দেশে পাপীর সংখ্যা অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জগদীশ্বরের ক্রোধের পরিচায়ক। যে দেশে পাপী অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া দ্বারা জগদীশ্বর পাপীদের দণ্ডবিধান করেন। বেকন যে প্রণালীটী প্রচলিত করিলেন, হবস্, লক্, হিউম্, মিল্, কম্‌টি, স্পেন্সার্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সেই মতের সম্প্রসারণ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাই এই প্রণালীর অনুসরণ করেন।

যতদিন দার্শনিকপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে আপনার ক্ষমতা বুঝিতে পারিত না। তাহারা সকল তত্ত্বই আপনাদের আয়ত্ত বলিয়া মনে করিত। পৃথিবী আদিতে কি ছিল, শেষেই বা কি হইবে, পরকাল কি প্রকার, পাপ পুণ্যের বিচার কি প্রকার, পরমেশ্বর কি প্রকার, তাঁহার শাসনপ্রণালী কিরূপ, প্রভৃতি সকল তত্ত্বই মনুষ্যের দ্বারা নির্ণীত হইত। মনুষ্যের কল্পনার গতি অপ্রতিহত। "উচ্চে, নীচে, গভীরে, অম্বরে,

গর্ভে, আকাশে” সর্ব্বত্রই কল্পনার নিকট সুগম্য। এবং যেখানে কল্পনা যাইতে পারে, মনুষ্য সেইখানেই যাইয়া তথাকার তত্ত্বনির্ণয় করিতে বসিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দার্শনিক প্রণালীতে মনই একমাত্র বিচারকর্ত্তা। যেখানে মন বিচারক সেখানে সকল বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। কারণ মনের উপর কাহারও আপীল নাই। মন যাহা বলিয়া দিলেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। মন যাহা স্থির করিয়া দিলেন তাহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন মনের আর ওরূপ ক্ষমতা রহিল না। মনের মীমাংসা কার্য্যের সহিত, ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির সুগম্য ছিল বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাহাদের অনেকগুলি মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরমেশ্বর কি, পরকাল কি; সেখানে পাপপুণ্যের বিচার কিরূপ প্রভৃতি প্রশ্ন একেবারেই মানবের অনুসন্ধেয় বিষয় হইতে দূরীকৃত করা হইল। যাহা কখন কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় নাই বা হইতে পারে না, এমন বিষয়সমস্তের উপর মনুষ্য আপনাকে নিয়োজিত করিতে চাহিল না। এই সকল কারণে বেকনের পর হইতে বিজ্ঞানচর্চ্চা বহুলরূপে প্রচলিত হইতে লাগিল। অন্য অন্য শাস্ত্রেরও লিখনপ্রণালী একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দর্শন হইতে অবিজ্ঞেয় বস্তুসকলের মীমাংসা একেবারে উঠিয়া গেল। ইতিহাস ভিন্নপ্রণালীতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইতে লাগিল। অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি নূতন অথচ অত্যাবশ্যক শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। নীতিসম্বন্ধীয় প্রশ্নসকল নূতন প্রকারে আলোচিত হইতে লাগিল। মনুষ্য অবিজ্ঞেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ করিতে লাগিল।

বাহ্যজগতের পদার্থসমূহসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করা সহজ। ঘেঁটুপাতা সর্পদংশনের ঔষধ কি না জানিতে হইলে আমরা জন্তুকে সর্পদষ্ট করাইয়া তাহাকে ঘেঁটুপাতা সেবন করাইতে পারি। চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাঁটার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার জন্য পূর্ণিমার দিন নদী বা সমুদ্রের জলবৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিতে পারি। কিন্তু অন্তর্জ্জগতে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অন্তর্জ্জগতের কোন ঘটনাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেখানে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করা যাইতে পারে? আমরা এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

যেমন বাহ্যজগতের সকলবস্তুরই

বিজ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতের সকলপ্রশ্নই দর্শনশাস্ত্র দ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। মন কি পদার্থ? ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রশ্ন। যত দিন দার্শনিক প্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে বলিত, মন একপ্রকার অদৃশ্য বস্তু। জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ যেসকল উপাদানে নির্ম্মিত, লোকে মনকেও সেই সেই উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ করিত। তখন মনের সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কেহ বলিতেন মন মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন হৃৎকোষে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন শরীরের সর্ব্বঅংশেই আছে, কেহ বলিতেন, মন শরীরের প্রত্যেক অংশে অবস্থিত ইত্যাদি। ফলতঃ মন যে শরীর হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাতে সকলেই বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের স্থল রহিল না। মনুষ্য মনকে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে স্বীকৃত হইল না। মনের মত কোন পদার্থই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। এই ক্রিয়াগুলি শারীরিক অন্য অন্য ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যেমন শ্বাসপ্রক্ষেপ, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, মনও সেইরূপ শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কি কি উপায়ে আমাদের জ্ঞানলাভ হয় ইহাও দর্শনশাস্ত্রের এক অতি নিগূঢ় প্রশ্ন। সকলেই স্বীকার করেন, যে আমরা ইন্দ্রিয়হইতে আমাদের জ্ঞানের উপাদান প্রাপ্ত হই। যতদিন দার্শনিক প্রথা প্রবল ছিল, ততদিন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভিন্ন আর একপ্রকার জ্ঞানে মনুষ্য বিশ্বাস করিত। তাহারা বলিত যে মনের এক স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রদায়িনী শক্তি আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, সকল বিষয়ের সমস্যা স্থির করিতে পারে না। সময় কি, স্থান কি, ঈশ্বর কি, আত্মা কি, প্রভৃতি কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কোন রূপ প্রয়োগ করা যায় না। ঐ সকল প্রশ্নের নির্দ্ধারণ কালে আমরা মনের স্বাভাবিকী শক্তির নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর মনের পূর্ব্বরূপ শক্তির প্রতি মনুষ্যের আস্থা রহিল না। তখন স্থিরীকৃত হইল, যে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জ।

নীতিসম্বন্ধেও ঐরূপ মতের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে। যখন দার্শনিক প্রণালী প্রবল ছিল, তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে জগদীশ্বর আমাদের মনে আমাদের জন্মকাল হইতেই হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কোন

দেখিবামাত্রই, উহা হিত কি হিত, আমরা ঐ ক্ষমতাবলে বলিয়া দতে পারি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর পূর্ব্বের মত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতায় লোকের* বিশ্বাস রহিল না। তখন হিতাহিত বিবেচনার সম্বন্ধে অন্য অন্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে এক্ষণে ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে সকল শাস্ত্রেই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রযুক্ত হইতেছে। ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী বহুলপরিমাণে সন্নিবেশিত হইতেছে। আমরা সকল বিষয়েই ইউরোপের অনুকরণ করিয়া থাকি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কখন অনুকরণ করিতে শিখিব কি?

খাজনা কেন দিই ?

বহুকালাবধি লোকে খাজনা দিয়া আসিতেছে। শতপুরুষ ধরিয়া লোকের সংস্কার এই যে জমী লইলেই খাজনা দিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে খাজনা ছাড়া জমী পাওয়া যায় না। ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর আদি যে সকল জমীর খাজনা দিতে হয় না তাহা আগে মালের জমী ছিল, কোন ভূম্যধিকারী দয়া করিয়া তাহার খাজনা দেওয়া রহিত করিয়া দিয়াছেন, অথবা খাজনা লন না এই পর্য্যন্ত। খাজনা লওয়াটাই নিয়ম, না লওয়াটা নিয়মবহির্ভূত। এইরূপ অনেক পুরুষ ধরিয়া দেখিয়া আসাতে সংস্কার এরূপ দাঁড়াইয়াছে, যে খাজনা লওয়া যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে এটী একটী প্রাকৃতিক নিয়ম, জমী লইলেই খাজনা দেওয়াও সেইরূপ। যখন খাজনা দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, তখন খাজনা কেন দিই, এরূপ প্রশ্ন লোকের মনে উদয় না হওয়াই সম্ভব। জমী লইব, যাহার জমী তাহাকে খাজনা দিব, ইহাতে আবার কেন কি? যেমন টাকা লইলে সুদ দিতে হয়, বাড়ী লইলে ভাড়া দিতে হয়, জমী লইলেও সেইরূপ খাজনা দিতে হয়। এর আবার কারণ জিজ্ঞাসা কেন?

* বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথার সময় আমরা "লোকের" এই কথাটি "অধিকাংশ লোকের" স্থলের ব্যবহার করিয়াছি। দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্বাস করেন, এখনও এরূপ লোক অনেক আছেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করার হেতু আছে। *তুমি টাকা রোজগার করিয়াছ, টাকা* তোমার। তোমার টাকা আমি লইতে গেলে তোমার কিছু লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তোমার বাড়ী তোমার নিজযত্নে প্রস্তুত, নিজে তাহার জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছ, আমি তাহা ব্যবহার করিব, তোমার নিজের লাভ না থাকিলে তুমি দিবে কেন? তুমি বলিবে আমার জমী আমি তোমাকে দিব আমার লাভ না থাকিলে দিব কেন? কিন্তু কথা এই তোমার জমী হইল কিরূপে। তুমি বলিবে আমি কিনিয়াছি। কিন্তু জমী কার যে তুমি কিনিবে। তোমার জিনিস তুমি ইচ্ছামত নষ্ট করিতে পার, তোমার বাড়ী তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, তোমার টাকা তুমি সমুদ্রের অগাধ জলে ফেলিয়া দিতে পার. তোমার অজ তুমি লাঙ্গুলের দিকে বলিদান দিতে পার, কিন্তু তোমার জমী তুমি নষ্ট করিতে পার না। বাস্তবিকও তুমি জমী কেন নাই, তুমি [illegible] জমীব্যবহারের স্বত্ব [illegible] কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে গেলে ত [illegible] পূর্ব্বে অনেক কথা বলা চাই। অনে[illegible] গুলি প্রশ্নের মীমাংসা চাহি। আ[illegible] আজি এই প্রস্তাবে চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

(১) জমী কার?

(২) কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে?

(৩) খাজনা কেন দিতে হয়?

(৪) খাজনা কত হওয়া উচিত? *তাহার পর প্রসঙ্গক্রমে*

(৫) যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হয় কেন? এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

১। জমী কার?

আমরা যে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে বাস করি তাহার পরিধি ১১০০০ ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ। এই ভূপৃষ্ঠের দুই ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। স্থলভাগের কোথাও মরুভূমি, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও বন, কোথাও জল। অবশিষ্ট উর্ব্বর ভূমি এই উর্ব্বরভূমিখণ্ড হইতে আমাদের প্রাণধারণোপযোগী পদার্থের উৎপত্তি হয়। যে কেহ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই জীবনধারণ প্রয়োজন সুতরাং জীবনধারণোপযোগী পদার্থ যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। জীবন বলিতে যে শুদ্ধ মনুষ্যেরই জীবন বুঝাইবে এমন [illegible] লেখা পড়া নাই। যাহার প্রাণ [illegible] হারই প্রাণধারণ করিতে হয় [illegible] ই পৃথিবীর জমীতে অধিকার। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কীটাণু প্রভৃতি সকলের পৃথিবীর জমীতে যে অধিকার, আমার তোমার ও মহারাজা গোপাল নগরেরও সেই অধিকার। প্রাণধারণোপযোগী পদার্থ এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইবে। প্রাণও সকলকে ধারণ করিতে হইবে, অতএব একজনকে ভূমি

হইতে বঞ্চিত করাও যাহা তাহাকে মরিতে বলাও ঠিক তাই।

ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের জন্য যেমন আকাশ হইতে ম্যানা বর্ষণ করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা করেন না, এখন আমাদিগকে নিজপরিশ্রমে স্বহস্তে এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আমাদের আহারসংগ্রহ করিতে হয়। জমী ভিন্ন আমাদের চলে না, অতএব জমী কাহারও নহে, উহাতে প্রাণী হইলেই স্বত্ব জন্মে।

এই সাধারণনিয়মের অনেক ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। অনেক হিংস্রজন্তু অপর জন্তুর মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে। অনেক মনুষ্যও অর্দ্ধেক উদ্ভিজ্জ ও অর্দ্ধেক প্রাণিজ আহারে দেহপুষ্টি করেন। অনেক জাতি আছে তাহাদের মৎস্যই প্রধান আহার। মৎস্যের সঙ্গে জমীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। এ সকল বিষয়ের তর্ক তুলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পশুআহার যাঁহারা করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন; তাঁহারা যে আর একজনের স্বত্বনাশ করেন, শুদ্ধ তাহাই নহে; তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত নাশ করেন। তাঁহাদের মত যাহাই হউক, তাঁহারা যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন, সেও ত এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আপনার দেহপোষক দ্রব্য সংগ্রহ করে। তবে ফলে একই দাঁড়াইল। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে মাংসাশীরাও এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করেন সুতরাং জমীতে তাঁহারও প্রয়োজন। এখন মাছের কথা। যাহারা মাছ খাইয়া বাঁচে তাহারা ত জমীর ধার ধারে না, কিন্তু জমীতে যেমন জলেও তেমনি সকলেরই সমান স্বত্ব। জমীরও যে জন্য খাজনা দিতে হয়, মৎস্যক্ষেত্রসমূহেও সেই প্রকার খাজনা দিতে হয়। সেই কারণে ও সেই পরিমাণে। প্রাচীনদেশসমূহেও এই নিয়ম ছিল যে জমী সবার, একজনের নহে। ইহুদীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, ৪৯ বৎসর অন্তর তাহাদের সমস্ত জমী অধিবাসীদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। সকলে সমান ভাগ পাইত কি না বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ভাগ হইত নিশ্চয়। উহাদের সংস্কার ছিল যে, কানানদেশ ঈশ্বর ইস্রেলের বংশকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করিয়াছেন সুতরাং যে কেহ ইস্রেলের বংশ, কানানের জমীতে তাহার অংশ আছে। প্রাচীন রোমে রোমের অধিবাসী প্রেট্রিসিয়ানরা জমীর ভাগ পাইতেন, কারণ প্রথম অবস্থায় তাঁহারাই রোমের অধিবাসী ছিলেন। তাহার পর প্লিবিয়ানেরা যখন রোমের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইল, তখন তাহারাও জমীর ভাগ পাইতে লাগিল। প্রাচীন জর্ম্মানির সমস্ত জমী folkland অথবা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজা জাতির কর্ত্তা সুতরাং তিনি জাতীয় ভূমিরও কর্ত্তা। জাতীয় ভূমির

বন্দোবস্তের ভার রাজা ও মহাসভার উপর স্থাপিত। আমাদের নিজদেশে রাজা সমস্ত দেশের কর্ত্তা জমী তাঁহার, অর্থাৎ প্রজারা তাঁহার নিকট হইতে জমী লইবে, কেবল উৎপন্নের ছয়ভাগের এক ভাগ তাঁহাকে দিতে হইবে। এ নিয়ম অতি সুন্দর, ইহাতে রাজস্ব জমী হইতেই আদায় হইত, স্বতন্ত্র কর বসানর প্রয়োজন হইত না। জমী কাজে প্রজাসাধারণেরই ছিল ; প্রজাসাধারণকে সাধারণকার্য্যের জন্য স্বোপার্জ্জিত শস্যের ষষ্ঠাংশ দিতে হইত। এখনও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। যেখানে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত সেখানেই এই নিয়ম।

জমীতে যে কোন এক ব্যক্তির স্বত্ব হইবে না তাহার কারণ, কি ? অর্জ্জনই স্বত্বের একমাত্র কারণ, যে অর্জ্জন না করিল তাহার স্বত্ব কিসে ? কিন্তু ভূমি অর্জ্জন করা যায় না, কারণ ভূমির ভূমি মালিক থাক আর নাই থাক, জমী যে জমী সেই থাকিবে। জমী কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কেহ উহা নাশও করিতে পারে না। জমী ঈশ্বরদত্ত সুতরাং উহা অর্জ্জিত নহে উহাতে কাহারও স্বত্ব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জমী ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না।

কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে ?

জমী কার, এ প্রশ্নের উত্তর হইল জমী কাহারও নহে, উহাতে জীবমাত্রেরই স্বত্ব আছে। তবে জমীদারের জমী আমার জমী, তোমার জমী কেমন করিয়া হইল ? জমীতে যদিও অর্জ্জনস্বত্ব না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ব্যবহারিক স্বত্ব উৎপন্ন হইতে কাহারও আপত্তি নাই। মনে কর আমি এক জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে চাস করিতে লাগিলাম। আমার উহাতে কোন স্বত্ব নাই, তুমি আমা অপেক্ষা বলবান্, কালি তুমি আমার গালে চড় মারিয়া আমার জমীখানি কাড়িয়া লইলে। যে শুনিবে সেই বলিবে এটি অত্যাচার হইল। কেন ? জমী আমার নয় সত্য কিন্তু আমি যে সেটি ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছি সেটুকুতে আমার স্বত্ব আছে, আমি পরিশ্রম করিয়া সে জমীর জঙ্গল আবাদ করিয়াছি, তাহাতে সার দিয়াছি দুই তিনবার চাস দিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি। জমী আমার না হইলেও আমি যে উহার উন্নতিসাধন করিয়াছি সেটি ত আমার, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই। সেটুকু আমি ছাড়িব কেন ? ছাড়িতে গেলে তাহার ক্ষতিপূরণ চাই। এইরূপে অনেক জমীতে লোকের স্বত্ব জন্মিয়াছে। যত উপনিবেশ সর্ব্বত্র এই কারণে স্বত্ব। আমাদের দেশে যে গ্রামিকবৃন্দ আছেন তাঁহাদেরও এইরূপে জমীতে স্বত্ব হইয়াছে। ব্যবহারিক স্বত্ব পুরুষানুক্রমে চলা উচিত কি না সে বিষয়ে আমরা

কিছু বলিতে চাহি না। অনেক সময়ে রাজা বা রাজসভা কোন বিশিষ্ট উপকার করার জন্য কোন সেনাপতি, পণ্ডিত, চিকিৎসককে ভূমিদান করেন, ইংলণ্ডের বক্‌লাণ্ড, আমাদের জায়গীর ব্রহ্মোত্তর জমীতে এইরূপে স্বত্ব জন্মিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ স্থলে দুর্ব্বল-জাতি কোন পরাক্রান্ত জাতিকর্তৃক পরাজিত হইলে শেষোক্ত জাতি পূর্ব্বোক্ত জাতির সমস্ত জমী দখল করিয়া লন। রোমধ্বংসের পর ইউরোপে সর্ব্বত্র এইরূপে বর্ব্বরজাতিগণ আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আসে। এরূপে ভূমিতে স্বত্বস্থাপন যে ঘোরতর অত্যাচার তাহা কে অস্বীকার করিবে। বাঙ্গালায় যে জমীদারের জমী হইয়াছে ইহা কেবল সেকালের ইংরেজদিগের বুঝিবার ভুলে। যেরূপেই হউক যদিও জমীতে সকল প্রাণীর সমান অধিকার, আজি কালি পৃথিবীর প্রায় তাবৎ জমীই মনুষ্য-নামক জাতির কতিপয়মাত্র লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা কিছু করুন আর নাই করুন জমী তাঁহাদের। উহা লইয়া তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে সকল লোক বা জীবজন্তু তাঁহাদের জমী হইতে উদরপূর্ত্তি করে, তাহারা তাঁহার অধীন, তাহাদের উপর তাঁহার ক্ষমতা অসীম। এরূপ অন্যায় অমিত ক্ষমতাপ্রকাশকে অত্যাচারই বল [illegible]র প্রাকৃতিক নিয়মই বল আর সমা-[illegible] নিয়মই বল।

অতএব জমীর উপর লোকের যে স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে তাহা ব্যবহারে উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অত্যাচারে।

৩। খাজনা দিতে হয় কেন?

আবার সেই কথা, জমী যখন আর একজনের তখন তাহার জমী লইয়া ব্যবহার করিলেই খাজনা দিতে হইবে। এটি মোট কথা। যদি সকল জমী সমান উর্ব্বরা হইত তাহা হইলে খাজনা হইত কি? তাহা হইলে জোর করিয়া জমী দখল করিবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে যে যে জমী পাইত, সে সেই জমী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। তুমি না হয় গঙ্গার ধারে জমী লইয়াছ, আমি না হয় দশহাত তফাতে লইব, এইমাত্র প্রভেদ। লাভ তোমারও যে রকম আমারও ঠিক সেই রকম, তবে তোমার উপর আমার অত্যাচার করার প্রয়োজন কি? কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে, জমীর গুণে অনেক প্রভেদ। আমার খানি খুব উর্ব্বরা, তোমার খানি পতিত বা কঙ্করময়; তোমার সুতরাং ইচ্ছা হইবে যে তুমি আমার জমীখানি পাও। তোমার জমীর দর কম হইবে আমার অধিক হইবে।

অন্যান্য ব্যবসায়ে যেমন জিনিসের খরচা ধরিয়া দাম হয় জমীর উৎপন্নে তেমন হয় না। মনে কর কাপড় বুনিতে হইবে, তুলা ছয় আনা, মেহন্নৎ ছয় আনা, কোর দেওয়া দু পয়সা ও অন্যান্য খরচ ৵১০।

কাপড় খানার খরচা হইল তের আনা তাহার ব্যবসায়ের মুনাফা আট পয়সা দিলাম, কাপড়ের দর হইল পনর আনা। এই দরে অধিকাংশ কাপড় বিক্রয় হইবে। শস্যাদির ত ঠিক এরূপে মূল্যনির্ণয় হয় না। তোমার জমী আমার জমী পাশাপাশি, তুমিও যে খরচ করিলে আমিও সেই খরচ করিলাম; তুমিও যেমন খাটিলে আমিও তেমনি খাটিলাম; তোমার উৎপন্ন হইল দশ সলি ধান আমার হইল ছ সলি। এই জন্য আদম স্মিথ বলেন যে অন্যান্য শিল্পে উৎপন্ন কিছুই হয় না, পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি হয় না, কেবল কৃষিকর্ম্মেই ধনবৃদ্ধি হয়। কৃষিকর্ম্মে যে খরচ তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। সেবার আর্য্যদর্শনে ইক্ষু নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইক্ষুর চাসে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়। এই লাভের অধিকারী কে হইবে? যে ভূম্যধিকারী সেই লাভেরও অধিকারী হইবে। যে সমাজে জমীদার ভূম্যধিকারী সে সমাজে জমীদারের লাভ, যে সমাজে রাজা ভূম্যধিকারী সেখানে রাজার লাভ, যে সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী সে সমাজে প্রজার লাভ। এই যে উৎপন্নের কমী বেশী এইই খাজনার কারণ। যদি সব জমী সমান হইত তাহা হইলে খাজনা হইত না। যদি সব জমী এমন হইত যে প্রজার শ্রম ও খরচা মাত্র উঠিত তাহা হইলে কেহই খাজনা দিতে পারিত না। যদি সব জমীতেই দ্বিগুণ *লাভ হইত, তবে কাহার নিকট খাজনা* আদায় হইত। যাহার নিক[illegible] আদায় করিতে যাইত, সেই ভাবি[illegible] হইতেছে। সমাজের বন্দোব[illegible] হইত। অতএব খাজনার [illegible] গুণতারতম্য।

খাজনা কত হওয়া উচিত?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জমী সমান হইলে খাজনা হইত না। কেহই খাজনা দিত না। এখন প্রশ্ন এই যে যাহারা খাজনা দিবে তাহারা কত দিবে? যখন কতকগুলি লোক একটি গ্রামপত্তন করিল যে কয়খানি উর্ব্বরভূমি ছিল সব কয়খানি তাহারা দখল করিয়া লইল। কিন্তু সব উর্ব্বরভূমি ত সমান নয়। মনে কর দশখানি উর্ব্বর জমী আছে এক খানিতে দশ সলি দুইখানিতে সাড়ে নয় সলি তিন খানিতে নয় সলি ও চারি খানিতে আট সলি আর একখানিতে সাড়ে সাত সলি উৎপন্ন হয়। ইহার নীচের জমী আবাদ হয় না। যাহার জমীতে সাড়ে সাত সলি জন্মে তাহার যদি তাহাতে শ্রম ও খরচা না পোষাইত তবে সে কখন আবাদ করিত না। সুতরাং বুঝা গেল যে সাড়ে সাত সলি উঠিলেই চাসার খরচা উঠে। অতএব সাড়ে সাত সলির উপর যে জমীতে যত উৎপন্ন হয় সমুদয়ই সে জমীর খাজনা হইবে। যাহার উৎপন্ন দশ সলি যে আড়াই সলি দিলে তাহার লোকসান হইবে না। যাহার সাড়ে নয়সলি তা-

দুই সলি দিলে লোকসান হইবে। অতএব যে সকল জমী চাস হয় তাহাদের মধ্যে যে জমী সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ তাহার উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জমীর উৎপন্ন হইতে বাদ দিলে বাকি যা কিছু থাকে তাহার নাম খাজনা। বলিবে যে দেশে প্রজা ভূম্যধিকারী সে দেশে ত খাজনা দিতে হয় না। আমরা বলি সেখানে প্রজা খাজনা ও মুনাফা দুই পায়, অন্য জায়গায় মুনাফা পায় প্রজা, খাজনা পায় রাজা বা জমীদার।

এত হল শস্যানুযায়ী খাজনা। যেখানে খাজনা টাকায় দিতে হয় সেখানে ইহা অপেক্ষা একটু জটিলতা অধিক। মনে কর পূর্ব্বোক্ত গ্রামে আর দশ ঘর লোক বাড়িল, পাঁচ ঘর চাসা আর পাঁচ ঘর চাউল কিনিয়া খায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে ভাল জমী আর নাই। নূতন চাসা যাহারা আসিল তাহারা যে জমী পাইল তাহাতে তিন খানিতে ছয়সলি ও দুই খানিতে পাঁচ সলি মাত্র। একেবারে সকল জমীর খাজনা বাড়িয়া গেল। যাহাতে দশসলি উৎপন্ন হইত তাহার খাজনা আগে ছিল আড়াই সলি, এখন হইল পাঁচ সলি, যাহার সাড়ে নয় সলি তাহার খাজনা আগে ছিল দুই সলি এখন হইল সাড়ে চার সলি, কেবল যাহার উৎপন্ন পাঁচ সলি সেই কোনমতে খরচা পোষায় বলিয়া তাহাকে খাজনা দিতে হয় না। এইরূপে পাঁচজন লোক হওয়ায় খাজনা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমীই খাজনা দিবে না। তাহা অপেক্ষা যে ভূমির উৎপন্ন যত অধিক ততই তাহার খাজনা। আগে ছিল সাড়েসাতসলিওয়ালা জমী নিকৃষ্ট। এখন পাঁচসলিওয়ালা জমী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং ভাল জমীর খাজনা বাড়িয়া গিয়াছে।

আবার দেখ উর্ব্বর জমীতে খরচা কম। মনে কর দশ সলিওয়ালা জমীতে যে খরচা হয় সাড়ে সাত সলি ওয়ালাতেও সেই খরচা হয়। মনে কর দুই জায়গায়ই ১৫ টাকা খরচ হয়। কিন্তু এ কের উৎপন্ন কম অপরের উৎপন্ন বেশী। সলিকরা ভাল জমির খরচা কম, মন্দ জমীর খরচা বেশী। ভাল জমীওয়ালা সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে মন্দ জমীওয়ালা তত সস্তা দিতে পারে না। কিন্তু এক বাজারে এক সময়ে এক জিনিসের দুই দর হইতে পারে না [খুজরা জিনিসের যদিও হয় কিন্তু বড় কারবারে হয় না]; সুতরাং সাড়ে সাত সলিওয়ালা যে দরে বিক্রয় করিবে দশ সলিওয়ালাকে সেই দরে বিক্রয় করিতে হইবে। দশসলিওয়ালা একে ত উৎপন্ন বেশী পায় তাহার উপর তাহার জিনিসের দাম ও তাহার খরচা অপেক্ষা অনেক অধিক। মনে কর সাতসলিওয়ালার সলিকরা দশ টাকা খরচা হইয়াছে, দশসলিওয়ালার সলিকরা সাড়ে সাতটাকামাত্র খরচা পড়িয়াছে; কিন্তু দুইজনকেই বিক্রয় করিতে হইল পনর টাকা সলি। একের

হইল ৭।।×১৫=১১২।। অপরে হইল ১৫×১০=১৫০ খরচা দুজনেরই এক। যাহার ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা তাহার উৎপন্ন বেশী খরচা কম, মুনাফা সুতরাং খুব বেশী।

এখন মনে কর পাঁচজন চাসা ও পাঁচ জন অপর লোক আসিয়া জুটিল। চাসারা আরও নিকৃষ্ট জমী চাস করিতে লাগিল। মনে কর সেই ৭৫ টাকাই খরচ হইতে লাগিল, উৎপন্ন হইল পাঁচ সলিমাত্র সলিকরা খরচা পনর টাকা হইল। নূতন লোক আসায় চাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে, প্রতি সলি এখন মনে কর বিশ টাকায় বিক্রয় হইল। পাঁচ-সলিওয়ালার ৭৫ টাকা খরচ ৫×২৫= ১২৫ টাকা আয় পঞ্চাশ টাকা মুনাফা। সাড়েসাতসলিওয়ার ৭৫ টাকা খরচ ৭।।×২৫=১৮৭।। আয়, মুনাফা ১১২।। টাকা। দশসলিওয়ালার খরচা ৭৫টাকা আয় ১০×২৫=২৫০ মুনাফা ১৭৫ টাকা। আগে ছিল ৭৫ টাকা এখন হইল ১৭৫ টাকা অথচ তিনি নিজে ইহার কিছু করেন নাই। ইহার মধ্যে পাঁচ-সলিওয়ালার যে ১২৫ তদ্বাদে সমুদয়ই খাজানা যাওয়া উচিত। অর্থাৎ চাসা আপনার খরচা মেহন্নত মায় মুনাফা উঠাইয়া লইলে পর যা কিছু বাকি থাকিবে তাহাই খাজানা। সুতরাং যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, নিকৃষ্ট জমী চাস হইতে আরম্ভ হইবে, ততই জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। যতই টাকা দেশে বাড়িবে লোকে অল্প মুনাফায় টাকা খাটাইবে; চাসার মুনাফা কমিয়া আসিবে জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। এই যে খাজানা ইহার নাম Ecconomic Rent আমরা ইহাকে যথার্থ খাজনা কহিব। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে খাজানা দিয়া থাকি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক জায়গায় কম ও অনেক জায়গায় বেশী। ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প খাজানা কেন হয়?

আমরা খাজানাসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা অধিকাংশই রিকার্ডো নামক প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদের মত। তাঁহার মত যে প্রমাণ সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার মত ইংলণ্ড ভিন্ন অপর দেশে গৃহীত হয় না। ইংলণ্ড অর্থপ্রধানদেশ ভূমি-প্রধান নহে; ইংলণ্ডের লোক বেশ বুঝিতে পারেন যে, চাসা যে খরচ ও যে পরিশ্রম করিল তাহার উদ্ধার ও তাহার মুনাফায় তাহার স্বত্ব, এ সমুদয়ের অধিক যা কিছু তাহাতে তাহার স্বত্ব নাই। আমাদের দেশ ভূমিপ্রধান। চাসারা জানে তাহারা চাস করিয়া নিজের গুজরান করিয়া যদি উদ্বৃত্ত হয়, তবে জমীদার পাইবে। অতএব রিকার্ডোর মত যে সত্য তাহা আমাদের দেশীয় লোকদিগকে বিশ্বাস করান অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দেশের ত কথাই নাই; ফ্রান্সের লোকও রিকার্ডোর কথায় বিশ্বাস করেন না। রিকার্ডোর কথা তুলিলে

...দের দেশীয় লোক মনে করিবেন ...থক জমীদারের অথবা গবর্ণমেণ্টের ...পক্ষতা করিয়া প্রজাবৃন্দের অনিষ্টের ...ল করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার কিছুই করিতেছি না যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস তাহাই লিখিতেছি।

লোকে জিজ্ঞাসা করিবেন যদি রিকার্ডোর মতই সত্য হয়, তবে খাজানা কোন দেশেই রিকার্ডোর মতানুযায়ী হয় না কেন? তাহার উত্তর এই ইংলণ্ডের খাজানা প্রায়ই রিকার্ডোর মতে গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের জমীদার ফারমারকে জমী দিলেন। ফারমার দেখিল তাহার টাকা উঠিবে মুনাফাও উঠিবে সে জমী লইল। ইংলণ্ডের ফারমার ধনী, সে যদি চাস না করিত, তবে ব্যবসায় করিত, ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের জমী নাই তাহারা ফারমারের মজুরদার। ইংলণ্ডে জমীর সম্পূর্ণ স্বত্ব জমীদারের, গবর্ণমেণ্টের বা প্রজাদের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। অন্য কোন দেশেই প্রায় সেরূপ নাই। আমাদের দেশের জমীতে (বাঙ্গালা ভিন্ন) গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজা সকলেরই স্বত্ব আছে ইহা অনেকে স্বীকার করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ঠিক রিকার্ডোর কথামত খাজানা হইতে পারে না। জমীদার উৎপন্নের অংশ পাইবেন গবর্ণমেণ্ট অংশ ...ইবেন প্রজা অংশ পাইবে। প্রজা ...জের খরচ তুলিয়া লইয়া বাঁকি যেটা ...কিবে তাহার অংশ পাইবে। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট নিজ অংশ জমীদারকে স্বত্বত্যাগ করিয়া দিয়াছেন—যখন দিয়াছিলেন তখন প্রজার স্বত্বের দিকেও বড় বিশেষ মনোযোগও করেন নাই। সুতরাং এই সময়ে জমীদারেরা প্রজার উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন এখন আবার প্রজার স্বত্বসাব্যস্তের জন্য বহুতর চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং জমীদার প্রজার নিকট সমস্ত বাড়তি উৎপন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ জমীতে এবং জমীর খাজানায় প্রজারও স্বত্ব আছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে জমীর খাজানা অর্থাৎ জমীদারের প্রাপ্য রিকার্ডোর খাজানা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, কারণ তাহার এক অংশ প্রজার নিজের।

ইতালীতে জমী জমীদার ও প্রজার ভাগে বিলি। আমাদের অল্প ব্রহ্মোত্তরভোগীরা যেমন ভাগে বিলি করেন, সেও ঠিক সেইরূপ, তবে আমাদের ব্রহ্মোত্তরভোগীরা মিয়াদি বন্দোবস্ত করেন, সুতরাং জমীতে প্রজার স্বত্ব জন্মাইতে না দিয়া অনেক সময়ে রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা আদায় করিয়া লন। ইতালীতে তাহা হয় না; ইতালীতে এই নিয়ম মেরায়স সলা জুলিয়স কায়সর প্রভৃতির সময় হইতে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। এক এক জায়গায় সেই জমীদার ও সেই প্রজা ...শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে প্রজাদেরও জমীতে স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। কোন

জায়গায়, জমীদারের অর্দ্ধেক কোন জায়গায় জমীদারে দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু ইতালীর জমী এত ভাল যে তথাপি প্রজা আপনার খরচা ও মুনাফা পোষাইয়া খাজানার কিছু অংশ আত্মসাৎ করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ফ্রান্স ও জর্ম্মনি প্রভৃতি স্থানে জমীই প্রজার সুতরাং সেখানকার খাজানা প্রজাই পায়।

যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল সর্ব্বত্র খাজনা রিকার্ডোর মতানুযায়ী খাজানা অপেক্ষা কম। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের এমনি দুর্ভাগ্য যে, সেখানে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী খাজানা। প্রজায় দিতে পারে না, কিন্তু জমীদারের খাতায় তাহার নামে পাওনা লেখা থাকে। তাহার কারণ এই যে সেখানে প্রজার স্বত্ব লোপ হইয়াছে; জমীদার সর্ব্বে সর্ব্বা। লোক অনেক। জমী একখানি বন্দোবস্ত হইবার সময় হাজার হাজার লোক দরখাস্ত করে, যে সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে পারিবে সেই জমী পাইবে। গরীবলোক ক্ষমতার অতিরিক্ত দিব বলিয়া স্বীকার করিয়া জমী লয়, দিতে পারে না, পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ঋণভার বহন করে।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

১। ইহার নাটকত্ব।

দুর্ব্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপন্যাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্যউপন্যাসনামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে; কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে। যে উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যচরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করান তাহাকেই নাটকের উপন্যাস বলে। মনুষ্যচরিত্র দুই প্রকার। বাহ্যজগতের দ্বারা অনুশাসিত হওয়া এক প্রকার চরিত্রের লক্ষণ; এবং বাহ্যজগৎকে শাসন করা আর এক প্রকার চরিত্রের লক্ষণ। দুইটি দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ প্রভূত ধনরাশি প্রাপ্ত হইল, পাইয়া এক জন গর্ব্বিত হইয়া উঠিল; আর এক জন পূর্ব্বের ন্যায় বিনয়নম্র রহিল। দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের ঘটনা একজনকে বিচলিত করিতে পারিল, আর একজনকে পারিল না; একজনের মন শক্তি এবং দৃঢ়তাসম্পন্ন, আর এক জনের মন তাহা নয়। একজন ধনের

শাসিত হইল, ধন আর একজনের শাসিত হইল। বাহ্যজগৎ একজনের ক রঞ্জিত করিল, আর একজনের বাহ্যজগৎকে রঞ্জিত করিল। এক র মন বাহ্যজগতের শক্তির বশীভূত; হ্যশক্তির শাসনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিতেছে। আর একজনের মন নিজশক্তির দ্বারা বাহ্যজগতের শক্তিকে হতবল এবং বশীভূত করিতেছে। সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। প্রথম নেপোলিয়ান সমবেত ইউরোপকর্ত্তৃক এল্বাদ্বীপে তাড়িত হইয়া পুনরায় সমবেত ইউরোপকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এল্বাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সমরানল প্রজ্বালিত করিল। সিরাজ এবং নেপোলিয়ান উভয়েই আস্ফালনকারী। কিন্তু সিরাজের আস্ফালন শেষে ফকিরীতে পরিণত হইল। আবার মনে কর সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর চলিতেছে। আজ শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য কৌরবসেনার অধিনায়ক। পাণ্ডবদিগের আর শ্রেয় নাই। বুঝি আজিকার যুদ্ধেই পাণ্ডবপক্ষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জনরব উঠিল যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা ঠিক্ কি না? তিনি সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা 'ইতি—গজস্বে' পরিণত হইল। শস্ত্রাচার্য্য শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যাহা হইল ভারতবাসী এবং ভারতানুরাগী মাত্রেই জানেন। কি ভয়ানক আত্মহত্যা! যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি সত্যরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষয়নিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চিরসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্য-সংহার করিলেন! একেই বলে প্রকৃত আত্মহত্যা,—আত্মহত্যা দ্রোণের নহে যুধিষ্ঠিরের—একেই বলে বাহ্যশক্তিরদ্বারা অনুশাসিত হওয়া—বাহ্যশক্তিরদ্বারা নিধন প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আত্মহত্যা নিবারণ করেন। এমনস্থলে আত্মহত্যা না দেখাইয়া নাটককার আত্মগৌরব দেখাইয়া থাকেন; আত্মার পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান। আবার সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র মনে কর। ভারতের সাম্রাজ্য লইয়া ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। যিনি সেই যুদ্ধে জয়ী হইবেন, তিনি ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; যিনি সেই যুদ্ধে বিজিত হইবেন তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন ত পথের ভিখারী হইয়া থাকিবেন। ব্যাপার বড় সহজ নয়; উদ্দেশ্যও বড় ক্ষুদ্র নয়—হয় রাজ্যভোগ, না হয় মুষ্টিভিক্ষা। ভয়ানক সমস্যা! এই সমস্যায় পড়িয়া কার মন অবিচলিত থাকে? একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাজ্যভোগ হয়; বারবৎসর বনবাস

বিস্মৃত হওয়া যায়; বৎসরব্যাপী অজ্ঞাত-বাসের যন্ত্রণাভোগ সার্থক হয়; সতী-সাধ্বী কুললক্ষ্মীর অপমানের প্রতি-শোধ হয়। কিন্তু সেই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে সত্যের বিপর্য্যয় ঘটে। আর একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাজ্যলাভ না হইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়; বারবৎসর বনবাস চিরবনবাসে পরিণত হয়; বৎসরব্যাপিনী যন্ত্রণা জীবনব্যা-পিনী যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়; অসূর্য্যম্পশ্যার অসহ্য অপমান কুলের কলঙ্ক হইয়া থাকে। কিন্তু এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে সত্যের জয় হয়, এবং সত্য-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি করিলেন? না না বলিয়া হাঁ বলিলেন! আর অমনি সমস্ত জগতের লোক ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিয়া উঠিল —না, এটী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বলা হইল না, এবার যুধিষ্ঠিরের যুধিষ্ঠিরত্ব বিনষ্ট হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির যদি রাজ্য-লোভ ত্যাগ করিয়া, বনবাস বিস্মৃত হইয়া, অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণায় দৃক্পাত না করিয়া, ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর অপ-মান হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া, কেবল সত্য এবং ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া 'না' বলিতেন, তাহা হইলেই বা কি হইত? তাহা হইলে কি সমস্ত জগৎ সহস্রমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত না, এবং দেবতারাও কি তাঁহার কার্য্যের বী-রত্ব দেখিয়া জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর বলিয়া তাঁহার পূজা করিতেন না? তাহা হইলে আমরা কি সমস্ত মহাভারতের হৃদয়হারিণী আখ্যায়িকা তুচ্ছবোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শুধু এই বীরত্বপূর্ণ 'না' শব্দটী লইয়া নাচিয়া থাকিতাম না? তাহা হইলে কি এই একাক্ষরনির্ম্মিত 'না' শব্দে আমরা সহস্র আখ্যায়িকার মনোহারিত্ব অনুভব করিতাম না? কিন্তু কেনই বা করিতাম? করিতাম, তাহার কারণ এই। যুধিষ্ঠিরকে সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র বলিয়া জানি, এবং দেখিয়া আসিয়াছি; এবং তাই বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিয়াছি। এখন দেখি সেই সত্যনিষ্ঠা ঘোর বিপদগ্রস্ত। এখন দেখি সেই সত্যনিষ্ঠার ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত। এখন দেখি একদিকে সত্যনিষ্ঠা এবং সর্ব্বনাশ, আর একদিকে একটিমাত্র মিথ্যাকথা, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীর আধি-পত্য, এবং হৃদয়ভেদী অপমানের প্রতি-শোধ। কি ভয়ানক পরীক্ষা! কি ভয়ানক হৃদয়যুদ্ধ! মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হয়। এ পরীক্ষায় কয়জন উত্তীর্ণ হইতে পারে, এ যুদ্ধে কয়জনের জয়লাভ হয়? কিন্তু যদি দেখি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, একেবারে ধর্ম্ম এবং সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন দিতেছেন, তখন কি মনে হয় না যে মর্ত্ত্যেই স্বর্গরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে? তখন কি উন্নতমন আরো উন্নত হয় না? তখন কি মনুষ্যপ্রকৃতিকে দেবপ্রকৃতি-বোধে হৃদয় আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠে

এবং সে আহ্লাদই বা কি রকম দ? গভীর, নির্ম্মল, উৎসাহপূর্ণ, দায়ী, শক্তিসঞ্চারী, আত্মার গৌরব হিমাবৃদ্ধিকারী। সহস্র আরব্যো- াস পড়িলে যে আহ্লাদ হয় সে আহ্লাদ এ আহ্লাদের দিকেও যায় না, এ আহ্লাদের শতাংশের একাংশ-পরি- াণও হয় না। এত আহ্লাদ কেন য়? না ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আপন হিমা রক্ষা করিল বলিয়া। মহাকবি সক্সপীয়রের একটি চরিত্র বুঝিয়া দেখ। প্রিয়বন্ধু বাসানিয়র উপকারার্থে উদার- চতা এণ্টোনিয় সাইলকের নিকট টাকা র্জ্জ করিয়া একখানি খত লিখিয়া দলেন। তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার রিলেন যে, যদি তিনমাসের মধ্যে দসহিত টাকা পরিশোধ করিতে না ারেন তবে সাইলক তাঁহার শরীর ইতে অর্দ্ধসের মাংস কাটিয়া লইবেন। ণ্টোনিয় জানিতেন যে, সেই সময়ের ধ্যে তাঁহার বাণিজ্যপোতগুলি ধনপূর্ণ ইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তিনি ক্লেশে টাকা পরিশোধ করিয়া প্রাণ- ক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঘটিল ? নিরূপিত সময়ের মধ্যে বাণিজ্য- োত ফিরিল না। এবং নিষ্ঠুর সাইলক ঙ্গীকৃত মাংসখণ্ড পাইবার প্রার্থনায় দ্বারে অভিযোগ করিল। বিচার হইল। তখন উন্নতমনা উদার- পরদুঃখকাতর, পরোপকারী কি করিলেন? তিনি তখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতে মহোন্নত মনও অবনত হইয়া পড়ে; উদার চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়; পরদুঃখকাতরতা নিজদুঃখকাতরতায় বিলুপ্ত হয়; হৃদয় ফাটিয়া যায়; মন কেন্দ্রবর্জ্জিত গ্রহের ন্যায় অপরিচিত পথে ছুটিয়া বেড়ায়। তাঁহার সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং বিচারপতিই শোকসংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ, যাঁহাদের উপকারার্থ তিনি আজ মৃত্যুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নিষ্ঠুর ঋণদাতার চরণ ধরিয়া করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তিনি কি করিলেন? তিনি স্থিরচিত্তে দৃঢ়তাপূর্ণ অন্তঃকরণে বিচারপতিকে বলিলেন—

"I have heard,
Your grace hath ta'en great pains to qualify
His rigorous course: but since he stands obdurate,
And that no lawful means can carry me
Out of his envy's reach, I do oppose
My patience to his fury; and am arm'd
To suffer with a quietness of spirit,
The very tyranny and rage of his."

এই কি সেই ঐশ্বর্য্যশালী, সুখশয্যা- শায়ী, প্রিয়বন্ধুবেষ্টিত, সস্মিতমুখ, প্রেম- পূর্ণ এণ্টোনিয়? তাঁহার কথা শুনিয়া

ত তাহাই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক আজ তিনি কি? বাস্তবিক আজ তিনি পথের ভিখারী; আজ তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য স্বপ্নে দৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আজ তিনি তাঁহার প্রফুল্লতাময়, করুণাজ্যোতিবিভূষিত, প্রীতিপূর্ণ, হাস্যময় গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন! তবুও তাঁহার এই রকম কথা? পাঠক! তুমি যাহাই মনে কর, আমি এই দেবতুল্য, উন্নতমনা বণিকরাজকে মনুষ্য মনে করিতে পারি না—আমি তাঁহাকে দেবতা মনে করি! সামান্য মনুষ্য হইলে আজিকার বিপদে কি তাঁহাকে পরোপকারব্রতে দৃঢ়ব্রতী হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর দেখিতাম, না আপনাকে আপনি ভুলিয়া, জন্মাবচ্ছিন্ন সংস্কার হারাইয়া, উন্নতমন কুঞ্চিত করিয়া, জীবনলালসায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেখিতাম? পাঠক! ইহাকেই প্রকৃত নাটকরহস্য বলে। প্রকৃত নাটককার ধর্ম্মের অবতারণা করেন; তাহার শক্তি, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব সকলই পাঠককে মনোহারিণী তুলিকা দিয়া আঁকিয়া আঁকিয়া দেখান; সেই বিমুগ্ধকর চিত্রেরদ্বারা পাঠকের মন মাতাইয়া তুলেন; তুলিয়া আবার সেই চিত্রটিকে ভীষণান্ধকারে নিক্ষেপ করেন; সে অন্ধকারের এমনি গুণ যে তাহার মধ্যে ধর্ম্মের মুখ স্বভাবতই মলিন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, শক্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, মহত্ত্ব হীনত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই ঘোর অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া পাঠকের মন আকুলিত হইয়া উঠে; প্রিয়বস্তুর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পাঠকের মন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে; ধর্ম্ম নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে বুঝি বা অপারগ হয় এই আশঙ্কায় পাঠকের হৃদয় বিলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে অন্ধকার সরিতে থাকে; দেখা যায় যে ধর্ম্মজ্যোতিঃ মলিন হয় নাই, যেমন উজ্জ্বল ছিল তেমনি উজ্জ্বল আছে; বাহ্যজগৎ অন্তর্জগতে চিহ্নমাত্র অঙ্কিত করিতে পারে নাই; স্বার্থজ্ঞান মাথা তুলিতে পারে নাই, নিঃস্বার্থ তেজোময় ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ তেজোময়ই রহিয়াছে। তখন পাঠকের মন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বুঝিয়া বর্দ্ধিতবল হয় এবং নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় আনন্দজ্যোতিতে ভাসিতে থাকে এবং হাসিতে থাকে। একেই আমি বলি নাটকের নাটকত্ব। সকল নাটকের কথা বলিতেছি না। নাটকের শ্রেণীবিশেষের কথা বলিতেছি। সেক্সপীয়রের Merchant of Venice এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব কোথায় দেখা যাউক।

নাটকখানির নাম সত্ত্বেও আমার মতে অভিজ্ঞানশকুন্তল একখানি নায়কপ্রধান নাটক। শকুন্তলা বড় কম নন; কিন্তু দুষ্মন্তই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রধান চরিত্র। দেখা যাউক এই দুষ্মন্ত কে।

কোন একটি মনুষ্যের মন এবং হৃদয় বুঝিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরখানি বুঝিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর, এ দুইয়ে অতি নিকটসম্বন্ধ। মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে। অধিকন্তু যাহার যে রকম মানসিক ভাব এবং রুচি তাহার শারীরিক কার্য্যসকলও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নির্জ্জনচিন্তাপ্রিয়, তাহার দেহের স্থির, ক্লিষ্ট, এবং সঙ্কুচিত ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উদ্যমপূর্ণ এবং কার্য্যপ্রিয় তাহার দেহের সজীব, চঞ্চল, ঈষদুগ্র, এবং বলিষ্ঠ ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সেবানুরক্ত তাহার দেহের কোমল, অসহিষ্ণু এবং আলুলায়িত ভাব হইয়া থাকে। কালিদাস দুষ্মন্তকে ইন্দ্রিয়শাসনাধীন করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের এবং শারীরিক কার্য্যানুরাগেরও একখানি চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন—

অনবরত ধনুর্জ্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

দুষ্মন্ত রাজা—ভারতের অতুলমহিমাসম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের মধ্যে এক জন প্রখ্যাতনামা রাজা। তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যসুলভ বিলাসরাশি মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাসবিদ্বেষী। তিনি বীরোচিতকার্য্যনিরত। তিনি শারীরিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জ্যাসম্পন্ন ধনুকহস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাসমগ্নের ন্যায় তাঁহার দেহ জীবনপ্রভাহীন শিথিলগ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বলব্যঞ্জক। এই ছবিখানি দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, চিত্রিত ব্যক্তি অসার বিলাসপ্রিয় বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। এ কি একজন জিতেন্দ্রিয় পুরুষকারপূর্ণ পুরুষের ছবি নয়? আবার শুধু তা নয়। যখন সেনাপতি দুষ্মন্তকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার শারীরিক বীরভাবের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন দুষ্মন্তের মানসিক অবস্থা কি? শকুন্তলারত্ন দেখিয়া তখন তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন, সেই পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কি না। বিদূষক আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূর্ব্বরাত্রে নিমেষমাত্র নিদ্রালাভ করেন নাই। এবং আমরাও তাঁহাকে মুহূর্ত্তাগ্রে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন—এবং আসিয়া প্রিয় বিদূষকের নালিশটি শুনিয়াও শুনিতেছেন না। আবার সেই মুহূর্ত্তেই ত সেনাপতি আসিলেন; কিন্তু তিনি ত এই বিষম হৃদয়ব্যথার চিহ্নমাত্রও দুষ্ম-

ন্তের শরীরে বা মুখাবয়বে দেখিতে পাইলেন না। তবে ত দুষ্মন্ত শুধু কর্ম্মবীর নন। তবে ত তিনি কর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড রবিকিরণ সহ্য করিতে পারেন তা নয়; চিত্তসংযমও তাঁহার তেমনি অভ্যস্ত এবং স্বেচ্ছাধীন। ফলতঃ কালিদাস এই অদ্ভুত চিত্তসংযমের চিত্র অতিশয় জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠক! আইস, একবার মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া আশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কত কি কথা কহিতেছেন। দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইতেছেন। সর্ব্বলোকপ্রিয় ভ্রমরটী শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, দুষ্মন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন—

> যতোযতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে
> ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
> বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে
> ভয়াদকামাঽপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥
> চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
> রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
> করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্ব মধরং
> বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

এ বড় সহজ ভাব নয়। যে ভাবে ভোর হইলে মানুষ-চিত্তসংযমে প্রায়ই বিফলযত্ন হয়, এ সেই ভাব। দুষ্মন্ত এখন সেই ভাবে ভোর। কিন্তু এখনি তাঁহাকে সেই সখীত্রয়ের সম্মুখীন হইতে হইল, শুধু তাও নয়। তাঁদের সুধাসিক্ত অনুরোধে তাঁহাদের কাছে বসিতে হইল। এমন অবস্থায় পড়িলে সে রকম ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায়? প্রিয়ম্বদা বলুক দুষ্মন্তের কি হইয়াছে—

> "হলা অনসূএ কোণু ক্‌খু এসো চুরবগাহগম্ভীরাকিদী
> মহুরং আলবন্তো পহুত্তদাকিখণ্ণং বিতথারেদি।

ইন্দ্রিয়সন্তপ্ত ব্যক্তির কি এই রকম প্রভাময় গাম্ভীর্য্যপরিপূর্ণ মুখ-ভাব হইয়া থাকে? ধন্য দুষ্মন্তের চিত্তসংযম, ধন্য তাঁহার আত্মজয়! এখনও কিন্তু দেখিবার বাকি আছে। পাঠক! অভিজ্ঞান শকুন্তলের তৃতীয় অঙ্কটি মনে কর। শকুন্তলা অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত করিব। দুষ্মন্ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন, এত যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ করিবার উদ্যমমাত্রে গুরুজনসমাগমাশঙ্কায় শকুন্তলাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তখন দুষ্মন্তের কি অবস্থা! তখন তিনি প্রজ্বলিতান্তঃকরণে প্রতিনিঃশ্বাসে অনল শ্বাসিয়া ফেলিতেছেন। সহসা রাক্ষসপীড়িত তাপসগণের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়াই—"ভো ভো তপস্বিনো মাভৈষ্ট মাভৈষ্ট অয়মহমাগত এব—" এই আশ্বাসবাক্য স্থিরগম্ভীরস্বরে উচ্চারণ

করিতে করিতে রাক্ষসবধে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যেন শকুন্তলার নামও শুনেন নাই! যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই! আশ্চর্য্য পুরুষ!

এই অদ্ভুত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুষ্মন্তচরিত্রের প্রশস্তভিত্তি, অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা বুঝিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মানুরাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানই সেই অলৌকিক চরিত্রের মূলভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। তখন বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মপালন এবং কর্ত্তব্যসাধনের কাছে দুষ্মন্তের বিবেচনায় আর কিছুই কিছু নয়—তিনি নিজেও কিছু নয়, তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়, তাঁহার নিজের কিছুই কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রতিনিঃশ্বাসে সুমিষ্ট মৃদুমন্দ মলয়বায়ুর ন্যায় নির্গত হয়। ঋষিগণের সন্তোষার্থ মৃগানুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ
বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্যাকং।
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি
সর্ব্বত্র।"

অয়ে শান্ত মিদমাশ্রমপদং—তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়; কিন্তু শুনিলে প্রাণটি জুড়াইয়া যায়! মনে হয় যেন সরাই সেই শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শান্তিময় তপস্যাশ্রম এবং দুষ্মন্তের প্রশস্ত মন একই পদার্থ! আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সখীত্রয়কে দেখিলেন—তাঁহারা তাপসোপযোগী-বল্কল-পরিধানা—মণিমুক্তা-বিহীনা—মহামূল্যবস্ত্র এবং অঙ্গরাগবর্জ্জিতা। দুষ্মন্ত রাজা; ভারতের মণিমাণিক্য সকলই তাঁহার; তাঁহার অন্তঃপুর মণিমাণিক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তিনি একবার মনে করিলেন, এ ঠিক্ হয় নাই। মনে করিয়াই আবার ভাবিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং॥
কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্ম্মুক্তকণ্ঠং
নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালং॥

কি মনোহর ভাব! কিবা সুরুচিসঙ্গত কল্পনা! কি ন্যায়পরায়ণ হৃদয়! সৌন্দর্য্য নিজেই সুন্দর—তাহার আবার পরিচ্ছদ পারিপাট্য কি? এ কথা কয়জনের মুখে শুনা যায়? এ কথা যে না বলে, সে সৌন্দর্য্যের অবমাননা করে। এ কথা যে বলে সে সৌন্দর্য্যের যাহা প্রাপ্য তাহা সৌন্দর্য্যকে দেয়; তাহারই রুচি যথার্থ ধর্ম্মমূলক; সেই সৌন্দর্য্যের সুন্দর রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। দুষ্মন্ত একজন হিন্দুরাজা; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। আশ্রমপ্রবেশকালে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল এবং

তিনি হিন্দু বলিয়া তাহাতে ভবিতব্যতার কথা মনে করিলেন। পরক্ষণেই যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মতন শাস্ত্রভক্তের মনে সহজেই এমন ভাব জন্মিতে পারে যে বুঝি সেই ভবিতব্যতার সূত্রপাত হইতেছে। আবার শুধু দেখা নয়। যাহা শুনিলেন তাহাও সেই ভবিতব্যতার প্রতিপোষক। যাহা শুনিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে শকুন্তলা তপস্বিনীর ন্যায় কাল কাটাইবেন না। তখন মনোধর্ম্ম* তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিল এবং ধর্ম্মসংস্কার মনোধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। তখন তাঁহার স্পৃহা জন্মিয়া ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্পৃহা এখনও মিলনস্পৃহারূপে পরিস্ফুট হয় নাই। কেবল সৌন্দর্য্য বোধেই নিহিত রহিয়াছে। দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন—

"অবিতথ মাহ প্রিয়ম্বদা। তথাহ্যস্যাঃ—
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানু
কারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু
সন্নদ্ধম্॥

তার পরেই শুনিলেন শকুন্তলা চূতবৃক্ষাশ্রিতা কুসুমিতা সহকারলতাটীকে দেখিয়া বলিতেছেন—

হলা রমণীও কৃখু কালো ইমস্স পাদবমিহুনস্স রদিঅরোসম্বুত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅংপি বদ্ধফলদাএ উঅভোঅক্খমো সহআরো।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গেল; রুচিতে রুচিতে মিলিয়া গেল; ভাবে ভাবে মিলিয়া গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিল হইল না। শকুন্তলা সহকারলতাটীর আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন; দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে সেটী এখনও বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন নাই। দুষ্ট প্রিয়ম্বদা সেই অভাবটি পুরাইয়া দিল। দুষ্মন্ত বুঝিলেন যে শকুন্তলা অভিলাষবতী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আহ্লাদে আটখানা না হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন বুঝি শকুন্তলা কণ্বদুহিতা—ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহিত শকুন্তলার মিলন হইতে পারিবেক না। যেমন অভিলাষ বলবতী হইয়া উঠিল অমনি ধার্ম্মিকের ধর্ম্মচিন্তা উদয় হইল। এইখানে সুচতুর মহাকবি জগদ্বিখ্যাত ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটী সংযোজনা করিলেন। সে ঘটনাটীর অর্থ—শারীরিক মিলন, শারীরিক সম্ভোগ। অভিলাষীর মনকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে ইহার অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত অথচ বলবৎ কৌশল অবলম্বন করা যায় কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের বিচলিত মন আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার জাতি এবং উৎপত্তিবিষয়ক সন্দেহ আরো বলবৎ হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয় দুষ্মন্তের ধর্ম্মানুরাগ -

* অনুরাগোৎপাদক বস্তু দেখিয়া মনে অনুরাগের সঞ্চার হওয়া অর্থে মনোধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলাম।

সংযম শক্তি কম হইলে সেই দণ্ডেই পবিত্র তপস্যাশ্রম কলুষিত হইয়া যাইত। তার পর সকলের একত্রে বসিয়া কথোপকথন। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে কণ্বের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভার মোচন হইয়া গিয়াছে। তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন; তাঁহার হৃদয় বুঝিয়াছে যে—

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

এমন সময় প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা রাগ করিয়া, 'সব বলিয়া দিব' বলিয়া গৌতমীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্তের হৃদয় আকুলিত হইয়া শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিণী কামিজনচিত্তবৃত্তিঃ।
অহং হি।

অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন
বারিতপ্রসরঃ।
স্বস্থানাদচলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতি-
নিবৃত্তঃ।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার মন বুঝিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, শকুন্তলার উপর এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। তিনি গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে নিবৃত্ত করিবার কে? যে রকম আর্ত্তা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলাকে চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কেন না দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভয়ানক আবেগবান্ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হৃদয় তাঁহার; শকুন্তলার ত নয়। দুষ্মন্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন—দুষ্মন্ত প্রকৃত উন্নতমনা—দুষ্মন্ত ধর্ম্মবীর। তাঁহার হৃদয়ের বল্গা তাঁহারই হাতে। সেই হৃদয়ের অশিষ্ট উদ্যম সেই হৃদয়েই নিঃশেষিত হইয়া গেল! পানথেকে চুণটুকুও খসিল না। ধন্য দুষ্মন্ত! ধন্য কালিদাস!

তার পর বিদূষকের সহিত কথা। সেকালের বিদূষক সেকালের রাজাদের 'ইয়ার'। রাজাদিগকে সর্ব্বদাই রাজঠাটে থাকিতে হইত; মনের কথা সকলের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদূষকের কাছে ঠাটভাট থাকিত না; প্রাণের কথা প্রাণ ভরিয়া বলিতেন। মাধব্য দুষ্মন্তকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

ভো জঙ্গসা তবস্সিকণ্ণআ অণব্ভুত্থণীআ
তা কিং তাএ দিট্ঠআএ।

অমনি দুষ্মন্ত যেন বিষধরদংশিতের ন্যায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ধিঙ্মূর্খ!
নিবারিত নিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন
পশ্যতি॥

ন চ পরিহার্য্যে বস্তুনি দুষ্মন্তস্য মনঃ
প্রবর্ত্ততে॥

তার পর রাজা পূর্ব্বদিনের সকল কথা মাধব্যকে বলিলেন। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি, মাধব্য, কি অছিলা করিয়া সেই আশ্রমে যাই। মাধব্য বলিলেন কেন, আমার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ চাই, এই বলিয়া যাও। দুষ্মন্ত রুদ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

মূর্খ! অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো যে নির্ব্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যতে। পশ্য—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ॥

কি গম্ভীর, কি দুর্জ্জয় ধর্ম্মভাব! কি মনোহর ধর্ম্মানুরাগ! যে শকুন্তলার নিমিত্ত হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্ম্মানুরাগের কাছে কিছুই নয়! শকুন্তলা যতই কেন প্রিয় হউন না, তা বলিয়া কি তাঁহার জন্য পবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা করিতে হইবেক? তা বলিয়া কি ধর্ম্মকে প্রেমের কুটিলকৌশলে পরিণত করিয়া ঘৃণাস্পদ করিতে হইবেক? বিদূষকের কাছেও এ কথা বলিতে দুষ্মন্তের ঘৃণা হয়!

তার পর কয়েকজন তপস্বী আসিয়া দুষ্মন্তকে রাক্ষসকর্ত্তৃক আশ্রমপীড়ার সংবাদ দিলেন। দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া রথসজ্জা করিবার আজ্ঞা দিলেন; রথ সজ্জিত হইল। এমন সময়ে রাজধানী হইতে মাতৃআজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারই কল্যাণার্থ রাজমাতা ব্রত করিবেন, অতএব তাঁহাকে যাইতে হইবেক। দুষ্মন্ত সঙ্কটে পড়িলেন। ঋষিগণও যেমন মাননীয়, রাজমাতাও তেমনি মাননীয়া। "ইত স্তপস্বিমাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয় মনতিক্রমণীয়ং।" তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাধব্যকে বরাবর পুত্রবৎ ভালবাসেন। অতএব স্নেহ এবং ভক্তিপূর্ণ মনে মাধব্যকে রাজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কবি একটি কৌশলে তাঁহার আখ্যায়িকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার দুষ্মন্ত যে কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ নন, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

দুষ্মন্ত রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকার্য্যের কথা কিছুই বলেন নাই। সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না। তিনি মুনিঋষিকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন; পিতামাতার ন্যায় গুরুজনকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন; তিনি চিত্তসংযমে অমিতবল; ধর্ম্মসেবায় একাগ্রচিত্ত; প্রণয়ে বিশুদ্ধমনা; শত্রুনাশে অসীমবিক্রম; শরীরপালনে কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে কিরূপ? কালিদাস তাহাও আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়াছেন সেটি কি চমৎকার! কঞ্চুকী পার্ব্বতায়ন, অকৃষ্যনামা মিবারমন্ত্রী ভামাশার ন্যায়, রাজসরকারে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। যে যষ্টি যৌবনে কেবল তাঁহার উচ্চ পদবীর চিহ্নস্বরূপ ছিল,

যষ্টি এখন তাঁহার অন্ধের নড়ী য়া দাঁড়াইয়াছে। সে যষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে এখন তিনি পদশ্চালনে অক্ষম। তিনি যে শুধু দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন এমত নয়। দুষ্মন্তের পিতা, পিতামহ হয় ত প্রপিতামহকেও দেখিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার কাছে 'কালিকার ছেলে' বই নয়। শার্ঙ্গরব প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ বহুদর্শী কঞ্চুকী ভাবিতেছেন,--যে প্রজাবৎসল নরপতি রাজকার্য্যকরত পরিশ্রান্ত হইয়া এইমাত্র অবকাশলাভ করিলেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনি ঋষিকুমারদিগের আগমনসম্বাদ দিব। কি স্নেহ! পিতাও সন্তানের ক্লেশে এতদূর কাতরতা প্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের প্রজাপালনকার্য্যানুরাগের ইহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কবি ইহার অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ দিয়াছেন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী একবারমাত্র স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পরক্ষণেই সুদৃঢ়চিত্তে বলিতেছেন—

"অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালানাং।"

তিনি কি রকম রাজা যাঁহার কর্ম্মচারীর এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—এত রাজনীতিপ্রিয়তা এত সাহস ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন? কঞ্চুকী, যথার্থই অনুপম রাজার অনুপম! বৃদ্ধবর! তুমি দুষ্মন্তকে 'কচি ছেলে' বলিয়া 'মাপ' করিবার লোক নহ। তুমি যখন দুষ্মন্তকে এত ভালবাস, তখন দুষ্মন্ত যথার্থই সমস্ত জগতের ভালবাসার পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শস্থল।

দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শকুন্তলা দুর্ব্বাসাকর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলেন। অবশিষ্ট আখ্যায়িকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবেক। শাপোচ্চারণ হইতে অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত একভাগ; অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন পর্য্যন্ত আর একভাগ। কি জন্য এইরূপ ভাগ করিতে হইল, বুঝাইতেছি।

দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন যে, দুষ্মন্তপ্রদত্ত নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। শকুন্তলা সেই নিদর্শনাঙ্গুরীয়ক হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না যে হারাইয়াছেন। এ ঘটনার যে কি চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন নয়। অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া শকুন্তলা তাঁহার পবিত্র বিশ্বমনোমুগ্ধকারী রূপরাশি লইয়া দুষ্মন্তের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পাঠক! তোমাকে এইখানে একবার সেই বল্কলপরিধানা, কুসুমিতযৌবনা, পবিত্রনয়না, লতামৃগানুরাগিণী, আশ্রমবাসিনী তাপসবালার রূপরাশি মনে করিতে হইবেক। যে রূপরাশি দেখিয়া ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত সেদিন দুর্নিবারশরবিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই রূপরাশি একবার

মনে করিতে হইবেক। সেই রূপরাশি এখনও সেই দুষ্মন্তের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে।

"অয়ে অত্র।
কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডু-
পত্রাণাম্॥"

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশি-সম্পন্না শকুন্তলাকে অস্পর্শনীয়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপপ্রভাবে তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকুন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটিলা অস্পর্শনীয়া কলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন? কৈ, সেখানে আর যাহারা আছে তাহারা ত অবিচলিতচিত্ত নয়। প্রতীহারী শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

অম্মো ধম্মাবেক্খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
নাম সুহোবণদং ইত্থিআরঅণং
পেক্খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি।

দুষ্মন্তও সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—

ইদমুপনতমেবংরূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি
মোক্তুম্।

তিনি মনে মনে অনেক ভাবিয়া দেখিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে শকুন্তলা তাঁহার। তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর ন্যায় বিষময় বাক্যে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন; তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিকুমারদ্বয় তাঁহার উপর শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিকোপানল যে কি ভয়ানক পদার্থ দুষ্মন্ত তাহা বিলক্ষণ জানেন। তিনি নিজেই সেদিন মাধব্যকে বলিয়াছেন—

শমপ্রধানেষু তপোবনেষু
গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তা-
স্তে হ্যন্য তেজোঽভিভবাদ্দহন্তি॥

আজ সেই গূঢ়নিহিতানল প্রজ্জলিত হইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিতেছে। কিন্তু আজ তিনি সে কোপানলকে ভয় করিতেছেন না। কেন, তিনি কি আর সে দুষ্মন্ত নন? তাঁহার চিরাভ্যস্ত গুরুজনগতভীতিসম্ভ্রম সকলই কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তা নয়। সে সকলই তাঁহার আছে; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে বলিতেছেন। গুরুজন আজ তাঁহাকে পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবীর; তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহা ঋষিও তুচ্ছ। কি ধর্ম্মানুরাগ! কি চিত্তসংযম! অতুল-

রূপরাশি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। লইলে, কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না, কেহই তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে না। দূষিতচিত্ত হইলে তিনিও লইতেন। প্রতীহারী যথার্থই বলিয়াছিল—

অম্মো ধম্মাবেক্‌খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
নাম সুহোপনদং
ইত্‌থিআরঅণং পেক্‌খিঅ কো অণ্ণো
বিআরেদি।

দুষ্মন্তের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন। সেই জয়ে কালিদাসেরও জয়। কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মের কাছে ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়! কালিদাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি জগতের ব্রাহ্মণ!

দুষ্মন্ত পুনরায় নিদর্শনাঙ্গুরীয়কটী দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তখন আর একপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু এ পরীক্ষাও বড় সহজ পরীক্ষা নয়। শকুন্তলার কথা মনে হইয়া তাঁহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অনুতাপানলে সন্তপ্ত। তাঁহার স্বাভাবিক আমোদ আহ্লাদ আর তাঁহাকে ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রাজভক্ত রাজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কঞ্চুকীর ন্যায় রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ কঞ্চুকী যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং
সেব্যতে
শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব
ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরে-
ভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-
বনম্রশ্চিরম্॥

ভাবিয়া ভাবিয়া দুষ্মন্তের শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার গম্ভীর প্রভাময় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় দুষ্মন্ত আর সে দুষ্মন্ত নাই! সেই পবিত্র আশ্রমে দুষ্মন্ত যেমন তাঁহার শকুন্তলার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বৃদ্ধ কঞ্চুকী দুষ্মন্তের অনুতাপদগ্ধ দেহযষ্টি দেখিতে দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় কাতর মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্ট বিশেষমণ্ডনবিধি র্ব্বামপ্রকোষ্ঠে
শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসো-
পরক্তাধরঃ।

চিন্তাজাগরণ প্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরা-
ত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি
নালক্ষ্যতে॥

এই শোচনীয় অবস্থায় আজ দুষ্মন্ত রাজোদ্যানে গভীর চিন্তানিমগ্ন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুবংশের দুর্দ্দিন দেখিয়া, অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্দ্দিন দেখিয়া, ভয়াকুলিত-বাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বুঝি একটু 'ভোলাভুলা' করিলে দুষ্মন্ত কিছু 'আনমন' হইবেন। এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিরামভূমিতে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষীয় পলিতকেশ কুলকর্ম্মচারীর মুখে এ রকম কথা শুনিলে, বিরহকাতর যুবা পুরুষের কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেই জন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে কিছু না বলিয়া, দুষ্মন্ত বেত্রবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

এত যাতনায়, এত সন্তাপেও দুষ্মন্ত রাজকার্য্য ভুলেন নাই। এত ক্লিষ্ট মনেও তাঁহার বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা কত বলবতী! এত অনলদগ্ধ হইয়াও দুষ্মন্ত অঙ্গারাবশেষ হন নাই!

তার পর সেই মনপ্রাণহারী চিত্র দর্শন। চিত্র দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চিত্রিত ভ্রমরটীকে সেই আশ্রমদৃষ্ট ভ্রমর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; তিনি কালজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যের সম্বাদ দিলেন। অমনি, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থিরগম্ভীর ভাবে তিনি কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধানামাত্যের ভ্রমসংশোধন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বিচার করিয়া দিলেন। শুধু তা নয়। সেই অপুত্রক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলার্থে স্নেহবান পিতার ন্যায় এই স্নেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাষাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্।

আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেলেন। তখন দুষ্মন্তের অপুত্রকাবস্থা স্মরণ হইল। স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দুষ্মন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভীরু। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের পবিত্রাত্মার শোচনীয় পরিণাম মনে হইল। তিনি যন্ত্রণাবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছি-

তের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন! অসহ্য শকুন্তলাচিন্তাও সেই গিরিচরগজবৎ বলসার দেহস্তম্ভকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই! এই পতনেই দুষ্মন্তের দুষ্মন্তত্ব দেদীপ্যমান!

মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রুত হইল। অমনি কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আর তাঁহার শকুন্তলাচিন্তা নাই। আর তাঁহার শকুন্তলাচিন্তাজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতাও নাই। এখন তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্ত! বিপরীত বিক্রম সহকারে তিনি ধনুর্ব্বাণ সাপটিয়া লইলেন। নিমেষমধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া দেবতাদিগের সাহায্যার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অসুরনাশে শূন্যপথে উঠিলেন।

পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখ, এখন দুষ্মন্তের কি ভয়ানক অবস্থা। তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি অবিচার, কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বুঝিতেছেন। তাহাতে আবার জানেন যে সেই নিরপরাধা এখন মর্ত্ত্যলোকে নাই। আর যে কখন তাঁহাকে পাইবেন, সে আশাও এখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, এবং সেই জন্যই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পরিণাম ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন তিনি শুধু অনুতাপদগ্ধ নন। যে আশার বলে লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, সে আশাও তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। মহাকবি মিল্টন নরকবর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন যে সেখানে—

"Hope never comes that comes
to all,
But torture without end."

এখন দুষ্মন্তের হৃদয়ও আশাশূন্য অনন্ত যন্ত্রণাগার! কিন্তু অসুরবধে আহূত হইবা মাত্র তিনি যেন সে সকলই ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া অত্যাতিশয় সহকারে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। করিয়া বিদূষককে বলিলেন—

"বয়স্য অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা
তদত্র পরিগতার্থং
কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি।
ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু
প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যাপৃতং
ধনুঃ॥"

বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুষ্মন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন কিন্তু যে কোটি কোটি হৃদয়ের সুখদুঃখ অনতিক্রমণীয় নিয়তির বলে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের সুখদুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অক্ষম। মহাকবি দুষ্মন্তকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মহাপরীক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া অতুলজ্যোতিঃ দেবতার ন্যায় উত্তীর্ণ করাইলেন! ইহাকেই বলে নাটকের নাটকত্ব। এই একরকম দেখা রহিল।

এত কাঁদি তবু কেন না জুড়ায় প্রাণ রে?

১

এত কাঁদি তবু কেন না জুড়ায় প্রাণ রে?
সেই মন সেই আশা,
আজো বুকে সে পিপাসা,
এ যাতনা তবে কিরে ফুরাবে না জীবনে?
জীবধর্ম্ম পরিহরি,
তাপসের ভাব ধরি,
সুখের জীবন মোর ফুরাবে কি রোদনে?
যথা বায়ু-অভিঘাত,
নিবিড় কানন-জাত,
বিশুষ্ক প্রসূন-দল ঝরায় রে বিজনে,
সাধের সঞ্চিত আশা,
বুকভরা ভালবাসা,
এ শুষ্ক জীবনে মোর ঝরিবে কি তেমনে?

২

কেঁদে যেন উঠে প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া,
জীবনের দুই তীর গেছে যেন ভাঙ্গিয়া;
ধূধূ করে চারিধার,
শূন্য যেন এ সংসার,
হাসি,খেলি সে যাতনা তবু উঠে জাগিয়া,
আশা নাই,তবু সে যে প্রাণে আছে মিশিয়া

৩

এ কি পুরুষের মন—যুবার হৃদয়!
এ কি জীবনের ব্রত—জীবের আশয়!
হেরি কুহকের ছায়া,
স্মরি স্বপনের মায়া,
শিশুর বাসনা-সম আশা উথলয়,
এতই দুর্ব্বল কিরে মানব-হৃদয়!

৪

সকলি বুঝেছি—তবু পারি না যে ভুলিতে,
জড়ান যাতনা চিতে নাহি পারি খুলিতে,
হৃদয়ে সে ছবি আঁকা,
নয়নে সে রূপ মাখা,
শয়নে,স্বপন সে যে—ভাবনা,সে স্মৃতিতে;
এ পরাণে তার আশা পারি না যে ত্যজিতে

৫

দুখ পাই—পাব দুখ, তবু তারে ভাবিব,
আঁখি পোড়ে—পুড়ে যাক্‌,তবু তারে হেরিব
এই বিষাদের রাশি,
আমি বড় ভালবাসি,
এ জীবনে চিরদিন তারি দুখে কাঁদিব।
অন্তিমে তাহারি দুখে দু নয়ন মুদিব।

৬

এ ভাবে সংসারে থাকি হবে না সে সাধনা,
মায়া-মোহ-স্নেহডোরে ভুলে যাব যাতনা;
উদাসীন-বেশ ধরি,
তারি ছবি বুকে করি,
পথে ঘাটে হাটে মাঠে গাহিব এ বেদনা
গৃহ-কারাগারে থাকি সব না রে গঞ্জনা।

৭

পাপের সংসার হেথা সকলি সে ছলনা,
আত্মপর ভালবাসা সবি স্বার্থ গণনা;
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
লোকেতে পাগল বলে,
বুঝাইলে নাহি বুঝে মরমের যাতনা;
মনমত্ত সমদুঃখী, দুখী হেথা পায় না

৮

সে ধন পাবার নয়—সে আমার হবে না,
এ দুখ সবার নয়—এ জীবনো রবে না,
যে কদিন বেঁচে রই,
তারি দুখে কেঁদে লই,
মরিলে এ আশা তৃষ্ণা কিছুই ত রবে না,
এ ভগ্ন জীবনে আর অন্য সাধো হবে না।

৯

কি সুক্ষণে মুগ্ধনেত্রে দেখেছিনু তাহারে,
কি কুক্ষণে ভালবাসা দিল না সে আমারে।
হায় লো বজ্রময়ী,
রমণী কি দয়াময়ী!
একটী আশ্বাসবাণী একটী আখরে,
এত যাতনায় নাহি ফুটিল অধরে!

১০

সেত নাহি দিল আশা--আমি কি তা ছাড়িব
সে বাসনা চিরদিন বুকভরে রাখিব।
করিব তাহারি ধ্যান,
গাহিব তাহারি গান,
দিয়াছি পরাণ তারে—তারি তরে রাখিব;
জন্মান্তরে দেখা হলে তারি হাতে সঁপিব।

১১

বিধাতঃরে! এত রূপ কেন দিলি তাহারে?
এত সুধা কেন দিলি গরলের মাঝারে?
সে না রমণীর মণি?
সেনা পীযূষের খনি?
(তবে)কেন সে অমিয়-সর পাষাণের প্রাকারে
বজ্রময় বক্ষ কেন চন্দ্রমার আকারে?

১২

আর মিছে তার আশে রহি পাপ ভুবনে,
এ ভবের খেলা-ধুলা ফুরাল এ জীবনে।
প্রণয়ের পুরস্কার,
থাকে যদি অভাগার,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,?
জন্মান্তরে পাইব রে সে রমণী-রতনে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ।

আমাদের এই প্রস্তাবটী দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, বিধবার বিবাহ, দ্বিতীয় মৃতপত্নীকব্যক্তির দারান্তরপরিগ্রহ। পত্নী জীবিতাসত্বেও পুরুষের অন্যস্ত্রী গ্রহণ করা যে যুক্তি-সঙ্গত নহে তাহা আজ কাল প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং এস্থলে সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আমরা বিধবা-বিবাহসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই মত যে কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ নির্ব্বাচন করিতে হইলে "ব্যবহারোপযোগিতার" অনুসরণ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ তাহাতে সমাজের উপকার কিম্বা অপকার হয় তাহাই

দেখা উচিত। যে নিয়ম সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের অধিক উপকারে আইসে, যাহাতে সাধারণের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, তাহাই সমাজমধ্যে প্রচলিত করা উচিত ; ইহার বিপরীত হইলে তাহা প্রচলিত করা উচিত নহে এবং প্রচলিত থাকিলেও তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য। অতএব বিধবাবিবাহ উচিত কি না স্থির করিতে হইলে দেখা উচিত ইহাতে সমাজের উপকার কিম্বা অপকার হয়, ইহা 'ব্যবহারোপযোগিতার' অনুসারী কি না ?

আজি কালি বঙ্গদর্শনের কৃপায় ম্যালথসের নাম বোধ করি কোন পাঠকের অবিদিত নাই এবং মোটের উপর তাঁহার মতটা কি তাহাও অনেকের জানা আছে। তিনি বলেন লোকসংখ্যার আধিক্যই সমাজের দারিদ্রের মূল ; যদি দারিদ্র্য দূর করিতে চাও, যদি সমাজ উন্নত করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি দেশের দুর্ভিক্ষনিবারণের মানস থাকে তবে যাহাতে দেশের অধিবাসিগণের সংখ্যা কমে অগ্রে তাহার চেষ্টা কর। প্রাণিগণের প্রকৃতি এই, যে পরিমাণ আহারে তাহাদের পর্য্যাপ্ত হয় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন বলেন যদি জীব বা উদ্ভিদ্‌গণ যথেচ্ছ জন্মিতে পাইত তাহা হইলে কয়েকসহস্র বর্ষমধ্যে একজাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ্ দ্বারা শত শত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। কেবল প্রাকৃতিক বৃদ্ধি নিয়মে এরূপ হইতে দেয় না। যে দেশের লোকের ব্যবহার বিশুদ্ধ, যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে দেশে বাল্যবিবাহের কোন প্রতিবন্ধক নাই, যে স্থানে ভ্রূণহত্যাদির দ্বারা মনুষ্যজাতির অকালে বিনাশ না হয়, অথবা যেখানে অনিয়ত পরিশ্রম বা অস্বাস্থ্যকর কার্য্যের দ্বারা অকালমৃত্যু না ঘটে সেখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে হয় যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত ১৫০ শত বৎসর ধরিয়া আমেরিকার উত্তর প্রদেশে প্রত্যেক ২৫ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইতেছে। কোন কোন স্থানে ১৫ বৎসর মধ্যে দ্বিগুণ হইতে দেখা যাইতেছে। সার উইলিয়ম পেটি বলেন যে দশবৎসরমধ্যেও অধিবাসিসংখ্যা দ্বিগুণ হইতেপারে।

যেমন মনুষ্যসংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ দেশের উৎপন্নও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তুপৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ, তাহাতে কৃষিকার্য্যের উপকরণ যেমনই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সার যেমনই উত্তম হউক না কেন, খাদ্যসামগ্রীর বৃদ্ধি কখনই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমান হইতে পারিবে না। ম্যালথস্ স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যসংখ্যা যদি ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি অঙ্কের পরিমাণে বৃদ্ধি হয় ধরা যায়, তাহা হইলে আহারদ্রব্য ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই অঙ্কের পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। যখন

লোকবৃদ্ধি ৮ গুণ খাদ্যবৃদ্ধি ৪ গুণ, যখন লোকবৃদ্ধি ১৬ গুণ খাদ্য বৃদ্ধি ৫ গুণ। ইহাতে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে অল্পদিনের মধ্যেই লোকসংখ্যা আহারদ্রব্যের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই দেশে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।

এক্ষণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার যে কয়েকটী প্রতিবন্ধক আছে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, উপযুক্ত অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে অথবা উপযুক্ত আহারাভাবে পীড়া দ্বারা বহুলোকে প্রাণত্যাগ করে। ২য়, যুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা অনেক নরহত্যা হইয়া থাকে। ৩য় বিদেশে উপনিবেশ দ্বারা দেশের লোকসংখ্যা কমিতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন যেমন মনুষ্য জন্মিতেছে আবার তেমনি মরিতেছে তবে সংখ্যা কিরূপে বাড়িবে? বাস্তবিক জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু কম; ইংলণ্ডে যে বৎসর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সে বৎসরেই জন্মমৃত্যুর অনুপাত ১২:১০ এবং ফ্রান্সে ১১:১০। জমা অপেক্ষা খরচ কম হওয়ায় কাজে কাজেই বাকী পড়ে।

মনুষ্যসংখ্যা যত বর্দ্ধিত হইবে ততই দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে এবং কাজেই আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষাদি আসিয়া কতক লোকের প্রাণসংহার করিয়া আবার খাদ্যের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা সমান করিয়া দিয়া যাইবে। পুনশ্চ যেমন লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া লোকের অন্নকষ্ট হইবে অমনি সকলেরই পুত্রোৎপাদনে স্পৃহা কমিয়া যাইবে। ইহাকেই ইংরেজিতে (Reaction) কহে। এদিকে ম্যালথসের বিপক্ষেরা বলেন যে লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি তাহারা পেটের দায়ে নূতন নূতন জমি আবাদ করিয়া আহারদ্রব্য বাড়াইবে; কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। কোন একটি বিশেষ স্থান লইয়া বিবেচনা করিলে এই কথা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু মোট ধরিলে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খাদ্যবৃদ্ধি কখনই লোকবৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিলও ম্যাল্থসের মতের পোষকতা করেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তির পুনরুক্তি এ স্থলে প্রয়োজন করে না।

ইতিপূর্ব্বে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির যে কয়েকটি প্রতিবন্ধক উল্লেখ করা গিয়াছে তন্মধ্যে ২য় ও ৩য় টী আমাদের দেশে নাই, এবং শীঘ্র যে হইবে তাহারও আশা নাই। তবে ১মটী অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও উপযুক্ত আহারাভাবে অকালমৃত্যু আছে এবং আজ কাল প্রায়ই ঘটিতেছে। যে কয়েকটি কারণ লোকবৃদ্ধির অনুকূল, আমাদের দেশে তাহার অনেক গুলি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। নানা ব্যক্তি ইহার নানা উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অকাতরে

বিবাহ বন্ধ করা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। অন্নাভাবে প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করা অপেক্ষা পুত্র না জন্মান যে অনেক সুখের, লোকবৃদ্ধিজনিত দুর্ভিক্ষে শত শত ব্যক্তির বিনাশ অপেক্ষা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না হইতে পায় এমত উপায় অবলম্বন করা যে উত্তম তাহা বোধ করি কোন বুদ্ধিমান্ লোককে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তবে অনেকে বলেন যে আজন্মকৌমারব্রত অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকে না, কিন্তু একটন বলেন যে কুমারীগণকে আজীবন সুস্থশরীরে থাকিতে দেখা গিয়াছে। চিরকাল অবিবাহিত থাকিলে যে কোন পীড়া জন্মে তাহা কোন কাজের কথা নহে। যাঁহারা আমাদের দেশের বিধবাগণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন একটনের মত সত্য। সুতরাং দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে দেশে বহুল পরিমাণে বিবাহ যাহাতে হইতে না পারে তাহার উপায় করা উচিত। আমাদের দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য লোকের (কার্য্যে না হউক মুখে) আজ কাল এই মত দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা প্রায়ই পুরুষের অকাতরে বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা যে কিরূপে বিধবাবিবাহের পোষকতা করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পুরুষের বিবাহ হইয়া কাজ নাই কিন্তু স্ত্রীলোকের বিবাহ বন্ধ করা হইবে না এ কোন্ যুক্তিশাস্ত্রের অনুসারিণী? যখন দেখা যাইতেছে যে, বিবাহ যত কমে ততই মঙ্গল, তখন যদি দেশাচারের কৃপায় কতকগুলি বিবাহ কমে তাহাতে ক্ষতি কি? কেন আমরা এই দেশাচারের উপকার গ্রহণ করিব না?

অনেকে বলেন বঙ্গবিধবাগণ চিরদুঃখিনী। তাহাদের কোন কার্য্যেই সুখ নাই, কোনপ্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাহাদিগকে আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতিনৃশংসের কার্য্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে স্নেহ মমতা কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয় অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচজন বিধবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র সহস্র লোকের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত, যিনি একজনের অঙ্গে সূচ কোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন? যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, তবে বিধবাবিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চণ্ডালতা; গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম্ম নহে। বিধবা যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে বিবাহ

দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এইজন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি, ন্যায়পরতার উগ্রমূর্ত্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকেই স্পেন্সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ স্বাভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।

মনু প্রভৃতির পর বোধ হয় মিতাক্ষরার মত আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তৎপরে জীমূতবাহন জন্মগ্রহণ করিয়া মিতাক্ষরাকে আমাদের দেশ হইতে বিদায় দেন। মিতাক্ষরামতে পিতা পুত্রোৎপত্তির পর নিজ ভূসম্পত্তি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারেন না। তাহাতে যাহার কৌলিক কিঞ্চিৎ ছিল তাহার কতকটা খাবার সংস্থান থাকিত। পরে দায়ভাগকার জন্মিয়া দারিদ্র্য কিছু বাড়াইলেন। তিনি বলিলেন পিতা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে পারেন। তৎপরে ইংরেজবাহাদুর আবার গণ্ডোপরি বিস্ফোটক জন্মাইয়া দিলেন। তাঁহারা [illegible]নুউইলের সৃষ্টি করিয়া দারিদ্র্যের পথ [আ]রও মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার [প]র যদি পুনরায় আমরা অকাতরে [বি]বাহ প্রভৃতি করিতে থাকি, তবে বং[শ] একেবারে [illegible] হইয়া যাইবে। [সু]তরাং যে কোন উপায়ে আমাদের দেশে বিবাহ কমে তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

একশ্রেণীর লোক আমাদের শাস্ত্রে কিছুই ভাল দেখিতে পান না; যত কেন উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী তাঁহাদিগের সম্মুখে ধর না, তাঁহারা একটা না একটা দোষ অনুভব করিবেনই করিবেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা এই ধাতুর লোক ছিলেন। আর একশ্রেণীর লোক ইঁহাদিগের ঠিক বিপরীত। তাঁহারা অতিসামান্য বিষয়েও ঋষিদিগের বুদ্ধিপ্রভাব দেখিতে পান, সামান্য কথা হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব টানিয়া বাহির করেন। পুষ্পকরথের নাম শুনিয়া তাঁহারা বলেন আমাদের বেলুন ছিল; ঋগ্বেদোক্ত "আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ" কথা পাঠ করিয়া তাঁহারা বলেন আমাদের দেশে হাইড্রোপেথি ছিল। বলা বাহুল্য যে এই উভয় শ্রেণীর লোকই ভ্রান্ত। এক্ষণে এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ লোকেরা বলিতে পারেন যে, বিধবাবিবাহ পূর্ব্বে আমাদের দেশে যখন চলিত ছিল তখন ইহা অবশ্য সমাজের উপকারী। আমরাও ইঁহাদের কথার অনুমোদন করি। হইতে পারে যে বিধবাবিবাহ প্রাচীনকালে প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে চলিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে প্রয়োজনটুকু আর না থাকাতে কাজেই ইহা রহিত করা উচিত হইয়া উঠিয়াছে। সময় ও অবস্থাভেদে কোন একটা নিয়ম হইতে উপকার অথবা অপকার হইতে পারে।

যখন আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে আসিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন, তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। অধিকৃত জাতির উপর আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। অধুনাতন ইউরোপে গমনাগমনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, তখন মধ্যএসিয়ায় সেরূপ ছিল না বলিয়া আর্য্যগণের নিজ দেশ হইতে আমদানী করিবার কোন সুবিধা হয় নাই। এইজন্য তাঁহারা সন্তানোৎপাদনদ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই কারণেই অনুলোম প্রতিলোম উভয়বিধ বিবাহই প্রচলিত হইল এবং তাহার উপর যাহার যে স্ত্রীকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা হইত তিনি তাহাকে (অন্যের স্ত্রী হইলেও) লইতে পারিবেন এইরূপ নিয়মও হইল। মহাভারতের আদিপর্ব্বে শ্বেতকেতুর গল্প যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের মতের যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, সে কেবল গল্পমাত্র বাস্তবিক ঘটনা নহে। আমরাও ঐটিকে যে প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি তাহা নহে, তবে ঐ প্রকার ঘটনার উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তৎকালে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। শুদ্ধ আমাদের দেশে কেন পৃথিবীর অন্যান্যস্থলেও ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। স্পার্টাদেশের (helots) হেলটদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে সেখানেও ঐরূপ নিয়ম এককালে চলিয়াছিল। যখন আর্য্যগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারা ঐ কদর্য্য নিয়ম উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অনুলোম বিবাহ এবং বিধবাবিবাহ আরও কিছুকাল চলিল। ক্রমেই খাদ্য অপেক্ষা ভোক্তার সংখ্যা অতিরিক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহারা উভয়বিধ প্রথাই উঠাইয়া দিলেন। এবং সেই অবধি তাহাই চলিয়া আসিতেছে। বিধবাবিবাহ কোন্ সময়ে আমাদের দেশে রহিত হয় তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই বিধবাবিবাহ আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। দায়ভাগকারীর মতে বন্ধ্যা বিধবাকন্যা পিতার বিষয়ভোগে অনধিকারিণী, কারণ তিনি নিজপুত্রেরদ্বারা পিতার শ্রাদ্ধাদিকরণে অসমর্থা। মিতাক্ষরার মতে যদিও তিনি পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত না হউন, তথাপি পুত্রবতী কন্যাসত্বে তাঁহার অধিকার নাই। যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইত না। বোধ হয় পরাশরের আবির্ভাবসময়ে বিধবাবিবাহ রহিত করিবার ইচ্ছা লোকের মনে উদিত হয় এবং সেই জন্যই তিনি নিজসংহিতায় লিখিয়াছেন যে "কলিকালে (অর্থাৎ আরও কিছুদিন পরে) বিধবাবিবাহ করিবে না।" তাঁ-

হার এরূপ লিখিবার অভিপ্রায় যে আর কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হইবে না। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস জন্য যে আইন করিতে হয়, তাহা আধুনিক ফ্রান্সের ঘটনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ম্যালথস্ অন পপুলেসন্ ও ফার্ষ্ট ফ্রুট অব ফিলসফি নামক দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ফ্রান্সদেশীয় লোক সন্তান উৎপাদনে এত শিথিলপ্রযত্ন হইল এবং কাজে কাজেই অধিবাসীর সংখ্যা এত কমিয়া গেল যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িল। ক্রমেই লোকসংখ্যা কমিতেছে দেখিয়া প্রায় একবৎসর গত হইল, গবর্ণমেণ্ট, যাহাতে লোকের সন্তান উৎপাদনে পুনরায় যত্ন হয় তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য কয়েকটি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। এলফিনষ্টোনকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লিখিত লোকসংখ্যা গতবর্ষের সেন্সসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে অধিবাসিসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং বৎসর বৎসর যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহাতেই দেশের দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে। সুতরাং লোকসংখ্যা যাহাতে কমে এরূপ কোন উপায় করিবার মুখ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে যদি আমরা সমাজসংস্কারচ্ছলে বিধবাবিবাহ দিয়া লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা করিয়া দিই তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ বৎসরান্তর না হইয়া মাসে মাসে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যেমন ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। আমরা বলি আমাদের সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কোন মতে উচিত নহে; আমরা নিজে আমাদের সমাজসংস্কার করিব, ইহাতে অন্যের মুখাপেক্ষা করিব কেন? ইচ্ছা করিয়া কেন নিজের যেটুকু স্বতন্ত্রতা আছে তাহা খোয়াইব?

এক্ষণে অনেকে বলিতে পারেন যে, হিন্দুগণ প্রাচীন নিয়মের একান্ত ভক্ত, প্রাণান্তেও তাঁহারা প্রাচীন নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। মনু প্রভৃতি কতকাল পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা সকলে মান্য করিতেছে। "রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনো বর্ত্মনঃ পরং, ন ব্যতীয়ুঃ প্রজা স্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ" এই কথা কি আধুনিক কি প্রাচীন সকল হিন্দুতেই সমানরূপে খাটে। হিন্দুসমাজ স্থিতিশীল, ইহা চিরকালই একভাবে এক নিয়মে চলিতেছে। তবে বিধবাবিবাহ পূর্ব্বে ছিল এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে, প্রতিলোম অনুলোম বিবাহ ছিল এক্ষণে নাই, এ কিরূপ কথা? আমরা বলি শুদ্ধ হিন্দুসমাজ কেন জগতের কোন সমাজই একেবারে স্থিতিশীল হইতে পারে না। তবে যে সমাজ অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাকেই লোকে স্থিতিশীল

কহিয়া থাকে নতুবা একেবারে স্থাবর সমাজ হইতে পারে না। আর অধুনাতন আমেরিকা বা জাপানের ন্যায় যাহার অতি শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাকে গতিশীল সমাজ কহে। সমাজ-পরিবর্ত্তন হইলেই নিয়মেরও পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়। হিন্দুশাস্ত্রের যে পরিবর্ত্তন নাই তাহা নহে। যদিও অদ্যাপি মনু প্রভৃতিকে সকলে মান্য করে বটে তথাপি তাঁহার সকল কথা আজ কাল চলে না। একজন টীকাকার একসময়ে আবির্ভূত হইয়া নিজ সময়ের সমাজের অবস্থানুসারে মনু প্রভৃতির অর্থ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার মত প্রচলিত হইল। অনন্তর অন্য একজন জন্মিয়া সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যেরূপ নিয়মের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, মনুবাক্য হইতে সেরূপ অর্থ বাহির করিলেন। এইরূপে মূল এক থাকিলেও বিভিন্নপ্রকার টীকা দ্বারা সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার অভাব মোচন হইতেছে। সুতরাং হিন্দুদিগের নিয়ম যে চিরকালই এক আছে তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহারও অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তন হইতেছে; তবে পরিবর্ত্তনের স্বরূপ অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য দেশে মূলই বদলাইতেছে, এখানে মূল এক আছে কিন্তু তাহার অর্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং ফলে একই দাঁড়াইতেছে। অতএব যেখা যেমন যে আর্য্যগণের সন্ততি বলিয়া আমরা লোকের নিকট বড়াই করি, যে আর্য্য আর্য্য করিয়া আমরা প্রত্যেক সভায় চীৎকার করি, সেই আর্য্যগণ সমাজরক্ষার জন্য যখন যেরূপ নিয়ম আবশ্যক বোধ করিতেন তখন সেই নিয়ম চালাইতেন। তবে আমরা কেন এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ না করি? শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের নিকট সম্মান পাইবার জন্য আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিব কিন্তু কার্য্যে কোনরূপে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিব না, এ অতি লজ্জার কথা। শুদ্ধ পিতার নামে কেহ বড় হইতে পারে না,—

"অনলে জনম বলে ভস্ম মান্য নয়।
হেয় নয় শুক্তিকাপ্রভব মুক্তাচয়॥"

কার্য্যে পিতার উপযুক্ত হওয়া চাই নতুবা সম্মানের বদলে এরূপ উপযুক্ত পিতার এমন অযোগ্য সন্তান এইরূপ নিন্দা রটিবে।

আমরা অধুনিক নব্য সমাজসংস্কারকদিগকে একটি কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা মনে করেন আমাদের যাহা কিছু আছে সব উল্টাইয়া দিতে পারিলেই সমাজসংস্কার হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও কতকগুলি অন্ততঃ ভাল আছে যে গুলি বজায় রাখিয়া যেগুলি মন্দ আছে তাহা বদলাইতে চেষ্টা করা উচিত।

একজন উল্লিখিত [illegible] অংশ লইয়া অন্য [illegible] অংশ আ-

রুদ্ধ করা যাইতেছে। বিধবাবিবাহ রহিত হওয়ার প্রধান প্রতিবাদী সাম্যবাদিগণ। তাঁহারা বলেন, "সমাজমধ্যে পুরুষের পক্ষে এক নিয়ম স্ত্রীর পক্ষে আর এক, কিরূপ যুক্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রীপুরুষ একই স্বভাবসম্পন্ন। কি ক্ষমতা, কি বুদ্ধি কোন বিষয়েই স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যূন নহে। তবে তাহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার কেন না পাইবে? যে সমাজ স্ত্রীপুরুষকে এক চক্ষে না দেখিবে সে সমাজ পক্ষপাতী, তাহার উন্নতি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। "গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ" যতদিন না হইবে ততদিন কোন সমাজের ভদ্রস্থতা নাই।" আমরা সাম্যবাদীদিগের মতে মত দিতে প্রস্তুত নহি; স্ত্রীলোক যে বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে পুরুষের ন্যূন একথা আমরা স্বীকার করি না, কারণ যদি তাহাই হইত তাহা হইলে অন্ততঃ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেখা যাইত এবং পশুপক্ষিগণের মধ্যেও যৌনতারতম্য থাকিত না। তবে স্ত্রীলোক ও পুরুষের অনুভবশক্তি যে একরূপ তাহাতে আমাদের মতভেদ নাই। ক্ষুধায় উভয়েই কাতর হয় আহার পাইলে উভয়েই আনন্দিত হয়। দুঃখে উভয়েই ম্রিয়মাণ হয় এবং সুখে উভয়েই প্রফুল্লচিত্ত হয়। বিবাহাদি করিতে উভয়ের ইচ্ছা সমান। তবে স্ত্রীলোকের। পতিবিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে না এবং পুরুষ নিত্য নূতন নূতন বিবাহ করিবে এ অতি অন্যায় ও অবিচার। এ অবিচার যাহাতে না হইতে পারে তাহা সাম্যবাদিগণের যেমন ইপ্সিত; আমাদেরও সেইরূপ। বিবাহ বিষয়ে আমরাও স্ত্রীপুরুষের সাম্যসংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। 'যেমন পুরুষের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রচলিত আছে সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ আরম্ভ হউক' একথা আমরা বলি না। আমরা বলি 'যেমন বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই সেইরূপ পুরুষেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ হউক।' ইহাতে স্ত্রীপুরুষের সাম্য অবিকৃত রহিল, মধ্যে মধ্যে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইল এবং ইহা দেশাচারের বিরুদ্ধ না হওয়ায় দলাদলিরও ভয় রহিল না।

পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে আনুষঙ্গিক আর একটা এই লাভ হইবে যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়পক্ষের সংসার করিয়া স্ত্রৈণতাদোষে কাজের বাহির হইয়া যান তাহা আর হইতে পারিবে না।

পতি মরিলে স্ত্রী দুইবেলা আহারে বঞ্চিত, অলঙ্কারে বঞ্চিত, সংসারে বঞ্চিত, অতএব পতিকে সুস্থ রাখিবার জন্য হিন্দুস্ত্রীর যেমন বিশেষ যত্ন হয় অন্য জাতির একটা থাকে না বরং অকর্ম্মণ্য পতি মরিলে মনের মত পতি গ্রহণ করিতে পরিব সে দিন কবে হবে এরূপ বাসনা বিধবাবিবাহ প্রচলিত সমাজে স্ত্রীরত্নের মধ্যে কখন

কখন সম্ভব; কিন্তু আমাদের সামাজিক সমাজে তাহার সম্ভব নাই এই জন্য হিন্দুপত্নী এত পতিভক্ত এত সংসারী। যদি পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে আমরা আরও পত্নীভক্ত হই সংসারডোর আরও টানিয়া বাঁধি তাহাতে ক্ষতি কি?
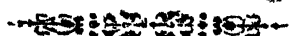
প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হিন্দী ব্যাকরণ। শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা, বিডন যন্ত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিহার হইতে সোলিমান পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকা পর্য্যন্ত এবং বিন্ধ্যাচল হইতে তেরাই পর্য্যন্ত এই ভাষা (হিন্দী) প্রচলিত। তদ্ভিন্ন কোহিস্থান হইতে আসাম এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারত-ভূমিতে যত প্রকার মনুষ্য বাস করে, তাহারা সকলেই অধিক বা অল্প পরিমাণে হিন্দী ভাষা বুঝিতে সক্ষম। ইউরোপে ফ্রেঞ্চ ভাষা যেরূপ, ভারতবর্ষে হিন্দীও সেইরূপ।" ঈদৃশ ভাষা শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য—বিশেষ বাঙ্গালীর। আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় স্নেহের কথা, ভক্তির কথা, ভালবাসার কথা, একরূপ পরিষ্কাররূপে চলে: কিন্তু ক্রোধের কথা হিন্দীতে হয়। বাঙ্গালীর ক্রোধ ছিল না, কাজেই ক্রোধের ভাষা হয় নাই; এক্ষণে একটু ক্রোধ বাড়িয়াছে, গরম মেজাইজ বাবুরা আতান্তরে পড়িয়াছেন। হিন্দী ব্যতীত তাঁহাদের ফুৎকার, চীৎকার প্রকাশ করিবার আর অন্য উপায় নাই। "সেকালো"-বাদীরা যদি একটু হিন্দী শিখিয়া তেড়া মেজাইজ দেখান, তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছি, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হিন্দীতে গালি দিতে শিখিবেন। বঙ্গীয় যুবকগণের হিন্দী শিখিবার সুবিধাজন্য এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে "হিন্দীভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক একটি ভূমিকা আছে। পুস্তকখানি অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে বাঙ্গালায় লিখিত। গ্রন্থকার প্রথম শিক্ষার্থীদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বৈয়াকরণিক বিষয়গুলি যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস, পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পাদনে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইবে। যদি কখন বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী পুস্তক পড়ান আরম্ভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকস্বরূপ নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্রূপ হিন্দীও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৫ সংখ্যা।

বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যের নালিশ।

ধনীর আর একটি নাম "বড়মানুষ।" বস্ত্রাদি যেরূপে হস্তদ্বারা পরিমিত হয়, সেইরূপে মনুষ্যও টাকার দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। এই বস্ত্রখানি হাতে অল্প, অতএব ইহা ক্ষুদ্র; এই মনুষ্য টাকায় অল্প, অতএব এই ব্যক্তি ছোটলোক; আর এই মহোদয় টাকায় অধিক, অতএব বড়মানুষ—আকার অতি ক্ষুদ্র হইলেও বড়মানুষ। আমার আকার বড়, উদরও বড়, আমি জানিতাম আমি "বড়মানুষ;" কিন্তু হলা, বলা, কেহই আমায় "বড়মানুষ" বলে না। আমি তাহাদের কতই বুঝাইয়া থাকি, কেহই বুঝে না। আবার দেখা যায় যে, যে ঋণ করে তাহাকে লোকে কখন কখন "বড়মানুষ" বলে; আবার যে ঋণ দেয়, হয়ত তাহাকে লোকে "বড়মানুষ" বলে না। তবে বোধ হয় কেবল টাকায় "বড়মানুষ" হয় না, বুঝি ব্যয় করিলে "বড়মানুষ" হয়।

আর যদি বল যাহার ভূমিসম্পত্তি আছে কেবল সেই বড়মানুষ; তবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি, কেন না আমার টাকা না থাকুক, আমার ভূমিসম্পত্তি আছে; কেবল এই বাঙ্গালায় নহে, নানাদেশে আছে। তুমি হাসিতেছ, তোমার বিশ্বাস হয় না। ভাল; তদন্ত করিয়া দেখ।

আমি এইমাত্র যে পাত্রপূর্ণ দেবদুর্লভ সম্বৃত খেতায় আহার-যজ্ঞে আহুতি দিয়া আসিয়াছি, আমার যদি ভূমি নাই, তবে তাহা আমি কোথায় পাইলাম। যে মৎস্যমুণ্ড আমার অঙ্গুলিস্পর্শসুখানুভব আকাঙ্ক্ষায় এইমাত্র অনিমিকুলোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যদি আমার পুষ্করিণী নাই, তবে আমি ঐ

মৎস্য কোথায় পাইলাম? এই যে কদলীছড়া প্রৌঢ়ার অঙ্গুলির ন্যায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপলকে আমায় ইঙ্গিত করিতেছে, আমার যদি বৃক্ষ নাই, তবে এই মর্কটমনোহর আমি কোথায় পাইলাম? এই যে পরিচ্ছদ সাগরের ন্যায় আমার উদর-সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং তরঙ্গ তুলিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, আবার মধ্যে মধ্যে তাহার ছিন্নভাগের শোভা দ্বীপ উপদ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে, যদি আমার ভূমি নাই, তবে এই বস্ত্রের কার্পাস কোথা হইতে আসিল?

তুমি বলিবে কার্পাস, বস্ত্র, কদলী, মৎস্য, তণ্ডুল, এ সকল আমি ক্রয় করিয়াছি। সত্য কথা, আমি মূল্য দিয়াছি, কিন্তু কিসের মূল্য? মজুরির মূল্য দিয়াছি, তাহা দাসদাসীর বেতনস্বরূপ। কিন্তু তণ্ডুল কি কার্পাসের মূল্য দিই নাই। কৃষকগণ কেবল ভূমিকর্ষণ, বীজ-বপন, জলসেচন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। চলিত কথায় সেই মূল্যকে ধান্যের মূল্য বলে। যে তোমাকে প্রত্যহ জলবিক্রয় করে, সে ব্যক্তি জলের সৃষ্টি করে নাই, জল তাহার নহে; সে ব্যক্তি কেবল নদী কি কূপ হইতে জল আনিয়া দেয়, তুমি তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া থাক। অথচ সে ব্যক্তি মনে করে, "আমি জলের মূল্য পাইলাম" তুমিও বল, "আমি জলের মূল্য দিলাম।" সেইরূপ কৃষকেরা মনে করে, "আমি ধান্যের মূল্য পাইলাম," তুমিও বল, "আমি ধান্যের মূল্য দিলাম," বস্তুতঃ তাহা নহে।

ধান্য কৃষকের নহে। সে ব্যক্তি পরিশ্রমদ্বারা ধান্যের উৎপাদন করিয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত কৃষক সেই পরিশ্রমের মূল্য না পায়, সেই পর্য্যন্ত ধান্য তাহার নিকট জামীনস্বরূপ আবদ্ধ থাকে। ধান্য মহাজনেরও নহে; সে ব্যক্তি কৃষকের মজুরি অগ্রিম দিয়া ধান্য খালাস করিয়া আনিয়াছে এবং ধান্য হয় ত তণ্ডুল করিয়াছে অতএব যে পর্য্যন্ত মহাজন তাহার মূল্য না পায়, সে পর্য্যন্ত ধান্য জামীনস্বরূপ আপনার নিকট আবদ্ধ রাখে। শেষ, যে ব্যক্তি এই সকল মজুরির মূল্য দিয়া তণ্ডুল খালাস করিয়া আহার করে, তণ্ডুল তাহার, তাহার নিমিত্ত উৎপাদিত হইয়াছিল। তণ্ডুল যাহার, ভূমিও তাহার।

যাহার আহার প্রয়োজন, তাহার ভূমিও প্রয়োজন। ঈশ্বর যাহাকে উদর দিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে ভূমিও দিয়াছেন। যে কৌশলে জানিতেছি এই শরীরে আমার উদর আছে, সেই কৌশলে জানিতেছি এই পৃথিবীতে আমার ভূমি আছে। পৃথিবীর কোন্ অংশে আছে তাহা আমি জানি না, কোন "বড় লোকে"ও তাহা জানেন না। রাজারা রাজমন্দিরে বসিয়া আপন আপন ভূমির

কর পাইয়া থাকেন, আমিও হট্টমন্দিরে বা পরমন্দিরে বসিয়া আপনভূমির উপস্বত্ত পাইয়া থাকি। রাজারা কখন আপন ভূমি দেখেন নাই, আমিও কখন আমার ভূমি দেখি নাই। দেখি নাই, তাহার আর এক কারণ আছে; আমার ভূমির অংশ কখন চিহ্নিত হয় নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের ন্যায় পৃথিবীর যাবতীয় উদরপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আমি একত্রে এই পৃথিবীর সমুদয় ভূমি পৈতৃক বলিয়া এজমালিতে ভোগ করিতেছি। মারকিন দেশের ভূমিতে যে কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে প্রয়োজনমত আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। কাবুল দেশের ভূমিতে যে আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা প্রভৃতি জন্মিতেছে, এখানে বসিয়া আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। সর্ব্বদেশের ভূমিতে আমার অংশ আছে, এই জন্য সর্ব্বদেশের উৎপন্নের অংশ পাইয়া থাকি। হয় ত কোন কোন অঞ্চলের উৎপন্ন আমি লই না, অথবা লইতে পারি না, অর্থাৎ মজুরির মূল্য দিতে পারি না। মূল্য যদিও না দিতে পারি, এবং সেই জন্য আপন অংশ যদিও না লইতে পারি, তথাপি আমার স্বত্ব যায় নাই। এ স্বত্বের তামাদি হয় না। সমাজকর্ত্তৃক যে সকল স্বত্ব সৃষ্টি বা প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই তামাদি আছে।

এই পৃথিবীতে আমার অংশে কি পরিমাণ ভূমি আছে, তাহা আমি নিশ্চয় অনুভব করিতে পারি না। অনুভব করিতে হইলে প্রথমতঃ আমার জ্ঞাতির সংখ্যা, অর্থাৎ মনুষ্যের সংখ্যা জানা আবশ্যক; কিন্তু তাহা আমি জানি না। বলিতে কি?—কালাশৌচ লইতে হইবে, এই ভয়ে জ্ঞাতির বার্ত্তা লই না। নিত্য কাঁদিতে হইবে বলিয়া মনুষ্যমধ্যে থাকি না। পাছে জ্ঞাতিবিরোধ হয়, এই ভয়ে পৈতৃকহিস্যা কখন চাই না। চাইব বা কাহার কাছে, কেবা আমার দাবী শুনিতে কর্ণপাত করিবে! রুষের রাজাকে যদি বলি, "ভাই আলেক্‌জন্দার, আমি তোমার জ্ঞাতি, পৈতৃকসম্পত্তিতে আমি তোমার তুল্যাংশী, তুমি কেন আমায় বঞ্চনা করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইতেছ?" তাহার উত্তর ভয়ানক হইয়া পড়িবে। বঞ্চিত হিস্যাদারেরা তাঁহার উপর নালিশ করে এমন আদালত এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আদালতস্থাপন না হইতে২ হইতেই একবার ফ্রান্সদেশে ভল্টেয়ার আর্জ্জী লিখিয়াছিলেন। তাহাতেই হিস্যাদারেরা মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাদসার হিস্যাদার ফকির। মুসলমানেরা তাহাই উভয়কে সা বলেন। আমিও সেই জ্ঞাতিবাচক উপাধিতে দাবি রাখি।

তোমরা আমায় তুচ্ছ কর, আমার ভূমি নাই বল। জমীদারকে ভূম্যধিকারী বল। কিন্তু বিচার করিলে দেখিবে জমীদার কর্ম্মচারী মাত্র। ভূমি কে কর্ষণ করিবে, কতদিনের নিমিত্ত কর্ষণ করিবে, এই স্থির করা জমীদারের অধি-

কার ; ভূমি কোন্ সময় কর্ষিত হইবে, তাহাতে কোন্ শস্য রোপিত হইবে, এই স্থির করা কৃষকের অধিকার ; জমীদারের নিয়োজিত রামাকৃষক ভূমি-কর্ষণ করুক, অথবা শ্যামাকৃষকই ভূমি-কর্ষণ করুক কিম্বা রামার নিয়োজিত ধবল বলদ, অথবা শ্যামার নিয়োজিত শ্যামল বলদ লাঙ্গল বহন করুক, তাহাতে ভূমির স্বামিত্ব জন্মে না। যে শস্য ভোগ করে, ভূমি তাহার। অতএব ভূমি আমার। তবে কেন লোকে আমায় ভূস্বলোক বলে? আমি বিচারপ্রার্থী।

বিচার না কর, আমি আর তোমাদের বাঙ্গালায় থাকিব না। তোমরা মুটিকে ধনক বল, চাসকে বেদ বল, আমায় কেন না বড়মানুষ বল?

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বক্কেশী।

স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন।

প্রয়োগ।

১

রমণী!—প্রণয়!—অহো কি ঘোর-স্বপন!
ভাবনা!—যন্ত্রণা!—ধিক্ মূর্খতা কেমন!
কেন চিন্তা!—কার চিন্তা!—কিসের যন্ত্রণা?
কি সে নারী?—কেন তার এতই ভাবনা?
তৃপ্তি!—সুখ!—দুর্ব্বলের, পশুর প্রয়াস,
যুবার সাজে কি সেই ঘৃণিত বিলাস?
মনের মাহাত্ম্য কোথা—কোথা দৃঢ়-পণ?
স্মৃতি কিম্বা হৃদ্‌পিণ্ড কর উৎপাটন।

২

পাষাণ চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে,
প্রেমমূর্ত্তি চূর্ণ হোক্ নিভৃত-অন্তরে।
ভালবাসা?—ভালবাসা—ছার ভালবাসা!
শুধু ক্ষোভ—শুধু ক্লেশ—মিটেনা পিপাসা;
প্রতিদান নাহি তাহে—অসহ-যাতনা,
দূর কর—হীন প্রেম করো'না কামনা।
ক্ষীণপ্রাণা রমণীর তপস্যা, নিষ্ফল।
ভীরু!—মূর্খ!—নরচিত্ত এত কি দুর্ব্বল?

৩

পাপ—পুণ্য—নীতি—সে ত সুদূর বিচার,
ভেবে দেখ একবার গৌরব আত্মার!
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড, আর আত্মার সম্মান,
তুলাদণ্ডে সমভারে কর পরিমাণ;
সে গৌরব—জীবনের সে অমূল্য ধন—
রমণী পূজিতে আজ কর বিতরণ?
ধিক্ প্রাণে—আন শীঘ্র তীক্ষ্ণ-তরবার?
অসার-ঘৃণিত-চিত্ত করহ বিদার।

৪

"বৃথা ক্লেশ কেন পাও, দুরাশা তোমার।"
কোথা ছিল সে সময় তীক্ষ্ণ-তরবার?
কেন না করিনু দীর্ণ হৃদয় আমার?
ঘৃণিত এ জীবনের—দুর্গন্ধ দুর্ব্বার।

রুদ্ধ কর বিধাতঃ! এ অতীত স্মরণ,
সে মূর্খতা—সে ভীরুতা—অসহ্য এখন।
কি পাপে, কি তাপে—হায় কোন প্রলোভনে,
সাশ্রুনেত্রে পড়েছিনু নারীর চরণে?

৫

শিক্ষা, দীক্ষা, ধন, মান, অমূল্য জীবন—
তুচ্ছ ভাবি যেই প্রেম করিনু সাধন,
অঙ্কুর-উদ্যমে, প্রেম-বারি-বিনা যার—
শুষ্ক—আশাময়ী-লতা হৃদয়ে যুবার,
মনের বিপুল-বল, গভীর-আশ্বাস,
শান্তির বিমল-জ্যোতি—চিত্তের উল্লাস,
উপেক্ষিনু অবহেলে যাহার কারণ,
সে রমণী—সে রাক্ষসী—পাষাণী এমন!

বিরাম।

৬

এ নহে মনের ধর্ম্ম, এ নহে প্রণয়,
প্রেমিকের চিত্ত এত স্বার্থপর নয়;
না দিয়াছে, নাই দিল প্রেম-প্রতিদান?
তুমি সদা বাস ভাল, তোমারি সম্মান।
মিলনেতে নহে সুখ—সুখ ভাবনায়,
তৃপ্তিতে মনের তৃষা নিমেষে ফুরায়;
জ্বলুক এ তুষানল হৃদয়কন্দরে,
সাবধানে রাখ যেন শিখা না উপরে।

৭

তুমি ত ভিখারি—তব কোথা অধিকার?
তোমার ঈপ্সিত-ধন আয়ত্তে তাহার।
ভিক্ষুকের কেন ক্রোধ—কেন অভিমান?
ভিক্ষুক ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র—তৃণের সমান,
মিথ্যা নহে—এ পিপাসা দুরাশা তোমার,
এ সংসারে—এ জীবনে জ্বলে পুরাবার,
তথাপি জ্বলুক এই মনের অনল,
এ জগতে রোদনই সুখদ কেবল।

প্রয়োগ।

৮

মূর্খ তুমি! কেন ক্রোধ? কেন অভিমান?
এখনো রয়েছে বক্ষ—চিরি দেখ প্রাণ।
কি দিয়াছি! কি চেয়েছি! কি ভিক্ষা আমার!
কোথা স্বার্থ, সে কি স্বার্থ, স্বার্থনাম কার?
চরণ হৃদয়ে ধরে ধূলায় পড়িয়া,
কি ভিক্ষা চাহিয়াছিনু কাতরে কাঁদিয়া—
"দর্শন, স্পর্শন তব চাহিব না আর,
ভালবাসি বল শুধু মুখে একবার।"

৯

সহস্র-বৃশ্চিক-দন্ত অন্তরে তখন,
শিরে শিরে, মেদে মেদে, করিছে দংশন;
রাক্ষসী কি উত্তরিল, অহো হো! নিশ্বাসি,
ধিক্ মোরে, পুনরায় কহিনু জিজ্ঞাসি—
"চেয়ে দেখ—কি হয়েছি—নিকট মরণ,
ভালবাসি বল শুধু—বাঁচিবে জীবন।"
উত্তরিয়া "না" পাষাণী কহিল আবার,
"ইথে যদি মর তবে কি করিব আর।"

১০

বিস্ময়-স্তম্ভিত-চিত্তে পলেক রহিয়া,
মানবী কি দেবী ভাবি দেখিনু চাহিয়া,
উজ্জ্বল-নয়ন দুটি না রক্ত না সিত,
পূর্ণেন্দু-বিমল-আস্য না শুষ্ক না স্ফীত,
ক্রোধ-ক্ষোভ-চিন্তা-লেশ, করুণার কণা,
নাই তাহে বিন্দু মাত্র—যেন অন্যমনা;
আবরি নয়নদ্বয় কাঁদিয়া ফেলিনু,
মানবী কি দেবী তাহা বুঝিতে নারিনু।

১১

মুছিয়া নয়ন পুনঃ দেখিনু যখন,
সেই দৃষ্টি—সেই আস্ত—বসিয়া অমন,
চির পিপাসার সেই বদন-মণ্ডল,
সুধা-বিগলিত সেই নয়ন উজ্জ্বল,
সে প্রথম মিলনের ছবি করুণার,
স্নায়ু-ত্বকে তখনও বিদ্যমান তার,
সে মূর্ত্তিতে, এ হৃদয়!—নণীতে পাষাণ!
সহিল না প্রাণে—বেগে ত্যজিনু সে স্থান।

১২

দেখি নাই, শুনি নাই, তদবধি আর;
দেখিব না, শুনিব না—জীবনে আমার,
তবুও পরাণ কাঁদে কখন কখন,
লজ্জায় ঘৃণায় দুখে ক্ষিপ্ত হয় মন,
ফুরায়ে গিয়াছে সবি আমার জীবনে,
সুখের বাসনা আর নাহিক এ মনে,
দেখিতে বাসনা শুধু অন্তর তাহার,
কাঁদে কি না কাঁদে মোর দুখে একবার।

বিরাম।

১৩

সে কাঁদিবে কোন দুখে? কি দুখ তাহার?
মর কিম্বা বাঁচ তুমি, তায় কিবা তার?
তুমিই বাসিলে ভাল, সে কেন বাসিবে?
তুমিই দহিলে দুখে—সে কেন সহিবে?
তুমি বল মন-প্রাণ দিয়াছ তাহায়,
কেন দেও? কারে দেও? সে ত নাহি চায়!
কি ঘৃণা! কি লজ্জা! ছিছি, এই কি তোমার,
মনের মাহাত্ম্য আর গৌরব আত্মার?

১৪

কাব্য উপাখ্যান নয় এ তব জীবন,
নাট্যশালা নয় ইহা—প্রকৃত ভবন;
নও তুমি জগৎসিংহ—সে আয়েষা নয়,
কল্পিত-প্রণয়ে তবে কেন তৃষা হয়?
মন তার, প্রাণ তার, প্রণয়ো তাহার,
তাহার হৃদয়ে তব কোন অধিকার?
তব-দুখে কভু তার কাঁদিবে না মন,
দুর্দ্দশা নিরখি তব হাসিবে সে জন।

প্রয়োগ।

১৫

সে কাঁদিবে কোন দুখে? এই কি সংসার!
দয়া-মায়া-সানুভূতি সবি কি মিছার?
সে নাহি কাঁদিবে যদি কে কাঁদিবে আর?
কার দুখে, কার তরে, এ দশা আমার?
কারে স্মরি দিবানিশি ঝরে এ নয়ন?
কার দুখে প্রতিপল আরাধি মরণ?
বজ্রাহত-তরু-প্রায় বিশুষ্ক-জীবন—
কার তরে আজো আছি করিয়া ধারণ?

১৬

সে কাঁদিবে কোন দুখে? অহো হো সংসার!
নরনারী-পূর্ণ তুমি—তব এ আচার?
জীবন-যৌবন-সুখ, অঞ্জলি পুরিয়া—
নিত্য যে চরণে তার দিয়াছি ঢালিয়া।
তৃষিত-চাতক হতে হইয়া কাতর,
দেখিতেছি মুখ তার এ দীর্ঘ-বৎসর!
ক্রীতদাস হতে তার হয়ে অনুগত,
তুষিতে তাহার মন—সদাই নিরত।

১৭

এ পূজার কিছুই কি নাহি পুরস্কার?
মনেও স্নেহের বিন্দু হর্না তাহার?
এ হ'তে অধিক তৃষ্ণা ছিল না আমার,
কথায়ো করুণা নাহি করিল তাহার?

রাজ্য নয়—ধন নয়—নহেক জীবন,
চেয়েছিনু করুণার একটী বচন।
স্নেহপূর্ণ তার সেই একটি বচনে,
প্রবাহিত মন্দাকিনী এ মরু-জীবনে।

১৮

এ তপস্যা—এ যন্ত্রণা—এত অনুরাগ,
পাষাণ-হৃদয়ে তার করিল না দাগ।
কি সে নারী?—চিহ্ন তার মানবিক নয়!
এত কি পাষাণময় নারীর হৃদয়?
দেবী নয়—পাষাণী সে—অমরেরো মন,
তপস্যায়—সাধনায়—হয় উচাটন।
পাষাণী পূজিনু হায় এত দিন ধরে!
এই দুখ চিরদিন রহিবে অন্তরে।

বঙ্গ বৈজ্ঞানিক।

আজ কাল বাঙ্গালার পশ্চিমবিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা বালকগণের শিক্ষার পক্ষে কোন অংশে উপযোগী নহে। যে যে অংশ বুঝাইতে ৫।৬ পৃষ্ঠা লাগে সেই সেই অংশ এক প্যারগ্রাফে লিখিত হইয়াছে। বালকগণ এই সকল বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল কতক গুলা অভ্যাস করিতে বাধ্য হয়। অনেকে বলিবেন যে ঐ অভ্যস্তবিষয় পরে বালকগণের উপকারে আসিতে পারে কিন্তু বালকগণ এই সকল পুস্তক হইতে যাহা অভ্যাস করে তাহার অধিকাংশই যদি ভুল হয় তাহা হইলে পরে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অপকারের সম্ভাবনা। এই জন্য আমরা বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ প্রণীত পদার্থবিদ্যার সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

মহেন্দ্র বাবু বিস্তর পড়িয়া শুনিয়া তাঁহার পুস্তকখানি ভাল করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে নিউটনের আকর্ষণবিষয়ক নিয়ম বুঝিতে পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি তাঁহার পদার্থবিদ্যার (অষ্টমাঙ্ক ২৭ এর পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে "তাবৎ বস্তুই নিক্ষিপ্ত হইলে ভূতলে পতিত হয় ইহা দেখিয়া আপাততঃ এরূপ বোধ হয় যে পৃথিবীই তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহারা পৃথিবীকে কি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; ফলতঃ পৃথিবী তাহাদিগকে যেরূপ আকর্ষণ করে তাহারাও পৃথিবীকে এবং পরস্পরকে

সেইরূপ আকর্ষণ করে কিন্তু পৃথিবীর সামগ্রী পরিমাণ অধিক হওয়াতে তাহার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল।" আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে নিউটন কত মাথা ধরাইয়া আকর্ষণ সংক্রান্ত যে নিয়ম বাহির করিলেন তাহার কি শেষে এই ব্যাখ্যা। নিউটনের আকর্ষণ-সম্বন্ধীয় নিয়ম বিষয়ে আমরা এইরূপ জানি যে একটি জড়পদার্থ অন্য জড়-পদার্থের প্রতি যেরূপ আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে শেষোক্ত পদার্থ প্রথম-টীকেও ঠিক সেই সমান বলে আকর্ষণ করে। দুইটি দ্রব্য পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে সেই আকর্ষণ-শক্তি সমান, নিশ্চয় সমান, তাহাদের পরিমাণ কখনও অসমান নহে। অর্থাৎ পৃথিবী একটি ফলকে যে বলে তাহার দিকে আকর্ষণ করে ফলটিও ঠিক সেই বলে পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে। ঘোড়া যে বলে গাড়িকে টানে গাড়িও সেই বলে ঘোড়াকে টানে। মহেন্দ্র বাবু এ নিয়ম জানেন কিন্তু নিয়-মের কার্য্য ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাহাই বলিয়াছেন "একের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল" মহেন্দ্র বাবু যে বিষয় না বুঝিয়া বালকগণকে ভুল শিক্ষা দিতেছেন আমরা সেই বিষয় নিম্নলিখিতরূপে বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

আপনি একখানি মোচার খোলা জ-লের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যে বল প্রকাশ করিবেন সেই বলে যদি একখানি নৌকা আকর্ষণ করেন তবে আকর্ষণের ক্রিয়া পূর্ব্ব-অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইবে এবং সেই বলে যদি এক বৃহদাকার জাহাজ টানেন তবে আকর্ষ-ণের ক্রিয়া এত অল্প হইবে যে কিছুই হয় ত দেখা যাইবে না। অর্থাৎ যদি দুইটি বস্তুর উপর সমান আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করা যায় তবে যেটির পদার্থ-সমষ্টি* অপেক্ষাকৃত অধিক তাহার উপর আকর্ষণক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবে। এস্থলে আকর্ষণের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক হয় আকর্ষণের ন্যূনাতিরেক হয় না।

পৃথিবীর পদার্থসমষ্টির সহিত কোন দ্রব্যের পদার্থসমষ্টির তুলনা হয় না, সুত-রাং পৃথিবী ও বৃক্ষচ্যুত ফল যখন ঠিক ভিন্নদিকে সমান বলে আকৃষ্ট হয় তখন ক্ষুদ্র ফলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণক্রিয়া এবং পৃথিবীর উপর ফলের আকর্ষণের ক্রিয়ার সহিত তুলনা হইবে না অর্থাৎ আমরা দেখিব যে ফল ভূপতিত হইল কিন্তু পৃথিবী ফলের দিকে উঠিল না।

মহেন্দ্রবাবু যদি কোন ইংরেজি পুস্তক না পড়িয়া কেবলমাত্র বাবু অক্ষয়কুমার দত্তপ্রণীত পদার্থবিদ্যাখানি ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতেন না। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, "যেমন পৃথিবী নিকটস্থ

*আমরা ইংরেজি Mass শব্দের অর্থে সামগ্রী না লিখিয়া পদার্থসমষ্টি শব্দ ব্যবহার করিলাম।

সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তাহারাও যত ক্ষুদ্র হউক না কেন পৃথিবীর উপর আপন আপন আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ করে। তবে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী সমুদায় দ্রব্য পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এ নিমিত্ত তাহাদের আকর্ষণগুণের ক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না।'

আকর্ষণবিষয়ে মহেন্দ্রবাবু যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভুল। ৩৫ পৃষ্ঠায়, নির্ব্বাতস্থলে কি গুরু কি লঘু সকল বস্তুই একস্থান হইতে এক সময়ে ভূপতিত হয়, ইহার কারণ লিখিয়াছেন যে "সকল প্রকার দ্রব্যকেই পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে।" ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে একখণ্ড লৌহ ও সেই পরিমিত সোলাকে পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ উভয়েরই ভার সমান। আশ্চর্য্য কথা বটে। পুনশ্চ "স্বর্ণের পরমাণু সকলকেও পৃথিবী যেবলে আকর্ষণ করে পালক ও কাগজের পরমাণু সকলকেও ঠিক সেই বলে আকর্ষণ করে" অর্থাৎ সকল শব্দের অর্থ যদি সমষ্টি না হয়, তবে স্বর্ণের (molecular weight) আণবিক ভার কাগজের আণবিক ভারের সহিত সমান। তবে ড্যাল্টন যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় ভুল।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াসম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবু কি বুঝিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বলেন যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চাপ ও প্রতিচাপ সব সময়ে সমান। কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা নহে। [illegible] পৃষ্ঠায়

যদি টেবিলের প্রতিচাপ হইতে দ্রব্যের চাপ অধিক হয় তাহা হইলে টেবিল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যাইবে।" কিন্তু চাপ যে কখনও প্রতিচাপ হইতে বেশী হয় ইহা নিউটন বলেন না। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে তাহা আমরা সময়ানুসারে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিব।

আকর্ষণসংক্রান্ত নিয়ম যিনি বুঝিতে পারেন নাই তিনি স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বিষয় যাহা বুঝিয়াছেন, ও বুঝাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। আমি প্রতিপরিচ্ছেদ লইয়া সমালোচনা করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রস্তাবের কলেবর বাড়িয়া যায় এই ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

বায়ুবিজ্ঞান ও বারিবিজ্ঞানে প্রথমে চাপ কাহাকে বলে এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। চাপ কাহাকে বলে ইহা যিনি ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তিনি বারিবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞানের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রবাবু বায়ুমানযন্ত্রের বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি বায়ুর ভার ও বায়ুর চাপ একই কথা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৯৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল চাপ, কেবল চাপ ব্যতীত ভার নহে এবং ভার শুদ্ধ ভার বই চাপ নহে। (presure is presure and weight is weight) কোন পাত্রস্থিত বাতাসের ওজন অন্য এক ক্ষুদ্রতর পাত্রমধ্যস্থ বাতাসের ওজনের সমান হইতে পারে, কিন্তু একের চাপ

অন্যের চাপের সহিত সমান নয়। বায়ুমানযন্ত্রে যে পারদ উঠে বায়ুর ভার তাহার কারণ নয়, বায়ুর চাপই তাহার কারণ; একটি মুখবন্ধ কাচপাত্রের অভ্যন্তরে যদি বায়ুমানযন্ত্র রাখা যায়, তাহা হইলে সেই যন্ত্রের পারদের উপর কিছু উপস্থিত সমস্ত বাতাসের ভার পড়ে না, তথাপি পারদপাত্রের মুখ খোলা থাকিলে যতদূর উঠিত বন্ধ করিলেও ততদূর উঠিবে। যদি পাত্রের মধ্যস্থ বায়ু ঘনীভূত করা যায় তবে বায়ুমানযন্ত্রের মধ্যে পারদ আরও অধিক উঠিবে। কারণ বায়ুর চাপ বায়ুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে, ভারের উপর নির্ভর করে না। এইরূপ ভার ও চাপের একই অর্থ মনে করিয়া অনেকে অনেক গোলযোগ করেন। যেমন মহেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে "আমরা প্রায় ৩১৫ মণ ভারে আক্রান্ত রহিয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদিগকে কোনরূপ ভার সহ্য করিতে হইতেছে ইহা আমরা একবার ভ্রমেও মনে করি না।" মহেন্দ্র বাবুর পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কারণ তিনি ভার ও চাপের বিভিন্নতা কখনও মনে ভাবেন নাই, কিন্তু যিনি ভার ও চাপের বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝিয়াছেন তিনি এই বায়ুসাগরে মগ্ন হইয়াও কেন যে কিছু ভার সহ্য করেন না তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যখন মোট মাথায় করিয়া না বেড়াই তখন নিজের শরীরের ভার ভিন্ন কিছুই বহন করি না। বায়ুসাগরে ডুব দিয়া বেশী ভার বহন করা দূরে থাকুক বরং কম ভার বহন করি, কারণ বায়ুমধ্যে থাকিলে শরীরের যে ভার ও শরীরের আয়তনপরিমিত বায়ুর ভার যোগ করিলে নির্ব্বাতস্থলে শরীরের ভারের সমান হয়।

তরল পদার্থের কোন বিন্দুর উপর চাপ, presure at a point), চাপসমষ্টি (total presure) সংঘাত চাপ (resultant presure) প্রভৃতি ইহাদের প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইয়া দেওয়াতে এক চাপ কথা লইয়া পুস্তকমধ্যে অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ।" ইহা পড়িয়া আমরা এই বুঝিতে পারি যে গঙ্গোত্রী ও সাগরসঙ্গমের জলপৃষ্ঠ সমান উচ্চে অবস্থিত। কলিকাতার গঙ্গার জলপৃষ্ঠ সাগরসঙ্গমের জলপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ এই কথা কোন বালককে বলাতে সে উত্তর করে যে, তাও কি হয়, আমরা পদার্থবিদ্যায় পড়িয়াছি "জল উঁচু নিচু হইতে পারে না।" "তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমান" ইহা লিখিবার সময় মহেন্দ্র বাবুর মনের ভাব এই যে তরল বস্তুর যখন সাম্যাবস্থা থাকে তখন তাহার পৃষ্ঠদেশ সমোচ্চ।

১২২ পৃষ্ঠা। "সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কেবল প্রতিফলিত পরিচালিত ও পরিবাহিত

হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিম্নিস্থ বায়ুরাশির অধোদেশমাত্র উষ্ণ কিন্তু উর্দ্ধদেশ হিম।" পূর্ব্বপৃষ্ঠায় পরিবাহন কাহাকে বলে বুঝান আছে। যদি এক কড়া জল চুলীতে গরম করিতে বসাই, তবে নিম্নের জল প্রথমে গরম হইবে। গরম জল লঘু হওয়াতে উপরে উঠিবে এবং উপরের জল নীচে আসিয়া পুনরায় গরম হইবে এবং উপরে উঠিবে। এইরূপে তাপ প্রবাহিত হওয়ার নাম পরিবাহন। সুতরাং পরিবাহনদ্বারা যেরূপ এক কড়া জল সমস্ত সমান উষ্ণ হয় সেইরূপ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবারই কথা। অতএব উপরের বাতাস কেন শীতল সেই বিষয়ে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার যুক্তি এই—সূর্য্যকিরণ দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় পরে পরিবাহন দ্বারা বায়ু উষ্ণ হয় কিন্তু পরিবাহন বশতঃ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবার কথা এইজন্য বায়ুরাশির অধোদেশ উষ্ণ ও উর্দ্ধদেশ হিম। যথেষ্ট বুঝিয়াছি। উপরের বায়ু কি কারণে শীতল তাহা আমরা এইস্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমে কোন বায়ুনির্ব্বাতনযন্ত্রের আবরণমধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমাইয়া দিয়া যদি পরে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করান যায়, তবে বায়ু প্রবেশকালে শীতল হইয়া পড়ে। এমন কি কোন কোন সময় বায়ু মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করে। ইহার কারণ এই যে বাহিরের বায়ুর পূর্ব্বে যে চাপ ছিল আবরণ-অভ্যন্তরে প্রবেশ কালে সেই চাপের হ্রাস হওয়াতে উহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই আয়তনবৃদ্ধির সময় বায়ু চতুঃপার্শ্বস্থিত বায়ুর চাপের বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিল কোন শক্তি দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হইল। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আভ্যন্তরিক তেজের কিয়দংশ ক্ষয়িত হইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা হইল সুতরাং বায়ু শীতল হইয়া পড়িল। আমরা জানি যে যত উপরে উঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমিতে থাকে, সুতরাং ভূতলসন্নিকটস্থ বায়ু যখন উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, যত উপরে উঠে তত তাহার চাপ কমিতে থাকে; সুতরাং তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় ও শীতল হইয়া পড়ে; কিন্তু এইরূপে শীতল হওয়াতে উহার ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় না সুতরাং পুনরায় নামিয়া আসিয়া আবার উষ্ণ হয় না।*

মহেন্দ্র বাবু কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বালকদিগকে বুঝান উচিত ছিল। যথা সামগ্রী (Mass) লম্ব (Vertical) সমতল (Level) ইত্যাদি। তিনি যখন ভূষার অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন (১২৩ পৃষ্ঠা ভূষা নামক যে বস্তুটির দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত হয়) তখন ঐরূপ কথা গুলির অর্থ বুঝাইয়া দিলে অসঙ্গত হইত না। কারণ আমরা লম্ব অর্থে perpendicular

* এই অংশে অন্য সময়ে বক্সদর্শনে পরিষ্কার রূপে লিখিবার মানস রহিল।

সমতল অর্থে (plane superficies) বলিয়া বুঝি। জড়ের গুণের মধ্যে জড়ের অবিনশ্বরতা গুণটির উল্লেখ করিলে বোধ হয় বেশি ক্ষতি হইত না।

অধিক আর কি বলিব ইহাতে নাই এমন কিছুই নাই। ইহাতে অনুপ্রাস আছে, অলঙ্কার আছে, শব্দবিন্যাস আছে, কবিত্ব আছে, যথা (৯০ পৃষ্ঠা) "বায়ু না থাকিলে পর্ব্বতনন্দিনী সুস্বাদু সলিলশালিনী প্রবাহিণী স্রোতস্বিনীগণ কলকল রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না থাকিলে কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনীরূপ সিঁথিতে সমুজ্জলিত হইত না। ইহাতে স্ক্রু আছে, কপিকল আছে, দড়ি আছে, জলপাত্রও আছে। মোট "ছিঁয়া সলিল্‌ চ হ্যায়, প্রাড়বিবেক হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নবি হ্যায়" সব শেষে প্রশংসাপত্র বি হ্যায়।

মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন বাঙ্গালায় বিজ্ঞানবিষয়ক সহজ বিষয় লইয়া কোন ভাল বই নাই বলিয়া তিনি এই ভাল বই লিখিতে প্রবৃত্ত হন।" কিন্তু অক্ষয় বাবু যেরূপ পরিষ্কাররূপে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহার পর মহেন্দ্রবাবুর ভাল বই একটু পরিষ্কার হইলে সুখী হওয়া যাইত। যে যে বিষয় তিনি ভালরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই লিখিলে ভাল হইত।

যিনি এই সমালোচনার বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই বঙ্গদর্শনে প্রতিবাদ লিখিয়া সকলকে জানাইলে সন্তুষ্ট হইব।

শ্রীয, গো,

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

২। দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র।

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে দুই রকম নাটকত্ব থাকে। একরকম নাটকত্ব দৃশ্যমান—নাটকের আখ্যায়িকা পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায়। আর একরকম নাটকত্ব অদৃশ্যমান—নাটক পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে পারা যায় না—বুঝিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। একরকম নাটকত্ব নাটকের কায়াতে আঁকা থাকে—দেখিতে ইচ্ছা কর আর নাই কর, নাটক পড়িতে গেলে দেখিতেই হইবেক। আর একরকম নাটকত্ব নাটকের গায়ে আঁকা থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হয়। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবরাজ হ্যাম-

লেটের মন তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্যের সম্বন্ধে রোষপূর্ণ, ঘৃণাপূর্ণ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধবাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধ সাধনে অদৃঢ়সঙ্কল্প—পিতৃব্যপ্রাণসংহারে অনিশ্চিতহস্ত। দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বিভাবাঙ্কিত। দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুবরাজ হ্যাম লট পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিবার জন্য ভয়ানক আবেগবান্, কিন্তু প্রাণসংহার করেন করেন করিয়াও করিতে পারেন না। এইটি হ্যামলেট নাটকের দৃশ্যমান নাটকত্ব—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িয়া গেলেই চোকে পড়ে। কিন্তু এই দৃশ্যমান নাটকত্বের মূলে একটি গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে—এই দ্বিভাবের মূলে একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানবপ্রকৃতি আছে। যে বিশেষ মানসপ্রকৃতির বলে, যে বিশেষ মনোগঠনপ্রণালীর গুণে কার্য্যক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হ্যামলেট নাটকের গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব। এই গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব দৃশ্যমান নাটকত্বের কারণস্বরূপ। দৃশ্যমান নাটকত্বের ন্যায় ইহাকে নাটকের গায়ে অক্ষরাকারে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় না—গূঢ়নিহিত বলিয়া ইহাকে খুঁজিয়া পাড়িয়া লইতে হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকেও ঠিক্ তাই। পূর্ব্বপ্রস্তাবে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা দৃশ্যমান নাটকত্ব। এই দৃশ্যমান নাটকত্বের মূলে যে গূঢ় অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে এখন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্তসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সারমর্ম্ম একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে প্রণয় করিতে বসিয়াছেন—একটি অসামান্যা রূপলাবণ্যসম্পন্না বালিকার সহিত প্রণয় করিতে বসিয়াছেন। এই প্রণয় করিতে বসিয়া দুষ্মন্তের মহাপরীক্ষা হইয়া গেল। এ কিসের পরীক্ষা? এ কি দুষ্মন্তের প্রণয়ের পরীক্ষা? বোধ হয় অনেকে বলিবেন—হাঁ তাই। বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে দুষ্মন্ত জনশূন্য তপোবনে একটি স্বল্পবয়স্কা, সরলমনা, রাজমাহাত্ম্যমুগ্ধা তাপসবালাকে দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাছে কেহ কিছু মনে করে সেইজন্য মহাকবি পরীক্ষাদ্বারা দেখাইলেন যে সে প্রণয় পবিত্র প্রণয়। এ কথার একটি উত্তর এই যে কালিদাসের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর কবিগণ দূষিত প্রণয় লইয়া কখনও কাব্য বা নাটক লেখেন না।* দ্বিতীয়

---

* সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সমালোচক Dr. Ulrici সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট নামক নাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন:—

"That the leading interest of this drama is centered in the loves of Romeo and Juliet, is clear even to a child. Still I cannot persuade

উত্তর এই যে জলসেচনকার্য্যনিরতা শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণসম্বন্ধে দুষ্মন্ত যেরূপ সন্দেহসংকুল হন, তাহাতেই সপ্রমাণ যে দুষ্মন্ত দূষিতান্তঃকরণে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই যে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলাকে দিয়া যান। চতুর্থ উত্তর এই যে উপন্যাসের প্রারম্ভেই কবি দুষ্মন্তকে যেরূপ শান্ত এবং পবিত্র মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে এই পরীক্ষায় গাঢ় পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ের প্রকৃতিপ্রকটন করা নাটকমাত্রে-রই উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য মহাকবি দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক লিখিতেই হইবেক, এমন কোন কথা নাই। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকা কবি লংফেলোর Evangeline নাম ঔপন্যাসিক কাব্য এই কথার এক প্রমাণ। আমরা জানি যে দুষ্মন্তের মা পরীক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণাময়—আমরা জা যে সেই পরীক্ষায় পড়িয়া দুষ্মন্ত অ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন। কিন্তু পবি ভাবে প্রণয় করিয়া কোন্ নৈতিক নি যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়? অতএব প প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার জন্য যন্ত্র ময় পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সমস্ত ধর্ম্মশা বিরুদ্ধ।

তবে এ পরীক্ষা কিসের পরী প্রশ্নটী বড় গুরুতর। অতএব কি বাহুল্যব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম প্র দুষ্মন্তের প্রণয়োপাখ্যান যে রকম কি করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। আমরা দে পাই যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণ আমরা দেখিতে পাই দুষ্মন্ত প্রেমে জিত হইবামাত্রেই প্রেমানুভবের

---

myself that the meaning of the whole piece is exhausted in deification and entombment of love, and that this idea constit the groundwork of the play. On the contrary, Shakspeare scarcely have designed to deify love merely as an inexpres feeling—an intoxicating passion. That were, indeed, an idolat which art could never be guilty, even though, like the African his Fetish, it should destroy its idol with its own hand."

Dr. Ulrici প্রণীত Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৪.

...দানে অক্ষম। আমরা দেখিতে পাই, ...দণ্ডে দুষ্মন্তের হৃদয় প্রেমবিহ্বল, সেই ...ণ্ডেই দুষ্মন্তের মন ধর্ম্মভয়ে ভীত। ...প্রেম কি? না শারীরিক বিকারযুক্ত হৃদ...য়র ভাববিশেষ। প্রেম একটি passion। ...র্ম্মভয় জ্ঞানমূলক। সকলেই জানেন ...জ্ঞান এবং ভাব প্রায়ই পরস্পর ...রোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ...লন যে sensation and perception ...ar an inverse ratio to each other। ...মিও জুলিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ...প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক ...ছে তাহা দেখিতে পান না। দুষ্মন্ত ...ন্তলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের ...যে সকল কণ্টক থাকিতে পারে ...বুঝিয়া দেখেন। ইহাতেই এক ...বুঝা যায় যে সেক্সপীয়রের নায়ক ...বর শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট; কালিদাসের ...ক ভাবের শাসনেও জ্ঞানের শাসনা... । ইহাতেই বুঝা যায় যে সেক্স...রের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের ...ধী কিছুই নাই; কালিদাসের নায়...মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী জ্ঞান ...জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভয় আছে। তাই ...ছিলাম যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্র... হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। ...নে আর একটি কথা বলা আব... সেক্সপীয়রের নায়কের প্রেমের ...বাহ্যবস্তুসম্ভূত—মণ্টেগিউ এবং ...বংশদ্বয়ের চিরশত্রুতাজনিত। ...দাসের নায়কের প্রেমে বাহ্যকারণ-সম্ভূত বিঘ্ন কিছুই নাই। দুষ্মন্ত দেখিতেছেন, শকুন্তলার হৃদয়ানুলিপ্তা সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া, শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত। তিনি বুদ্ধিমান্—বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অধিনায়িকা গৌতমী সব জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্ কণ্ব কেবল উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বস্তুতই দুষ্মন্তের প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন দুষ্মন্তের অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্ম্মভাব।

তার পর আমরা দেখিতে পাই যখনই দুষ্মন্ত শকুন্তলাভাবে ভোর তখনই মহাকবি তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, যখন দুষ্মন্ত মোহাভিভূত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সকলেই জানেন যেখানে মোহাধিক্য সেইখানেই কার্য্যশক্তির নাশ—সেইখানেই মনুষ্য প্রায় উদ্যমহীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুষ্মন্ত লালায়িত হইয়াছেন। হইয়া ঋষিদিগের আহ্বানে পুনর্দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত। ইহার তাৎপর্য্য কি? বলা অনাবশ্যক যে শুধু

সাধনাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কবি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে এই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ, আত্মেতরভাবেরই জয় হইল। দুষ্মন্তের প্রেমশক্তির প্রবলতা প্রতিপন্ন না হইয়া তাঁহার মাতৃস্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা প্রতিপন্ন হইল। তবে কেমন করিয়া বলিব যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা?

আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়াও না পাইয়া প্রজ্বলিতচুল্লীর ন্যায় প্রেমানল উদ্গার করিতেছেন, তখনই মহাকবি তাঁহাকে বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণ করাইলেন। আবার সেই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ। এবং আবার সেই রকম আত্মভাবের লয় হইয়া আত্মেতরভাবের ঘোরতর উদ্রেক। আবার সেই রকম প্রেমশক্তির প্রবলতা চিত্রিত না হইয়া সামাজিক স্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা চিত্রিত হইল।

আর বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্বপ্রস্তাবটী স্মরণ করিলেই অবশিষ্ট এবম্বিধ ঘটনাগুলির অর্থগুরুত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্য্য অনুভূত হইবেক।

এখন বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সৎপ্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মভাব এবং অনাত্মপরতার পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষায় বিনা সংঘর্ষে তেজ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কে না জা[নে] যে সেই বিবশ চিত্রদর্শনের পর ভূপতি বিহ্বলহৃদয় বিহ্বলজ্ঞান দুষ্মন্ত স[হসা] বিপন্নের আর্ত্তনাদ শুনিয়া বীরবিক্র[মে] ধনুর্ব্বাণ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ত[খন] বোধ হইল যেন একটা প্রকাণ্ড অ[গ্নি]শিখা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল। [তবে] দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ কিসের স[ংঘর্ষ] হইতে পারে? আমাদের বোধ হ[য়] সংঘর্ষ সেই মনের আত্মভাবের [এবং] আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ। আম[াদের] বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের অ[াত্ম]পরতার এবং সমাজপরতার সং[ঘর্ষ]। আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই ম[নের] একঅংশের সহিত আর একঅং[শের] সংঘর্ষ। সেক্সপীয়রের সর্ব্বপ্রধান [...] তত্ত্বজ্ঞাপক নাটক, রোমিও এবং [জুলি]য়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর সংঘর্ষের কারণ দুইটি বংশের চির[...] —বাহ্যজগৎমূলক। রোমিওতে, [এক] দিকে একটি রিপুগ্রস্ত মন, আর এ[ক দিকে] বাহ্য বা জড়জগৎ। দুষ্মন্তে, মনে[র এক] দিকে একটি রিপুগ্রস্ততা আর এ[ক দিকে] বাকি সমস্ত মনটা। দুইটি প[্রণালী] প্রণালী দুই রকম। কোন্ প্র[ণালী] উৎকৃষ্ট, পরে বলিব।

আমরা দেখিলাম যে দুষ্মন্ত আত্মেতরভাব বা সামাজিকভাব[প্রধান] চরিত্র। আমরা দেখিলাম [যে] দুষ্মন্তের মনের আত্মভাবের এব[ং] তত্ত্বজ্ঞানের সংঘর্ষ সেইখানেই

আত্মেতরভাব বিজয়ী। আমরা দেখিলাম, যেখানেই আত্মসন্তোগ এবং সামাজিক ধর্ম্মের বিরোধ সেইখানেই দুষ্মন্তের সামাজিকধর্ম্ম প্রবলতর। এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক ধর্ম্মভাবের প্রকৃতিটী [illegible] হইবেক।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের সামাজিক প্রকৃতি দুইপ্রকার—একটি ভাবমূলক, আর একটি জ্ঞান বা যুক্তিমূলক। সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম—সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইলে জগতের কতকগুলি লোক নিজের যুক্তিশক্তিপ্রয়োগ না করিয়া পরের মতাবলম্বী হইয়া চলেন; আর কতকগুলি লোক পরের মতানুসরণ না করিয়া নিজের যুক্তিশক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরের মতানুসরণ করিয়া সংসারধর্ম্ম করা মোহের কার্য্য। সে মোহ শ্রদ্ধাতিশয়মূলক। ভারতে এ পর্য্যন্ত এই মোহমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে এই প্রাণিসঙ্কুল লোকসাগরতুল্য ভারতভূমিতে অতি পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণবাক্যই সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র সূত্র—একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম বলিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্ম্মাচার্য্য যাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্য্যক্ষেত্রে অধর্ম্ম বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।" উন্নতিশীল ইউরোপেও এই দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে। দুই কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপবাসী ভারতের প্রণালীতে সংসারধর্ম্ম করিত—রোমানক্যাথলিক পুরোহিতগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্ম্মসূত্র, একমাত্র ধর্ম্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্দ্ধাধিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানবপ্রকৃতি রহস্যের মূল কি? আমাদের বোধ হয় ইহার একটি মূল মনুষ্যমনের একরকম স্বাভাবিক অলসপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার শ্রমকাতরতাজনিত ইচ্ছাশক্তি বা will power এর দুর্ব্বলতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার সম্বন্ধে মনুষ্যমনের শ্রদ্ধার ভাব। ভাল জিনিস প্রাচীন হইলে অনেকে স্বভাবতই তাহাতে সম্ভ্রমের সহিত আসক্ত হয়। সে আসক্তি একটি মোহের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে মোহে অর্দ্ধাধিক জগৎ মুগ্ধ। সে মোহ খণ্ডন করা একরকম অসাধ্য বলিলেই হয়। আর কতকগুলি লোক যুক্তিদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মোহে মুগ্ধ নন! তাঁহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এটিও মনুষ্যমনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই প্রকৃ-

তির বলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজসংস্কার। এই দুইটি মানবপ্রকৃতির কোনটিই পরিত্যজ্য নয়। কিন্তু দুইটি একত্রীভূত না হইলে সমাজের বিষম অমঙ্গল ঘটে। সমাজ হয় ভারতের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া উন্নতিসাধনে একবারে অক্ষম হইয়া উঠে, নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ন্যায় অনন্তবিপ্লবাবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্যজাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক। এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাবমান। ইউরোপে এবং এশীয়ায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ভয়ানক সমাজবিপ্লব এবং ধর্ম্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিপ্লব মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহার বলবৎ সাক্ষী। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই সামঞ্জস্যসাধনস্পৃহারূপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি। দুষ্মন্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। সেইটি বুঝাইতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে দুষ্মন্তের অগাধ ভক্তি। তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল, তিনি ভাবিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ
বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্যাকং।
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি
সর্ব্বত্র।"

এ ভক্তি বড় কম ভক্তি নয়। আমরা এ রকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি। আমরা এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানভ্রষ্ট না হইলে এ রকম ভক্তি মনে স্থান পায় না।

দুষ্মন্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অন্যে যাগযজ্ঞ করিলে, তিনি তাহার ফলভাগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন—"অনামেব ভাগধেয় মেতে তপস্বিনো যে নির্ব্বপন্তি।"

দুষ্মন্ত প্রচলিতপ্রথার পক্ষপাতী। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কাছে শার্ঙ্গরব প্রভৃতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ, অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপি এতান্ তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দুষ্মন্ত হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মকাণ্ড মানিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র আহবনীয়াগ্নি সযত্নে রক্ষিত—

রাজা। উত্থায়। বেত্রবতি! অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

দুষ্মন্ত মনে করেন যে ভারতের মুনিঋষিগণ দেবতুল্য। তিনি মুনিঋষিকে দেবতানির্ব্বিশেষে ভয় করেন, ভালবাসেন এবং সম্ভ্রম করেন। তিনি জানেন যে—

শমপ্রধানেষু তপোবনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তা স্তে হ্যন্য
তেজোঽভিভবাদ্দহন্তি॥

পাঠক বোধ হয় সহজেই স্বীকার

করিবেন যে, যে ব্যক্তির মনের বিশ্বাস এইরূপ, সে ব্যক্তি পৌরোহিত্যকুহকে অভিভূত। পাঠক বোধ হয় বলিবেন, যে ব্যক্তির মনের ভাব এই রকম, সে ব্যক্তি ইউরোপের 'মধ্যযুগের' ন্যায় পৌরোহিত্যপ্রধান যুগের লোক বই উনবিংশশতাব্দীর ন্যায় জ্ঞানপ্রধান যুগের লোক হইতে পারে না।

দুষ্মন্তের কাছে মুনিঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ন্যায় মাননীয় এবং পালনীয়। তিনি মৃগয়ার খরতর ঔৎসুক্যে প্রধাবিত হইয়া ভয়কুণ্ঠিত পলায়নপর মৃগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন করেন, এমন সময় ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজানুলম্বিত উষ্ণশোণিতোত্তেজিত বলসারবাহু গুটাইয়া লইয়া তিনি সেই বীরহস্তোপযোগী শানিত শর তূণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলুন ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়
মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতি লোলঃ
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরা স্তে॥
তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি॥

রাজা। সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব। ইতি যথোক্তং করোতি।

"সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব।" বলিতে গেলে, দুষ্মন্ত প্রায় প্রণাম করিতে করিতেই সেই দুর্দ্দমনীয় শর শরাধারে ফেলিয়া দিলেন। মৃগয়োন্মত্ত বীরচূড়ামণি যেন একটা জঠরানলক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় কোন একটা বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা আহত হইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া প'ড়িয়া গেল। শকুন্তলা নাটকের প্রতিশব্দেতে দুষ্মন্তচরিত্রের যেটি প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ বিরোধিভাবের অবিরোধে অবস্থান, সেটি প্রতিপন্ন। এমন নাটক কি আর হয়!

আর বিস্তার না করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ১২০ কোটি মানবের মধ্যে এখনও ৭০ কোটি মানব যেমন পুরাতন প্রথার কাছে এবং পুরাতন প্রথার যাজকদিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাভিভূত, কালিদাসের দুষ্মন্তও ঠিক্ তাই। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিহীন? তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় নিজে ভাল মন্দ বিচার করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক—ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা ভাল বলেন তাই ভাল মনে করেন, ধর্ম্মাচার্য্যেরা যা মন্দ বলেন তাই মন্দ মনে করেন? না, দুষ্মন্ত সে প্রকৃতির লোক নন। শার্ঙ্গরব তাঁহাকে বলিলেন যে পূজ্যপাদ মহা ঋষি কণ্ব তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়কার্য্যের অনুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অতঃ

এব তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন—

অয়ে। কিমিদমুপন্যস্তম্।

এ কি! মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন যে তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাপসকুলসম্ভ্রমকারী, তাপস-কুলপক্ষপাতী, তাপসকুলভীত, তাপস-কুলরক্ষক দুষ্মন্তের কি এই উত্তর? আবার শুধু তাই? এই অসঙ্গত উত্তরটী শুনিয়া শার্ঙ্গরব ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া বলিলেন—

কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি। নমু ভবন্তএব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত নিষ্ণাতাঃ।
সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্ত্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।

এ কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কি বলিলেন—তিনি বলিলেন,

কিমত্র ভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

এ ত সেই অগ্নিপ্রভ সনাতনধর্ম্মনিরত ঋষিকুমারকে এক রকম মিথ্যাবাদী বলা! শার্ঙ্গরব ভারতের একজন তেজস্বী ঋষি-কুমার। মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তকে শ্লেষপূর্ণবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতো-
চিতা রাজ্ঞঃ?

দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন—

কুতোঽয়মসংকল্পনাপ্রশ্নঃ?

ভারতের ঋষিতপস্বী প্রবঞ্চক? আজ দুষ্মন্ত তাও মনে করিতে সক্ষম! ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই—যেখানে ভারতের ঋষিতপস্বী সত্যের বিরোধী, কুনীতিশিক্ষক, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত, সেখানে ঋষিকুলপক্ষপাতী, ঋষি-কুলসম্ভ্রমকারী দুষ্মন্ত ঋষিবাক্যেও হত-শ্রদ্ধ। ইহার অর্থ এই—যেখানে পবিত্র ঋষির বাক্য সনাতনসত্যের, অপরিবর্ত্ত-নীয় অনপলাপ্য নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধী, সেখানে দুষ্মন্তের কাছে ঋষি-প্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়, নিজযুক্তি-সঙ্গত নীতিতত্ত্বই অনুসরণীয়। কিন্তু দুষ্মন্ত ঋষিবাক্য অসত্য বুঝিয়াও ঋষি-দিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষি-দিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ নন। শার্ঙ্গরব মিথ্যা কথা কহিতেছেন বুঝিয়াও দুষ্মন্ত বলিতেছেন—

ভো তপস্বিন্ চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণ
মত্রভবত্যাঃ স্মরামি।
তৎকথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যা-
ত্মানং ক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

ঋষির মুখে অশ্রদ্ধেয় কথা শুনিয়াও দুষ্মন্ত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া এখনও ঋষির প্রতি আস্থাবান্—এখনও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছেন, কথাটা সত্য কি না। মনুষ্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেই-খানে প্রাচীন প্রথানুরাগী আচার্য্যকুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্ব্বা-পর-প্রচলিতপ্রথার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণাপূর্ণ

এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম শয়তানের ষড়্‌যন্ত্র। বুদ্ধের কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এবং বেদ-পুরাণমূলকধর্ম্ম পৌরোহিত্যদূষিত কুসংস্কারকুণ্ড। দুষ্মন্তে জগতের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রীভূত; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে কর্কশতা নাই—সমাজদগ্ধকারী অগ্নিশিখা উঠে না। এরূপ সংঘর্ষ অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডের ১৬৮৮ সালের রাজবিপ্লবে ইহার সম্ভবতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং আধুনিক মনুষ্যসমাজও বিনাবিরোধে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বিভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধনের দিকে ধাবমান দেখা যাইতেছে। কোম্‌তের সমাজদর্শনের আবির্ভাব এই স্পৃহার প্রধান নিদর্শন। দুষ্মন্ত এই গূঢ় ঐতিহাসিক নিয়মের চিত্র। দুষ্মন্ত এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানবপ্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি। দুষ্মন্ত সমগ্র ঐতিহাসিক মনুষ্যসমাজের গূঢ়ার্থবোধক চরিত্র। দুষ্মন্ত ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয়কালের সমষ্টি। দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসলক্ষিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা।* এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কি না সন্দেহ। কালিদাস বোধ হয় এত ভাবিয়া লেখেন নাই। কিন্তু কবির প্রতিভায় ভবিষ্যইতিহাসও নিহিত থাকে। কবি ভাবের চক্ষে মানবপ্রকৃতির অনন্ততত্ত্ব দেখিয়া থাকেন এবং প্রতিভার গুণে মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। তবে কলিদাসের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বৌদ্ধবিপ্লবের পর জন্মগ্রহণ করেন।

দুষ্মন্ত প্রচলিতমত এবং প্রচলিতপ্রথার অনুরাগী অথচ স্বাধীনচিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি? আমরা দেখাইয়াছি যে প্রচলিতপ্রথার প্রতি অনুরাগ মনুষ্যহৃদয়ের একটি মোহের স্বরূপ। মোহ অন্ধ—যাহাকে অধিকার করে তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। দুষ্মন্ত সেই মোহের বশবর্ত্তী হইয়াও স্বাধীন। ইহার অর্থ—দুষ্মন্ত অন্ধ হইয়াও অন্ধ নন। অর্থাৎ আবশ্যক হইলেই দুষ্মন্ত জ্ঞানেরদ্বারা মোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন—দৃষ্টিনাশকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু শুধু তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, যাঁহারা দুষ্প্রবৃত্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন কিন্তু বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। না পারিবার

* বোধ হয় প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানবপ্রকৃতি নিরূপণ করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে সামাজিক চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই তত্ত্ব ঐতিহাসিক প্রণালীতেও বুঝিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন স্থলে সেই ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝাইলে কোন দোষ পড়ে না।

কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অভিভূতাবস্থা হইতে উত্থানশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উদ্যমের (effort) আবশ্যক। যে অবস্থা পরিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা যতই অভিভাবকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will power।

দুষ্মন্তের মুনিঋষির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনিঋষি অপেক্ষা ভাল জিনিসের প্রয়োজন হইলে, দুষ্মন্ত সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দুষ্মন্ত সৎপ্রবৃত্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুগ্ধাবস্থা হইতে অভিলষিত উৎকৃষ্ট অবস্থায় গমন করিতে পারেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই —দুষ্মন্ত এই আশ্চর্য্য ইচ্ছাশক্তি কোথায় পাইলেন? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, সকল লোকে যেমন আর আর মানসিক গুণগুলি সমান পরিমাণে পায় না, তেমনি তাহারা ইচ্ছাশক্তিও সমান পরিমাণে পায় না। দ্বিতীয় উত্তর এই যে মানসিকশক্তির মূলপরিমাণ যতই হউক না কেন, সে শক্তি যতই প্রয়োগ করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্ত রাজা। পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র রাজাদিগের নাট্যশালা; সেইখানেই তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে হয়। নানাপ্রকৃতির লোকের সহিত, নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সমস্যার সহিত, অসংখ্য অভাবনীয় সহসাসম্ভূত বিপদের সহিত তাঁহাদের সংস্রব। এই সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়া, এই সকল গোলমালের মীমাংসা করিয়া, তড়িৎবৎ কার্য্য করিতে হয়। দীর্ঘসূত্রিতা জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনর্থের মূল। এমনস্থলে নিজের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলে না, অপ্রখর বুদ্ধি হইলে চলে না। দীর্ঘসূত্রী হইলে চলে না। পাঠক এখন সহজেই বুঝিবেন যে এইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বেশী প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তি বেশী আয়ত্ত এবং অভ্যাস হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন, তালেরান পামার্ষ্টন, ডিস্‌রেলি, বিস্‌মার্ক—এই সকল রাজা এবং রাজমন্ত্রিগণের অসীম ইচ্ছাশক্তির কথা কে না জানে? কঞ্চুকি পর্ব্বতায়নের মুখে আমরা শুনিয়াছি দুষ্মন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুষ্মন্তের ইচ্ছাশক্তি যদি অসীম বল এ

অনায়াসপ্রযোজ্য না হইবে তবে হইবে কার? প্রথম প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্তের যে আশ্চর্য্য চিত্তসংযমের চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, পাঠক বোধ হয় এখন সেই আশ্চর্য্য চিত্তসংযমের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুষ্মন্তের চিত্তসংযম শক্তি এত প্রবল কেন? না দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধানের ন্যায় জগতের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ হইয়া, প্রখরবুদ্ধির অধিকারী হইয়া পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া। এইটী দুষ্মন্তের মনোগঠনপ্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব—গূঢ় নাটকত্ব।

শকুন্তলা নাটকের পঞ্চমাঙ্কবর্ণিত প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটী দেখিয়াই আমরা দুষ্মন্ত চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে দৃশ্যটী দুষ্মন্তের সামাজিক জীবনপ্রণালীর উদাহরণস্বরূপ। কিন্তু সে দৃশ্যের হেতু দুর্ব্বাশার শাপ। তাই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে দুর্ব্বাশার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

শিক্ষা।
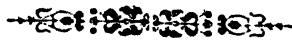
মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যনামক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছিল, যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য সাতাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমাজের ধার করিয়া খায়, তাহার পর এই ধার শোধ দেওয়া মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়। এই অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যদি সমাজের আরো কিছু উপকার করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধার করিয়া যাহা খাইয়াছ, তাহা ত শোধ দিবেই; শোধ দেওয়ার উপর আরো কিছু বাড়তি করা চাই।

যে সাতাইশ বৎসর আমরা ধার করিয়া খাই, সেই আমাদের শিক্ষার সময় ও দেহপুষ্টির সময়। আমরা প্রতিভাশালী লোকের পক্ষে এ কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী বা জিনিয়স বলিয়া এক একজন লোক আছেন আমরা স্বীকার করি। ইঁহাদের শরীর পুষ্ট না হইতে পারে, ইহাদের সকল মনোবৃত্তি সম্যক্ পরিচালিত না হইতে পারে, তথাপি ইঁহারা জগতের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারেন। শরীর অসুস্থ, মেজাজ খিট্‌খিটে, কুক্রিয়াসক্ত, অথচ তাঁহারা পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবে তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী লোকদিগকে আমরা ভক্তি করি ভয়ও করি। তাঁহাদের কার্য্যদ্বারা মনুষ্য-

সমাজের উপকার হয় বলিয়া ভক্তি করি। তাঁহারা নিজে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বড় বড় কাজ করিতে পারেন বলিয়া বিস্মিত হই; কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তে জগতে অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বড় ভয় করি। জিনিয়স দূর হইতে ভাল, কিন্তু নিকটে অতি ভয়ানক, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকের ক্ষতি হয়। অতএব আমরা এ প্রস্তাবে জিনিয়সের নামও করিব না, যাহা মনুষ্যসাধারণের পক্ষে খাটে এইরূপ কথাই কহিব।

সাধারণমনুষ্যের পক্ষে শরীরটি সবল সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহার পর মনোবৃত্তিগুলিরও পুষ্টিসাধন প্রয়োজন। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকারের--বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা। এই তিনেরই সাতাইশ বৎসরের মধ্যে পরিচালনা চাহি। মনুষ্য পৃথিবীতে পড়িয়া আপনার শিক্ষাবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহাতে সকল দিকে চক্ষু রাখিতে পারে, সকল জিনিস বুঝিতে পারে, সকল প্রকার লোকের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে ও সকলপ্রকার কার্য্য করিতে পারে, তাহার শিক্ষা এই সাতাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে হওয়া চাই। শিক্ষা একমুখী হওয়া কিছু নহে, উহা বিশ্বতোমুখী হওয়া চাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বামনাই শিক্ষা পাইত, ক্ষত্রিয়েরা রাজাই ও লড়াই শিক্ষা পাইত, ছুতোর ছুতোরি শিখিত। এক সময়ে ইউরোপেও ঠিক এইরূপ ছিল। এরূপ একমুখীশিক্ষার নিশ্চয় ফল অধীনতা, নির্ব্বুদ্ধিতা। একমুখীশিক্ষায় মানুষ তৈয়ারি হয় না কল তৈয়ারি হয়। যে কোন লোকের চারিদিকে নজর থাকে একমুখগণ সকলেই তাহার অধীন আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সকল দিকে নজর জন্মে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বীকার করি যে, মানুষের পক্ষে সকল বিষয় জানা নিতান্ত অসাধ্য, সকল কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সকল বিষয়ে সুরুচি থাকা ও সকলের সহিত সমবেদনা থাকা একান্ত অসম্ভব। স্বীকার করি, মানুষের জ্ঞান ইচ্ছা ও হৃদয়বৃত্তি সকল চারিদিকে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ লোহময় বেড়া দিয়া মনুষ্যকে বলিতেছে তুমি এই পর্য্যন্ত যাইও ইহার অধিক যাইবার ক্ষমতা তোমার নাই। এ সকল স্বীকার করি, তথাপি যতটুকু মনুষ্যে জানিতে পারে ততটুকু জানা ত প্রয়োজন। ততটুকু জানিতে যে কয়টি মনোবৃত্তি সতেজ ও সবল থাকা প্রয়োজন সে কয়টিকে ত সতেজ ও সবল রাখা চাই। এইটি শিক্ষার কার্য্য এইটি শিক্ষকের ভার, এইটির জন্য সমাজ দায়ী।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকটসম্বন্ধ তাহাতে শরীরের উন্নতির প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত। মনুষ্যের শরীরও কলের মত। অধিক দিন শরীর না

চলিলে ইহাতেও মরিচা ধরে, এবং অধিক বলে অধিক খাটাইলে ইহারও কল বিগড়িয়া যায়, ঠিক সময়ে দম দিলে যেমন ঘড়ী অনেক দিন চলে সেইরূপ নিয়মিত শ্রমেও মনুষ্যশরীর অনেক দিন টিকে। যে কয়েক বৎসর পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, সেই কয়েক বৎসরে যাহাতে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিপুষ্ট হয় তদ্বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ যত্ন থাকে অন্ততঃ সে বিষয়ে ইচ্ছা থাকে। কিন্তু অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অথবা উদ্যোগ অভাবে অনেকে সন্তানের দেহপুষ্টিসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটান। কেহ কেহ কেবল স্নেহ-পরবশ হইয়া তৎপক্ষে অনিষ্ট ঘটান। দৌড়িওনা পড়িয়া যাবে, শ্রম করিও না ক্লান্ত হবে, এ সকল স্নেহবাক্য কতদূর অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে তাহার সমালোচনা এক্ষণে আমরা করিব না। মূলকথা শরীর পুষ্ট করা যে আবশ্যক তাহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। এই পুষ্টি-শব্দে যে শুষ্ক হস্তের বা শুদ্ধ পদের পুষ্টতা নয় সে বিষয়েও বোধ হয় কাহার অমত নাই। যে সকল লক্ষীছাড়া লোক পুত্রের ভরণপোষণ ও পুষ্টিবর্দ্ধনবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মালপসের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা ভিন্ন সকলেই পুত্রের শরীরপুষ্টিবিষয়ে মনোযোগী আছেন।

কিন্তু মানসিক পুষ্টিবিষয়ে এরূপ একমত নাই। কোন জাতি ধর্ম্মশিক্ষাদানই পিতা-মাতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কোন জাতি পুত্র যাহাতে অন্ন করিয়া খাইয়া শীঘ্র পিতাকে অব্যাহতি দিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি যেমন শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি প্রয়োজন মনেরও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি বাঞ্ছনীয়। শরীরের পক্ষে যেমন যাহার সর্ব্বশরীর সবল নহে সে ভাল বেহারা হইতে পারে না, ভাল মুটিয়া হইতে পারে না, ভাল দাঁড়ী হইতে পারে না, ভাল বাঁকী হইতে পারে না, মনের পক্ষেও সেইরূপ; যাহার মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, সে কখন ভাল উকীল হইতে পারে না, ভাল ডাক্তার হইতে পারে না, ভাল কবি হইতে পারে না, খুব উত্তম রূপে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার দেহ খুব পুষ্ট নয় সেকি বাঁকী দাঁড়ী হইতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু তাহার ভাল হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প থাকে। সেইরূপ যাহার মন সম্যক্ পুষ্ট নহে সেকি উকীল, ডাক্তার, কবি হইতে পারে না? অবশ্য পারে, কিন্তু ভাল হইবার সম্ভাবনা অল্প। একজন জোয়ান লোক ভাল বাঁকী হইয়াও যদি দরকার পড়ে সে অতি অল্পদিনের মধ্যে দাঁড়ীর কাজ, বেহারার কাজ বা যোগাড়ের কাজ অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারে। কিন্তু একজন রোগা বাঁকী তাহা কখনই পারে না। তাহার বাঁকী হইবার মত শরীর বনিয়া গিয়াছে; তাহার আর কিছু হইবার যো নাই। আর কিছু হইতে গেলে

যে পদার্থটুকু থাকা চাই সেটুকু তাহার জন্মে নাই। বহির্জ্জগতে যেরূপ অন্তর্জ্জগতেও ঠিক সেইরূপ। যাহার শিক্ষা বিশ্বতোমুখী তাহার কোন একটি বিষয়ে ক্ষমতা অধিক হইলেও সে সকল কাজই মোটামুটি করিতে পারে। সংসার করিতে গেলে সকল কাজই যে মোটামুটি করা চাই বা জানা চাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাবলম্বন উন্নতির মূল। ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। সকল কাজ মোটামুটি করিতে শিখিলে স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তির প্রকৃত উন্নতি করা হয়। আর এক কথা এই, অতি প্রাচীনকালে পণ্ডিত হইলেই লোকে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিত। সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত এক কথা নহে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞশব্দের অর্থ যতদূর বাড়ান যাইতে পারে অধুনাতন ভট্টাচার্য্যেরা বাড়াইয়া উহাকে অভ্রান্তসমপর্য্যায়ক করিয়া তুলিয়াছেন। ঋষিরা বা পণ্ডিতেরা যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রথিত হইতেন ইহার কারণ কি? শুদ্ধ ঋষিরাই বা কেন! আরিষ্টটল প্রভৃতিও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন! ইহার কারণ তাঁহারা যে সমাজে বাস করিতেন সে সমাজে সাধারণলোকের মন অপুষ্ট ছিল আর তাঁহাদের মন সম্যক্ পুষ্ট ছিল অর্থাৎ মোটামুটি অনেক বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল, সুতরাং সামান্য লোকে আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া (তুলনার অমন সামগ্রী আর নাই) উঁহাদের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিকও যখন সমাজের অভাব অল্প থাকে, সমাজের সেই প্রথম অবস্থায় দুই পাঁচজনলোক পুষ্টমনা থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই সামান্য সামান্য সমস্ত অভাব পূরণ হয়, সুতরাং সামান্য অভাব পূরণের জন্য মোটামুটি জ্ঞানে চলিত। এখনও সেইরূপ গৃহস্থের সামান্য সামান্য অভাবের জন্য গৃহপতির নিজের মোটামুটি সব জিনিস জানা চাই।

আর এক কথা। পুষ্টমনা ব্যক্তিগণের মধ্যে একমুখী শিক্ষা আরম্ভ হইলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রথম নানা বিষয়ের শিক্ষা আবশ্যক; তাহার উপর একমুখী শিক্ষা হইলে উপকার হয় নতুবা একমুখী শিক্ষা অনিষ্টকারী। তাঁতির একমুখী শিক্ষা, এই জন্য তাহারা সংসারযাত্রায় এত অপটু যে তাহারা উপহাসের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব আগে মোটামুটি শিক্ষা, তার পর একবিষয় শিক্ষার প্রয়োজন। আগে সব জিনিসের কিছু কিছু, তাহার পর এক বিষয়ের সবটা। এ বিষয়ে আর একটা কথা আছে। মানুষ জন্মিয়া উকীল হয়, উকীল হইয়া কেহ জন্মে না। সুতরাং আগে মানুষের শিক্ষা তাহার পর উকীলের শিক্ষা। মানুষের শিক্ষা অর্থে শরীর ও মনের সম্যক্ পুষ্টি, সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার, ও হাত দিবার শক্তি। তাহার পর কোন একটা জিনিস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা।

মানুষের মনকে যদি একটি পায়রার

ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সর্ব্বতোমুখীশিক্ষায় উহার সকল দ্বার মুক্ত করিয়া রাখে। এই অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চক্ষু-উন্মীলন করিলেই কত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়; কিন্তু যাহার মনের সকল দ্বারগুলি খোলা নাই, যা-হাব মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক্ পুষ্ট নহে, তাহাব পক্ষে সমস্তই অন্ধকার। পরন্তু যাহাব সেই দ্বারগুলি খোলা সে যে দিবানিশি জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পাবে তাহাই নহে,সে উহার ব্যবহারও করিতে পারে। মনে কব খোপগুলি খোলা। একটির নাম ব্যাকরণ, একটির নাম সাহিত্য, একটির নাম অলঙ্কাব, একটির নাম বিজ্ঞান, একটিব নাম হীট, একটির নাম লাইট ইত্যাদি। যখন যে জিনিসটি দেখিল সে তাহাকে তাহার আপন খোপে রাখিয়া দিল সুতরাং দরকার হইলে তাহাকে আর হাতড়াইতে হইল না। সে যেমন অনেক অধিক জিনিস দেখিতে পায়, তেমনি সেগুলিকে পরি-ষ্কার করিয়া সাজাইতে পারে এবং দরকারমত ব্যবহার করিতে পারে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, সর্ব্বতোমুখীশিক্ষা থাকিলে প্রায়ই লোক চিন্তাই করিতে পারে; ভাবিতেই পারে, কাজ করিতে পারে না। তাহারই জন্য আমরা বলিতেছি সর্ব্বতোমুখী ও একমুখী দুইপ্রকার শিক্ষারই প্রয়োজন। জ্ঞান চারিদিক্ হইতে আসিবে এক বা দুইদিক্ দিয়া বাহির হইবে। নচেৎ সে জ্ঞানে জ্ঞানবানের লাভ হইতে পারে সমাজের লাভ নাই। উভয়প্রকার শিক্ষা হইলে মনকে লাটিমের সহিত তুলনা করা যায়। লাটিমের কাষ্ঠময়ভাগ সর্ব্বতোমুখীবিদ্যা ও লৌহময়ভাগ এক-মুখীবিদ্যা। সেই লৌহময়ভাগের উপব লাটিম যেমন ঘোরে আমাদেব মতে উভয়প্রকারে শিক্ষিত লোকও সেইরূপ কাজ কবিতে পাবে।

যদি বিশ্বতোমুখীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একমুখীশিক্ষা থাকে তাহা হইলে যে বিষয়ে শিক্ষা তাহার অনেক উপকার হয়। যদি একজন প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত লোক কোন এক বিষয়ে লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ে লাগিয়া থাকেন সে বিষয়ের অনেক উন্নতি হয়, নহিলে সে বিষয়েব উন্নতির উপায় নাই। শুদ্ধ মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন বিষয়েব উন্নতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু তাই বলিয়া শুদ্ধ একমুখীবিদ্যায় বিষয়েব উন্নতি হয় না। মনে কব একজন দন্তচিকিৎসায় যাবজ্জীবন অতি-বাহিত করিল। সে অনেক দেখিল শুনিল, কিন্তু সে যদি শরীরের অন্য রোগসম্বন্ধে কিছু না শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাল চিকিৎসক হইতে পারিবে না। মনে কর, দন্ত উঠে নাই এমত কোন পঞ্চমবৎসরের বাল-কের চিকিৎসা কবিতে গেলে, বালকের চুলের প্রতি সে কখনই দৃষ্টিপাত করিবে-

না, কেবল দন্তেরই চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। যদি কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে বালকের চুলও উঠে নাই, চিকিৎসক তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিবে না। যে কারণে কেশ উঠে নাই, সেই কারণে যে দন্তও উঠে নাই ইহা তাহার একেবারে অনুভবই হইবে না, কেশের সহিত দন্তের যে এরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সে কোন মতে বুঝিতে পারিবে না। যদি আর একজন বহুদর্শী দন্ত-চিকিৎসকের লিখিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাহার দন্তচিকিৎসাজনিত অভিজ্ঞতা তাহারই জীবনাবধি শেষ হইয়া গেল। লিখিতে জানিতে হইলে সুতরাং অন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শুদ্ধ একমুখীশিক্ষার আর এক দোষ দেখাইব। আমাদের প্রাচীনকালে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, কি স্বতন্ত্র প্রোফেশন ছিল না, ঋষিদিগের হস্তে যতদিন বৈদ্যশাস্ত্র ছিল, ততদিন শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছিল। তাহার পর শুদ্ধ চিকিৎসা বৈদ্যদিগের ব্যবসায় হইল। বৈদ্যেরা পুত্রকে শুদ্ধ বৈদ্যক পড়াইতেন। ক্রমে শিক্ষা সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাজেই এই সময়ে সংগ্রহগ্রন্থ আরম্ভ হইল। অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ গ্রন্থ পড়িয়াই বৈদ্য হইতে লাগিল। বৈদ্যশাস্ত্রের হীনাবস্থারও সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। প্রায়ই সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি দেখিলেনলোকের শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ছাত্রেরা আর শাস্ত্রের সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠিতে পারে না এই জন্য তিনি তাহার সার-সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলেন। লোকের শক্তির হ্রাস শব্দের অর্থ আর কিছুই নহে, সাধারণশিক্ষার সর্ব্বতোমুখীশিক্ষার অভাব। বিদ্যা সংগ্রহগ্রন্থমাত্রে যখন দাঁড়াইল, তখন সে বিদ্যার উন্নতি আর হইল না। সে বিদ্যাবান্ লোক সঙ্কীর্ণমনা হইতে লাগিল। সংগ্রহগ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ হইলেন তাঁহার গ্রন্থের উপর সরুকাটা আরম্ভ হইল, ফাঁকি আরম্ভ হইল। বিষয়ে বিদ্যার গৌরব রহিল না, গ্রন্থে বিদ্যার গৌরব হইল। পাঠ লাগানই বাহাদুরী হইয়া দাঁড়াইল।

অতএব শিক্ষার জন্য ও শরীর পুষ্টির জন্য যে ২৭ বৎসর আছে তাহার মধ্যে এই দুইপ্রকার শিক্ষাই দেওয়া প্রয়োজন, প্রথম সর্ব্বতোমুখীশিক্ষা ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পর ৪।৫ বৎসর একমুখীশিক্ষা। এরূপ শিক্ষিতলোক অনন্তশক্তির আধার হন, তাঁহাদের সংখ্যার যত বৃদ্ধি হয়, সমাজের শক্তির ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বাঙ্গালার জ্বর।*

বাঙ্গালা যে দুর্দ্দশাপন্ন দেশ ইহা স্থির। দেশবৎসল বাঙ্গালিরা এবং দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ এই দুর্দ্দশার কারণ সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বাঙ্গালার চিরপরাধীনতাই এই দুর্দ্দশার কারণ। কেহ বলেন, বাঙ্গালার লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ইহার হেতু। কেহ বলেন, বাঙ্গালিদিগের শারীরিক এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য জন্যই বাঙ্গালা দুর্দ্দশাপন্ন। কেহ বলেন, বাঙ্গালার কদর্য্য জলবায়ুই সকল অনর্থের মূল। ফলে এ দেশে যত অনিষ্ট লোকসমূহকে পীড়িত করে, তাহা গণিয়া সংখ্যা করা ভার। একে বহুপ্রজা—সহজে উৎপন্ন ধনে খাইতে কুলায় না; তাহাতে বিদেশে ধন চলিয়া যাইতেছে, শিল্পোপজীবীদের ব্যবসা মারা যাইতেছে, তাহার উপর সুশাসনে আরও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে। বিদেশী শিক্ষায় লোকের ধর্ম্মলোপ পাইতেছে, অথচ ধর্ম্মজনিত সামাজিক কুসংস্কার সকল লোপ পাইতেছে না, নূতন শিক্ষায় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সকল পরিস্ফুট হইতেছে, কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে না। আইনে হাত পা বাঁধা—মনোবৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তি নাই, পেটে খাইতে কুলায় না তবু টেক্স দিতে হইতেছে। তাহার উপর সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ, সময়ে সময়ে জলপ্লাবন, বাত্যাবিপ্লব, প্রদেশে প্রদেশে সংক্রামক জ্বর। বাঙ্গালি দুঃখী, তাহার উপর রোগগ্রস্ত।

অন্যান্য সকল দুঃখের অপেক্ষা এই রোগদুঃখই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর—আর সকল দুঃখের মূল। রোগের জন্যই শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য; শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যজন্যই চিরপরাধীনতা। তিন কারণেই দারিদ্র্য। আধুনিক দেশবৎসল বাঙ্গালিরা কেহ সামাজিক, কেহ রাজনৈতিক সংস্করণে উৎসাহশীল। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক অনর্থের মূল যে রোগ, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকে কোন কথা কহিতে শুনা যায় না।

ইহার কারণও আছে। রোগ জলবায়ুজনিত। দেশের জলবায়ুপরিবর্ত্তন করিবে কে? বাঙ্গালা নিম্নভূমি; ইহার মাটী ভিজে, অথচ রৌদ্র অতিশয় প্রখর। ভিজে মাটীতে প্রখর রৌদ্র লাগিলে ম্যালেরিয়ানামে বিষময় বাষ্পের সমুদ্ভব হয়। ম্যালেরিয়া হইতেই বাঙ্গালায়

* সরল জ্বরচিকিৎসা। প্রথম ভাগ। গৃহস্থ আর, পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ২৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য ২।০ টাকা।

সর্ব্বভুক্ জ্বর। অতএব বাঙ্গালার মাটী আরও উঁচু করিয়া না তুলিতে পারিলে, সূর্য্যের তেজ অপ্রখর করিতে না পারিলে, বাঙ্গালার জ্বর নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যাসাগর বা কেশব সেন, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাস পাল সকলে মিলিয়া ধরাধরি টানাটানি করিলেও বাঙ্গালার মাটী এক ইঞ্চ উঁচু হইবে না। আর সূর্য্যের তেজ কমান ত্রেতাযুগে যা হইয়াছিল, তা হইয়াছিল, আর বড় হইবার আশা নাই। সুতরাং প্রেট্রিয়টের দল, সেদিকে বড় ঘেঁসেন না।

দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণসকল বিশেষরূপে সমবেত সেখানে জলবায়ুর উৎকর্ষসাধন করা মনুষ্যের নিতান্ত অসাধ্য নহে। মাটী উঁচু করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার জলনিকাসের সুপ্রণালী করা যাইতে পারে। জলনিকাসের সুপ্রণালী হইলেই ভূমির আর্দ্রতা কমিবে। আর্দ্রতা কমিলেই ম্যালেরিয়া কমিবে। স্থানীয় জলবায়ুর উৎকর্ষসাধনের এইরূপ অনেক উপায় আছে। কয়জন দেশবৎসল লোক, সেদিকে যত্ন করিয়া থাকেন। তাহার জন্য কয়টা আসোসিয়েসান, কয়টা সভা হইয়াছে? কয়টা জ্বরো বক্তৃতায় হাততালির ঘটা পড়িয়াছে? কয়খানা জ্বরঘ্ন পাম্‌ফ্লেট ছাঁপা হইয়াছে? এ কথা লইয়া কালেজের ছেলে কয়বার জলপান খাইয়াছে? ঘোড়দৌড়ের চাঁদার কথা অনেক শুনা যায়, এ বিষয়ে কয়টাকা চাঁদা উঠিয়াছে? বরং এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগকে কিছু প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা কখন কখন জোর করিয়া এ সকল কাজ করাইয়া থাকেন। দেশহিতৈষীরা তাহাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া ডানকুনীর জলা সাফ করিলেন, আজ পর্য্যন্ত দেশহিতৈষীর দল সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে গালি দিতেছেন।

একা জ্বরই বাঙ্গালার পরমশত্রু। দুর্ভিক্ষ, বাত্যা, জলপ্লাবন কালেভদ্রে কখন কোন প্রদেশকে পীড়িত করে। কিন্তু জ্বর প্রত্যহ প্রতি গৃহে গৃহে লোকধ্বংস করিতেছে। যাহাকে না মারিতেছে, তাহাকে নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য, অমানুষ, জীবনভারবহনে অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে। এই পরমশত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই?

নিষ্কৃতির জন্য দ্বিবিধ উপায়। প্রথম যাহাতে জ্বর না হয়, অর্থাৎ নিবারণোপায়। দ্বিতীয় জ্বর হইলে যাহাতে আরোগ্যলাভ হয়, অর্থাৎ চিকিৎসা নিবারণের সম্বন্ধে উপায় কিছু বলা গিয়াছে; যাহাতে স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর হয়, তাহা করিতে হয়। এক্ষণে চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বলিব।

নব্য দেশবৎসল বাঙ্গালিরা ইংরেজ

দিগকে যতই গালি দিন না কেন, ইংরেজ হইতে এ দেশের যে কয়টি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। ইংরেজ হইতে পাশ্চাত্য-বিদ্যা এ দেশে আসিয়াছে। ইংরেজ হইতে মুদ্রাযন্ত্র এ দেশে আসিয়াছে। স্বাধীনতা দেশবাৎসল্য প্রভৃতি মোহমন্ত্র ইংরেজ হইতেই আমরা শিখিয়াছি। আর ইংরেজ হইতে কুইনাইন এ দেশে আসিয়াছে। বাঙ্গালায় জ্বরচিকিৎসায় কুইনাইন একমাত্র ঔষধ। বাঙ্গালির পরমশত্রুনিধনে কুইনাইন আমাদের একমাত্র সহায়।

পাঠক বলিবেন কুইনাইন যে জ্বরের ঔষধ ইহা ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে, ইহা বলিবার জন্য এত বড় একটা প্রবন্ধ কেন? প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয়, যে কথাটা বস্তুতঃ আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কুইনাইন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের অনেক কুসংস্কার আছে। অনেকে বলেন কুইনাইন খাইলেই জ্বর আটকাইয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, যে কুইনাইন না খাইলেই শীঘ্রই জ্বর ছাড়িত; এত ভুগিতে হইত না। এ কথা সত্য বটে যে, কুইনাইন না খাইলে এত ভুগিতে হয় না। কেন না রোগ ও রোগী শীঘ্রই একত্রে নিকাষ পায়। আবার অনেকের বিশ্বাস আছে, যে এ দেশে এত কুইনাইন আসিয়াছে বলিয়া এখন এত জ্বর হয়। যখন কুইনাইন ছিল না তখন লোকের এত জ্বর হইত না। তাঁহাদের বিশ্বাসের স্থূলমর্ম্ম এই, যে কুইনাইন খাইলেই জ্বরের ধাত হইয়া যায়। অতএব কুইনাইন খাওয়া ভাল নয়। অনেকে এই সকল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, যথাসময়ে কুইনাইন ব্যবহার করেন না, নিতান্ত বিপন্ন না হইলে কুইনাইনে রাজি হন না। তার পর কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আশু উপকার পাইলেই, কুইনাইন ছাড়িয়া দেন। সুতরাং কুইনাইন তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় না।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, বহুতর লোক বাঙ্গালায় দেখা যায় যে কুইনাইন খায় আর জ্বরে ভোগে। ইহার এক কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করেন যে, বাজারে যে কুইনাইন বিক্রয় হয়, সাধারণ লোক যাহা কিনিয়া খায় সে কুইনাইন ভাল নহে তাহারই দোষ। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে কথা এখন আমরা ছাড়িয়া দিই। প্রধান কারণ চিকিৎসারই দোষ, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় এবং উপযুক্ত প্রণালীতে কুইনাইন সেবন না করিলে, উপযুক্ত ফল কেন ফলিবে?

চিকিৎসার দোষ দুই কারণে হয়। এক, চিকিৎসক সুচিকিৎসা না জানিলে, কাজে কাজেই চিকিৎসার দোষ ঘটিবে। দ্বিতীয় রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য না করিলে চিকিৎসার দোষ হ

উঠে। সর্ব্বত্র সুচিকিৎসক পাওয়া যায় না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। সে সকল স্থান না হইলে তাঁহাদিগের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। দুর্গম পল্লীগ্রামসকলে, যে সকল স্থানে জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেই সকল স্থানে সুশিক্ষিত চিকিৎসক মিলে না। সে সকল স্থানে জ্বরের চিকিৎসা হাতুড়েদিগের হাতে। তাহারা কেবল দুই এক বৎসর কম্পাউণ্ডারি করিয়া কেহ তাহা নাও করিয়া, কেবল জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর অভাবে ডাক্তার হইয়া বসে। তাহাদিগের হইতে, সুচিকিৎসা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় সুচিকিৎসক মিলিলেও গৃহস্থ নিজে কিছু চিকিৎসা না বুঝিলে, চিকিৎসার সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে না। চিকিৎসক কিছু, সর্ব্বক্ষণ সকল রোগীর শিওরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি কেবল উপদেশ দিয়া গিয়া থাকেন, গৃহস্থের মধ্যে কাহারও চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বোধ শোধ না থাকিলে সে উপদেশমত সম্পূর্ণ কার্য্য হয় না। ডাক্তার বলিয়া গেলেন গায়ের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইলে কুইনাইন দিবে, তিনি চলিয়া গেলে গায়ের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইল—কিন্তু গৃহস্থ ভাবিল যে একেবারে গা না জুড়াইলে কুইনাইন দেওয়া হইবে না; জ্বর আটকাইয়া যাইবে। এদিকে রোগীর গা আর না জুড়াইয়া আবার জ্বর আসিল, কুইনাইন খাওয়া হইল না, চিকিৎসাও নিষ্ফল হইল। কোন রোগীর অজীর্ণ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন, তুমি শীতল জলে মিশাইয়া এই ঔষধটি মধ্যে মধ্যে সেবন করিবে। ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রোগী বর্ষাকালের কর্দ্দমময় জলে মিশাইয়া ঔষধসেবন করিতেছে। এবং তাহার পেটের পীড়াও বাড়িয়াছে। আর একরোগী শিরঃপীড়ায় পীড়িত হইলে চিকিৎসক উপদেশ করিয়াছিলেন যে মাথায় জলপটী দিয়া সর্ব্বদা শীতল জলে ভিজাইতে থাকিবে, রোগী মাথায় সাতপুরু মোটা নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে জল থাবড়াইতে লাগিল। সুতরাং মাথার যন্ত্রণা না কমিয়া বাড়িয়া উঠিল।

অতএব বাঙ্গালায় জ্বরের মহৌষধ আমাদের হাতে থাকিতেও দুইটি অভাবের জন্য বাঙ্গালাদেশ জ্বরে ধ্বংস পাইতেছে। প্রথম অভাব অধিকাংশ স্থানের চিকিৎসকেরা জ্বরের চিকিৎসা জানে না। দ্বিতীয় অভাব যেখানে সুচিকিৎসক আছে, সেখানে গৃহস্থেরা চিকিৎসকের উপদেশপালন করিতে জানে না। যিনি এই দুই অভাব দূর করিবেন, যিনি পল্লীগ্রামের হাতুড়েদিগকে জ্বরচিকিৎসা শিখাইবেন আর গৃহস্থদিগকে সেই চিকিৎসার মর্ম্ম বুঝাইতে শিখাইবেন তিনিই বাঙ্গালাদেশধ্বংসকারী জ্বররূপরাক্ষসকে পরাস্ত ও নিহত করিবেন। তাঁহাকে দেশহিতৈষী

মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান দিতে আমরা প্রস্তুত।

এই পুণ্যময় সংগ্রামে আমরা কেবল একজন বাঙ্গালিকে ধৃতাস্ত্র দেখিতে পাই। আমরা বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার জ্বর হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দ্বিবিধ উপায়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা—বিজ্ঞানের নিয়মপালন। দ্বিতীয় সুচিকিৎসা। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি স্বদেশীয়দিগকে শিখাইবার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর হইল শরীরপালন নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা এ দেশে উত্তমরূপে প্রচলিত হইয়া দেশের বিস্তর মঙ্গলসাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় উপায় সুচিকিৎসা। গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে জ্বরের সুচিকিৎসা প্রচলিত করিবার জন্য তিনি সম্প্রতি জ্বরচিকিৎসা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। আমরা যে দুইটি অভাবের কথা বলিয়াছি এই দুইটি অভাবই এই গ্রন্থের দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারিবে। এমন ভরসা কখনই করা যাইতে পারে না, যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশ হইতে জ্বর একেবারেই তিরোহিত হইবে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থখানি কিম্বা এইরূপ কোন গ্রন্থ, বাঙ্গালায় গ্রামে গ্রামে প্রচারিত এবং গৃহে গৃহে অধীত হইলে দেশে যে জ্বরাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমিবে, এখনকার অপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক জ্বরে মরিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

এইরূপ গ্রন্থ বলিতেছি তাহার কারণ এই, যে এই গ্রন্থখানির কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে। এরূপ গুণ না থাকিলে এ শ্রেণীর গ্রন্থেরদ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। প্রথম গুণ এই যে ইহার রচনা অতিশয় সরল—যে ইচ্ছা সে পড়ুক না কেন, বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ইহার ভাষা ধাত্রীশিক্ষার ভাষার ন্যায় সহজ কথাবার্ত্তার ভাষা। কিন্তু ইহা ধাত্রীশিক্ষার ন্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হয় নাই। কেবল ভাষা সরল হইলেই যে রচনা সরল হইল এমন নহে। চিকিৎসাশাস্ত্রান্তর্গত দুরূহ তত্ত্বসকল কঠিন ও কালব্যাপী শিক্ষার আয়ত্ত, সেগুলি অশিক্ষিতকে শিখাইতে গেলে, কেবল সরল ভাষায় লিখিলে হইবে না। বুঝাইবার কৌশলও জানা চাই। যদুবাবু যে সে সকল কৌশলে অসাধারণ পটু ধাত্রীশিক্ষায় তাহার পরিচয় আছে। ধাত্রীশিক্ষা অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে জ্বরচিকিৎসা আরও পরিষ্কার। নিজে চিকিৎসা করিতে করিতে লেখক যাহা দেখিয়াছেন এমন অনেক উদাহরণ দিয়া স্বীয় উপদেশগুলি স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গুণ এই, যে, যে গৃহস্থের যেমন অবস্থা তাহার প্রতি তেমনি ব্যবহার আছে। অনেক সময়ে ডাক্তারেরা দরিদ্রের প্রতি এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; যে তাহা বড়মানুষেরই সাধ্য।

এবং পল্লীগ্রামে যে সকল সামগ্রীর হুকুম করেন, তাহা নগর নহিলে পাওয়া যায় না। সে সকল স্থানে যদুবাবু অনুকল্প গুলি বলিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়ও প্রধান গুণ এই,যে এখনকার প্রচলিত জ্বরচিকিৎসার মধ্যে যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রণালী তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ যখন যদুবাবুর ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের লিখিত, তখন সে কথা আমাদের বলাই বাহুল্য। অন্য চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত যশস্বী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু এরূপ সুদক্ষ,সুবিজ্ঞ এবং কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক অতি বিরল।

চতুর্থ। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। জ্বরপীড়িত ব্যক্তির এমন কোন অবস্থা নাই—জ্বরের এমন কোন উপসর্গ বা উপদ্রব নাই যে এই গ্রন্থে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বা ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প নাই। প্রথম ভাগে সকলগুলি শেষ হয় নাই।

এই প্রবন্ধ লিখনে আমাদিগের তিনটী উদ্দেশ্য। প্রথম বাঙ্গালার জ্বর, বাঙ্গালার প্রধান শত্রু ; সেই শত্রুহস্ত হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশহিতৈষিগণ, চেষ্টিত নহেন। তাঁহারা চেষ্টিত হউন তাঁহাদিগের কাছে এই প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় কিম্বিধ উপায়ে এই শত্রু পরাস্ত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা। তৃতীয় যদুবাবুর এই গ্রন্থ খানি, সে মানসোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত প্রথম শর বলিয়া, সাধারণের নিকট পরিচিত করা।

গ্রন্থখানি কিরূপ প্রাঞ্জল, ও ইহা যে সাধারণের ব্যবহার্য্য, এই পরিচয় আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য,আমরা উহা হইতে দুই পাত উদ্ধৃত করিলাম। যেটুকু উদ্ধৃত করিলাম সেটুকু যিনি পড়িবেন তাঁহারই উপকার হইবে। এইরূপ গ্রন্থের সকল স্থানে।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি। এর আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন দিবে। নৈলে অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে ১০ গ্রেণ, আবার জ্বর আসিবার দুইঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে দুইঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোনও জায়গায় অপ্রতিভ হইবেন না। মনে কর, আজ বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিল সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়িল অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দুইঘণ্টা অন্তর, অর্থাৎ রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টার সময় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪ টার সময় একবার, দুই গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়

অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময় ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময় আর দুই গ্রেণ দিলে। তার পর ৬ টার সময় একেবারে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জ্বর আসিতে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া, সে সময় জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত, জ্বর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্যে বল্‌ছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে, তার দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাত্রি ৮ টার সময়ও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্যান্ত, দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ২ গ্রেণ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টায় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া, বৃহস্পতিবারের ভোর পর্য্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া অল্প মাত্রায় দিনকতক কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আর দিনকতক কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না, যে জ্বর রোজ আসে কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আট্‌কাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একবারে যায় না। ফল কিন্তু না নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোক

দের মধ্যে, কুইনাইনের তত আদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইবার জন্যে, কুইনাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদের মধ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা নষ্ট নয়। এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে! পাড়াগাঁয়ে লোকে ত এই জন্যেই জ্বরে এত মরে। তবেই দেখ, যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দরকার। তবে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর, দুই তিন দিন বেশ বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন করিবার দরকার নাই। বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিয়াছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেণ, আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন খাওয়া চাই।"

উপসংহারে যিনি ধাত্রীশিক্ষা, শরীর পালন, এবং জ্বরচিকিৎসা প্রণয়ন করিয়া সাধারণ লোকের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

মাধবীলতা।

১৩

যে নির্জ্জনমন্দিরে ব্রহ্মচারী বাস করিতেন, চন্দ্রালোকে তাহার গাম্ভীর্য্য বিশেষ বাড়িত। প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির, সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, পিতম পাগলা যখনই রাত্রে দেখিত, তখনই বড় বিমর্ষ হইত। এ জগতে যে সে একা, তাহার যে আর কেহই নাই, এ কথা কেবল এই নির্জ্জন স্থানে আসিলেই তাহার মনে হইত। ইহা অসম্ভব নহে। স্থানমাহাত্ম্য অতি আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। ভয়, ভক্তি, বিলাস, বৈরাগ্য এ সকলই স্থানের গুণে আপনিই মনে উদয় হয়। এই জন্য অনেকে বলে স্থানানুযায়ী মনুষ্যের প্রকৃতি। বাঙ্গালায় পাহাড় পর্ব্বত কিছুই নাই, একখানি কঠিন প্রস্তরও নাই, বাঙ্গালায় যাহা কিছু আছে সকলই কোমল, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত কোমল; অল্প তাপে শুষ্ক হয়, অল্প রসে গলিয়া যায়, অল্প ভরে আহত হয়। আমরাও ঠিক সেইমত কোমল; তাহাই পূর্ব্বে চটি পরিতাম, ধীরে ধীরে পা ফেলিতাম, পাছে মৃত্তিকার অঙ্গে আঘাত করি।

আমরা এক্ষণে বিলাতি জুতা পরিতেছি, দম্ভ করিয়া পা ফেলিতেছি, কিন্তু তা- হাই বলিয়া আমাদের প্রকৃতিপরিবর্ত্তন হয় নাই, আমরা যাহা ছিলাম তাহাই আছি। অনুকরণ-অনুরোধে মৃত্তিকায় জুতার পেরেক ফুটাইতেছি, কিন্তু পরে হয় ত বাঙ্গালার অঙ্গে জুতার দাগ দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিব। জুতায় বা মোজায় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, যদি কখন বাঙ্গালায় পর্ব্বত জন্মে. মৃত্তিকা কঠিন হয়, আমরাও কঠিন হইব; নতুবা যে জাতিই আসিয়া বাঙ্গালায় বাস ক রিবে, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের ন্যায় কোমলস্বভাবই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে কালীয়দহের কূলে বিমর্ষভাবে পিতম একা বসিয়া ছিল। অনেকক্ষণ চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তরকূলে ধূমরাশি মেঘবৎ জমিয়াছে, পিতম তাহাই দেখিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি কি বলিতেছিল, এমত সময় ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে আসিয়া বসিলেন। পিতম তাঁ- হাকে কোন কথায় সম্ভাষণ করিল না, অন্যমনস্কে যাহা দেখিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতম কেমন আছ? পিতম মুখ না ফিরাইয়া বলিল, ভাল আছি। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতম তোমার মনের অবস্থা কেমন? কোন উত্তর না দিয়া পিতম প্রান্তরকূলের ধূম- রাশি অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ করিল।

ভ্রম। কিন্তু লোকের বোধ হয় তোমার আর চিত্তবৈকল্য নাই। তুমি এক্ষণে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ।

এই শেষ কথায় পিতম পাগলা ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া বসিল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্ম- চারী ব্যথিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম কি জন্য তোমার এ ম্লানতা? সংসার আশ্রম যাহার নাই, কাতর হইবার তাহার ত কোন কারণই নাই, মায়াই দুঃখের হেতু।"

পিতম কোন উত্তর করিল না দেখিয়া ব্রহ্মচারী আবার বলিতে লাগিলেন "কি জন্য যে তোমার মনকষ্ট তাহা আমি জানি না কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে তোমার মনকষ্ট অতি গুরুতর। এ কষ্ট নূতন নহে, অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইতেছে—"

পিতমের শরীর চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতম উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্রহ্মচারীকে কোন সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেল। ব্রহ্মচারী বসিয়া একদৃষ্টিতে পিতমের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পিতম দৃষ্টির বাহির হইলে উরু হইতে উরু নামাইয়া আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগি- লেন "চমৎকার লোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ বৃদ্ধ, অথচ যুবার মত ইহার সুখ দুঃখের অনুভব রহিয়াছে, না জানি অল্প বয়সে কতই ছিল।"

এই সময় আবার পিতম ফিরিয়া

আসিল। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল "ক্ষুদ্র পক্ষীর দ্বারা মনুষ্যের কোন অনিষ্ট হয় কি না?"

ব্রহ্ম। কই তাহা আমি ত কিছু শুনি নাই।

পিতম। তবে কেন অনেক দূর হইতে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী রাজবাটীতে আনীত হইতেছে?

ব্রহ্ম। সকলেই ত পাখী ভাল বাসে, রাজা ভাল পাখী দূর হইতে আনাইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

পিতম। রাজা আনাইতেছেন না। রাজকুমারকে উপহার দিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি বহু ব্যয় করিয়া আনাইতেছে, তাহাই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

ব্রহ্ম। এ সন্দেহ তোমার অনর্থক।

পিতম। আচ্ছা, বলুন দেখি, লোকে ঘুঘুকে ভয় করে কেন? বাটীতে ঘুঘুচরা গালি কেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি বিশেষ জানি না।

পিতম। কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারি।

ব্রহ্ম। কি অনুভব কর।

পিতম। কোন কোন পক্ষী সময়ে সময়ে বিষাক্ত হয়। একসময়ে বাঙ্গালায় হয় ত ঘুঘুপক্ষী বিষাক্ত হইয়াছিল; যে বাটীতে ঘুঘু বাস করিত সেই বাড়ীতেই মড়ক হইত, তাহাই হয় ত ঘুঘুর অপবাদ বাঙ্গালায় অদ্যাপি আছে। যে পাখী আসিতেছে, সে পাখী বিষাক্ত নিশ্চয়। আমি কল্য পাখীমারা সাজিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিব। কল্য রাজকুমারের জন্মদিন, আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আপনার হইয়াছে?

ব্রহ্ম। তোমায় কে নিমন্ত্রণ করিল?

পিতম। রাজাবাহাদুর খোদ। অন্যের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করি না, বিশেষতঃ রাজবাটীতে—

ব্রহ্ম। কেন?

পিতম। কুটুম্ববাটীতে অন্যের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য।

ব্রহ্ম। রাজার সহিত তোমার কুটুম্বিতা কিরূপ?

পিতম। ব্রহ্মচারীর সহিত ব্রহ্মদৈত্যের কুটুম্বিতা যেরূপ, রাজার সহিত দরিদ্রের কুটুম্বিতা সেইরূপ। অর্থাৎ ঘটনামূলক।

ব্রহ্ম। পাগলামি আরম্ভ করিলে? কই পাগলামি করিতে গিয়া তুমি ত কখন রূঢ় হও না, আজ রূঢ় কথা বলিতে আরম্ভ করিলে কেন?

পিতম। অপরাধ লবেন না, বড় গায়ের জ্বালা হইয়াছে, তাহাই বলিতেছিলাম যে আপনি যেমন শীঘ্র ব্রহ্মদৈত্য হইবেন এই মূর্খ রাজা সেইরূপ শীঘ্র আমার মত দরিদ্র হইবেন। কল্য তাহার বীজরোপণ হইবে, আপনি একবার রাজবাটীতে যাবেন। রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাবেন, আমি নিমন্ত্রণ করিয়া গেলাম। আপনার দ্বারা রাজার কোন উপকার হবে না জানি, লোকের উপকার করা আপনাদের ধর্ম্ম

বিরুদ্ধ, পরোপকার গৃহীর ধর্ম্ম, আত্ম-উপকার উদাসীনের ধর্ম্ম, তথাপি মন বুঝে না, কি জানি যদি কিছু হয়।

ব্রহ্ম। রাজার কি বিপদ?

পিতম। রাজার অপেক্ষা আমার বিপদ অধিক, কল্য বিস্তর আহার করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিদ্রা যাই।

এই বলিয়া পিতম কালীদহের একটি সোপান অবতরণ করিয়া শয়ন করিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আইস পিতম মন্দিরে শয়ন করিবে চল।

পিত। ঘরের ভিতর শয়ন বড় বিপদ, ইট কাঠে আমার বড় ভয় হয়। আচ্ছা ব্রহ্মচারীঠাকুর, বলুন দেখি মানুষের আকৃতি আর প্রকৃতি কিরূপে সংশোধন হয়, বিশেষতঃ উদরের ভাগটা।

ব্রহ্ম। কিছু আহার করিবে? বোধ হয় আজ কিছু জুটে নাই।

পিতম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু কল্য পোষাইয়া লওয়া যাইবে, আজ আর কিছু নয়। কিন্তু গঠনের দোষ না গেলে—এই বলিয়া পিতম চুপ করিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে পিতম ঘুমাইল, অতএব ধীরে ধীরে উঠিয়া নগরাভিমুখে গেলেন।

১৪

পরদিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পর পিতম রাজবাটীর দিকে চলিল। দূর হইতে নহবৎ শুনিয়া ভাবিল, আমার বিলম্ব হইয়াছে, হয় ত উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে সকল মন্দিরে রক্তপতাকা উড়িতেছে। ছাদের উপর শত শত শ্বেত কপোত বসিতেছে, উড়িতেছে, আবার বসিতেছে, আবার উড়িতেছে; সূর্য্যকিরণে যেন আকাশে হীরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিতম কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, রাজদ্বারে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছে, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে, নহবৎখানার বিশেষ শোভা হইয়াছে, রৌপ্য নাগারার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে। দশ বারটি হস্তী সুসজ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পিতম আসিয়া মহানন্দে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কত কথা কহিতে লাগিল। একটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, ছি! মা! তুমি কেন সিঁথি পরিয়াছ? তোমার যে বয়স গিয়াছে। আর একটির পশ্চাতে গিয়া বলিল, কেন মা, তোমার চন্দ্রহার কই? তৃতীয়কে বলিল, তুমি গলায় যে মালা পরিয়াছ, তাহা কয় নরী গণা যাইতেছে না। সালঙ্কারা যুবতীর ন্যায় মাথা তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, পাঁচনরী কি সাতনরী ভাল করে দেখাও। নতুবা পাড়ার মেয়ের কাছে তোমার মান থাকিবে না।

এই সময় দেওয়ানপুত্র নবকুমার

রাজবাটী প্রবেশ করিতেছিলেন, পিতমের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পিতম! পাড়ার মেয়ের কাছে হাতীর মান কিসে?

পিতম। অলঙ্কারে—নচেৎ আর কিসে? আচ্ছা! বলুন দেখি, ধনীরা হাতীকে স্ত্রীর ন্যায় সাজায় কেন? আর একই জাতীয় অলঙ্কার পরায় কেন? স্ত্রীর কপালে সিঁথি হাতীর মাথায়ও সিঁথি। স্ত্রীর গালে অলকা তিলকা, হাতীর গালেও তাহাই। শিকল, শিকলি, ঘণ্টা আর কিঙ্কিণী এই প্রভেদ। আপনার চক্ষে হস্তিনী আর গৃহিণী কি এক রূপ বোধ হয়?

নবকুমার। বড় নয়, তবে গৃহিণী অন্দরের শোভা, আর হস্তিনী সদরের শোভা। বশতাপন্ন উভয়েই সমান, উভয়েই বন্দিনী।

পিতম। ঠিক বলেছেন, শিকলের রূপান্তর পায়ের মল। তাই ত তাই ত! আমি চিরকাল মনে করিতাম এই অলঙ্কারের অর্থ কি? এখন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু এই মল ক্রমে ক্রমে সরু হবে, তাহার পর ভাঙ্গিয়া যাবে ততদিনে হয় ত অনেক পুরুষ কেটে যাবে। কিন্তু মল ভাঙ্গিলে পুরুষের কপাল]ও ভাঙ্গিবে।

নব। এত দূরদর্শিতা যদি তোমার আছে, তবে লোকে তোমায় পাগল বলে কেন?

পিতম। ভাল, বল দেখি, তুমি এমত চমৎকার সন্তান, তথাপি লোকে তোমায় কুসন্তান, পিতৃশত্রুর ধামাধরা বলে কেন?

নবকুমার আর কোন উত্তর না করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। পিতম আবার ফিরিয়া হস্তীর নিকট গিয়া মহা আহ্লাদে নানা কথা কহিতে লাগিল। এমত সময় একবার চূড়াধন বাবু কর্ম্মান্তরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতীর সঙ্গে কি মিষ্টালাপ হইতেছে?"

পিতম। দেখুন দেখি বিধাতার অবিচার, হস্তীর এই প্রকাণ্ড শরীর, এই শক্তি, কিন্তু দেখুন ইহার চক্ষু কত ক্ষুদ্র। তাহাই বলিতেছিলাম ছি! মা! তোমার বড় ছোট নজর।

চূড়াধন। চক্ষু ছোট হউক, হস্তী পৃথিবীর সকল বস্তুই ত দেখিতে পায়, কিছু ত আটক হয় না। বিশেষতঃ যেরূপ উহারা স্বভাবতঃ সতর্ক তাহাতে বড়চক্ষুর আর বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পিতম। হাজার বুদ্ধিমান্ হউক বা সতর্ক হউক, পশ্চাতের বিপদ কিছুই ত দেখিতে পায় না। তাহাই আমার বড় কষ্ট হয়।

চূড়াধন। তা তোমার এত কষ্ট হয় কেন?

পিতম। পরের বিপদে আমার বড় কষ্ট হয়, নিজের বিপদে বরং সাহস হয়, পাগলের লক্ষণই এই, ইহা বুঝিতে পারেন ত। (শেষ একটী হস্তিনীকে নির্দেশ

করিয়া) এই ভানুমতীর বিপদে আমার যেমন কষ্ট, রাজার বিপদে সেইরূপ কষ্ট, আবার আপনার বিপদেও প্রায় সেই রূপ। কিন্তু এই তিনজনেরই দৃষ্টির দোষ সমান। পশ্চাদ্দৃষ্টি রাজার একেবারে নাই, কেন না তিনি সকলকে বিশ্বাস করেন; আপনারও তাহা নাই, কেন না আপনি নিজের বুদ্ধিকে বিশ্বাস করেন। স্ত্রীকে বিশ্বাস করিলে যেমন বিপদ, নিজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিলেও তাহাই ঘটিতে পারে। উভয়েই প্রলয়ঙ্করী, বিশেষতঃ দুশ্চরিত্রা হইলে। আপনার বুদ্ধি দুশ্চরিত্রা—ইতিপূর্ব্বে দুই একবার ধরা পড়িয়াছে, আজ একেবারে বেরিয়া যাবে।

চূড়াধনবাবু অতি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এমত সময় নবকুমার আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "কে বেরিয়া যাবে হে?"

পিতম। কেন? চূড়াধনবাবুর দুশ্চরিত্রা বুদ্ধি।

চূড়াধন। পাগলের কথায় কান দিলে সকল সময় কাজ চলে না, কেব।

উভয়েই আবার পুরীপ্রবেশ করিলেন। পিতম দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোলাহল শুনিতে লাগিল। পর্ব্বতরন্ধ্র জলকল্লোলের ন্যায় তাহা অতি মধুর বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। পিতম দ্বারে প্রবেশ করিলে, সেই কোলাহল আরও ঘোরতর ও মনোহর হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রাঙ্গণে আর সেরূপ কোলাহল বোধ হইল না। পিতম চমৎকৃত হইয়া পরীক্ষার্থ আবার ফিরিল, দ্বারে শব্দ অধিক, প্রাঙ্গণে শব্দ অল্প, পিতম ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। পিতমের যাতায়াত দেখিয়া দ্বারপালেরা নিষেধ করিল না। পাগলকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। একজন পিতমকে নিকটে ডাকিয়া আপন অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিল। পিতম মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বড় ব্যস্ত; শেষ একমুষ্টি সিদ্ধি বাহির করিয়া সকলকে কিছু কিছু দিয়া চলিয়া গেল। দ্বারপালেরা দেখিল, যে সেরূপ উৎকৃষ্ট সিদ্ধি তাহারা আর কখন চক্ষে দেখে নাই। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া পাগলাবাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল। যে অবধি পিতমের প্রতি রাজার অনুগ্রহ হইয়াছিল, সেই অবধি পিতমের প্রতি রাজভৃত্যদের বড় ভক্তি জন্মিয়াছিল। অনেকে পিতমকে সাধক মনে করিত, সাধক না হইলে রাজার এত যত্ন কেন হইবে। ভক্তিহেতু দ্বারবানেরা পিতমকে "পাগলাবাহাদুর" বলিত, অদ্য আশ্চর্য্য সিদ্ধি পাইয়া সে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। অনেকে ভাবিল, যে কৈলাসপুরীতে যে সিদ্ধির ব্যবহার হয়, সিদ্ধপুরুষ কোনরূপ যোগাড় করিয়া সেই সিদ্ধি আনিয়াছেন।

এক বৃদ্ধ চৌবে বলিল, "তাহা অসম্ভব নহে, যখন ভাল সিদ্ধি মহাদেবের নিমিত্ত আসে, তখন নন্দী তাহার কিছু কিছু সিদ্ধপুরুষদের পাঠাইয়া দেন। বোধ

হয় পাগলাবাহাদুর হালফেল কিছু সংবাদ পাইয়া থাকিবেন। একবার এক বড় আজব ঘটনাক্রমে আমার পিতামহ কিছু পাইয়াছিলেন। তিনি তখন ছোকরা ছিলেন—বয়স জোর বিশবৎসর হইবে, তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, বিরোধ করিয়া বিবেকী হন। প্রথমে হরিদ্বারে কিছুদিন থাকিয়া, পরে কেদারনাথ ডাহিন হাত রাখিয়া একেবারে কৈলাসের নীচে আসিয়া পৌছেন। তখন সূর্য্যদেব হেলিয়া পড়িয়াছিলেন। পিতামহ দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলেন; একদিকে রুদ্রাক্ষবন, তিনি মেঘের কোলে সেই রুদ্রাক্ষবনের বাহার দেখিতেছিলেন, এমত সময় মহামায়া জগৎজননী গণপতিকে গদিতে লইয়া এক আশ্চর্য্য সিংহের উপর আসওয়ার হয়ে বনহইতে বাহির হইলেন। সে সিংহের যে দেমাক্ তাহা আর কি বলিব। তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা গণপতি কতই খুসি, মার গদি হইতে হেলিয়া পড়িয়া সিংহের জটা ধরিয়া টানিবেন চেষ্টা করিতেছেন। সতর্ক সিংহ মাথা নামাইয়া চলিতেছে; মহামায়া বলিতেছেন, "ছি! বৎস, সিংহকে লাগিবে।" গণপতি আরও হেলিয়া পড়িয়া জটা ধরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত হুঙ্কার ছাড়িল, কৈলাসপর্ব্বত অমনি কাঁপিয়া উঠিল; গণপতি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুঁড়িতে লাগিলেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল। গণেশজননী সন্তানের শুঁড় ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এদিকে কার্ত্তিকের মার সঙ্গে সিংহ চড়িতে পায়েন নাই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিলেন; ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল উঠিতে পারিল না, আর একজন গিয়া মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কার্ত্তিকের আরও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব পূরা চক্ষুতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আইস বৎস, আমরা দুইজনে বৃষবাহনে যাই। বৃষ কেমন মণিমাণিক্যে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন অলঙ্কার নাই।" এই বলিয়া ষাঁড়ের শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া রাখিয়া আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোকরা কার্ত্তিকেয় মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্রবেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা মারিলেন, তাহার সকল কিঙ্কিণী ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃষ একটু হেলিল না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল। কার্ত্তিকেয় ষাঁড়ের কপাল হইতে হীরার ধুক্‌ধুকী ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর একে একে বৃষের সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। আমার পিতামহ তাহা কুড়াইতে লাগিলেন। অলঙ্কার ফুরাইলে কার্ত্তিকেয় দৌড়িয়া গিয়া ভৃঙ্গীর সম্মুখে যে সকল সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহাও ফেলিয়া দিলেন, পিতামহ তাহাও কুড়াইয়া লই-

লেন। এই সময় দুইশত চুয়াড় লোক গিয়া পড়িল; আমার পিতামহের সহিত লড়াই করিল। এক এক তরবারের চোটে পিতামহ সকলকে টুটুকরা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, শেষ উপর হইতে মহাদেবের ত্রিশূল আসিয়া মাথায় পড়িল, কাজেই পিতামহ মরিলেন। কার্ত্তিকের ত্রিশূল ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই মরিলেন, নতুবা তাঁহাকে মারা কাহারও সাধ্য ছিল না। চুয়াড়েরা অলঙ্কারগুলি লইল; কিন্তু ত্রিশূল আর সিদ্ধির গাঁটরী আমাদের বাটী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, অদ্যাপি আমাদের বাটীতে ঐ ত্রিশূল আছে নিত্য পূজা হয়। আর রামলীলার সময় ঐ সিদ্ধি আমরা দুটি দুটি খাই। সেই অবধি কেহ আর আমাদের বাটীর নিকট মোচ উচা করিয়া যাইতে পারে-না। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি, যে, আমাদের গোষ্ঠীর কেহ লড়াইয়ে হারেন নাই; কেবল দুই একজনমাত্র লড়াইয়ে মরিয়াছেন। আর সেই সময় ত্রিশূলের যে খোসবু পাইয়াছিলাম, অদ্যাপি ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে।”

এই সময় নবকুমার আর চূড়াধনবাবু, একত্রে যাইতেছিলেন; উভয়েই গল্পের কতকাংশ শুনিয়াছিলেন, নবকুমার মাথা ফিরাইয়া বলিলেন, “চৌবে! ঝুট বাৎ।”

চৌবে রাগান্ধ হইয়া উত্তর করিল, “বাঙ্গালি আর হিন্দুস্থানী বহুৎ ফারাক। কিরূপে আমার কথা ঝুট হইল, আমার কি পিতামহ ছিলেন না? আমি তবে কি আকাশ হইতে পড়িয়াছি?”

জীব। তুমি এইমাত্র বলিলে তোমার পিতামহের বয়স তখন বিশবৎসর হইবে, আবার বলিলে, তুমি সে সময় উপস্থিত ছিলে, ত্রিশূলের তৎকালিক সদ্গন্ধ তোমার স্মরণ আছে তাহা কিরূপে সম্ভব?

চৌবে। পশ্চিমদেশে তাহা সম্ভব। আপনাদের দেশে তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশ বীরের দেশ; সেখানে সকলই সম্ভব।

নবকুমার হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। চৌবে ঠাকুর তাঁহার অনুপস্থিতিতে নানা আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালির চরিত্রসম্বন্ধে নানাপ্রকার গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমাদের দেশে কহে;—

জি চাহে ত কর দুষ্মণকে সাত দোস্তি।
মগর না করো কভু বাঙ্গালা মে বস্তি॥

১৫

রাজবাটীর প্রথমপ্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, দুই একজন এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিকে অধ্যাপকেরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তৎকালে কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বাহুল্য

বড় জন্মে নাই; এই জন্য শাস্ত্রালাপের চীৎকার বড় অধিক শুনা যাইতেছিল না। বিশেষতঃ রাজা তখন সভায় আইসেন নাই।

আর একদিকে শতাধিক ভাট, সেরেস্তাদার পেস্কারের ন্যায়, পাগড়ি মাথায়, বসিয়া আপন আপন প্রাপ্তির কথা কহিতেছিল, মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া একত্র রাজার গুণকীর্ত্তন করিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া আপন আপন ঘরের কথা কহিতেছিল।

রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দার পরিচ্ছদ পরিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছিল, সকলেই নম্র, সকলেই যোড়হস্ত, সকলের মুখেই সম্মানসূচকবাক্য। এক্ষণকার ভৃত্যেরা স্বাধীন হইয়াছে, মাথায় আর তাহাদের পাগড়ি বাঁধিতে হয় না, যোড়হস্তে আর কথা কহিতে হয় না। তখন নাপিত পর্য্যন্ত পাগড়ি বাঁধিত, দাড়ি ধরিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রণাম করিত।

এক্ষণে প্রভুরাও স্বাধীন হইয়াছেন, তাঁহারা আপনইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিতে পারেন। অদ্য ধূতি, কল্য পায়জামা বা পেণ্টুলন; আজ বাঁকা সিঁথি, কাল সোজা সিঁথি; তাহার নিমিত্ত কাহাকেও এক্ষণে কৈফিয়ত দিতে হয় না। আহারও ইচ্ছানুরূপ, লোকের ভয়ে কিছুই বর্জ্জন করিতে হয় না। ব্যবহারেও তাহাই, লোকের ভয়ে কন্যাকে অপাত্রে দিতে হয় না। লোকের ভয়ে দীনদশাপন্ন হইয়া থাকিতে হয় না অথবা প্রথার ভয়ে পৈতৃক মূর্খতা রক্ষা করিতে হয় না।

বাঙ্গালা এক্ষণে আহারে স্বাধীন, ব্যবহারে স্বাধীন, শিক্ষায় স্বাধীন, ব্যবসায় স্বাধীন। বাঙ্গালা এক্ষণে যথার্থ স্বাধীন। এতদূর স্বাধীনতা বিলাতের কোথাও আছে কি না তাহা সন্দেহ। ইংরেজ রাজা বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীকে পরাধীন বলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতাজ্ঞান আর একরূপ।

পিতম ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশ করিল, অতি কুণ্ঠিতভাবে একপ্রান্তে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নতশিরে থাকিয়া মস্তক তুলিল, তখন ঈষৎ হাসি হাসি মুখে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। পিতম কতক নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু পিতমের মলিন বেশ, বিশেষতঃ তাহার ম্লানমুখ রাজভগিনী অনিমিক্লোচনে দেখিতেছিলেন। পিতম তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। অন্তঃপুরবাসিনীরা অনেকে সভা দেখিবার নিমিত্ত চীকের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের দেখিতেছেন, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন কেবল রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতী অনিমিক্লোচনে বৃদ্ধ পিতমের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারে একজন পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি! অমন করে কি দেখিতেছেন?"

জ্যোৎস্নাবতী। স্বপ্ন দেখিতেছি।

পরি। ঘুম কই যে স্বপ্ন দেখিবেন?

জ্যোৎ। আমি নিদ্রিত কি জাগরিত বুঝিতে পারিতেছি না।

পরিচারিকা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ক্ষান্ত হইল; যেদিকে জ্যোৎস্নাবতী চাহিয়া রহিয়াছিলেন, পরিচারিকা তাহা অনুসরণ করিয়া দেখিল, রাজভগিনী পিতম পাগলাকে দেখিতেছেন। কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আরও আশ্চর্য্য হইল। পিতমের রূপ আছে, না বয়স আছে, না অলৌকিক কিছু আছে যে তাহার প্রতি রাজভগিনীর দৃষ্টি পড়ে। জ্যোৎস্নাবতীরও বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধা বলিলেই হয়, তবে এ ব্যবহার কেন? পরিচারিকা আপনা আপনি অনেক ভাবিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঙ্গিনি, তুই এই দুঃখী, এই দরিদ্রকে চিনিস?"

পরিচা। চিনি মা, ও পাগল।

জ্যোৎস্নাবতী। এর উপর আবার পাগল হইয়াছেন?

পরিচা। ও আজন্মপাগল। পথে পথে বেড়ায়, ভিক্ষা করে খায়, রাত্রে গাছতলায় পড়ে থাকে।

জ্যোৎস্নাবতী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুছিয়া চারিদিকে চাহিলেন। কেহ তাঁহার ক্রন্দন শুনে নাই, দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুই জানিস তবে বল দেখি, সকল কথা বল দেখি শুনি।"

পরিচা। আমি আর ত কিছুই জানি না, ওর নাম পিতম পাগলা এই জানি। এইখানে ঘুরে বেড়ায় এই দেখেছি।

জ্যোৎস্নাবতী। এত স্থান থাকিতে এখানে কেন? তাই বা কেন জিজ্ঞাসা করি।

পরিচা। ও কে মা, তবে, ওরে কি চেন, ওর বাড়ী কোথায়?

জ্যোৎস্না। পিতম! পিতম নাম কেন? দাদা কি এ কাঙ্গালকে দেখেছেন, কখন আলাপ করেছেন? তিনিও কি পিতম বলে কথা কন?

এই সময় বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল, রাজা আসিতেছেন বলিয়া সভাসদ্ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতমও উঠিল। রাজা আসিয়া প্রধান প্রধান সকলের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবামাত্র ভাটেরা মনোহর স্বরে স্তবপাঠ করিতে লাগিল, এই অবকাশে রাজা ইতস্তত: অবলোকন করিতে লাগিলেন। পিতমের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু রাজা কোন সম্ভাষণ করিলেন না দেখিয়া জ্যোৎস্নাবতী আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "তবে কি আমার ভ্রান্তি? না তা নয়; হয় ত দাদা চিনিতে পারেন নাই।"

পরিচারিকা বলিল, "ঠাকুরাণি, আপ-

মার দুখানি পায়ে পড়ি, কে শিশুর বলুন না।”

জ্যোৎস্না। ইনি এখানে কতদিন এসেছেন ?

পরি। অনেককাল, আমাদের ত জ্ঞান-ভোর দেখিতেছি, তা আমাদের বয়স ত অধিক নয়, কিন্তু সকলেই বলে পিতম অনেককাল অবধি এখানে আছে।

জ্যোৎ। তুমি কখন এই কাঙ্গালের সঙ্গে কথা করেছ ?

পরি। না মা, আমার ভয় করে। কি জানি পাগল যদি কিছু বলে।

জ্যোৎ। এখানে অনেক দিন আ-ছেন ? অথচ আমি তাহা জানিতে পারি নাই।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, “রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত রাণীঠাকুরাণী আপ-নাকে ডাকিতেছেন।” জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

রাণীমহলে এক বিস্তৃত শয্যায় রাণী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত পুত্রকে লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে আত্মীয় স্বজনেরা বসিয়া রাজকুমারের গুণব্যাখ্যা করিতেছে, সম্মুখে এক স্বর্ণপাত্রে ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি আশীর্ব্বাদের উপকরণ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবতী আসিবামাত্র রাণী বলিলেন, “তুমি আশীর্ব্বাদ না করিলে আর কেহ আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশীর্ব্বাদ করা হইলে বাহিরে ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজা সভায় গিয়াছেন।”

এই সময় চূড়াধন বাবুর স্ত্রী রাজভগি-নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি, আজি-কার দিনে তোমার চোখে জল পড়েছে কেন ?” রাণী একবার জ্যোৎস্নাবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রাজভগিনী অপ্রতিভ হইয়া স্বর্ণথালহস্তে তুলিয়া রাজকুমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকুমার তাঁহার অভিসন্ধি অনুভব করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। জ্যোৎ-স্নাবতী ধান্যদূর্ব্বা হস্তে তুলিবামাত্র শিশু মাথা সরাইয়া লইল। পুটুর মা এক-জনকে চুপি চুপি বলিলেন, বরের গায়ে হরিদ্রা দিতে গেলে বর যেমন করে, রাজকুমার আজ ঠিক তাই করিতেছেন।

জ্যোৎস্নাবতী আশীর্ব্বাদ করিলে একে একে সকলেই ফুল লইয়া আসিলেন, রাজকুমার তাহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ছাড়িল না, সকলেই মাথায় ফুল দিতে লাগিল। মাধবীলতা মার ক্রোড় হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাণীর নিকটে আসিল, একবার স্বর্ণপাত্রের দিকে চাহিল, আবার রাণীর মুখপ্রতি দেখিল। তাহার পর একটী ফুল কুড়াইয়া লইয়া রাজকুমারের নিকট সরিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হস্তখানি তুলিয়া ফুলটি ছাড়িয়া দিল। ফুলটি রাজকুমারের মাথা কি অঙ্গ স্পর্শ করিল না, শয্যায় পড়িয়া গেল। মাধবী আবার সেই ফুলটি

কুড়াইয়া লইয়া ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিল। রাজকুমারের কানপর্য্যন্ত হাতখানি পৌঁছিল। সেবার ফুলটি ফেলিয়া দিয়া মাধবী ক্ষুদ্র অঙ্গুলিদ্বারা রাজকুমারের চুল স্পর্শ করিল। স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া রাণীর মুখপ্রতি চাহিল। রাণী আর একটি ভাল ফুল হাতে দিয়া বলিলেন, "কর, তুমিও আশীর্ব্বাদ কর তোমারই আশীর্ব্বাদ সত্যের।" এই কথায় রাজভগিনী একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, এবার রাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মাধবীলতা ফুলটি তুলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, বামহস্তে দুই একটি তাহার পাপড়ি ছিঁড়িল, তাহার পর রাজকুমারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মাথা স্পর্শ হইল না বলিয়া সেইদিকে সরিয়া গেল। আবার হাত বাড়াইয়া দেখিল আবার সরিয়া গেল। শেষ মাথায় ফুল দেওয়া হইল। মাধবী আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া মার ক্রোড়ে গিয়া উঠিল। মাতা পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

এই সময় চূড়াধনবাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন যে, কই রাজভগিনী এর মধ্যে আবার কোথায় গেলেন। রাণী অমনি তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিক দেখিলেন, তাহার পর পরিচারিকাদিগকে বলিলেন তোমরা কে, রাজকুমারকে রাজসভায় লইয়া যাইবে আইস। একজন তৎক্ষণাৎ আসিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার পর্য্যন্ত চলিল, রাণী কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে আর আর সকলেও ফিরিয়া আসিয়া রাজসভা দেখিবার জন্য রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

রাজকুমার সভায় হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলেই উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা স্বয়ং রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বাহির হইলেন। রাজদ্বারে গিয়া দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার আদেশ করিলেন। মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকের বাদ্যোদ্যম ছাড়াইয়া দরিদ্রের চীৎকার উঠিল।

রাজসভার প্রায় অধিকাংশ লোকেই কাঙ্গালিবিদায় দেখিতে বাহির হইলেন, কেবল দশ বারজন অধ্যাপক একত্রে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে পিতম পাগলা একা বসিয়া থাকিল। পূর্ব্বমত ম্লান ও অন্যমনস্ক। একজন ভাট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এখানে? বাহিরে কাঙ্গালীবিদায় হইতেছে, এখানে বসিয়া কেন ঠকিতেছ। পিতম তাহার প্রতি চাহিল, কোন উত্তর করিল না। ক্ষণকালপরে নবকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি পিতম, বাদ্য অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?"

পিতম। শুনিতে ত পাইতেছেন।

নবকুমার। আচ্ছা, দরিদ্রের চীৎকার অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?

পিতম। পুত্রশোকের।

একজন অধ্যাপক বলিলেন,"শুনিলে, পাগলা কি বলিতেছে। পাগলার যে জ্ঞান আছে আপনাদের তাহা নাই। আপনারা কোন্ বুদ্ধিতে আমাকে ধৈর্য্য হইতে বলিতেছেন। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি। এখন সকল শুনিয়াছি আর কেন সহ্য করিব। এতকালের কষ্ট হইতে আজ মুক্ত হইব।"

এই সময় রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও আসিল। রাজা আসিবামাত্র সেই অধৈর্য্য অধ্যাপক অগ্রসর হইয়া বলিল, "পুত্রকে আমায় সমর্পণ করুন, এ সন্তান আমার।"

রাজা। আপনি কি চান?

অধ্যাপক। আমার পুত্র চাই।

রাজা। তোমার পুত্র কোথা?

অধ্যাপক। সে আপনার ক্রোড়ে। রাজক্রোড়ে আমার সোনার চাঁদ, একবার দিন বুকে করি। বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমায় পাগল ভাবিতেছেন। আমি পাগল হইয়াছিলাম সত্য কথা, কেন হব না? আমার ঘরে ছেলে শুয়ে। প্রাতে সে ছেলে আর কোথাও নাই। পীড়া সিড়া নয়, মাতৃক্রোড় হইতে ছেলে গেল। এতে কে না পাগল হয়! লোকে বলিল, ভৌতিক ব্যাপার; আবার কেহ বলিল, অপহরণের কার্য্য, আমি তখন জানি না যে, রাজার কার্য্য। এখন প্রমাণ পাইয়াছি যে আমাদের মৃতবৎসা রাণী মৃতকন্যা প্রসব করিয়া এ হতভাগার কপাল পোড়াইয়াছেন। তাহা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলাম, এক্ষণে আমার হারাধন সমর্পণ করুন।

"এ কি ব্যাপার" বলিয়া রাজা পুত্রকে বুকের ভিতর করিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন। কেহ কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সকল অধর্ম্ম অপেক্ষা পুত্রহরণ অতি গুরুতর, অতএব সাবধান সাবধান, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট।"

এই সময় দেওয়ান অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়কে পুত্রশোকাকুল দেখিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, কে আপনার এই দুরবস্থায় যন্ত্রণা বাড়াইয়াছে তাহা শুনি। কিরূপ প্রমাণের দ্বারা আপনার এ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে তাহা বলিবেন চলুন।"

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৭ সংখ্যা।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৩। শকুন্তলা,—নাটকের চরিত্র।

আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত অসীম বলের অধিকারী। তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত। কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজেতা। আমরা আরও দেখিয়াছি, যে দুষ্মন্ত আলস্যবিদ্বেষী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। তিনি দিবারাত্রি রাজকার্য্য করিয়া ক্লান্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে তেজোহীন—অসীম শ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নন—তাঁহার অতুল দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভূত বলবাঞ্জক। দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষজাতির গুণ। রমণীরত্ন শকুন্তলা সে রকমের নন। সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদীতীরস্থ পরমরমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তপোবনে শ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন। তিনটিবালিকা দেখিতে প্রায় এক রকম—বয়সে প্রায় একরকম—একত্রে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা শউন্তলে তত্তোবি তাতকণস্স অস্সমরুক্খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল পরিউরণে নিউত্তা।

নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলাফুল একই বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি নরম। এটিও যেমন মধুরতাময়, ওটিও তেমনি মধুরতাময়। এটিও যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রমণীপুষ্প অনেক রকম আছে; কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগর, কোনটি

জবা, কোনটি ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটী কর্ণিকার। এগুলির মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি সাধারণ গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতারজ্জু অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং রজ্জু অপেক্ষা কোমল। নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার প্রাণস্বরূপ। কেন না ইহা যেমন কোমল, তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা এবং তেমনি ফুটফুটে। তাই অনসূয়া বলিতেছেন, যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভালবাসেন। কেন না, শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুলতাগুলিতে জল দিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই শ্রমক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। আর হইলও তাই। দুই তিনটিমাত্র বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই শকুন্তলা যেন একেবারে আলুথালু হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইয়া উঠিলেন।

স্রস্তাংসা বতিমাত্রলোহিততলৌ বাহু ঘটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাম্ভসা জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥

ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল; শ্রমাধিক্য বশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিতশোণিতস্রোত খরতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপদ্মটীকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল; তাঁহার নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়িতে লাগিল, এবং নবযৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্তস্রোতস্বিনীর ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষ পুষ্পগুলি অতি সুকোমলভাবে জড়াইয়া গেল; তাঁহার কেশগুচ্ছ খসিয়া পড়িল; তাঁহার অলকাগুলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সামান্য শ্রমে শকুন্তলা-পুষ্পটী যেন বৃন্তস্খলিত হইয়া পড়িল! যেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটী অঙ্গুলিস্পর্শানুভব করিতে না করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া গেল! এইজন্যই দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি কণ্ব সুকোমল নীলোৎপলপত্রের কোমলতম ধারেরদ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইতেছেন।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

আমরা সকলেই পদ্মের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি। জল সে পাতার প্রাণ—সে পাতা যেন কি রকম জলীয়

শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে। সে পাতা কি কোমল! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন। সে পাতায় নখের আঘাত সহ্য হয় না। নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায়। আবার সেই বড় পাতাটিকে আস্তে আস্তে মৃণাল হইতে ছিঁড়িয়া তোল, পাতাটি অমনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা? যদি কোমলতার ধার থাকে তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে কোমলতার নাম 'নীলোৎপলপত্রের ধার।' শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। এখন সেই কোমলতার সহিত দুষ্মন্তের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে, দুষ্মন্ত যে কঠিন শমীবৃক্ষ এবং কোমল নীলোৎপলপত্রের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং দুষ্মন্তই সেই শমীবৃক্ষ এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বলসম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। কর্ম্মের মূল শারীরিক বল এবং সেই জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের —রমণীর নয়। সামান্য জলসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য?

কিন্তু বলহীনা হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা ভারাক্রান্তা বোধ করেন; আমরা দেখিয়াছি যে একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আলুথালু হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলহৃদয়ে বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কমদূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমনাগমন করা বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ্ডরবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে রবিকিরণ নিতান্তই অসহনীয়। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিতেছেন—

ভগবন্ দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা তত্বরয়াত্র-
ভবতীম্।

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বলা শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ্য করিলেন; করিয়া মধ্যাহ্নকালে দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুষ্মন্তের

বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের শ্রান্তিবিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূরপথগমনের স্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কেবল এই মাত্র বলিলেন—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডু-
পত্রাণাম্॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা! রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বলহীনা হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম কষ্টসহিষ্ণু! তুমিই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এই অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝর জলের পতনশব্দ মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্রজন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমার সাজিবে না (১)।" কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কি না তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদ্‌গ্রস্ত শিশুসন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য

(১) হেমচন্দ্র—অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৩--৫৪ পৃষ্ঠা। স্থানে স্থানে দুই এক পংক্তি ছাড়িয়া দিলাম।

জননী অনেক সময়ে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অগ্নিরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন, জলরাশি ভেদ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরত্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী বীরদর্পে পুরুষোত্তম যাইতেছেন, গয়া-কাশী যাইতেছেন, কামরূপ-বৈদ্যনাথ যাইতেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? আমাদের বোধ হয় ইহার অর্থ এই—পুরুষ, শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী, হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্ম্মক্ষম। পুরুষ সর্ব্বক্ষণই জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেন। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্যমধ্যে পরিগণিত।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা বলহীনা। যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা কার্য্য করিতে সক্ষম, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য্য করিতে অক্ষম। রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই। দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলা সকল কর্ম্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়ম্বদাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনসূয়াকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা মৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বামকরতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশনপ্রতিম মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভো' বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বরে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তনিমগ্না প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দা শকুন্তলা নিস্পন্দভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতে নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্যজগৎ প্রলয়নিমগ্ন; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়সর্ব্বস্ব শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তহৃদয়ে লীন। তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোররবে ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইত, তাহা হইলে দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই

সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্রগম্ভীর স্বরে দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন—

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী য মনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মা মুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

এখনও সংজ্ঞা নাই! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীন! তাঁহার জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিকশক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ে বিলুপ্ত। সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ। প্রেমানলসন্তাপিতা শকুন্তলা যখন প্রথম দুষ্মন্তের কথা বলেন, তখন প্রিয়ম্বদা বলিয়াছিলেন যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে—সুকোমল মাধবীলতা চূতবৃক্ষকেই জড়াইয়া উঠে। দুষ্মন্ত নানাগুণে গুণবান্—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিলেই হয়। শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই। তাঁহাতে দুষ্মন্তের বাহুবল নাই, শস্ত্রনৈপুণ্য নাই, মৃগয়াদক্ষতা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কর্ম্মশীলতা নাই, অপরিমেয় শ্রমশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্য্যদক্ষতা নাই। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা সমান। পুরুষ, চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী, হৃদয়গভীরতায় সমুদ্রবৎ। পুরুষ ভালবাসার সামগ্রীকে রমণীর মত তত আত্মগত করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত আত্মবিস্মৃত হইয়া, তত জগদ্বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে পারে না। পুরুষ-হৃদয়ের গভীরতা কম। সেই জন্য পুরুষ বিরহে অস্থির হইয়া পড়ে। রমণীহৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়। সেই জন্য রমণী বিরহে হৃদয়-সর্ব্বস্ব, হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে জীবনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্পন্দহীনা। কিন্তু অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনান্তর শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির, অনেকটা গাম্ভীর্য্যভ্রষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় প্রগল্‌ভ। শকুন্তলার হৃদয় অনন্তাধার—যতই কেন দুঃখ হউক না সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। দুষ্মন্তের হৃদয় পরিমিতাধার;—ভাবনা একটু বেশী হইলেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে, জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়ের মোহে রমণী বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যান, পুরুষ ভুলিয়া যান না। শকুন্তলা সেই ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভো" শুনিতে পাইলেন না—সেই ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দুষ্মন্ত বিহ্বল-হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াও বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণমাত্র বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্মন্তকে শোক-

বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।' মাতলি উত্তর করিলেন—

'তদপি কথ্যতে কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।'

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোকবিহ্বল দুষ্মন্তের কাছে বাহ্যজগৎ প্রবল হইল। নিমেষমধ্যে দুষ্মন্তের শোকবিহ্বলতা কর্ম্মশীলতায় পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাসাসত্ত্বেও হৃদয়মুগ্ধাই রহিলেন। বিলুপ্ত বাহ্যজগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়মগ্নার নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টাশীলা সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণীচরিত্রের প্রধান ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণীহৃদয়রহস্যের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষ চরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বল। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয়প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাসা এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষহৃদয়ে এত লাগে না কেন? দুষ্মন্ত ত শকুন্তলাকে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুকে শুধু হৃদয়ে রাখিয়াই অনেকপরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুকে চোকে চোকে রাখিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়বস্তু ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Nineteenth Century তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটী রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সতেজে বলিতেছেন—"Heavens! do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No: he is never happy when away from her." সম্ভাষিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুকে সর্ব্বদাই চোকের উপর রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্তু চোকের

অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনাসম্ভূত বস্তুতে প্রকৃত বস্তু বোধে মিশাইয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে রমণী তাঁহার আশ্চর্য্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্য্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে আশ্চর্য্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্যজগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সেরকম আশ্চর্য্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সম্মুখস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্ত্তী দুষ্মন্ত প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষানুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষী এবং সেই জন্য শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান নাই। পর্ণকুটীরে দুষ্মন্তনিমগ্না শকুন্তলা,—এটি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অক্ষয়, অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্ত্তি। এ কবি যাহাদের, তাহারা যথার্থই জগতে স্পর্দ্ধাক্ষম।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্ত্তিটী দেখিলাম সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়, ভীত হইতে হয়। এই আশ্চর্য্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রখরতার ফল। এত ভাবপ্রখরতা (Intensity of feeling) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদিগকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে মুহূর্ত্তকালের জন্য বাহ্যজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহ্যজগতে বাস করিয়াছে সে কখন এত অন্তর্নিমগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে যাহার এত ভাবপ্রখরতা সে যদি শকুন্তলার ন্যায় ভাল হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেক্সপীয়রচিত্রিত মেকবেথপত্নীর ন্যায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন

মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবপ্রথরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরাবদ্ধ রহিয়াছে—কখন গলে নাই, কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে, আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেমনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়, কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিদায় দৃশ্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের ন্যায় কোমল, হৃদয়াপহারী, কবিতাময়, মানবপ্রকৃতিপ্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

গৌতমী। বৎসে! স্বজনবৎ স্নেহপূর্ণ তপোবনদেবতারা তোমায় গমনে অনুমতি করিতেছেন। ইহাদিগকে প্রণাম কর।

শকুন্তলা। (প্রণাম পূর্ব্বক কয়েক পদ গিয়া জনান্তিকে) সখি প্রিয়ম্বদে, আমি যদিও আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তথাপি আশ্রমপরিত্যাগে আমার পা উঠিতেছে না।

প্রিয়ম্বদা। তুমিই যে কেবল তপোবনপরিত্যাগে কাতর হইয়াছ তাহা নহে, তপোবনও তোমার বিরহকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর হইতেছে। মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্র মোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।

কণ্ব। জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই যে দক্ষিণপার্শ্বে আছে।

শকু। বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহু দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আমি আজ অবধি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

ক। আমি তোমার জন্য অগ্রে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম তুমি স্বগুণে সেই আত্মসদৃশ স্বামী পাইয়াছ। আর এই নবমল্লিকা সহকারবৃক্ষের সহিত মিলিয়াছে। এক্ষণে তোমার ও ইহার জন্য আমার দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। এইস্থান দিয়া চল।

শকু। (সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি, আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম।

সখী। আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?

ক। অনসূয়ে কাঁদিও না, তোমরাই ত এখন শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবে।

(সকলেই যাইতেছে)

শকু। এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও। সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।

ক। না, আমরা ইহা ভুলিব না।

শকু। (গতিব্যাঘাত দেখিয়া) কে আমার বস্ত্র আটকাইতেছে? (দেখিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইল)

ক। বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোধক ইঙ্গুদীতৈল-সেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাক ধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

শকু। বৎস! আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তুমি কেন আমার অনুসরণ কর। তোমার জননী তোমায় প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়, তুমি সেই জননীব্যতীত আমার যত্নে এত বড়টি হইয়াছ। এখন আমি আবার চলিলাম। এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন। যাও ফের। (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

ক। বাষ্প তোমার উন্নতপক্ষ্মযুক্ত নেত্রদ্বয়ের দর্শনব্যাপার নিরোধ করিতেছে। এই ভূমিভাগ উন্নতানত। বাষ্পাবরোধ হেতু ইহা সম্যক্ লক্ষিত না হওয়াতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্ শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর। যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।

ক। ভাল, আইস আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই।

(সকলের উপবেশন)

ক। বহুমানাস্পদ দুষ্মন্তের নিকট বলিতে পারা যায় এমন কি কথা বলিয়া দিব। (চিন্তা)

শকু। সখি, দেখ, চক্রবাক নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

অনসূয়া। সখি, এমন কথা বলিও না। এই চক্রবাকীও প্রিয়ব্যতীত দীর্ঘতরা রজনীযাপন করিয়া থাকে। আশা অতি গুরুতর বিরহদুঃখও সহনীয় করিয়া দেয়।

ক। শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার বাক্যক্রমে সেই রাজাকে এইরূপ বলিবে।

শার্ঙ্গ। মহাশয় আজ্ঞা করুন।

ক। আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃৎস্বজনেরা যাহা কোন রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাঁকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা

অধিক হইবে, বধূবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

শার্ঙ্গ। মহাশয়ের কথা গ্রহণ করিলাম।

ক। বৎসে! এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপার বুঝিয়া থাকি।

শার্ঙ্গ। বুদ্ধিমান্ লোকের কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

ক। তুমি এ স্থান হইতে ভর্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এই রূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গৌতমীই বা কি বলেন?

গৌ। বধূর প্রতি এইই উপদেশ। বাছা, এই সকল মনে রাখিও।

ক। বৎসে! তুমি আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। পিতঃ! প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এ স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইবে?

ক। বৎসে! প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ারও বিবাহ দিতে হইবে। তথায় যাওয়া ইহাদের উচিত হয় না। গৌতমী তোমার সহিত যাইবেন।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন তোমার অঙ্কচ্যুত হইয়া কিরূপে চন্দনবৃক্ষচ্ছিন্ন চন্দনশাখার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিব?

ক। বৎসে! তুমি কেন এইরূপ কাতর হইতেছ। তুমি মহাকুলোৎপন্ন পতির স্পৃহণীয় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাসম্ভাবে দুর্ব্বহ গৃহকার্য্যে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে এবং পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যকে প্রসব করে সেইরূপ অচিরাৎ এক পবিত্র পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিতে পারিবে না।

শকু। (পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন)

ক। আমার যাহা সংকল্প তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদিগের সন্নিহিত হইয়া) সখি, তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি, যদি সেই রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে এই তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও।

শকু। আমি তোমাদের এই কথায় ভীত হইলাম।

সখীদ্বয়। ভয় পাইও না, স্নেহ অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, তোমরা সত্বর হও।

শকু। (আশ্রমাভিমুখী হইয়া) পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব?

ক। শুন, তুমি বহুকাল যাবৎ এই সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী হইয়া, পুত্রকে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুত্রন্যস্তপ্রজারক্ষণভার ভর্ত্তার সহিত এই শান্ত আশ্রমে পুনর্ব্বার বাস করিবে।

গৌ। বাছা, গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দাও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।

ক। বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।

শকু। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত, অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক) বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!

(শকুন্তলা সহযাত্রিগণের সহিত নিক্রান্ত হইলেন)

আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিতা আশ্রমটী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। "মৃগদগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।" যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে, সমস্ত বাসস্থানটী বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থই সেই বাসস্থানের প্রাণ! আজ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র আশ্রমটী প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। আশ্রমপ্রাণা শকুন্তলাও যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি যেদিকে চাহিতেছেন, সেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর স্নেহপরিপুষ্ট তরু, লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন—'পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।' পিতা জানিতেন যে তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থই তাঁহার শকুন্তলার প্রাণ এবং তাঁহার শকুন্তলা তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই যে দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমায়

ছাড়িয়া যাইতেছি!' পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটীকে শকুন্তলা বড়ই ভালবাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকাটীকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

হলা রমণীআে কখু কালো ইমস্স পাদবমিহুণস্স বুদিঅয়ো সংবুত্তো জেণ ণব কুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅং পি বদ্ধফলদাএ উঅভোঅ কৃখমো সহআরো॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীরত্ন রমণীরত্নের ন্যায় সখীদ্বয়কে বলিলেন—'সখি! আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম!' সখীদ্বয় আকুলিতপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ন্যায় বিগলিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতাম—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' তার পর সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটীকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—'এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।' আহা! ক্ষুদ্রবালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ্য করিতেছে! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটীর মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সযত্নে ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন সেই পুত্রাধিকপ্রিয় মৃগটী মুখাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে! স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাহার স্নেহে মুগ্ধ, যাহার বিরহে আকুলিতপ্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বহৃদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন—'ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।' তখন সকলে বটবৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলে পর মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তকে যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন। বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—'বৎসে! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা

জানিতেন যে কণ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবেন? উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বৰ্দ্ধিতযন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বিহ্বলহৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি! তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর! তিনহৃদয়ে একহৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল! তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল! হৃদয়ময়ি শকুন্তলে, যেখানে তুমি সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মন্ত্রমুগ্ধ! যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রখররবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষদৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতিপরিনিত যন্ত্রণাকাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব!' কাতরহৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবাত্মা শিহরিয়া উঠে! কথাটি কণ্বের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপসপ্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' ধর্ম্মানুরাগিণী তাপসবালা পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত; অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুঁড়িধানের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে।

আমি যখন তা দেখব, তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!' বিগলিত-হৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগ করিতেছেন; দৃঢ়-মনা পুরুষবর এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণীহৃদয়! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত; জগতের তাপসকুলাচার্য্যও বিজিত! সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ়! এ রহস্য কে বুঝাইবে! তার পর সহচারিগণের সহিত শকুন্তলা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল! হিমালয়প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল! যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়-দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্সপীয়রপ্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা রচনা-কৌশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

শকুন্তলা স্নেহময়ী! কিন্তু সে স্নেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের স্নেহ সে প্রণালীর অনুগামী নয়। কণ্ব আশ্রমের তরুলতা মৃগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনসূয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। মৃতবণিকের উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ স্নেহের পাত্রবিশেষ নাই। এ স্নেহ-প্রকাশের জন্য পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ স্নেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ স্নেহের বিকাশ আছে। আর এ স্নেহ পরেরদ্বারা কার্য্য করিয়াই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতি-প্রতিম শকুন্তলার স্নেহ এ জাতীয় নয়। সে স্নেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে স্নেহের পাত্র কে? সে স্নেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের মৃগ-পক্ষী, সেই আশ্রমের স্ত্রীপুরুষ। সে স্নেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে স্নেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাই ভগিনী, মৃগ মৃগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্র সূর্য্য। তিনি কোন লতাটীকে বন-জ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতা-টীকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের স্নেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে স্নেহ নিরাকার। আর শকু-

ন্তলা যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে কি রকমে স্নেহ করেন? তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের আশ্রমের একটি মৃগী একটি বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। তিনি সেই মৃগশাবকটীর জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধাতে ধান্য খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুলতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। মহর্ষি কণ্ব বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবসাতি জলং যুষ্মা-
স্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা
ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনু-
জ্ঞায়তাম্॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর একরকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে। পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়; রমণীর শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরপথগমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কার্য্যে পুরুষের শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতার প্রকাশ। ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতা। দুইপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর। উত্তমরূপে পানাহার করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অপেক্ষা পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অধিক ক্লেশকর। কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ। যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেখিতে পায় না। রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ব নিভৃতে নিস্তব্ধভাবে জগতের মহৎ কার্য্যসাধনে নিরত নিযুক্ত। কিন্তু খুঁজিয়া পাতিয়া না দেখিলে জগৎ সে বীরত্ব এবং সে মহত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া পাতিয়াই লইতে হয়। রমণীরত্ন যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে! সে রত্ন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিষ্ফল, 'মেকো' হইয়া পড়িবে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে মায়াশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্রীশূন্য, জননীশূন্য না করেন।

একবার একটি মৃগশাবক তাহার জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন,

অনসূএ জহ এসো ইদো দিম্মদিট্ঠী উস্সুও মিত্তপাদও মাদরং অণ্ণেসদি এহি সংজোএম ণং।

এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটীকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, রমণীর

অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ়; বাহ্যবিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। স্নেহময়ী রমণী স্নেহের বস্তু পাইলে স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করেন, স্বয়ং তাহাকে লালন-পালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্তুবিশেষনাস্ত নয়; পুরুষ রমণীর ন্যায় স্নেহের বস্তুকে 'কোলে পিঠে' করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্তুর জন্য নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না, দিবাকে রাত্রি করেন না; স্নেহের বস্তুতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্তুতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract নিহিত; রমণীর স্নেহ concrete নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জগৎনিবদ্ধ; রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণীকে জগদ্ধাত্রী বলে। এই নিমিত্তই রমণী শিশুর ধাত্রী, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale;) এই নিমিত্তই কৃপাময়ী-ভগিনীসম্প্রদায় (sisters of mercy)। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাকারপ্রিয়, জড়ানুরক্ত। সেইজন্য রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিকধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবল। সেইজন্য ১৭৯৩ সালের ফরাসিবিপ্লবে ফরাসীদার্শনিকেরা মাদাম রোলেনের শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্টভাব সকল স্ত্রীজাতির মনে শুধু ভাবরূপে থাকে না; বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত হয়। জগতে 'সেণ্টিমেণ্টাল' রমণী নাই বলিলেই হয়।

কালিদাসের শকুন্তলা সেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ কি ইজাবেলার ন্যায় প্রখরবুদ্ধি নন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী। তিনি পোর্শিয়ার ন্যায় নৈয়ায়িক নন, ইজাবেলার ন্যায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন। আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থাতে সে রকম হইলে ভালও হইত না। আমাদের আরও বোধ হয় যে কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়-প্রধান করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই চারিটী জ্ঞানপ্রধান থাকে বটে। কিন্তু সে দুই চারিটী স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত। জ্ঞানপ্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মিস্ মার্টিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান তবে তিনি যেন সংসারাশ্রম প্রবেশ না করেন।

আর যেখানে রমণী সংসারাশ্রম প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চা করেন, সেখানেও রমণীকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না*।

কিন্তু শকুন্তলার স্ত্রীরত্নোপযোগী বুদ্ধি যাহা আছে তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয়। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিমূলক। শকুন্তলার বুদ্ধি সে রকমের নয়। আশ্রমের নিভৃতপ্রদেশে দুষ্মন্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন তখন তিনি বারম্বার তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আত্মসমর্পণে অক্ষম। জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। যিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—দুষ্মন্ত বিচারশক্তি সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীরত্নের নৈসর্গিক সৎপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক; রমণীর জ্ঞান রমণীহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'লিবর্টি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা একরকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কলিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা যাহা যাহা পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ; রমণীর শরীর কোমল—রমণীর শরীর নাই বলিলেই হয়।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট; রমণীচরিত্র গভীরতা-

* অহিফেনসেবক শ্রীলশ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অহিফেনের নেশায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সে মালা কখন আধখানার বেশী দেখেন নাই।

গুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা কম ; রমণীর অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা অপরিমেয়।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন ; রমণীর আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে জড়জগৎসাপেক্ষ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্ব্বল হইয়াও বলিষ্ঠা, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ। জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।

স্ত্রীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই। একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্প-প্রতিভায় সেক্সপীয়রও তাঁহার সমকক্ষ নন।
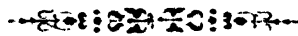
কালেজীশিক্ষা।

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখীশিক্ষা না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখীশিক্ষা নহে তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না। উহা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাও নহে। কারণ উহাতে শারীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয় উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহাও উহাতে নাই। উহাতে আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা তাহাও উচ্চতর বৃত্তিসমূহের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণশক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।

সত্য বটে এক্ষণে সর্ব্বত্র জিম্নাসিয়ম হইয়াছে কিন্তু তাহার উন্নতি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে দৃষ্টি নাই। সত্য বটে স্কুলে কাব্যপাঠ হয় কিন্তু তাহা হৃদয়বৃত্তিসমূহের পরিচালনার জন্য নহে শুদ্ধ ভাষাশিক্ষার জন্য। আর বই পড়িয়া যে হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা সেও বিড়ম্বনা মাত্র। ইচ্ছা বা কর্ম্মক্ষমতার মধ্যে আমাদের পাকে পাশকরা সুতরাং তাহা ভিন্ন অন্যবিষয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা বড় একটা নাই।

যাহা একটু আমরা কালেজে শিখি

তাহাও শিখিবার উপায়ও ভাল নহে। আমরা সব শিখি বই পড়িয়া। বিধাতা যেন আমাদের চক্ষুনামক একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন অপর-ইন্দ্রিয় যেন কোন কাজেই আসে না। যে সকল জিনিস ঘরের দ্বারে আছে তাহাও আমরা কেতাব পড়িয়া শিখিতে যাই। দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা কিছুই শিখি না। যে জিনিস একবার দেখিলে তৎক্ষণাৎ শিখিব এবং জন্মে ভুলিতে পারিব না, সেই জিনিস আমাদের কেতাবে পড়িয়া তিনমাসে বুঝিতে হইবে ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে। শিখিতে আমোদ হয় এমন করিয়া কোন শাস্ত্র বা কোন বিষয়ই শিখান হয় না। তাহার উপর যদি আবার মাষ্টারে যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেও হয়। তাহা না হইয়া মাষ্টারগণ (একে ত ডাওনিসিয়সের বংশ) তাহাতে আবার ইংরেজী পড়িয়া রুক্ষমেজাজ হইয়াছে। সাহেব প্রোফেসরদিগের ত কথাই নাই। অনেকে বলেন তুমি বুঝ আর নাই বুঝ আমার নাম বাহির হইয়া গিয়াছে, আমার মাসিক বেতন বাড়িবে বই কমিবে না।

যদি নিজভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আটদশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটা অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আমরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের এক মাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটী ছষট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজিমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়

ইংরেজি শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিকপরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞানঅর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি এক্জামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক, ঠকাইতে পারিবে না এ জন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে যখন এক্জামিন নাই তখন পড়ি না, এক্জামিনের সময় রাত দিন পড়ি। লাভ এই হয় কতকগুলা গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাতজেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখা পড়ার যে উদ্দেশ্য —মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কালেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুইচারিজনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstractএর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞানঅর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরেজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটীর মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা হয় না; অতএব উহাদ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয়।

কালেজের ছেলেরা প্রায় পিতামাতা স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসায় অথবা হিন্দু-হষ্টেলে বাস করে, সুতরাং সমাজে থাকিলে ও বাড়ীতে থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তি পুষ্ট হয় তাহার কিছুই হয় না, স্নেহ, মমতা, বিশেষ ভক্তি একেবারেই থাকে না। বাড়ী বা সমাজে যে সকল অভিজ্ঞতালাভ হয়, ইহাদের তাহার কিছুই হয় না। অন্য লোকে কিসে মনে ব্যথা পাইবে, তাহা একেবারেই জ্ঞান থাকে না; অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিসমূহের

কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না। শুদ্ধ যদি বাপ মা বা গুরুজনের চোকে, চোকে থাকিত, তাহা হইলেই এ সকল লাভগুলি অবশ্যই হইত। সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্টে এই সকলগুলি শিখিতে হয়। অনেকে হয় ত অনেক জিনিস একেবারেই শিখিতে পারে না। অশিক্ষিতের সহিত সমবেদনা প্রায়ই থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব কালেজীশিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ান একেবারেই হয় না। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হয়। একজন কর্ত্তার খেয়াল হইল, জরীপবিদ্যা পড়ান আরম্ভ হইল, কিন্তু ভূগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভূগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয় এত আর কিছুতেই হয় না। সেই ভূগোল উঠিয়া গেল। আর একজন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন? পাঁচ কর। আর একজন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয় তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে ছয়টা বিষয় শিখা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাক্‌টিকল শিক্ষা চাই, হাতে হাতীয়ারে অনেক কাজ করা চাই। ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ভদ্রসন্তানগণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজী শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভূগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালী করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্ব্বত্র ফিরিত, সকল জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে যেন জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রেন্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া

সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সেকালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্দ্ধিত হয় নাই, সুতরাং প্রাচীনকালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটামুটি বিদ্যা ছিল তখনও ঠিক তেমনি ছিল; আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখা পড়া করিতে গেল অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন "রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হবে।" রাম শুদ্ধ লেখা পড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কালেজ হইতে বাহির হইলেন, একটী গাছবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরী পাইলেন, কি মেলা টাকা রোজকার করিলেন এক রকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ। সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশজন লোক আছে সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোকে জানিল রামটা লেখা পড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী নরলোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।

কালেজী শিক্ষার দোষপ্রদর্শন অনেক করা গেল। কালেজী শিক্ষার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ আছে বলিয়াই আমরা উহার দোষপ্রদর্শনে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আমাদের দেশীয় কালেজী শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে উহাতে স্বাধীনচিন্তাশক্তি উদ্রেকের যেমন সুবিধা এমন আর কিছুতেই নাই। সামাজিক অত্যাচারে, সাংসারিক (পিতৃমাতৃকৃত) অত্যাচারে, শিক্ষকদিগের অত্যাচারে চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না; আমাদের কালেজে এ তিনের একটিও নাই। আমাদের কালেজের ছাত্রগণের কুসংস্কার যত অল্প এত আর বোধ হয় কোথাও নাই। কিন্তু কালেজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তন আমাদের আবশ্যক নাই, উহার শত দোষসত্বেও আমরা উহাকে ভালবাসি ও আমরা এরূপ সুন্দর শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। এবং এইরূপ মনে করি বলিয়াই অদ্য উহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক আমাদের সংস্কার এই যে আর দুই সময়ে দুই জাতির অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল, সেই দুইটির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া তাহাদের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিব। পাঠকগণ দেখিবেন কালেজী শিক্ষার কত উন্নতি হইলে উহা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। কালেজীশিক্ষার যদি দোষসকল অন্তর্হিত হয় তবে ইহাই পৃথিবীর সকল জাতীয়শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা যে দুইটি শিক্ষার কথা বলিতেছিলাম তাহার একটি ভারতবর্ষের আর একটি গ্রীসের। একটি ব্রাহ্মণদিগের আর একটি এথিনীয়দিগের। একটীতে ব্রাহ্মণ তৈয়ারি হইত আর একটিতে সিটিজেন তৈয়ারি হইত। একটির ফল সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতে ব্রাহ্মণজাতির চিরপ্রাধান্য আর একটির ফল গ্রীক্ আর্টস্, গ্রীকসাহিত্য, গ্রীকচিন্তার চিরপ্রভুত্ব। দুই জাতিই জগতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, উভয়ের শিক্ষা হইতেই অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ হয় ১৮ না হয় ২৭ না হয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিতেন। তৎকালপ্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। বেদ বেদান্ত দর্শন সাহিত্য, ব্যাকরণ চিকিৎসা তাঁহারা এ সমস্তই কেতাব হইতে শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, গুরু ও শিষ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এক জন ভাল বাসিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত আর একজন ভক্তি করিয়া শিখিবার জন্য যত্ন করিত। শিক্ষা উত্তম হইত। শিষ্য গৃহস্থালিতে গুরুর সহায়তা করিতেন সুতরাং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে যে শিক্ষা হওয়া অসম্ভব সে শিক্ষা অতি সহজেই হইত। গুরু তাহাদিগকে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় কিরূপে সংসারের কার্য্য করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেন। স্নেহমমতা তাঁহারা গুরুকুলে অনেক শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতই থাকিত। শিষ্যকে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু শিষ্যের গৃহস্থজীবনে যা কিছু আবশ্যক হইত গুরু সমস্ত শিখাইতেন, কেমন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে হয়, যাগ যজ্ঞ করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয় এই ৩৬ বৎসর মধ্যে তাহারা সব শিখিত। তাহারা প্রাক্টিকেল ও থিয়োরেটিকেল দুইরকমই শিখিত। বাহির হইয়া যখন এরূপ একটি শিক্ষিতব্রাহ্মণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি সমাজের মূর্ত্তিমান্ শক্তিস্বরূপ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন তিনিই মনে করিলেন আমার রাজ্য ধন্য হইল। তাঁহাকে সকলে অগ্নির সহিত তুলনা করিত, কারণ অগ্নির যেমন তেজঃ তাঁহারও তেমনি। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ তিনিও তেমনি সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যার আধার, অনন্তশক্তির আধার। আমরা এখানহইতে বেশ দেখিতে পাইতেছি তাঁহার শিক্ষার অনেক দোষ ছিল। তাঁহার শিক্ষা অনেকটা প্রোফেসনাল, তিনি ব্রাহ্মণের যাহা দরকার তাহাই শিখিতেন। মানুষের যাহা দরকার

তাহা ত শিখিতেন না, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার তাঁহার থাকিয়াই যাইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার মধ্যে পুরোহিতের শিক্ষা অনেক থাকিত। পুরোহিতশিক্ষায় কলাশিক্ষা একেবারে হইত না, সুরুচি (টেষ্ট) বলিয়া যে জিনিস তাহার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ নৃত্য গীতাদি শিখিলে পতিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষার এত দোষসত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইত। আগে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা তাহার পর একমুখী শিক্ষা না হইয়া, একমুখী শিক্ষার জন্য যতদূর প্রয়োজন, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ততদূর পাইত।

গ্রীকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্ত্তা নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা তাহাদের সম্পূর্ণরূপ হইত। তাহাদের মত উৎকৃষ্ট রুচি আর কোন জাতির কি আছে? তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্করকার্য্য, তাহাদের রুচিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। শারীরিক শিক্ষা তাহাদের মত আর কাহারও হইত না, তাহাদের মেলায় পারিতোষিক দেওয়া হইত সেই পারিতোষিক পাইত বলিয়া সকলেই ব্যায়াম করিত, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি গ্রীকদিগের যেমন হইত এমন কি আর কখন কোন জাতির হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে শারীরিক দোষবিশিষ্ট অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ অতি অল্প ছিল। সৌন্দর্য্য তাহাদের প্রায় সকলেরই ছিল। বিশ্রীলোক কাণা খোঁড়া কুৎসিত তাহাদের দেশে হইতেই পারিত না। তাহারা সকলপ্রকার শিক্ষার জন্য প্রাইজ দিত; হেরোডোটস্ ইতিহাস লিখিয়া পড়িলেন, পারিতোষিক পাইলেন, যে, যে কোন কাজই করুক না, যদি তাহাতে সাধারণ লোকের সন্তোষ হইল অমনি প্রাইজ। এত উৎসাহে গ্রীকদিগের যে সর্ব্বাঙ্গীণসুন্দর শিক্ষা হইবে আশ্চর্য্য কি! বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা গ্রীসে যত হইয়াছিল, এত আর কোন জাতির হয় নাই; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের যে শুদ্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল এমন নহে, অনেক উন্নতিও গ্রীসে হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষমতা গ্রীকদিগের মত আর কাহার ছিল? দুই পাঁচজন লোকের প্রতিজ্ঞায় যেখানে পারস্যরাজ্যের অক্ষৌহিণী সূর্য্যকরস্পৃষ্ট নীহারবৎ দ্রবীভূত হইয়া গেল, তাহাদের মত কার্য্যক্ষমতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কাহার? বাস্তবিক গ্রীকবিশেষ এথিনীয়দিগের মত সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা আর কোন জাতির কখন হয় নাই। কিন্তু এত উৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহারা বিনাপরিশ্রমে লাভ করিত। শুদ্ধ বিনাপরিশ্রমেই বলি কেন তাহারা আমোদ করিয়া শিখিত। ইশ্চাইনিস সফোক্লিস তাহাদের শিক্ষা দিত। তাহারা শুদ্ধ আমোদের জন্য থিয়েটারে আসিত অথচ কিছু না কিছু শিখিয়া যাইত। আবার নাগরিকদিগকে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে তাহা-

দের প্রাক্টিকাল শিক্ষাও অনেক হইত। নাগরিকগণ বিচার করিতে শিখিত, যুদ্ধ করিতে শিখিত, মন্ত্রিসভায় পরামর্শ দিতে শিখিত অথচ কাজ করিতেছি বলিয়া কাহারও গায়ে লাগিত না।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা ধর্ম্মপ্রধান, গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যপ্রধান। সুতরাং গ্রীকদিগের শিক্ষা ক্রমে ছড়াইয়া সমস্ত নাগরিকগণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতর শিক্ষা গুটাইয়া ক্রমে অল্পসংখ্যকমাত্র লোকে ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইচ্ছা না থাকিলেও আপনি শিখিতে বাধ্য হইত, ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন ও শ্রম করিয়া শিখিত।

আমাদের কালেজী শিক্ষা এ দুইয়ের কোনটীরই মত নহে। কিন্তু দোষ সংশোধন করিয়া লইলে ইহা হইতে গ্রীকদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আমাদের শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার বড় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। গ্রীকদিগের কুসংস্কারাপন্ন নাগরিকগণের দোষে তাহা কখনই হইতে পারিত না। যেখানে সক্রেতিস্‌কে নাস্তিক ও দেবদ্বেষী বলিয়া বধ করিল, তাহাদের চিন্তাশক্তি আধুনিক বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবকদিগের মত উন্নতরূপিণী ছিল কেমন করিয়া বলিতে পারি।

শশ-ধর।

স্থান—গৃহ-চূড়; সময়—গভীর-নিশি।

পার না কি শশ-ধর, ঢালিতে কিরণ—
এই দগধ-পরাণে?
অনন্ত-আকাশ-তল, অনন্ত এ ভূমণ্ডল,
কর নিত্য আলোকিত কিরণ প্রদানে,
পার না কি এক বিন্দু ঢালিতে এ প্রাণে?

২

নিরেট, নির্ম্মম ওই প্রকৃতির বুকে—
কেন এতই আদর?
ও কি আশা করেছিল, কিবা আশা না পূরিল?
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ উহার অন্তর;
ও কি জানে চন্দ্রালোক কত স্নিগ্ধ-কর!

৩

শশ-ধর,
প্রকৃতির শূন্য-বক্ষ শুধুই দেখিলে—
এ অনন্ত-কাল ধরে!
দেখ দেখি একবার, ভগ্ন-বক্ষ অভাগার,
কি আছে লুকান এই প্রাণের ভিতরে,
কত সুধা শুক এই পঞ্জরে পঞ্জরে!

৪

দুখী-মানবের মন এই স্নিগ্ধালোকে—
শশি দেখ একবার;
গগনের কক্ষে কক্ষে, অনন্ত-সাগর-বক্ষে,
হেরিয়াছ কি নক্ষত্র, কি রতন হার—
দেখ দেখি হতাশের হৃদয়-ভাণ্ডার!

৫

কত পৃথ্বী, কত বিশ্ব হয়েছে বিনষ্ট—
এই প্রাণের ভিতরে!
কত তারা কক্ষ-চ্যুত! কত রত্ন ভস্মাবৃত!—
আঁধারে পড়িয়া আছে কন্দরে কন্দরে;
কত নদী—কত সিন্ধু—শুষ্ক কলেবরে!

৬

হেন বক্ষ ছাড়ি তবে কেন শশ-ধর—
শূন্যে ঢালিছ কিরণ?
যাহার বুকের মাঝে, নিরাশার বজ্র বাজে,
কর তার বুক ভরি কৌমুদী ক্ষরণ;
সে বুঝিবে কি মধুর তোমার কিরণ।

৭

কি মধুর বেশে শশি কিরণে তোমার—
আজ সজ্জিত ভুবন!
ঊর্দ্ধে নীল-নভস্তল, নিম্নে পৃথ্বী-বক্ষঃ-স্থল,
ভাসিতেছে শুক্লালোকে স্বপ্নের মতন।
পার না কি ও আলোকে ভাসাতে জীবন?

৮

শূন্য মরুভূমি ওই সু-দূর-প্রান্তর,
তাও—শোভিছে কেমন!—
বালুকায় বালুকায়, চন্দ্র-কর-প্রতিভায়,
কি বর্ণ—কি মূর্ত্তি, মরি করেছে ধারণ!
পার না কি ওই বর্ণে রঞ্জিতে জীবন?

[illegible]

প্রাসাদের মূলে ওই "পদ্ম" সরোবর—
আজ কত মনোহর!
পূর্ণ-বক্ষ জ্যোৎস্না-ময়, নক্ষত্রের সর-প্রায়,
শোভিতেছে শান্ত-ভাবে—সলিল নিথর;
ওই শান্তি, দগ্ধ-চিত্তে কতই সুন্দর!

১০

নিশা-নাথ,
এত শান্তি, এত সুধা, কেন অকারণ—
ঢাল ওই সরোবরে?
শীতল-হৃদয় তার, কেন স্নিগ্ধ কর আর,
নাহিক বিষের জ্বালা উহার অন্তরে,
বৃথা জ্যোৎস্না ঢাল তাহে এমন আদরে।

১১

অহো!
এই পূর্ণিমায় হেন প্রাসাদের চূড়ে—
আজ কত শত নরে,
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার, দেখিতেছে অনিবার,
কত স্মৃতি—কত স্বপ্ন—উন্মত্ত-অন্তরে,
উথলিয়া জীবনের নিরুদ্ধ-সাগরে।

১২

আর আমার মন,
সেই পূর্ণিমায় সেই প্রাসাদ-শিখরে—
আমি কি দেখি এখন!
নেত্রে ঝরে অশ্রু-ধার, বুকে ঢাকা অন্ধকার,
দগ্ধ, আশা—দগ্ধ, স্মৃতি—তাপে দগ্ধ মন;
স্তূপাকার-ভস্ম-রাশি আমার জীবন!

১৩

শশধর,
কত দগ্ধ-হর্ম্ম্য-পথ কর আলোকিত—
তব মধুর-কিরণে;
বিনষ্ট-পম্পের* বক্ষে, দগ্ধ-গৃহে কক্ষে কক্ষে,
ঢালিয়াছ এই শান্তি পীযূষ-ক্ষরণে,
কেন নাহি ঢাল তবে এ দগ্ধ-জীবনে?

* Disinterred remains of the ancient city of Pompeii.

পাতিয়া দিয়াছি বক্ষ কিরণে তোমার—
চিত্তে ঢাল একবার ;
ছড়ায়ে জ্যোছনা-রাশি, কর
আলোকিত—হাসি,
আঁধার, আঁধার-ময় জীবন আমার ;
ভাঙ্গা-ঘরে চাঁদ-আলো দেখি একবার।

১৫

পারিবে না ? বুঝিয়াছি, জ্যোৎস্নায়
এ প্রাণ—
কভু হাসিবে না আর ;
তবে যদি মর্ম্ম-স্থলে, সেই ক্ষীণ-শিখা জ্বলে,
জ্বলে উঠে কোন মতে আলোক তাহার,
ত্রিদিব-পূর্ণিমা হৃদে হইবে সঞ্চার।

১৬

দুরাশা!—যে ক্ষীণালোক হয়ে ক্ষীণ-তর—
ক্রমে হতেছে নির্ব্বাণ,
আজ কোন্ পুণ্য-বলে, সে শিখা উঠিবে জ্বলে,
কে করিবে তৈল-সেক—কার হেন প্রাণ?
যে করিবে—সে যে সেই কঠিন-পাষাণ!

শ্রীঈঃ—

মাধবীলতা।

১৮

সায়ংকাল অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা বহির্ব্বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। দেওয়ানের সমভিব্যাহারে নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতকগুলি ভট্টাচার্য্য আমার কুমারকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন কেন? আমি তাঁহাদের ভাব ঠিক বুঝিতে পারি নাই, ব্যাপারখানা কি? সত্য সত্যই কি তাঁহারা আমার ক্রোড় হইতে আমার সন্তান কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন?"

দেও। একপ্রকার তাহাই বটে, দশরথ নামে একজন ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছেন যে, রাজকুমার তাঁহার সন্তান, তাহাই তিনি মহারাজের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন।

রাজা। বোধ হয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা দিনসেই চক্রে বসিয়াছিলেন। তাহার পর, তাঁহারা কিরূপে ক্ষান্ত হইলেন?

দেও। ক্ষান্ত তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে হন নাই, বোধ হয় তাঁহারা এই দাবি আবার মধ্যে মধ্যে করিতে আসিবেন ; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছি।

রাজা। তবে কি তাঁহাদের সত্য সত্যই এই ধারণা?

দেওয়ান্ এই সময় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণদের সমুদয় কথার পরিচয় দিলেন। রাজা দুই একবার সজোরে নস্য টানিলেন। প্রকাশ্যে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল ; তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,

ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক—শাস্ত্রব্যবসায়ী—এক জন নয়, দুইজন নয়, অনেকগুলি—সকলেই ত পাগল নহে—আমার সঙ্গে তাঁহাদের কাহার ত শক্রতা নাই—তাঁহারা কেন মিথ্যা বলিবেন? অবশ্য তাঁহাদের কথার কোন বিশেষ হেতু থাকিতে পারে—তাঁহারা বলিয়াছেন, "রাণীর দুইজন সখী এ কথা জানে," সখীরা ত আমার লোক, ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মূল কিছু আছে। যাহাই হউক, আমার ভগিনীও এ কথার অবশ্য কিছু জানেন, আমার ভগিনী—রাজভগিনী, কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে, তিনিও আজ মহারাণী—এক্ষণে কাঙ্গালিনী—কিছুতেই দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখ, অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গম্ভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাঁহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না। আজ জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলেছেন, হয় ত মনে কি ব্যথা পাইয়াছেন—রাণী বলেন জ্যোৎস্নাবতী আজ চোখের জল ফেলিয়া অমঙ্গল করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির মন।—

এই বলিয়া রাজা সশব্দে আবার নস্য-গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানমহাশয় বলিলেন:—

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয়ের কোন তদন্ত আবশ্যক হইবে না। আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, কোন রাজশক্র এই কথা রটাইয়াছে। দশরথ ভট্টাচার্য্য কতকটা সাদা লোক, রটনার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া রাজসমক্ষে আসিতে সাহস করিয়াছেন।"

রাজা। তা বটে, কিন্তু কথাটা এই যে রাজভগিনী সাক্ষী, তিনি ত রাজশক্রর দলে নহেন। তাঁহার কথা আমি কখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।

দেও। রাজভগিনী ত সাক্ষী নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজভগিনী এ কথা অবশ্য জানেন এই অনুভব আপনিই করিতেছেন।

রাজা। তা সত্য, তাঁহাকে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কিন্তু পরের সন্তান পিণ্ড দিলে আমার পিতৃপুরুষ গ্রহণ করিবেন না; তবে এমন সন্তান লইয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ করিবার ফল কি?

দেওয়ান। এখনও ত স্থির হয় নাই যে রাজকুমার দশরথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, যদি তাহা মহারাজের প্রতীতি জন্মে, তখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু এই সময় রাজশক্ররা মহারাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে, নানা ব্যাঘাত ঘটাইবে।

রাজা। না, আমি কোন কথাই এখন বলিতেছি না; রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, তাঁহাকেও কোন কথা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিব না; তিনি বোধ হয়, কোনরূপ মনোব্যথা পাইয়াছেন।

জ্যোৎস্নাবতী বাস্তবিক সে দিবস বড় মনের কষ্টে ছিলেন, তাঁহার প্রতি রাণীর মনোভঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলিয়াছেন,বলিয়া রাণীর প্রথম বিরক্তি জন্মে; তাহার পর রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় জ্যোৎস্নাবতীকে খুঁজিয়া আনিতে হইয়াছিল বলিয়া রাণীর চিত্তবিকার আরও অধিক হয়, শেষ রাণী যখন সভাদর্শনে গিয়াছিলেন, সকল স্ত্রীলোকই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেবল জ্যোৎস্নাবতী উঠেন নাই; রাণীকে সম্মান করা দূরে থাক,একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; এই তাচ্ছিল্য রাণীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এমন কি তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া শয়নমন্দিরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

দশরথ দেবশর্ম্মা গোপনে যে দুইজন দাসীর নাম করিয়াছিলেন,তাহারা রাণীর সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত, রাণীর মনের গতি বিশেষ বুঝিত, অতএব রাণীর সঙ্গে সঙ্গে শয়নাগারে আসিয়া ব্যজনহস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্যোৎস্নাবতীর স্বাপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল,রাণীর রাগ বরং তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাজেই দাসীরা ক্রমে ক্রমে সুর ফিরাইল, সাবধানে জ্যোৎস্নাবতীর দুই একটি নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; এমন সময় অপর একজন পরিচারিকা অতি ব্যস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী কোথায়? বিষম বিপদ উপস্থিত; অনেকতক লোক রাজকুমারকে লইয়া পলাইতেছিল।" "রাজা কোথা!" বলিয়া রাণী বাঘিনীবৎ সদর্পে উঠিলেন। পরিচারিকা বলিল, "রাজকুমারকে বুকে করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিতেছেন।" রাণী শিথিলোদ্যম হইয়া আবার পর্য্যঙ্কে বসিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

যে দুইজন দাসী রাণীকে ব্যজন করিতেছিল, একজন বলিল, "আমরা তা আগেই জানি, রাজভগিনীর মহলে রাম না হতে রামায়ণ হয়ে গিয়াছে। আজ ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিবে পরামর্শ হয়েছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম।"

রাণী। কি শুনেছিলি?

প্রথম দাসী। আমাদের সে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয় দাসী। আমাদের বলা ভালও হয় না, আমরা যেমন লোক সেইরূপ থাকাই ভাল, আমাদের কথায় রাজঘরে মনান্তর হইলে আমাদের সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান হবে না।

রাণী। আমি সকল কথা শুনিতে চাই, আমার লোক হয়ে, আমার বিরুদ্ধের কথা যে গোপন করিবে, আমার বাটীতে তার স্থান হবে না।

প্রথম দাসী। আমাদের উভয় সঙ্কট, তা আর তয় করিলে কি হবে, রাগ করিবেন না; একদিন আমরা দুইজনে রাজভগিনীর মহলে গিয়া শুনিয়াছিলাম

যে এতদিনের পর রাজবংশে পিণ্ডলোপ হলো। যে ছেলে আমরা লালনপালন করিতেছি, সে ছেলে নাকি কোন্ বামুনদের। প্রসবের সময় যখন আপনি মূর্চ্ছা যান, তখন নাকি রাজভগিনী মরা মেয়ে ভূমিষ্ঠা দেখে, কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মহলে চলে যান, তাহার পর আমরা না কি কোন ধাইকে দিয়ে সেই মরা মেয়ে কোন্ বামুনদের আঁতুড়ে রেখে, তাদের নাকি ছেলে আপনার আঁতুড়ে এনে দিই। আবার নাকি টাকার লোভে আমরা এ কাজ করেছিলাম; চোখখাগিরা বলে কি, রাজপুত্র হলে বড় ঘটা হবে, অনেক দান ধ্যান হবে, তাই নাকি আমরা দুজনে পরামর্শ করে ছেলে বদল করেছিলাম।

রাণী। তোরা রাজভগিনীর মুখে এ কথা শুনেছিলি?

প্র, দা। না, তাঁর মুখে কেন? আমাদের কি এত সাহস হয় যে আমরা সে কথা বলিতে পারি। আর পাঁচজনে এ কথা বলিতেছিল, তবে তিনি সেখানে বসে ছিলেন। তা তাঁর বলা কাজেই হল বই কি, তিনি ত বলিলেন না যে একথা মিথ্যা।

রাণী তৎক্ষণাৎ সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন। মাথা বাঁকাইয়া প্রথম দাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দুর্দ্দম রাগহেতু কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একজন যাও, জ্যোৎস্নাবতীকে বল গিয়া, যে যত দিন তিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তত দিন তাঁর এ বাটীতে থাকা ভাল দেখাইয়াছিল।"

প্রথম দাসী চলিয়া গেল। কয়েক পদ গেলে আবার রাণী তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের মহলে লইয়া গিয়া এই কথা বলিবে। আমার মহলে এ কথা বলিবে না।"

দাসী বিনীতভাবে জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার মহলে লইয়া গেল। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া দুই একবার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিল, "রাণীঠাকুরাণীর কি হয়েছে, সকলকেই কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন দিন যায় না যে অনর্থক দুই একবার আমরা তিরস্কার না খাই—"

জ্যোৎ। তাই বলে তোমরা কিছু মনে কর না, তিনি স্বাভাবিকই একটু রাগী, রাগটা পীড়ার মধ্যে, রাগ যার আছে তার উপর দয়া হয়। যদি স্ত্রীলোকে রাগ করে কথা কয়, তাহা হইলে বড় কুৎসিত দেখায়, স্ত্রীলোকের রাগ শুনিলে আমার বড় লজ্জা হয়। গল্প আছে যে, সত্যভামা একবার রাগ করে একজনকে গালি দিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ একখানি দর্পণ লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, সত্যভামা আপনার রাগভরা মুখ দেখে বড় লজ্জিত হলেন, আর সেই অবধি কখন তিনি

রাগ করে কথা কহেন নাই। রাগ হলে চুপ্ করে থাকিতেন।

দাসী। তা যাহাই হউক, আমাদের উপর রাগ করে যাহাই বলুন, আমরা সকলই সহ্য করি, কিন্তু এখন যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

"কেন, আবার কার উপর রাগ করে কি বলেছেন?" এই কথাটি জ্যোৎস্নাবতী কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

দাসী। তা আপনি ত বুঝেছেন।

জ্যোৎ। তা হোক্, রাণী আমার উপর জন্ম জন্ম রাগ করুন।

দাসী। তিনি রাগ করে বলিলেন যে—

জ্যোৎ। যাহাই বলুন, সে কথা আমায় আর শুনাইবার আবশ্যক কি?

দাসী। আবশ্যক আছে বই কি, তিনি যে সে কথা শুনাইবার জন্য আমায় পাঠালেন।

জ্যোৎ। তুমি বল গে "বলে এসেছি, তাহা শুনে অনাথিনী জ্যোৎস্নাবতী অনেক কেঁদেছেন," তাহা হইলেই ত রাণীর তৃপ্তি হবে?

দাসী। না, তিনি বলেছেন আপনাকে এখান হতে চলে যেতে, না গেলে তাঁহার তৃপ্তি হবে না।

দাসী এই বলিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি আর ফিরিয়া চাইতে পারিল না।

১৯

সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী ছাদের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, নিকটে তাঁহার পরিচারিকা মাতঙ্গিনী বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "রাত্রি অধিক হয়েছে ঘরের ভিতর চলুন।" জ্যোৎস্নাবতী বাক্যদ্বারা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বা অঞ্চলে মুখ মুছিয়া উত্তর দিতেছেন। যখনই মাতঙ্গিনী কথা কহিতেছে, তখনই জ্যোৎস্নাবতী এইরূপ করিতেছেন; মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্থিরভাবে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে জল আসিল। পূর্ণিমার রাত্রি মেঘাবৃত হইলে ম্লানজ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন কখন কখন প্রাণ কাঁদে, জ্যোৎস্নাবতীর ম্লানমুখে চক্ষের জল দেখিয়া সেইরূপ মাতঙ্গিনী কাঁদিল। মাতঙ্গিনী হয় ত ভাবিল, জ্যোৎস্নাবতীর মনোবেদনা বাড়িল। মাতঙ্গিনী অল্পবয়স্কা; বুঝিল না, যে যখন বিষম ঝড় বহিতে থাকে তখন এক ফোঁটাও জল পড়ে না—ঝড় থামিলেই জল হয়। জ্যোৎস্নাবতীর হৃদয়ে যতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, ততক্ষণ চক্ষে জল আইসে নাই; ঝড় মন্দীভূত হইল, আর চক্ষে জল আসিল।

মাতঙ্গিনীর ঘন ঘন নিশ্বাস শুনিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহার মুখপ্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, শেষ উঠিয়া তাহার চক্ষের

জল মুছিয়া দিলেন। জ্যোৎস্নাবতী স্নেহময়ী—সকলকেই ভালবাসিতেন, সকলকেই স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ আবার দুঃখীদিগকে; যে নিজে দুঃখী, সেই কেবল অন্যের দুঃখ বুঝিতে পারে। মাতঙ্গিনী পিতৃমাতৃহীনা, আশ্রয়হীনা, বিধবা,বিশেষতঃ সে মাতৃসম্বোধন করিত বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মাতঙ্গিনীর চক্ষের জল মুছিয়া জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই কাঁদিস্ কেন ?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "এখন আপনি তবে কোথায় যাবেন?"

জ্যোৎস্না। আমার আর এ জগতে স্থান কোথা ?

মাত। কেন—আপনার শ্বশুরবাড়ী? শুনিয়াছিলাম আপনার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আপনি কেন সেইখানে যান্ না। আপনার সঙ্গে ত সম্বন্ধ ঘুচে নাই।

জ্যোৎস্না। ঘুচে গেছে বৈ কি, আর এখন কি সম্বন্ধ! শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিতে বড় কষ্ট হয়।

এই বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিব না কেনই বা বলি। দিবানিশি যে সেই কথাই আমার জপ, সেই কথাই লয়ে আমার সুখ, সেই কথাই লয়ে আমার দুঃখ। আজ আবার যে আদ্যন্ত সে সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

মাত। আপনার শ্বশুরবাড়ীর কি কথা মা ? আমি কোন কথা কখন শুনি নাই।

জ্যোৎ। হল্‌দির জাঙ্গাল দেখেছ ?

মাত। দেখেছি—সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। তার ধারের গাছগুলি কত বড় হয়েছে ?

মাত। সে সব খুব বড় হয়েছে। বটগাছ থেকে ঝুরি নেমে অনেকদূর অবধি অন্ধকার হয়ে আছে।

জ্যোৎ। সে জাঙ্গাল দিয়ে লোকজন চলে ?

মাত। বড় নয়—কখন কেহ যায়। কেহ যায় না বলিয়া তাহার মাঝখানে বড় জঙ্গল হয়েছে।

জ্যোৎ। তবে ঠিক আমার অদৃষ্টের মত হয়েছে।

মাত। কেন মা ?

জ্যোৎ। সেই জাঙ্গাল আমার বিয়ের সময় হয়। সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার শ্বশুর বিয়ে দিতে এসেছিলেন।

মাত। বিয়ের পর আপনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন ?

জ্যোৎ। তা ত যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ষোল বৎসর থাকি; তার পর

চিরদুঃখিনী হয়ে এখানে আবার ফিরে আসি।

জ্যোৎস্নাবতী এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন।

মাত। তা—এতদিনের মধ্যে এঁরা আপনাকে আর আনেন নাই কেন?

জ্যোৎ। এ সকল রাজকায়দা। আমার তেমন বিপদের সময় বড় ইচ্ছা হয়েছিল, একবার এখানে এসে কাঁদি। আমি তখন সতের বৎসরের। বিপদের কি জানি। সংসারের কি জানি, কপালের কথাই বা কি জানি।

মাত। কেন মা, কি হয়েছিল।

জ্যোৎ। কি হয়েছিল তার কোন্ খানটা বলিব, যখন তাঁর বয়স ২২ বৎসর তখন সেই সর্ব্বনাশ হয়, তার পূর্ব্বে আমি কত সুখে ছিলাম; ভাবিতাম পৃথিবীর সুখই বুঝি এইরূপ, এ সুখ থাকে কি যায়, সকলের কপালে ঘটে কি না ঘটে, তাহা একবারও মনে ভাবিতাম না, আপনার সুখে আপনি ডুবে থাকিতাম, তাঁর যত্নে অন্ধ হয়ে থাকিতাম। এজগতে কাহারও যে কষ্ট আছে তাহা একেবারে জানিতাম না, তাঁরে আদর করিতাম তাতে সুখ, আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতাম তাতেও সুখ। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কি তাঁর দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল আমায় লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি শিখিতে কত আপত্তি করিতাম, পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলিতাম, যে "আমাদের লেখা পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে অদৃষ্ট মন্দ হয়।" তিনি তাহা কিছুই শুনিতেন না, আমার সকল কথা হাসিয়া কাটাইতেন, বলিতেন, "স্ত্রী রামায়ণ পড়িলে যদি স্বামী মরে, ত এমন স্বামী মরাই ভাল।" এ কথায় বড় ব্যথা পাইতাম। চোখের জল মুছিয়া পড়িতে বসিতাম। তিনি আমাকে পড়াইয়া পাখী পড়াইতে যাইতেন; হাসিয়া বলিতেন, "এটিও তোমার মতন—খাঁচায় থাকে, জানে না যে কেন এ খাঁচা, কেন আপনার এতরূপ, কেন এত মিষ্টস্বর, কেন বা ঐ সূর্য্য, কেন বা ঐ চন্দ্র, কেন বা এ পৃথিবী, কেন বা এ জগৎ।" আমি হাসিয়া বলিতাম, "বল, এ দুটীর মধ্যে কারে ভালবাস।" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া পলাইতেন, তাঁর হাসি কি আর ভুলিতে পারিব? পাখীটিও তাঁর হাসি বুঝিত, তাঁর হাসি শুনিলে সুখে সে কত কথাই কহিত, আমি ভাবিতাম যে আমা অপেক্ষা বুঝি পাখী তাঁরে বেশী আদর করিল। আমার মধ্যে মধ্যে হিংসা হইত, আমি তখন আর কার হিংসা করিব? তিনি চলিয়া গেলে তাঁর হাসি কি কথা না শুনিতে পাইলে পাখীটি নীরবে থাকিত, আমি রাগ করে তার খাঁচা ধরে কত গালি দিতাম, পাখী একবার এ কাণ একবার ও কাণ ফিরাইয়া আমার গালি শুনিত, কোন উত্তর দিত না, একবার একবার লাফাইয়া আমার আঙ্গুল ঠোকরাইত, আমি আবার গালি

দিতাম; তিনি ঘরে আসিলে তাঁর সাক্ষাতেও গালি দিতাম, বলিতাম, "ও আমার সতীন।" তিনি হাসিয়া উঠিতেন, পোড়া পাখী সে হাসি শুনিবামাত্র আবার আপনার সুর ধরিত। কত কথা কহিত, তিনিও যেন তার সকল কথা বুঝিতেন, সেই মত তাহার সঙ্গে আমোদ করিতেন। আমি রাগ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন বুঝিতাম না যে তাঁরে পাখীটি পর্য্যন্ত সকলে ভালবাসে। উঠানে বাহির হইলে তাঁহাকে পায়রায় আসিয়া ঘেরিত, যে তাঁর শরীরে বসিতে না পাইত, সে তাঁরে বেড়িয়া উড়িত, তিনি মুখ তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, ঊর্দ্ধমুখখানি কত সুন্দর দেখাত।

রাজবাটীতে যত হাতী ছিল, সকলে তাঁরে চিনিত, ভালবাসিত। তাঁর স্নানের সময় পুষ্করিণীতে সকলগুলি আসিত; তাঁরে লইয়া জলে কতই খেলা করিত। শুঁড়ে বসাইয়া কেহ তাঁরে জলে নামাইত, আর সকলে সেই সময় শুঁড় দিয়া তাঁর গায়ে জল ছিটাইত। এক একদিন পুষ্করিণীর ধারে যখন জলচৌকিতে বসিয়া তিনি তৈল মাখিতেন সেই সময় কোন হাতী হয় ত জল হইতে ধীরে ধীরে শুঁড়ের আগা বাড়াইয়া তাঁর শরীর স্পর্শ করিত, তাঁর অঙ্গস্পর্শ না করিলে যেন সে আর থাকিতে পারে না। জলে নামিতে দেরি হতেছে বলে কোন দুরন্ত হাতী হয় ত জল-চৌকি ধরিয়া টানিত, তিনি হাসিয়া গালি দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন; জলের ভিতর লুকাইতেন, আর সকল হাতীরা তাঁরে খুঁজিয়া বেড়াইত, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জানেলায় বসিয়া থাকিতাম, তার পর তিনি একদিকে ভাসিয়া উঠিলে সকল হাতী সেই দিকে গিয়া পড়িত। শেষ তিনি সকল হাতীর শুঁড়ে এক একবার করিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের তৃপ্তি হইত। তাহার পর স্নান হইলে একটা হাতী শুঁড় দিয়া ছাতি ধরে বরাবর তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত দিয়া যাইত।

স্নানের পর পূজা করিতে বসিতেন। তখন তাঁর কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি হইত, মুখ দেখে বোধ হইত, যেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর কোন সংস্পর্শ নাই। যখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন, সম্মুখের দেবতারা তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত, দেবতারা তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন। তা হবে, আশ্চর্য্য কি! তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে দেবতাদের ইচ্ছা হতে পারে, মানুষের মধ্যে তাঁর মত পবিত্র আর কে ছিল? মার নিকট বসে আহার করিতেন, কোন কোন দিন আহারের পর মার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি শিশুর মত কোমল হইত যেন আদর-ভরা।

তার পর বিষয়কার্য্য দেখিতে যাইতেন, যে পর্য্যন্ত তিনি কাছারিবাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত দেওয়ানের ভয় হইয়াছিল।

তাঁকে সকলেই ভালবাসিত, কেবল দেওয়ান্ বিষ দেখিত; সেই দেওয়ানই আমার কাল হয়েছিল; কিন্তু তিনি থাকিতে দেওয়ান্ কিছু করিতে পারে নাই।

তাঁর সকলই গুণ ছিল, কেবল এক দোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁর নিন্দা করিত; তিনি চেষ্টা করে বিপদ আনিতেন। বিপদ্ না ঘটে এই সকলের চেষ্টা, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল কিসে বিপদ হবে। আমি তাঁরে কত বলিতাম, তিনি কিছুই শুনিতেন না, হাসিয়া বলিতেন, "অনেকে মধ্যে মধ্যে পা না টেপাইলে কষ্ট পায়, আমারও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিপদে না পড়িলে বড় কষ্ট হয়।" আমি অবাক্ হয়ে শুনিতাম। একবার কোন্ দেশে কাছারী দেখিতে গিয়াছিলেন, বাটী আসিতে পথে শুনিলেন যে, দূরে এক পুষ্করিণীতীরে ডাকাতেরা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে, পূর্ব্বদিন একজন ভদ্রলোকের কন্যা পাল্কী করে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, এমন সময় ডাকাতেরা তাহাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনে সঙ্গীরা বলিল, ওপথে যাওয়া হবে না, শুনে তিনি বলিলেন, ঐ পথেই যেতে হবে। এই বলে বৌ সেজে পাল্কীতে উঠিয়া সঙ্গীদের ফেলে চলিয়া গেলেন, সাত আট জন ডাকাতকে ধরে বাটী আনিলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার সময় একজন ডাকাত খুন হয়। সেই অবধি আমার কপাল ভাঙ্গে, কেমন তাঁর ধারণা হয় যে তাঁর লাঠিতেই ডাকাত মরেছে, অথচ সে সময় তাঁর হাতে লাঠি একেবারে ছিল না। যার লাঠিতে মরিয়াছিল সে আপনি স্বীকার করেছিল, বখসীসও পেয়েছিল তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না।

প্রথমে তিনি পূজা ছাড়িলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আমি এখন অশুচি—দেবতারা আর আমার পূজা লবেন না। তার পর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, এক একবার বলিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিব, অন্যের জন্য মরিলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বুঝিতাম সে মুখে আর হাসি নাই। শেষ একদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে পথে একটা দুরন্ত ছেলে ইট হাতে করে একজন পাগলকে বলিতেছে, "আমি তোরে মারিব।" পাগল ভয়ে হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, যতবার বালক বলিতেছে, "এই মারি" ততবার পাগল কাঁদিয়া উঠিতেছে; এই দেখে তিনি কেমন ব্যাকুল হলেন, হয় ত ভয় পেলেন, তিনিও যেন ভয়ে কাঁদিয়া উঠেন, তাঁর এইরূপ বোধ হলো, কিন্তু বাড়ী এসে তাহা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "পাগলের কান্না দেখে তুমি ভয় পেয়েছ কেন, তুমি ক্ষেপেছ নাকি?" অমনি তিনি আমার মুখ চাপিয়া বলিলেন, "ও

কথা কেন বলিলে? আমার ভয় করিতেছে; তবে কি সত্যই,—" এই বলিয়া আমার হাত ছিনিয়া পলাইলেন। আমার নিকট হইতে পলাইয়া মার নিকটে গেলেন, দুই হাতে মার পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিলেন "মা, আমার পীড়া হয়েছে, তোমার চরণরেণু মাখিলেই আমি ভাল হব।" মা এই কথায় কাঁদিয়া উঠিলেন, কান্না দেখিয়া আবার ভয় পেয়ে বলিলেন, "তবে সত্যই।" অমনি সেইখান হইতে পলাইলেন, একবার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতা ভাবিলেন, অসময়ে এ প্রণাম কেন? কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আর তাঁকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেই দিন অবধি রাজবাড়ী শূন্য হলো।

চারিদিন পরে একজন জেলে আসিয়া সম্বাদ দিল যে রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র রাজবাড়ীর সকলে জেলের সঙ্গে ছুটিল, গ্রামের লোকও পালে পালে গেল। আমি একা বসে মনে মনে করিতে লাগিলাম যে; এবারে তাঁরে পেলে আর তিলার্দ্ধের জন্য ছেড়ে দিব না: একবার তাঁরে দেখিতে পেলে হয়। অনেকক্ষণ পরে আবার পালে পালে লোক ফিরে আসিতে লাগিল, রাজবাটীরও লোক সকল ফিরে আসিল; কিন্তু তাঁর আসার কথা কেহ বলে না। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম, শেষ রাজমহলে কান্নার গোল উঠিল, আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু কেমন একটা আতঙ্ক হলো, আমি গিয়া লুকায়ে রহিলাম, আপনি লুকালে ত কুসম্বাদ লুকান থাকে না; ক্রমে শুনিলাম, নদীতীরে তাঁর দেহের সংকার আরম্ভ হয়েছে, জেলে জাল ফেলিতে গিয়ে তাঁর দেহ পাইয়াছিল, তাই রাজবাটীতে খবর দিতে এসেছিল, কেহ তার কথা প্রথম বুঝিতে পারে নাই শেষ নদীরধারে গিয়া বুঝিতে পারিল। তার পর আমার কি হলো আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন উঠে বসিতে পারিলাম, তখন একদিন শ্রাদ্ধের কথা আমার কাণে গেল, আমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশের কথা আমার আগে সকলেই বুঝেছিল, পোড়া আমি কেবল বুঝিতে পারি নাই। পায়রা আর সেরূপ গোলমাল করে না, কার্ণিসের নীচে চুপ করে বসে থাকে। একদিন স্নানের সময় জানেলায় বসে পুষ্করিণীর ধারে তাঁর শ্বেতপাথরের জলচৌকিখানি দেখিতেছিলাম, এমন সময় একটি হাতী দৌড়িয়া সেইখানে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ছিল, কিন্তু হাতীর কাছে কেহই আসিল না। লোকে ভেবেছিল হাতী ক্ষেপেছে; কিন্তু হাতীটি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তিনি এই হাতীটিকে বড় ভাল বাসিতেন, এই হাতীটিই তাঁরে হাতী

ধরিত, এই হাতীটিই এক একদিন শুয়ে থাকিত,আর তিনি তার পেটে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজাতেন। হাতীটি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাটে দাঁড়ায়ে এদিক ওদিক ফিরে ঘুরে দেখিতে লাগিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম তাঁরে খুঁজিতেছে, একবার তাঁরে চীৎকার করে ডাকিল, শেষ জলে নামিল, মনে করিল, তিনি জলের ভিতর কোথাও লুকায়ে আছেন; কতবার ডুব দিল, কতবার মাথা তুলে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। আবার জল হতে উঠে জলচৌকির নিকট দাঁড়াল, জলচৌকি সরাইয়া দেখিল। হাতী কি চায়, কি খুঁজিতেছে, মাহুত তা বুঝিল, কাছে এসে গা চাপড়ে বলিল, "আর কেন খোঁজ ? সে ধন হারিয়ে গেছে।" হাতী সে কথা কিছুই শুনিল না, দাঁড়ায়ে রহিল, একজনের হাতে একটি ছাতী ছিল শুঁড় দিয়া তাহা কাড়িয়া লইল, জলচৌকির উপর ক্ষণেক তাহা ধরিয়া রহিল, তার পর যেন তাঁরে স্নান করাইয়া বাড়ী আনিতেছে এই ভাবে ছাতী ধরে দরজা পর্য্যন্ত আসিল; এই দেখে মাহুত কেঁদে উঠিল। জানেলা থেকে আমার দাসীরা সকলে উঠাইয়া নিয়ে গেল।

তার পর শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিতে আমায় লয়ে গেল, আয়োজন দেখে তা বুঝিতে পারিলাম। আমি প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসিলাম. আর কোন মতে গেলাম না। শেষ আমার শ্বশুর নিজে এসে একবার কাঁদিতে লাগিলেন, একবার সাধিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করি, মিছে করে বলিলাম যে, "তিনি ত মরেন নাই, তিনি আবার ফিরে আসিবেন। জেলের কথা শুনে যে দেহের সৎকার করা হয়েছে, সে দেহ ত তাঁর নহে। যারা দেখিতে গিয়েছিল তারা কেবল কাপড় দেখে চিনেছিল; কিন্তু অন্য লোকে কেহ যদি তাঁর কাপড় পরে থাকে ?"

এই কথা শুনে আমার শ্বশুর অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "সত্য কথা, আমি কেন এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমার চাঁদ বেঁচে আছে। আবার আসিবে ঠিক কথা। আমি দেওয়ান্‌কে বলি গিয়ে।

কিন্তু পাষণ্ড দেওয়ান্ তাঁর সকল কথা উল্‌টাইয়া দিল। আবার শ্বশুর এসে জেদ করে ধরিলেন যে "শ্রাদ্ধ করিতে হবে, নতুবা তাঁর গতি হবে না, প্রেত অবস্থায় কত কষ্ট পাবেন।" আমি আর কি করি; শ্রাদ্ধ করিলাম।

মাতঙ্গিনী। আপনার শাশুড়ি কিছু বলিলেন না, আপনি তাঁর কোন কথাই ত বলিতেছেন না।

জ্যোৎ। তিনি বৃথা মানুষ ছিলেন, কখন কখন তাঁর জ্ঞান থাকিত না। আমার বিবাহের পর বরাবর দেখেছি বেশ সহজ লোক ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে

তিনি কথাও কহিলেন না, একদিন কাঁদিলেনও না; আমি কাঁদিলে বলিতেন, আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, রোজ আমার কপালে সিন্দুর পরায়ে যেতেন। কিন্তু অধিক দিন বাঁচিলেন না। আমার শ্বশুর দিনকতক শোক করিলেন, তার পর ক্রমে ক্রমে পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন; বুড়ালোকের শোক কত দিন থাকে?

মাতঙ্গিনী। শোক নাকি আবার বুড়া যুবার পৃথক্!

জ্যোৎ। বিস্তর পৃথক্। তা আমার শ্বশুর হতে দেখেছি। একবৎসর না যাইতেই তিনি পোষ্যপুত্র লইলেন। একদিনের জন্যও আপন পুত্রকে স্মরণ করিলেন না। তার পর আর এক কাণ্ড হয়ে গেল, যার অদৃষ্ট মন্দ তার যন্ত্রণা পদে পদে, বিধাতা যেন তারে একবার মেরে তৃপ্তি হন না।

আমি বিধবা হবার দশবৎসরের পর একদিন বৈকালে পাঁচজনে একত্রে বসে আছি, এমন সময় আমার শ্বাশুড়ির একজন দাসী ছুটে এসে বলিল, "আবার যে কি শুনিতে পাই।" শ্বাশুড়ির মরণের পর অবধি দাসী আর রাজবাড়ীতে থাকিত না; কখন কখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। আমি তারে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কথা শুনিতে পাও?" সে বলিল, "এবার সত্য সত্যই নাকি রাজকুমার ফিরে এসেছেন, তিনি ফাল্গুনবাগে বসে আছেন বাপকে খবর পাঠায়েছেন, রাজামহাশয় সেখানে এই গেলেন।"

এই সময় আর একজন দৌড়াদৌড়ি এসে বলিল, "আমি এই তাঁরে স্বচক্ষে দেখে এলাম, বড় কাল হয়ে গেছেন; প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা, আমি ফাল্গুনবাগের পুকুরে জল আনিতে গিয়া দেখি ঘাটে একজন সন্ন্যাসী বসে আছে। কে আর বল সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে চায়, আমি কলসী হাতে জলে নামছি এমন সময় সন্ন্যাসী আমায় ডেকে বলিলেন 'কাদম্বিনি আমায় তোমরা চিনিতে পার?' আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখ দেখিতে লাগিলাম, মনে হতে লাগিল ঠিক যেন আমাদের রাজকুমারের মত, কিন্তু তিনি ত নাই। তার পর তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পেরে হাসিমুখে বলিলেন, 'তবে আমায় আর বুঝি চেনা যায় না।' সে হাসি দেখিবামাত্র আর আমার সন্দেহ রহিল না; আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে যোড় হাতে বলিলাম, আর এখানে কেন? তিনি বলিলেন, 'আমার বিলম্ব আছে;' আমি বলিলাম যে, তবে এই সময় বৌ-রাণীকে খবর দিই গে, তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলিলেন, 'তিনি নাকি এখন বড় বিজ্ঞ হয়েছেন? বিজ্ঞবতীকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কোন্ বিজ্ঞতার দরুণ

তিনি জীবিত স্বামীর শ্রাদ্ধ করেছেন।' তা আমি আর কোন কথার উত্তর না করে ঘাটের উপর কলসী রেখে একেবারে ছুটে এসেছি; বাড়ীও যাই নাই।"

এই সম্বাদের পর আমার মহলে আহ্লাদের ঢেউ উঠে গেল, চারিদিকে সকলে ছুটাছুটি করে বাড়ী পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমি নির্জ্জনে গিয়ে কাঁদিতে লাগিলাম, কেন কাঁদিলাম তাহা জানি না, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদিলাম। তার পর সেখানে দাসীরা আমার চুল বাঁধিতে গেল, আমি বারণ করিলাম না, তার পর তাহারা যখন আমায় অলঙ্কার পরায়, তখন আমি বলিলাম, যে এখন রাখ তিনি এসে আমায় আপনি পরাইয়া দিবেন, দাসীরা বলিল, "সে কি কথা! তিনি কি এসে আপনার এই বিধবার বেশ দেখিবেন?" আমি কোন কথা বলিলাম না। দাসীরা গহনা পরাইল। পরে তিনি এসে প্রথমে আমায় কি বলিবেন আমি তাঁকে কি বলিব এই কথাই মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো, তখনও তিনি এলেন না, মনে করিলাম বাপের কাছে এই দশবৎসরের কষ্টের কথা পরিচয় দিতেছেন; তার পর রাত্রি এক প্রহর হলে আমি একজনকে বলিলাম যে,তোমরা একজন রাজমহলে যাও সম্বাদ কি জানিয়া আইস। সে বলিল যাবার উপায় নাই, দরজা বন্ধ। দেওয়ানের হুকুমমত দরওয়ানেরা দরজার চাবি দিয়াছে; যারা রাজপুত্রের সম্বাদ এনেছিল, তারাও বাড়ী যাইতে পায় নাই। আমার বড় সন্দেহ হলো, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত আমরা সকলে বসে রহিলাম, কোন সম্বাদ পেলাম না, দরজাও কেহ খুলে দিল না। সে দিন গেল, তার পর দিন গেল, এইরূপে আটদিন গেল দরজার চাবি কেহ খুলে দিল না। এই আসেন এই আসেন মনে করে মানুষ কয়দিন বসে থাকিতে পারে! ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়িল, আমি অজ্ঞান হলেম, জ্বরবিকার বলে আমার চিকিৎসা আরম্ভ হলো, আমি কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম তা জানি না, যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন আমার কিছুই মনে ছিল না, ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে হলো, আমি শয্যায় পড়ে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কেহই আমায় কিছু বলিত না; জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহসও হইত না; একদিন আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা শুনিলাম, তাতে আর এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হলো না। দুর্ভাগীর প্রাণ কি বাহির হয়? সেই আমি আজও বেঁচে আছি।

মাতঙ্গিনী। আপনি কি শুনিলেন?

জ্যোৎ। যে দিন তিনি ফিরে এলেন, কাঞ্চনবাগ হতে পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইবামাত্র রাজা কাঞ্চনবাগে ছুটিলেন, সেখানে

গিয়া পুত্রকে বুকে করে কত কাঁদিলেন, তার পর যখন আমার শাশুড়ীর মরণের কথা হতেছিল, তখন দেওয়ান্‌মহাশয় ফাল্গুনবাগে গেলেন; কিন্তু তিনি রাজপুত্রকে চিনিতে পারিলেন না। রাজা স্বয়ং চিনিয়াছেন, দেওয়ান্ চিনিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে আর কি ক্ষতি? রাজা বলিলেন, "এখন তবে বাড়ী চল;" রাজপুত্র রাজার সঙ্গে উঠিতেছিলেন, এমত সময় দেওয়ান্ বলিলেন, "একটা কথা আছে, ভ্রমক্রমে শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, এক্ষণে বাটী যাইবার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যদের নিকট ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক; যদি তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সেটা করা চাই।" রাজা বলিলেন, "এ কথা সঙ্গত বটে, আমি এখনই বাটী গিয়া ভট্টাচার্য্যদের ডাকাইতেছি।"

রাজা বাটী গেলে রাজপুত্রের সেবার নিমিত্ত কয়েকজন চাকর ফাল্গুনবাগে আসিল, তাহারা সকলেই নূতন লোক, রাজপুত্র তাহাদের কাহাকেও চেনেন না, তাহারাও কেহ রাজপুত্রকে চেনে না। রাজপুত্র তাহাদিগকে পুরাতন চাকরদের সম্বাদ একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, "পুরাতন চাকর আর রাজসরকারে কেহই নাই।" রাজপুত্র কিছু আশ্চর্য্য হলেন, কিছুই হেতু অনুভব করিতে পারিলেন না।

পরদিবস প্রাতে পেস্কার আসিয়া রাজপুত্রকে বলিল, "যদি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক; ভট্টাচার্য্যেরা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন; তাহার উদ্যোগ করিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে, অতএব যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি এই ফাল্গুনবাগে থাকিবেন। যাহাতে আপনার কোন কষ্ট না হয়, তাহার নিমিত্ত রাজাবাহাদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এই কথায় রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "(যদি রাজপুত্র বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করা হয়) এ কথা বলিতে কে তোমায় শিখাইয়া দিয়াছেন?" পেস্কার বলিল, "রাজাবাহাদুর নিজে, তিনি যেমন বলিতে বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া একজন চাকরের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে রাজবাটী যাও, পত্রখানি রাজাবাহাদুরের হাতে দিবে, অন্যথা না হয়।" চাকর "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল; পরে অনেক বিলম্বে উত্তর আনিল। উত্তরখানি দেওয়ান্ মহাশয়ের স্বহস্তের লেখা; কিন্তু তাহার শিরোভাগে রাজার দস্তখত ছিল। রাজপুত্র পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন, তাহার প্রথমভাগে স্নেহপূর্ণ বাক্য, শেষভাগে বিপরীত কথা। রাজপুত্রের বড় সন্দেহ হইল; কিন্তু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না। রাত্রে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি দুই দিবস আসিয়া-

ছেন,! গ্রামবাসীরা এ সম্বাদ অবশ্য পাইয়াছে; অথচ কেহ এপর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিল না, ইহার তাৎপর্য্য কি? সকলেই ত তাঁহাকে ভাল বাসিত। পরদিবস একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের চেন।" সে উত্তর করিল, "আমি কাহাকেও চিনি না।" রাজপুত্র বলিলেন, "কোন পুরাতন আমলাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" সে উত্তর করিল, "পুরাতন আমলা কেহই আর রাজবাটীতে নাই।" রাজপুত্র আশ্চর্য্য হইলেন—সাবেক কোন চাকর নাই, দরওয়ান নাই, আমলাও নাই, তাৎপর্য্য কি!

পরদিন প্রাতে রাজার নিজ হাতের এক পত্র পৌছিল; তাহাতে লিখিত ছিল, "নগরবাসীদের মধ্যে রাষ্ট যে তুমি রাজপুত্র নহ, কোথাকার একজন বৈষ্ণবের সন্তান, আমার দুর্ভাগ্য শুনিয়া আমায় প্রতারণা করিতে আসিয়াছ; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার চেষ্টা বৃথা; তোমার এখানে থাকাও বৃথা। আর যদি তুমি সত্যই আমার পুত্র হও, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে, এই অবস্থায় তোমায় গ্রহণ করিলে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমি বৈষ্ণবের সন্তান গ্রহণ করিয়াছি। যদি আমার পৌত্র হয়, লোকে তাহাকে বৈষ্ণবের পুত্র বলিবে, এ কলঙ্ক হইলে আমরা কেহই সুখী হব না; অতএব তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে পুত্রশোকাকুল, এ সময় সকলেই আমায় প্রতারণা করিতে পারে, তাহা না হইলে সে দিবস তুমি 'পুত্র' বলিয়া পরিচয় দিবামাত্র আমি তোমায় কেন বুকে করিয়া কাঁদিলাম? কিছুই দেখিলাম না, শুনিলাম না, কোন তদন্তও করিলাম না; আমি তখন একেবারে ভাবিলাম না যে, যে সন্তান মরিয়াছে, যাহার দেহ দাহ করাইয়াছি, যাহার শ্রাদ্ধ করাইয়াছি, সে সন্তান আবার কিরূপে ফিরে আসিবে? অতএব তুমি আর কোন চেষ্টা করিও না, এ পত্রের উত্তর আমি চাই না, উত্তর দিলে সে পত্র আমার নিকট পৌছিবে না; আমার সহিত সাক্ষাৎ করাও বৃথা, তাহার চেষ্টা করিলেও সাক্ষাৎ হইবে না; বরং তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে।"

রাজপুত্র পত্র পাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন; পেস্কার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজবাটী।" পেস্কার বলিল, "যাইতে নিষেধ।" রাজপুত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। পেস্কার তৎক্ষণাৎ একজন ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন; রাজপুত্র সেখানে আসিয়া দেখিলেন, রাজদ্বারের

সম্মুখে কয়েকজন বলিষ্ঠ সিপাহী যেন তাঁহারই নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজদর্শন।" সিপাহী উত্তর করিল, "নিষেধ আছে।" তথাপি রাজপুত্র অগ্রসর হইলেন, সিপাহী পথরোধ করিল, রাজপুত্র তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজবাটী প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন আর সকল সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে শৃগাল কুক্কুরের মত ধরিল, তিনি প্রথমে রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সিপাহীরা তাঁহার হাত পা বাঁধিল, শেষ তিনি বলিলেন, "আর প্রয়োজন নাই, এখন আমি বুঝেছি।" সিপাহীরা ক্ষান্ত হইল। তিনি আপনার দ্বারে আপনার চাকরের হাতে বাঁধা পড়িলেন, সেইখানে পিতা বসে, ফিরেও চাহিলেন না। অদৃষ্ট মন্দ হলে পিতাও শত্রু হয়।

সিপাহীরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পথে বিস্তর লোক জমিল; সকলেই "জালরাজা" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, কেহ কেহ গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। রাজপুত্র আর মুখ তুলিলেন না।

আটদিনের পর আমার মহলের দরজা খুলে দিলে আমার দাসীরা গিয়া সম্বাদ আনিল; প্রথমেই সকল কথা জানিতে পারি নাই; ক্রমে জানিলাম। তখন আমি নিজে রাজমহলে গিয়া শ্বশুরের পায়ে কাঁদিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, "যাহা শুনিয়াছ সকল মিথ্যা। একজন দুষ্টলোক জাল সেজে এসেছিল, আমি তারে বাঁধিয়া দেশছাড়া করে দিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনি তাঁকে নিজে চিনেছিলেন, তাঁরে পেয়ে কত কেঁদেছিলেন, তবে এরূপ কেন করিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি চিনিলে কি হয়, আমি বৃদ্ধ, আমার ভ্রম হতে পারে; কিন্তু দেওয়ান্ তাঁরে বাল্যকালাবধি দেখে আসিতেছে, দেওয়ানের ভুল হবার ত কোন কথা নহে। যখন দেওয়ান্ বলিল "এ ব্যক্তি রাজপুত্র নহে" তখন অবশ্যই আমার সন্দেহ হইতে পারে।"

আমি বলিলাম দেওয়ান্ তাঁকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন, কেবল আপনাকে তাহা বলেন নাই। আপনি কি ভুলে গেছেন যে দেওয়ানের পুত্রকে আপনি পোষ্যপুত্র লয়েছেন? আপনার পুত্র ফিরে আসিলে দেওয়ানের অবশ্য ক্ষতি আছে, কাজেই দেওয়ান্ মহাশয় আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছিলেন।

এই কথায় শ্বশুরমহাশয় অন্যমনস্ক হইলেন; ক্ষণবিলম্বে বলিলেন, "এমন হবে না; এত অধর্ম্ম আচরণ দেওয়ান্ কখনই করিবে না। আমি তারে চিরকাল প্রতিপালন করেছি, তার কত উপকার করেছি, আমার সে নিতান্ত অনুগত, সে কখন এমন অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না।. যে ব্যক্তি এসেছিল, তাঁর আকার অবয়ব কতকটা আমার ছেলের সঙ্গে

মিলেছিল বটে, কিন্তু বর্ণ সে নয়, মুখের সে হাসি নয়, শরীর তেমন নরম নয়, আবার কতকগুলা দাড়ি আছে। তবে এরে দেখিলে তারে মনে পড়ে বটে। কাজেই দেওয়ানের কোন দোষ ছিল না। —কিন্তু আমার এক কথা আছে, দেওয়ানের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যখন প্রথম আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আমি তাহারে বলিয়াছিলাম 'আর একবার আমি নিজে গিয়া সন্দেহভঞ্জন করে আসি।' কিন্তু দেওয়ানই তাহার বাধা দিয়াছিল।"

আমি সময় পাইয়া বলিলাম, "প্রথম সন্দেহও বোধ হয় দেওয়ান্ মহাশয়ই উত্থাপন করে থাকিবেন।" রাজা ভাবিয়া বলিলেন, "তাও সত্য, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক তাহাকে জালরাজা বলেছে, কেহই ত চিনিতে পারে নাই। সকলেই ত তারে দেখেছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "গ্রামের কেহই ত তাঁকে দেখে নাই। কাঞ্চনবাগে কাহারও যাবার হুকুম ছিল না, দেওয়ান্ মহাশয় নিজের লোক তথায় রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও তথায় যাইতে দেন নাই; যদি কেহ যাইতে পাইত, তাহা হইলে সকলেই তাঁরে চিনিত। তিনি যখন এসে পুষ্করিণীর ধারে বসেছিলেন, তখন কাদম্বিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনেছিল। তিনি ত তখন তার কাছে "রাজপুত্র" বলে পরিচয় দেন নাই, তখন কাহারও কাছে নিজের পরিচয় দেন নাই, আপনাকেও তখন পত্র লেখেন নাই; কাদম্বিনী যেমন দেখিবা মাত্র তাঁকে চিনেছিল, দেখিলে আর সকলেও সেইমত চিনিত। আর কেহই না চিনুক, আপনি ত তাঁকে চিনেছিলেন। তবে যে লোকে জালরাজা বলে গোলযোগ করেছিল তাহা তাহাদের দোষ নয়; দেওয়ান মহাশয় লোকের কাছে যেমন পরিচয় দিয়াছিলেন, লোকও তেমনি বলাবলি করেছিল। কেহ ত কাঞ্চনবাগে প্রবেশ করিতে পায় নাই।"

রাজা অনেকক্ষণ অবধি নীরবে রহিলেন, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন আমায় এ সকল কথা বল নাই কেন?" আমি বলিলাম, "দেওয়ান্‌মহাশয় আমায় মহলে আটদিন চাবি বন্ধ করে রাখিয়াছিলেন, কাজেই আমি কোন কথা বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই।"

আমার শ্বশুর বলিলেন, "এখন দেওয়ানের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলাম, আমায় বৃদ্ধ পাইয়া আমার এই দুর্গতি করেছে, আমার সোণার চাঁদকে তাড়াইয়াছে। যাবার বেলা ছেলে আমার কত ব্যথা পেয়ে গেছে; আমায় না জানি কি ভাবিয়া গিয়াছে! আমি কি নরাধম! আমি এখনই তারে খুঁজিতে চারিদিকে লোক পাঠাইব।"

আমি বলিলাম, "এক্ষণে লোক পাঠান বৃথা, তাঁকে অনুসন্ধান করে এমন লোক আপনার আর একটিও নাই।

যাহারা আপনার লোক ছিল, তাহারা সকলেই একে একে ছেড়ে গিয়াছে; এখন যাহারা আছে, তাহারা কি আমলা, কি চাকর, কি সিপাহী, সকলেই দেওয়ানের লোক, দেওয়ানের ইচ্ছা না থাকিলে তারা কখনই অনুসন্ধান করিবে না।" রাজা বলিলেন, "বটে, আমার এমন অবস্থা করেছে! আমি এখনই দেওয়ানকে তাড়াইব।" এই বলিয়া মহা রাগত হয়ে বাহিরে গেলেন, আমিও আমার মহলে আসিলাম। রাজা তখনই দেওয়ান্‌কে বরখাস্ত করিয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া যাইতে অনুমতি পাঠাইলেন। দেওয়ান্ রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ঈষৎ হাসিল, তার পর মুখ ভার করে যোড়হাতে রাজসভায় গিয়া এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাসের কি অপরাধ হয়েছে?" তাহার নম্রতা দেখে রাজার কিঞ্চিৎ রাগ কমিল। রাজা বলিলেন, "তুমি ষড়যন্ত্র করে রাজপুত্রকে তাড়াইয়াছ, অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার বাটী হইতে যাও। যদি রাজ-পুত্রকে তল্লাস করে পুনরায় আনিতে পার, তবেই আমার এখানে আবার তোমার স্থান হবে; নতুবা এই পর্য্যন্ত।" দেওয়ান্ রাজার পা ধরিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি কোন ষড়যন্ত্র জানি না, তাহা হইলে অনেক কাল অবশ্য ধরা পড়িতাম। আমি বালককাল অবধি এই রাজসরকারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আমি নিতান্ত অনুগত বলে সামান্য মুহুরীর পদ হইতে ক্রমে ক্রমে দেওয়ানের পদ পেয়েছি, এতদিন কখন ত আমার কলঙ্ক ছিল না। বোধ হয় এতদিনের পর আমি নষ্টচন্দ্র দেখে থাকিব, অথবা এতদিনের পর আমার কেহ শত্রু জুটে থাকিবে, নতুবা জানত আমি কোন অপরাধ করি নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার পুত্রবধূর দরজায় চাবি দিয়াছিলে কেন?" দেওয়ান্ তখন বুঝিল, যে আমার দ্বারা এই কাণ্ড হইয়াছে। দেওয়ান তখন যোড়হস্তে বলিল, "নির্জ্জন হইলে সে সকল কথা নিবেদন করিতে পারি।" রাজা নির্জ্জনে গেলে দেওয়ান বলিল, "সকল কথা আপনার সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, কিন্তু কি করি বলিতে হই-তেছে। রাজবধূর চরিত্রসম্বন্ধে মহাশয় অবশ্য এত দিন কিছু শুনিয়া থাকিবেন, সে সকল কথা আমার বলা ভাল হয় না। সম্প্রতি তিনি নিজে পত্র লিখিয়া এই জালরাজাকে আনাইয়াছিলেন; ভদ্র ঘরে এই জন্যই স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখায় না। আমি বিবেচনা করিলাম, যদি দুইজনে এই সময় চিঠি লেখালিখি চলে, তাহা হইলে শেষ ভয়ানক কলঙ্ক রটিবে; তাহাই আমি আপনাকে না জানাইয়া পত্রযাতায়াতের পথ বন্ধ করি-য়াছিলাম। বিশেষতঃ কাদম্বিনীনামে একজন স্ত্রীলোক মধ্যবর্ত্তিনী জুটিয়া ছিল। জালরাজা আসিয়াই তাহার দ্বারা প্রথম পত্র পাঠান, আমি সময়ে সম্বাদ

পাইয়া অন্দরের দরজায় চাবি দিয়াছিলাম। কাদম্বিনী ফিরিয়া বাটীতে পায় নাই, কাজেই পত্রও চালাচালি হয় নাই। চাবি না দিলে বোধ হয় জালরাজার সঙ্গে তিনি চলিয়া যাইতেন, কেন না শেষ যখন জালরাজা দেখিলেন যে, তাঁহার শঠতা ধরা পড়েছে, তখন পেস্কারকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন, "আমার ধনসম্পত্তি কিছুরই আর কাজ নাই, আমার স্ত্রীকে দিলেই আমি চলিয়া যাই। তিনি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত আছেন।"

রাজা পেস্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় পেস্কারও তাহাই বলিল। আমি সেইদিন হইতে আর শ্বশুরবাটীতে স্থান পাইলাম না; তৎক্ষণাৎ দরজায় পাল্কী আসিল। বিদায়ের সময় শ্বশুরকে প্রণাম করিব বলিয়া এত জানাইলাম, শ্বশুর তাতে একেবারে কাণ দিলেন না, শেষ বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি দুশ্চরিত্রার মুখদর্শন করেন না; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে উঠিলাম। সেই অবধি আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে।

মাতঙ্গিনী। আপনার কি বরদাস্ত।

জ্যোৎ। অভাগীর, বরদাস্ত চিরকালই আছে; যাহারা ভাগ্যবতী সুখের কোলে নিদ্রা যায়, তারাই একটুতে কাতর হয়। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার বরদাস্ত আপনিই হয়।

মাতঙ্গিনী। যিনি এসেছিলেন, তিনি সত্যই কি রাজপুত্র?

জ্যোৎ। আমি তাঁরে ত তখন দেখি নাই। কাদম্বিনী দেখেছিল; সে কেনই বা মিথ্যা করে বলিবে?

মাতঙ্গিনী। তবে আপনি ত বিধবা নন?

জ্যোৎ। তিনি বেঁচে আছেন, আমি তাঁরে দেখেছি।

মালাচন্দন।

ইংরেজি কেতার সম্মান বাঙ্গালিরা বড় বুঝেন না, শীঘ্র বুঝিবেন এমনও বোধ হয় না। ইংলণ্ড ও বাঙ্গালা পরস্পর যেরূপ দূর, পরস্পরের ব্যবহারও সেইরূপ দূর। আমরা হাততালি দিয়া উপহাস করি, ইংরেজেরা হাততালি দিয়া "বাহবা" দেন। বৈপরীত্য বড় সামান্য নয়। আমাদের চক্ষে নতশির, নিম্নদৃষ্টি নম্রতার লক্ষণ, সাহেবদের চক্ষে তাহা অপরাধের অকাট্য প্রমাণ; তাঁহারা ভাবেন, 'যখন এই ব্যক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল না, তখন ইহার বিরুদ্ধে আর প্রমাণের বাকি কি?' উভয় জাতির মনের গতি স্বতন্ত্র, এই জন্য ইংরেজেরা আমা-

দিগকে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না, আমরাও ইংরেজদের বুঝিলাম না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপকার এবং উৎসাহের নিমিত্ত কতই কৌশল করিতেছেন, কিন্তু আমরা কেবল এই জন্যই তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারি না, তাহার অনেকগুলি গ্রহণ করি না। ফেলারাম বিশ্বাস "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা খেলারাম তাহা কিছুই বুঝিল না। ফেলারাম যদি নিজগ্রামে গেলেন, তথায় কেহই তাঁহার নূতন সম্মান অনুভব করিতে পারিল না; ফেলারাম কাজেই সুখী হইলেন না। "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হওয়া অপেক্ষা ফেলারাম যদি কোথায়ও মালাচন্দন পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি অধিক সুখী হইতেন; কেননা সে সম্মান লোকে দেখিতে পায়, আত্মীয়স্বজনে বুঝিতে পারে। যে শ্রেষ্ঠ, যে সর্ব্বপ্রধান, কেবল সেই মালাচন্দন পায়; যখন শত শত লোক একত্র সমবেত হয়, তখন সর্ব্বসম্মুখে সর্ব্বপ্রধানকে মালাচন্দন দিয়া সম্মান করা হয়। ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে লোকে এইরূপে সর্ব্বপ্রধানকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে। সেখানে ফেলারাম শর্ম্মা—ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া—বসিয়া থাকুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিবে না; মালাচন্দন দিবার সময় তাঁহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিবে না। তবে সমাজে "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়ার" সম্মান কই?

এই জন্য বলি গুণবানের মান প্রচার করিবার জন্য যে বিলাতী পদ্ধতি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাল খাটিতেছে না। নামের পরে নাইট কম্পানিয়ান প্রভৃতি সেকেলে কথা যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সে যোড়া দেওয়া কয়টা লোক দেখিতে পাইতেছে কিম্বা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে?

"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বা ভারতনক্ষত্র যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন হয় ত জানেন, যে তাঁহাদের কিরণে ভারতের কোন অংশই আলোকময় হয় না, ভারতের অনেক লোকই তাঁহাদের আলোক দেখিতে পায় না। তাহাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে লোকের উচিত, "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বলিয়া তাঁহাদের মালাচন্দন দেয়, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোন হুকুম দেন। পূর্ব্বকালের মালাচন্দন যে দেখিয়াছে, সেই জানে যে গুণের কিরূপ সমাদর এ দেশে সর্ব্বদা করা হইত; কাজেই ভারতনক্ষত্রের মনে মালাচন্দনের জন্য লোভ হইতে পারে।

কিন্তু মালাচন্দনের আর গৌরব নাই। যে অবধি বাঙ্গালির দুরদৃষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ভালমন্দ বিচার করিবার আর আমাদের শক্তি নাই। কাহাকে পূজা করি, কাহাকে সম্মান করি, কাহাকে আদর্শ করি, এ সকলের আর কিছুই ঠিকানা নাই। বোধ হয় সম্মানোপযোগী লোক বাঙ্গালায় থাকিলে

বাঙ্গালার দুর্দশা আরম্ভ হইত না। সমালোচনাযোগী লোক বিশেষরূপে কিছু তাঁহাদের দোষ আছে, কাজেই কুলপূজা আরম্ভ হইয়াছে, কুলীনের বংশোদ্ভব বলিয়া অনেক বহু মালাচন্দন পাইতেছে, ফল আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। ভাল আরম্ভ হইলে যেমন ক্রমেই আরও ভাল হইতে থাকে, মন্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ; একবার মন্দ আরম্ভ হইলে ক্রমে সেই মন্দই বাড়িতে থাকে; স্বভাবের নিয়মই এই। যখন অন্তবংশ সামান্য ব্যক্তিরা কুলগৌরবে পূজ্য হইল, তখন বাঙ্গালার রুচি আরও মন্দ হইতে লাগিল; ব্যক্তিগত গুণ আর সমাজে লক্ষ্য হইল না, উৎসাহ পাইল না, বাঙ্গালার আর টান ফিরিল না।

এক্ষণে এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন, কেবল কুলপূজা করা ভুল। তাঁহাদের বলিবার তাৎপর্য্য যে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজে ব্যক্তিগতগুণের জন্য মালাচন্দন আরম্ভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শনির দশা ঘুচিবে না। কুলপূজা বন্ধ করিলে ভাল, কিন্তু শত কারণে মন্দ। সংস্কৃত শব্দ অভিপ্রায় অনুযায়ী বটে; কিন্তু যেখানে স্পষ্ট বিপরীত ফল দেখা গিয়াছে, সেখানে আর কুলপূজা কেন?

কুলবিষ অনেক প্রকারে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, সেই বিষেই 'বুনিয়াদী' 'আধুনিক' এই সকল বিচারের জন্ম। কেহ ভাবেন, 'আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম সৃষ্টি হয়, আর অন্যলোকের পূর্ব্বপুরুষ পরে সৃষ্টি হইয়াছে; তাই আমি বুনিয়াদী।' আবার কেহ ভাবেন, তাঁহারও যে বুনিয়াদ, রামাবাগদীরও সেই বুনিয়াদ। যদি তাঁহার অপেক্ষা রামাবাগদীর বিশেষ গুণ থাকে, তবে রামাবাগদী তাঁহার নিকট মালাচন্দন পাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা বাঙ্গালায় ক্রমেই বিস্তার হইতেছে, কাজেই "ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার" এক সময় মালাচন্দন পাইবার সম্ভাবনাও বাড়িতেছে।

যিনিই যাহাই বলুন, বোধ হয় মালাচন্দনের রীতি উঠিয়া যাওয়া ভাল নহে। যদি বিচার করিয়া মালাচন্দন দেওয়া হয়, তাহা হইলে উন্নতিই সম্ভব।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৮ সংখ্যা।
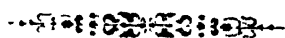
মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত।

শ্রীদর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম গুড়মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড়মহাশয় এক ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায় অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বা-

ম্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম, এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো কোলো কোঁকড়া চুল নধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে মা, "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিনবৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচবৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচ্‌লে হয়।

পাঁচবৎসরে সাফলরাম গুড়মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচবৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যেদিন কথা পড়িল, সেদিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখা পড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ, শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ তা আমি পারি, তবে কি জান শিষ্যসেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল।" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে—"এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরাচ"—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা

মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত— শুনা গিয়াছে কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। একবৎসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না। কেন না প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তার পর একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর একঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশবৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারি; কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিনদিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিনরাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্ত-যাত্রা, এই প্রথম শুনিল: চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠিসহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি, যে পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথমদিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারীমহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে, টাকার সিন্ধুকের ভিতরও প্রবেশ করিল। অধিকারীমহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারীমহাশয় একা দোষী নহেন— জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীলমহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও

গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—Glorious British Constitution!—হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারীমহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিষ পার্লিমেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,

"তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলেন? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে! যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচটাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুলভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারীমহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্প দিনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে, পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাঁহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে!—মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা
দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ কুন্তলা—" থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা"—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল "লুচি চিনি ছোলা।" পিছন হইতে বলিয়া দিল "দধতি সুন্দর রূপং"—মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল "দধিতে সন্দেশ রূপং।" সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী" টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল, "মানময়ি রাধে একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল "গুড়ুক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল "রাধে—একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের,—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল, যে এই বাঁক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারীমহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতা পিতামহ মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে অধিকারীমহাশয়ের পিতৃমাতৃসম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজঘরে গিয়া, বেশত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে

সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে-কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে, বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারীমহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারীমহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুট্‌তে হয়, আপনি জুট্‌বে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারিনে।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল. "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুট্‌তে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়-বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে অধিকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারিবামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিনপ্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ, বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী! বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃ

পতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী, চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশান বাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না বলিতে পারি না; যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্কশরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাঁদ্‌ছিস কেন বাবা?" ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব" এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন; মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িলে তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া

পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকা-সন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্যঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, " মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশান বাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টরেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টরেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশান বাবুর ঘরের তণ্ডুলচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তণ্ডুলচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন "ঘুস খাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আটগণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই, তাহা প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর হই-

লেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুইচারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিষকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিষের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে একটাকা, দুই টাকা, তিনটাকা, চারিটাকা, ক্রমে পাঁচটাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা একরকম বলিত, মুচিরাম আর এরকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া কি সাক্ষপ্রতি চারিআনা, আটআনা, একটাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানা প্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ—কখন কখন লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম করিতে আছে, এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ—এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট্‌খিট্ করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ—সকল তাতে মুচিরাম গালি খাইত!

সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজ পত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব "রিপোর্ট" শুনিতেছে—সে সময়ে মুচিরামকে কটি বিসকট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর একজন আসিল। ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণজন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হয়েন অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাহারই একজন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Grongerham—লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিষমিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয় আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যতদিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন, যে আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না কাজ কর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী, মির্জা গোলাম সর্ফদর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব, পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়িটাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—দিওজিনিস্ হইতে দর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন—কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই "হিতোপদেশ" গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষে মাকিয়াবেলি—

চাণক্য ভারতের রোশকুকেল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম দুইতিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোমসাহেবের মেজাজ মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় বানরগোষ্ঠীর সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ ভনে কে বানর? যে মেজাজ বুঝে, না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজী দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যা হোক না হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি "মাই লার্ড" আর "ইওর লার্ডশিপ" থাকে। লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন, শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লাথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া, স্বহস্তে মাথায় বিঁড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আমদানি নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখান সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোমসাহেব এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চটঙ্গে, রেল দেওয়া পিঁজরের ভিতর, হোমসাহেব এজলাষ করিতেছেন। চারিদিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—সাহেব নখ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র

পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোমসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডর। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say you are well up in Shakspeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakspeare and Milton and Bacon in the office. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You can go." শামলা চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন,

"Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল,

"বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড ঘরানা হৈঁয়।"

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল; সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন,

"হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সক্‌তা; লার্ড ঘরনা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল, যে মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল,

"বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হৈঁয়।"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

Struggle for existence! Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম বাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু; এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরাম বাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন

তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বারবৎসর তাইদ নবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম কাজ বারবৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজ-গোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মের সহায়তা করে, রাত্রি কালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে এবং আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্ম কাজ মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধপ্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" এবং "ইয়র আনর" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরামবাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জ-মিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন। মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ। ভজ-গোবিন্দ বলিল যে বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন, যে স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখানকার দেবোত্তর। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবাইৎ" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এই রূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামাসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইৎকে খাইতে হইত চরণতুলসী—এখন, খাইতে হয় চরণ—পাপমুখে কি বলিব?

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ ইহা মুচিরাম বুঝিলেন কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এপর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এস্থলে অনুকল্প চলিবে কি না তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজ-গোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব

মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে তাঁহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী, ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমীদারী পত্তনী খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দবৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে হোমসাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাহার স্থানে ঋড সাহেব আসিলেন। ঋড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটা বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু ঋড সাহেব যেমন বিচক্ষণ তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—ঋড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। ঋড সাহেব মুচিরামকে দুইএকবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারিবার "গরিব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর, তাহাকে পেষকারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য

মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে, যে আমার শরীর ভাল নহে মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব —হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত খড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা খড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গালি আপিসে সেক্রেটরি ছিলেন—রিপোর্ট পৌছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াইশত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে। মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন—যে অস্বীকার করিলে খড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুইদিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপোটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ও হে—'গুড়' টা নাই লিখিলে! শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা, এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত "মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর," কেহ লিখিত "রায় মুচিরাম রায়বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ে ডিপুটি।" আর ইস্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কল্‌সীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝ্‌তে নারি সার কি মাত?"

কেহ বলিত,

"সরা মালসার খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই ?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষ মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরেগুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম শুড় মূর্খ,কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত; যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত,তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত; অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন; সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশানর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এত্তেলা হইবা মাত্র বলিলেন, "নেকাল দেও শালা কো!" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তমপঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাস্কাবার দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? দুটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখান-

কার কমিশ্যনর একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—একদিন একরাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কিপ্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোবা লইয়া তেতুঁল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভাল বাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন "ওতে ভারি অম্ল হয়—ও বিষ!" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও সর্করা সংযোগ পূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে শপথ করিলেন যে তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুল মাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপাণ কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে ডিপুটি গিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম, ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!" (তিনি সকের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটা বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে এখানে বড় বাড়ী করিচল, লোকে বল্‌বে ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুকপুরে বড়মানুষি করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন।

ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যত বড় মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন, যে কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া, মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া, উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ি করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচটাকার জিনিসে দেড়শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল—যে বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুটিতে ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্ম্মা, ভাল ধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গপরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিকে বিশেষ

আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজানা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে, বলে দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথম শ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রাণ্ডি বা এক খানা কাটলেটের লোভে কাহারও অনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালচাল্লা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়—তিনখানা গাড়ি আছে, সোনাবাঁধা হুকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা "কাগজ"—সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন, যে গর্দ্দভের পৃষ্ঠহইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কিপ্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ের উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি। রামচন্দ্র বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ; মুচি গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরামমৎস্য ফাঁদে পড়িল—রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন—মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণ-

ভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত,যখন মুচিরাম বলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়য়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর,তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি—একখানা বেরুষ—একখানা ব্রৌনবেরি। একটা আরবের যুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত—এখানে একটা চাপকানে ৬৫ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তার পর, মুচিরাম, কলিকাতার যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাহার বাড়ীতে আসিলে জন্ম-সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র; মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক যায়গাতেই ঝাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিম মহাসভার "একটা বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন

বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। বেলবিডীরে গেলে বড় লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়া ছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী নিরীহ—ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না—অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীতসম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এতবড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন—জানেন যে মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে স্বশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা, টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরাম দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে, তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরামদর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে, তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠপার হইয়া, অশ্বযানে, একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে বৎসর ঐ অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে

দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাসাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি, লোক বড় ভাল হইলেও আত্মগরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাসার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"টোমাডিগের গ্‌ড়ামে* ডুর্‌ভাখ্‌খা† কেমন আছে?"

চাসা ত জানে না ডুর্‌ভাখ্‌খা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুর্‌ভাখ্‌খা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত, এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুর্‌ভাখ্‌খাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাসা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার—Sick?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well, there may much sickness without their being any scarcity—the fellow doesnot understand perhaps; I am afraid these people don't understand their own language—I say ডুর্‌ভাখ্‌খা কেমন আছে—অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে?"

এখন চাসা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখম জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ডুর্‌ভাখ্‌খা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুর্‌ভাখ্‌খা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল কই আমরা ত ডুর্‌ভাখ্‌খার টেক্স দিই না; কিন্তু যদি বলি যে আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টোমাডের গ্‌ড়ামে ডুর্‌ভাখ্‌খা অধিক কিম্বা অল্প আছে?"

চাসা উত্তর করিল,

"হুজুর আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুর্‌ভাখ্‌খা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph! I

* গ্রামে।　　† দুর্ভিক্ষ

thought as much—" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বোজন করিল?" (উদ্দেশ্য "করাইল")

চাসা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, "টাহা আমি জানে—they eat, that I see—but who pays?—টাকা কাহাড়?"

এখন সে চাসা জানে যে যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্ধুকে যাইতেছে; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল,

"টাকা জমীদারের"

সাহেব। Ah! there it is; they do their duty—জমীদারের নাম কি?"

চাসা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে?

চাসা। তা ধর্ম্মাবতার প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

সাহেব। এগ্‌ড়ামের নাম কি?

চাসা। চন্নপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন,

For Famine Report.

"Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাসা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাসামহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এদিকে মীন্‌ওয়েল্‌ সাহেব যথাকালে ফেমিন্‌ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরামরায়সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, যে মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যানরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায়মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায়বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

৪। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা।

যে পুরুষ এবং যে রমণীর ইতিহাস লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, যাহাদের অদৃষ্টপট অভিজ্ঞানশকুন্তলরচয়িতা কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে দেখা হইয়াছে। সে পুরুষ পুরুষচরিত্রের আদর্শস্বরূপ এবং সে রমণী রমণীকুলের উচ্চপ্রতিমা তাহা দেখা হইয়াছে। দুইটি ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে শক্তির গুণে সেই দুই ভিন্ন জগৎ ভিন্নতাসত্ত্বেও এক হইয়া গেল, ভিন্ন পথ ছাড়িয়া একপথে চলিতে লাগিল, সে শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ এখনও দেখা হয় নাই। সে শক্তির নাম প্রেম। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের পরীক্ষা—অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের মনের এক অংশেরদ্বারা অপর অংশের পরীক্ষা। সে মনের এক অংশ দেখিয়াছি; এখন অপর অংশ দেখিতে হইবে। সে মনের সমস্ত দেখা হইয়াছে, কেবল রিপুমত্ততা দেখা হয় নাই। এখন সেই রিপুমত্ততার প্রকৃতি এবং পরিমাণ দেখাইব।

আশ্রমপ্রবেশকালে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়াতে তিনি ভাবিলেন—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাম্ দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥

ইহার অর্থ এই:—এই আশ্রমপদ শান্তিময়। এমন শান্তিময়স্থানে আমার বাহু স্পন্দিত হইল, ইহার ফল কি হইতে পারে, এখানে ত স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা নাই। অথবা এমন হইতে পারে যে, ভবিতব্যের বলে সকলস্থানেই স্ত্রীলাভ সম্ভব। দুষ্মন্ত ধার্ম্মিক; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। শাস্ত্র স্মরণ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভের কথা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের কারণ কি? এ বিস্ময়ের কারণ—'শান্তমিদমাশ্রমপদং।' অর্থাৎ, স্থানটি শান্তিময় তপস্যাশ্রম বলিয়া তাঁহার বিস্ময়। সংসারাশ্রমবাসী সংসারধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হইলে তাঁহার এ বিস্ময় হইত না। এ সকলই সম্ভব। কিন্তু এ বিস্ময়ের আরও একটু অর্থ আছে। তাহা "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র" এই কয়টি কথায় প্রকাশ। এ কথার অর্থ এই—স্ত্রীলাভ হইলে দুষ্মন্ত সুখী বই অসুখী হন না; স্ত্রী সত্ত্বেও দুষ্মন্ত পুনরায় স্ত্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন। শুধু

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ বলিয়া যে তিনি এইরূপ ভাবিলেন তা নয়। কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয় না হইলে তিনি বোধ হয় এইরূপ ভাবিতেন ঃ—"এ কি! আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয়? ইহার কি আর কোন অর্থ থাকিতে পারে? জানি না দেবতাদিগের কি অভিপ্রায়।" কিন্তু তিনি এরূপ ভাবিলেন না। কেবল তপস্যাশ্রম বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, বিবাহিত বলিয়া বিস্মিত হইলেন না। তিনি কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয়।

তার পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়কে দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহাও তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তার এবং রূপানুরাগের ফল। সে ভাব এই—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-
লতাভিঃ॥

যদি সামান্য আশ্রমবাসিনীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে দুর্লভ হইল, তবে যে দেখিতেছি উদ্যানলতা বনলতার কাছে পরাজিতা। অলোকসামান্যরূপরাশি দেখিলে লোকে চমৎকৃত হয়, মুগ্ধ হয়, মন্ত্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়, মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, অথবা উচ্ছ্বাসময় স্তুতিবাক্য নির্গত হয়। দুষ্মন্তের এ সকল কিছুই হইল না। তিনি তাপসবালাদিগের রূপরাশি দেখিয়া আপনার রূপসীদিগের নিন্দা করিলেন। আমরা এইরূপ বুঝি যে, যে পুরুষ বা যে রমণী অন্য স্ত্রী অথবা অন্য পুরুষ দেখিয়া আপনার পত্নীর অথবা আপনার পতির নিন্দা করে, তাহার লালসা অতিশয় বলবতী। বকুলতলায় সুন্দরকে দেখিয়া যে সকল কুলকামিনীরা আপন আপন পতির নিন্দা করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে কেহ কখন ভাল বলে নাই এবং ভাল মনে করে নাই। যাহাদের ভোগলালসা একান্ত বলবতী, তাহারাই উপভোগ্য বস্তুর তুলনা করিতে ভালবাসে। দুষ্মন্তের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সে জন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময় এই গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিদো সি ণং কহং॥

হে মধুকর! তুমি মধুর লোভে লালায়িত হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেই ভাবে চুম্বন করিলে, এখন কেবল কমলের

সহবাসে নির্বৃত্ত হইয়া বল দেখি কেমন কোরে সেটিকে একেবারে ভুলিলে?

মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গানটির অর্থ কি? দুষ্মন্ত বলিলেন—

সকৃত্কৃত প্রণয়োঽয়ং জনঃ।
তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহ-
দুপালম্ভনং গতোঽস্মি।
সখে মাধব্য মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা
নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্ত উপভোগসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত। তিনি একটি ভোগ্যবস্তু লইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নূতন ভোগ্যবস্তুর পক্ষপাতী। এই নিমিত্তই মহাকবি তাঁহাকে অগাঢ়প্রণয়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শকুন্তলার চিত্রদর্শনকালে বসুমতীর ভয়ে তাঁহাকে সেই চিত্র লুকাইতে দেখিয়া সানুমতী ভাবিতেছেন—

অন্ন সংকন্তহিঅআো বি পঢ়মসংভাবণং
অবেক্খদি।
সিঢ়িল সোহদো দাণিং এসো।

ইনি অন্যের প্রেমে তদ্গতচিত্ত হইয়াও পূর্ব্বপ্রণয়ের সম্মান রাখিতেছেন। এক্ষণে বসুমতীর প্রতি ইঁহার প্রণয় শিথিল হইয়াছে।

শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর মাধব্য পরিহাস করিয়া বলিল, যে যখন আপনার অন্তঃপুর স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তখন এই বালিকার প্রতি আপনার অনুরাগ কেমন?—না,যে ব্যক্তির মিষ্ট খর্জ্জুর খাইয়া অরুচি হইয়াছে, তাহার তেঁতুলের প্রতি অনুরাগ যেমন। তাহাতে দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন যে তুমি যদি তাহাকে দেখিতে তাহা হইলে এমন কথা বলিতে না। কিন্তু আমাদিগকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে মাধব্যের পরিহাস বড় পরিহাস নয় এবং সে পরিহাসের অর্থও যা, দুষ্মন্তের প্রতিবাদের অর্থও তাই।

ফলতঃ দুষ্মন্তের রূপতৃষ্ণা এবং ভোগলালসা অতিশয় বলবতী। সে ভোগলালসার আধিক্য দেখিলে তাঁহাকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি শকুন্তলাকে পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধপীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিকুমারদিগের অপমান করিতেছেন। তথাপি সেই শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্তরূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথম পরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি
হাতুম্॥

এই অক্ষত রূপরাশি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আমি কি ইহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি? কই মনে ত হয় না। ভ্রমর যেমন হিমাচ্ছন্ন কুন্দপুষ্পটি ভয়ে ভোগ করিতেও পারে না, আবার

ছাড়িতেও পারে না, তেমনি আমিও ফাঁপরে পড়িলাম।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে দুষ্মন্তের অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কণ্বের পবিত্র তপস্যাশ্রম কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতেন। এখন বোধ হয় কথাটি অত্যুক্তি বলিয়া কাহারও সংশয় থাকিবে না। রূপবতী রমণী দেখিলে দুষ্মন্ত লালসায় অধীর হইয়া পড়েন। কেবল উন্নতশিক্ষা, উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান এবং অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি তাঁহাকে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত করে।

শকুন্তলা রূপবতী; শকুন্তলা রূপবতীর মধ্যে রূপবতী। তাহাতে আবার তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে ভাব প্রথমে অস্ফুট। "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ," এই তুলনায় সেই ভাবের প্রথম অস্ফুট স্ফূর্ত্তি। এ রকম তুলনা নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ। যাহার সুন্দরী রমণী আছে সে যদি কোন নূতন রমণী দেখিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া নূতন রমণীকে প্রাধান্য দেয়, তাহা হইলে সেই তুলনাকে নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হয়। যেখানে নূতন বস্তুর তুলনায় পুরাতন বস্তু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইখানেই নূতন বস্তুতে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ তুলনায় স্পৃহাসূচক কিছুই নাই। এ তুলনা কেবল স্পৃহার পূর্ব্বগামী মানসিক অবস্থাব্যঞ্জক। তার পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাসম্বন্ধে যাহা ভাবিলেন, তাহাও স্পৃহাসূচক নয় কিন্তু তাহাতে স্পৃহার আভাস আছে। তিনি ভাবিলেন—

কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা।
অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য
ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃ
ক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্র ধারয়া
শমীলতাংচ্ছেত্তুমৃষির্ব্ব্যবস্যতি॥

ইহার মর্ম্ম এই যে এমন কোমলাঙ্গীকে কঠিন আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্ব অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কোমল নীলোৎপল পত্রের দ্বারা কঠিন শমীবৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব, এই কোমলাঙ্গীর দ্বারা সেই কঠিন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

তপস্যাশ্রমে তপস্বিকন্যাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের ন্যায় চিত্তসংযমক্ষম ধর্ম্মবীরের মনে একেবারে বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুষ্মন্ত স্ত্রীপ্রিয়। 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ' এই তুলনাতেই তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তা প্রকাশ। তবে যখন তিনি শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যার অযোগ্যা বলিয়া ভাবিলেন, এবং কণ্বকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিন্দাবাদের মূলে কিঞ্চিৎ আত্মদৃষ্টি নিহিত আছে। মানুষ যখন দুর্লভ অথবা এক অবস্থাপন্ন বস্তুকে

স্থলত অথবা অন্য অবস্থাপন্ন করিতে চায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ইচ্ছার মূলে সেই বস্তুপ্রাপ্তির স্পৃহা নিহিত আছে। যাহার কোন দূরস্থিত বস্তু পাইবার স্পৃহা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে এই বস্তুটী নিকটে থাকিলে ভাল হয় এবং ইহার নিকটে থাকাই উচিত। যাহার কোন উদ্যানস্থিত পুষ্প লইবার ইচ্ছা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে বড় মানুষের বাগান সাধারণের ক্রীড়াস্থল হওয়া উচিত। যাহার কোন অন্তঃপুরস্থিতা সুন্দরী বিধবা রমণীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় সে সেই রমণীর আত্মীয়দিগের কাছে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হয় এবং 'জেনানা সিস্‌টেমের' নিন্দা করিয়া থাকে। দুষ্মন্তের নিন্দাবাদের অর্থও সেই রকম। তাঁহার মনে এখন স্পৃহার উদ্রেক হইয়াছে। তার পর তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে কণ্বের অভিপ্রায় যাহাই হউক, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের মানসিক ভাব ঠিক তপস্বিকন্যার মতন নয়। তিনি এই কথোপকথন শুনিলেন—

শকু। সহি অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্হি সিঢ়িলেহি দাব ণং।

অন। তহ।

প্রিয়। এথ পওহরবিথারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।

শকুন্তলা বলিলেন—প্রিয়ম্বদা আমার বুকের বক্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, অতএব, অনসূয়ে, তুমি এটা একটু আল্গা করিয়া দেও। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন—তোমার নিজের যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে, তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে?

দুষ্মন্তের মন যাহা চায় এ ত তাই। তপস্বিকন্যারা আশ্রমধর্ম্মপ্রতিপালনে নিযুক্ত; কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ও তাঁহাদের মনে স্থান পাইয়া থাকে। তাঁহারা যৌবনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন এবং যৌবনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্পৃহাবান্ দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা কমিবার কথা। বস্তুতঃ সে আশঙ্কা কমিয়া স্পৃহা এবং স্পৃহাজনিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তপরে শকুন্তলাকে কেশরবৃক্ষমূলে কিঞ্চিৎ হেলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন এই কেশরবৃক্ষটীর একটি লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। তপস্বিকন্যাদিগের মানসিক অবস্থা আরও প্রকাশ পাইল। দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা আরও কমিয়া গেল; তাঁহার স্পৃহাবিচলিত মন আরও বিচলিত হইল; তিনি সেই বর্দ্ধিতস্পৃহার বলে শকুন্তলার ওষ্ঠ, বাহু, প্রভৃতি এক একটি অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু
সন্নদ্ধম্॥

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হয়, লোকে অনুরাগের বস্তু ততই তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। লোকে যখন কোন বস্তুর প্রতিঅংশে সৌন্দর্য্য দেখে, তখন বুঝিতে হয় যে তাহাদের মন সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুষ্মন্তের মনও এখন শকুন্তলার প্রতি প্রবল অনুরাগপূর্ণ। শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় অনসূয়ার মুখে শুনিলেন যে শকুন্তলা নিজে বৃক্ষের সহিত লতার বিবাহ দিয়া থাকেন—কোন বৃক্ষের পত্নী করিয়া দেন, কোন লতার পতি করিয়া দেন।

হলা শউন্তলে ইঅং সঅংবরবহু সহআরস্স তুএ কিদনামহেআ বনজোসিনী ত্তি ণোমালিআ ণং বিস্মরিদাসি।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন :—

তদা অত্তাণং বি বিস্মরিস্সং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীয়ে কখু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুনস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বনজোসিনী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো।

সখি, রমণীয় সময়েই এই লতা ও পাদপের মিলন হইয়াছে। দেখ, বনজ্যোৎস্না অঙ্গে নবকুসুমের যৌবন আর এই সহকার তরু নবপল্লবধারণ করিয়া সম্ভোগসুখের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে।

এতক্ষণ দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদার মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া শকুন্তলার মনের ভাবও অবশ্য বুঝিতেছিলেন। কিন্তু এখন স্বয়ং শকুন্তলার মুখে অনেক কথা শুনিলেন এবং শকুন্তলা কি করিতে ভালবাসেন তাহাও জানিলেন। জানিলেন যে শকুন্তলা বৃক্ষ এবং লতার মধ্যে বিবাহ দিতে ভালবাসেন এবং দেখিলেন যে তিনি নবমল্লিকা এবং সহকারের মিলন দেখিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ ভাবিয়া পরমহর্ষোৎফুল্ল। আবার দুষ্ট প্রিয়ম্বদা তখনি অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিল, যে শকুন্তলার নিজের উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাপ্তা বনজ্যোৎস্নার প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। এবং শকুন্তলা সেই কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—তোমার নিজের বুঝি সেই ইচ্ছা হইয়াছে। শকুন্তলার মানসিক অবস্থার বিষয় জানিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তাঁহার মন এখন মিলনকল্পনাপূর্ণ; তাঁহার ভাবনা এখন মিলনের; তাঁহার জীবন এখন স্বপ্নময় এবং সে স্বপ্ন নবপ্রস্ফুটিত যৌবনের অপরিস্ফুট সঙ্গীতে সঙ্গীতময়। সেই সঙ্গীতধ্বনি দুষ্মন্তের কর্ণে বাজিল। তাঁহার লালসা মিলনকামনায় পরিণত হইল। শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তিনি তখনি বিবাহসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রধান আশঙ্কা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহার মন এখন উৎসাহপূর্ণ। তিনি শকুন্তলার জাতি

নির্ণয় করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। লালসার বস্তুকে ঈপ্সিত অবস্থাপন্ন বুঝিতে পারিলে লোকে তাহা অধিকার করিবার জন্য সাহস এবং ব্যগ্রতাসহকারে উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। দুষ্মন্ত এতক্ষণে শকুন্তলার সহিত অধিকারের ভাব সংযোগ করিলেন। তার পর শকুন্তলাকে ভ্রমরতাড়না হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে নিক্রান্ত হইয়া তাপসবালাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোন প্রভাবশালী পুরুষবরকে দেখিলে ক্ষুদ্রবালিকার মনে যে চকিতের ভাব হইয়া থাকে, তাহা শমিত হইবার পরেই শকুন্তলা মনোবিকার অনুভব করিলেন :—

কিং ণু কৃখু ইমং পেক্খিঅ তপোবন বিরোহিণো বিআরস্স গমনীঅ ক্ষি সংবুত্তা।

ইঁহাকে দেখিয়া আমার তপোবন-বিরোধী মনোবিকার জন্মিল কেন ?

ক্ষুদ্র হরিণী একেবারে ব্যাধশরাহত। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার মনের ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের কাছে এবং দুষ্মন্তের কাছে লুকোচুরি আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদা কি অনসূয়া দুষ্মন্তসম্বন্ধে তাঁহার মনের মতন কথা বলিলেই তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সতৃষ্ণভাবে কিন্তু যেন চোরের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছেন। শকুন্তলাসম্বন্ধে দুষ্মন্তের এখন যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহার কেবল ইহাই জানা আবশ্যক যে শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা। এবং প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আরো বলিয়া দিল যে কণ্ব শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে অভিলাষী। কথাটি শকুন্তলার খুব মনের মতন হইল। কিন্তু তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আর দুইটি গাছে জল দিবার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া দিল। দুষ্মন্ত তাঁহার শ্রমকাতরতায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঋণের বিনিময়ে নিজের অঙ্গুরীটি প্রিয়ম্বদাকে দিলেন। প্রেমের স্নেহময় মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। অঙ্গুরীটি পাইয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শকুন্তলার এখন চলিয়া যাইবার সাধ্য নাই। তিনি রাগ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—

কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা।

আমাকে তাড়াইয়া দিবারই বা তুমি কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা তুমি কে ?

প্রথম প্রেমসঞ্চারের সময় রমণী অধিকতর লজ্জাশীলতাহেতু এইরূপ লুকোচুরিই করিয়া থাকে। রমণী শীঘ্র

মনের কথা বলিতে পারে না। রমণীর অস্তিত্ব হৃদয়গত। যে যত হৃদয়াধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর। সে কষ্ট রমণীমণ্ডলে লজ্জাব্রূপধারণ করিয়া লুকোচুরি প্রভৃতি রমণীর কুটিলতায় অভিব্যক্ত হয়। যেখানে রমণী পুরুষের সহিত বেশী মিশামিশি করে, সেখানে রমণীর বাহ্য অভিব্যক্তি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য রমণীর প্রেমের ইতিহাস, অথবা বলিতে গেলে রমণীর সমস্ত ইতিহাস, ইউরোপে এক রকম, এসিয়ায় কিছু ভিন্ন রকম। শকুন্তলা হিন্দুরমণী। সুতরাং তাঁহার প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু বেশী। এ লজ্জাশীলতা এবং লুকোচুরির আরো একটু তাৎপর্য্য আছে। যে দেশের ভাবে এবং শিক্ষায় শরীর আত্মার তুলনায় অতি অপবিত্র, সে দেশে শারীরিকসম্ভোগসূচক প্রসঙ্গমাত্রই কিছু লজ্জা উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং সেই নিমিত্তই সে দেশে প্রেমের সহিত লুকোচুরির কিছু ঘনিষ্টসম্বন্ধ। ইউরোপের ভাব এবং শিক্ষা এ রকমের নয় এবং সেই জন্য ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমপ্রসঙ্গে এক রকম প্রগল্‌ভা বলিলেই হয়। কিন্তু ভারতের এই ভাব এবং এই শিক্ষা। এবং শকুন্তলা ভারতরমণী এবং ব্রহ্মসেবানিরত তাপসবালা। সেই জন্যই দুষ্মন্তের নিকট হইতে গমনকালে তাঁহার পায় কাঁটা ফুটিল এবং তাঁহার বস্ত্র গাছের ডালে আট্‌কাইয়া গেল। তখন দুষ্মন্তও যেমন তাঁহাতে মজিয়াছেন তিনিও তেমনি দুষ্মন্তে মজিয়াছেন। তবে তিনি এক রকমে মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত আর এক রকমে মজিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্তকে দেখিবামাত্রই মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাঁহাকে দেখিবামাত্র মজেন নাই। দুষ্মন্তের প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে; সুতরাং সে প্রেম একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইনি যে দেখিতে পাই তপস্বিকন্যা, ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মণকন্যা—দুষ্মন্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিঘ্নকল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় কোন কল্পিত বিঘ্ন প্রকৃত বিঘ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা সে রকম কোন বিঘ্নকল্পনা করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মন একেবারেই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য কিছুই হইল না। বোধ হয় সে প্রেমের কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই প্রেমানলেই তিনি ভস্মীভূতা হইতেন। রমণী হৃদয়-প্রধান বলিয়াই দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পরে এমনি মুগ্ধ, যে কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ছাড়িয়া থাকিতে হইল। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে

চলিয়া গেলেন; শকুন্তলাও আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিচ্ছেদের পর যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মিলন হইল, সে পর্য্যন্ত দুইজনের ইতিহাস কতকটা একরকম কতকটা ভিন্নরকম। উভয়েই পরস্পরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই সেই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া উভয়েই শীর্ণ, দুর্ব্বল, আহার-নিদ্রাবর্জ্জিত।

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্য-
মুক্তস্তনং
মধ্যং ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ
পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়-
মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা
মাধবী॥

ভাবিয়া ভাবিয়া শকুন্তলার ত এই দশা হইয়াছে। দুষ্মন্তেরও তাই ঘটিয়াছে। প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিতেছেন:—

ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ দিট্‌ঠিএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅসাইং পজ্জাঅরকিসো লকৃখীঅদি।

এবং দুষ্মন্ত নিজে এই কথা বলেন:—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণ মণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভির-
শ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কণকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে॥

এ কি রকম চিন্তা? দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, শকুন্তলার সম্বন্ধে তত সহজ নয়। কারণ দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ চিন্তার বাহ্যস্ফূর্ত্তি আছে, শকুন্তলার সম্বন্ধে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াই নিজসখা মাধব্যের কাছে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শকুন্তলা নিজসখীদ্বয়ের কাছে কোন কথা বলিলেন না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপের কথা মনে করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন; আবার কি রকম করিয়া শকুন্তলার সহিত দেখা হইবে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যালোচনাই দুষ্মন্তের মনে প্রবল। সে পর্য্যালোচনার প্রকৃতি এই:—

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাব-
দর্শনায়াসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয় প্রার্থনা
কুরুতে॥
(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্ট-
জনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।
স্নিগ্ধং বীক্ষিত মন্যতোঽপি নয়নে যৎ-
প্রেষয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং
বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা
সখী
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী
স্বতাং পশ্যতি॥

মনে করিলেই প্রিয়াকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সে সদা তাঁহারই অনুরাগ-দর্শনে উৎসুক। এখনও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অনুরাগ দর্শন করিয়া একপ্রকার আনন্দে উন্মত্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হুঃ এই-রূপে প্রণয়ী ব্যক্তি প্রতারিত হয়। সে ভাবে তাহার আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহার প্রিয়-জনের মনেও অবিকল সেই সকল ভাবের উদয় হইতেছে। তিনি অন্য দিকে যদৃচ্ছায় নয়ননিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি ভাবিয়াছি সেটী আমাকে দেখি-য়াই। তিনি গুরু নিতম্বের ভরে মন্থর-ভাবে গমন করিয়াছেন, আমি মনে করিয়াছি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার গতি বিলাসে অলস হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আটকাইলে তিনি সখীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন, সেটীও আমার মনে হইল যে আমারই জন্যে। কামী ব্যক্তি আপনার ভাবে ভোর হইয়া সকলি আপনার বলিয়া দেখে।

এ পর্য্যালোচনার অর্থ—সন্দেহ। প্রে-মোন্মত্ত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়াও বুঝে না, নিশ্চিন্ত হইয়াও সন্দিহান হয়, আশ্বস্ত হইয়াও প্রতারিত মনে করে। শকুন্তলাকে জর্জ্জরিতাবস্থায় দেখিয়া দুষ্মন্ত একবার সন্দেহ করিয়া পরক্ষণেই নিশ্চয় বুঝিলেন যে মনোবিকারই এ অবস্থার কারণঃ—

বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। অথবা কৃতং সন্দেহেন স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপু-রিদম্।

সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-র্নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই যখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলাকে তাঁহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন শকুন্তলার উত্তর প্রতীক্ষায় দুষ্মন্ত ভয়াকুলিত হইয়া পড়িলেন, চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি॥

যাহারা চিরদিন ইহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী সেই সখীরা জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, ইনি এখন আর মনস্তাপের কারণটী লুকাইতে পারিবেন না। ইনি তৎকালে বারংবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিলেও এই সময়টা (ইনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য) আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

শুধু প্রেম কেন, সকল বিষয়েই মানুষ যাহার বেশী অভিলাষী হয় তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ও সন্দেহসংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শকুন্তলার বোধ হয় এ রকম সন্দেহ হয় নাই। এ রকম সন্দেহ

যুক্তিপ্রয়োগের ফল। রমণী হৃদয়সর্ব্বস্ব। সে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিলে রমণী হৃদয়ের বস্তু পাইবার জন্যই ব্যাকুল হন, পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা করেন না। যদি সে বস্তু পান, ভালই; নচেৎ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকেন, অথবা শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যান।* প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার অনুরোধে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়কে বলিলেন :—

তং জই বো অণুমদং তহ বচ্চহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পনিজ্জা হোমি। অন্নহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং।

অতএব তোমাদের যদি মত হয় ত যাতে সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহার উপায় কর, নতুবা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর।

তবে শকুন্তলার একটি সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি দুষ্মন্তের যোগ্যা কি না। প্রিয়ম্বদা যখন তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন, তখন তিনি বলিলেন :—

চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং।

আমি ভাবিতেছি। কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

কিন্তু এ সন্দেহ প্রকৃত যুক্তিমূলক সন্দেহ নয়। এ সন্দেহের নাম ভয়। যাহার অন্যের ইচ্ছার উপর জীবন এবং মৃত্যু নির্ভর করে, তাহার সেই ইচ্ছা জানিবার সময় এইরূপ ভয় হইয়া থাকে।

প্রেমসঞ্চারের পর মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতেছি তাহার আর একটী লক্ষণ যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার দুইটী কারণ—সন্দেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা। তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল কারণ। এই কারণ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই বর্ত্তমান। উভয়েই জর্জ্জরিত দেহ। উভয়েই উত্তপ্তশোণিত। উভয়েই জ্বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এ জ্বালায় দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির; শকুন্তলা প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলাঙ্গ, উত্থানশক্তি রহিত। দুষ্মন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রতিনিশ্বাসে প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন :—

(নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) সেই তাপসতনয়া যে পরাধীনা ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং তপস্যার কিরূপ উগ্রপ্রভাব তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথায় আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার শক্তি নাই। তথাপি সেই দুর্লভ বস্তু হইতে হৃদয়কে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না।

---

* বঙ্কিমবাবুর শৈবলিনী রমণী বলিয়া উন্মাদগ্রস্তা। সেও এই কথার একটি বিকল্পমাত্র। তাঁহার কুন্দনন্দিনীও এ কথার একটি প্রমাণ। কিন্তু যে সকল বঙ্গীয় কবি এবং উপন্যাসলেখক অসিদ্ধমনোরথ নায়িকাকে যোগিনী সাজাইয়া শ্মশানে মশানে পুষ্করে হরিদ্বারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান, তাঁহারা স্ত্রীপ্রকৃতি বড় একটা বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না।

(মদনপীড়া প্রকাশ করিয়া) হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আপনি এবং চন্দ্র, আপনারা উভয়ে নিজ কোমল ও বিশ্বস্তমূর্ত্তিতে প্রলোভিত করিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। আপনার শর সুকোমল কুসুমে রচিত এবং চন্দ্রের রশ্মি শীতল সুধাময়, কিন্তু আমার নিকটে ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। কারণ চন্দ্র হিমগর্ভ রশ্মিদ্বারা অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন আর আপনিও কুসুমশরকে বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন। তপস্বিগণ যজ্ঞকার্য্যের অবসানে আমাকে গমনে অনুজ্ঞা দিয়াছেন,এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শন ভিন্ন আর শান্তি কোথায়? এই দারুণ রৌদ্রের সময় শকুন্তলা সখীজনের সহিত প্রায়ই মালিনীতীরস্থিত নিকুঞ্জদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব সেই স্থানেই গমন করি। (গমন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করত) আহা! এই স্থানটী শীতলবায়ুর সঞ্চারে কি মধুর! আমার অঙ্গ সকল না কি অনঙ্গবহ্নিতে জ্বলিতেছে, তাই এই পদ্মসৌরভপূর্ণ মালিনীনদীর শীতল বাতাসটুকু বারংবার গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বোধ হয় শকুন্তলা এই বেতসলতাবেষ্টিত লতামণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন, কেন না, ইহার এই সিকতাময় দ্বারদেশে নূতন পদচিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে, আর এই পদচিহ্ন সকলের পূর্ব্বভাগ উচ্চ রহিয়াছে আর পশ্চাদ্ভাগ জঘনভরে বালুকায় বসিয়া গিয়াছে। অতএব লতান্তরালে থাকিয়া দেখি। (সেইরূপ করিয়া আনন্দে) আঃ! আমার চক্ষু জুড়াইল।*

যাহার অন্তঃপুর সুন্দরী রমণীতে পরিপূর্ণ তাহার এরূপ অবস্থা দেখিলে কে না বলিবে যে তাহার রিপু যথার্থই দুর্দ্দমনীয়, আসঙ্গলিপ্সা কিছুতেই মিটিবার নয়। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ রকম অবস্থায় মানুষ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঘোর-অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু এ অবস্থার, এ যন্ত্রণার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এ যন্ত্রণায় বাহ্য জ্ঞান অতিশয় তীব্র। যে চন্দ্ররশ্মি অন্য সময়ে 'খবরে' আসে না, যে শীতল বায়ু অন্য সময়ে গায়ে লাগে না এ যন্ত্রণায় সে চন্দ্ররশ্মি, সে শীতলবায়ু তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজগৎ ভয়ানক প্রভাবশালী। কিন্তু শকুন্তলার যন্ত্রণা এ রকমের নয়। শকুন্তলা 'মুমূর্ষুর ন্যায় শয্যাশায়িনী। দুষ্মন্তকে দেখিয়া অবধি তিনি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এক পা নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার বাহ্যিক দৃশ্য মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহার অন্তর বিষম জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে। সে জ্বালা এত প্রবল যে

*স্থানাভাবে ইহার মূল দেওয়া হইলনা।

তজ্জন্য তিনি একরকম বাহ্যানুভূতি-রহিত। সে জ্বালায় তিনি পদ্মপত্র-সঞ্চালিত বায়ু অনুভব করিতে পারেন নাই। সে জ্বালায় বাহ্যজগৎ তাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন। সে জ্বালায় একটি কথাও তাঁহার ওষ্ঠস্খলিত হয় নাই। দুই জনের যাতনার দুই রকম আকৃতি। একজন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায় এবং বাক্যে এবং নিশ্বাসে অগ্নি উদ্গীরণ করে। আর একজন যাতনায় মুমূর্ষুর ন্যায় শিথিলদেহ এবং মৃতের ন্যায় নিস্তব্ধ। দুই জনেই যেন আগ্নেয় গিরি। কিন্তু একটী গিরির গর্ভস্থ অগ্নি সতেজে শিখর ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং দূরে অদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; আর একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি শিখর ভেদ করিতে না পারিয়া সেই গর্ভকেই বর্দ্ধিতবিক্রমে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এখানেও দেখিতেছি যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষের অভিব্যক্তি আছে, রমণীর অভিব্যক্তি নাই। এই মূলীভূত বৈপরীত্য কালি-দাস যেমন আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আর কোন কবি তেমন দেখান নাই।

তার পর মিলন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার সম্মুখে দুষ্মন্ত বলিলেন:—

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্॥

যদিও আমি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এখন হইতে দুইটী বস্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল—একটী আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য আর একটী তোমা-দের সখী শকুন্তলা।

সম্মান প্রকৃত প্রেমের একটী প্রধান উপাদান। দুষ্মন্তের প্রেমের সেই উপা-দান এখন ব্যক্ত হইল। দেখিয়া প্রিয়-ম্বদা এবং অনসূয়া সরিয়া গেলেন। তখন রিপুযুক্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধরি-বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন:—

পোরব রক্‌খ অবিণয়ং মঅণসংতত্তা বি ণহু অত্তণো পহবামি।

পৌরব! শিষ্টাচার ভঙ্গ করিও না। আমি লালসাবতী সত্য, কিন্তু আমার নিজের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই।

এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ইতিহাস বলিয়া এইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম। শকুন্তলা বুঝিলেন না। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তো-মাকে এখন ছাড়িব না; ছাড়িব কখন, না—

অপরিক্ষত কোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

যখন তোমার কোমল অক্ষত অধরের

মধুপান করিয়া আমার খরতর পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তাঁহারই ন্যায় ভোগতৃষ্ণাতুরা হইয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জাশীলতা এখনও প্রবল; জ্ঞানহীনার জ্ঞান এ সময়েও পরিষ্কার। কিন্তু সংযতচিত্ত দুষ্মন্ত একেবারে বিহ্বলমতি; জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। যখন বাহ্যজগৎ ভুলিলে বিষম অনিষ্ট ঘটে তখন রমণী বাহ্যজগৎ ভুলে না, পুরুষ ভুলে। অবশেষে দুষ্মন্তের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। রিপু জয়ী হইল। ন্যায়পরায়ণ সংযতচিত্ত ধর্ম্মবীরের পদস্খলন হইল। সে পদস্খলনের কারণ সেই ধর্ম্মবীরের প্রবল রিপু। দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নয়; দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে শকুন্তলার আত্মসমর্পণক্ষমতা নাই। শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার অতুল রূপের বর্ণনা করিলে পর মাধব্য তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যত শীঘ্র পারেন সে রূপবতীকে দখল করিবার চেষ্টা করুন, বিলম্ব করিলে হয় ত সে কোন চিক্কণমস্তক ঋষির হাতে পড়িবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

পরবতী খলু তত্রভবতী।
ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

তিনি পরাধীনা এবং তাঁহার গুরুজন গৃহে নাই।

এখন শকুন্তলা স্বয়ং সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি সে কথা না শুনিয়া শকুন্তলাকে বুঝাইতেছেন যে তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম, তাঁহার গুরুজনের সম্মতি লইবার আবশ্যকতা নাই। এ রহস্যের অর্থ—দুর্দ্দমনীয় রিপু। শকুন্তলাকে কাছে পাইয়া দুষ্মন্ত তাঁহার উন্নত নীতি, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিচারশক্তি, অসাধারণ চিত্তসংযমক্ষমতা সকলই হারাইলেন। প্রখর রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি কি রকম ভাব তাহা দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপু পরবশ। তিনি ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া কণ্বের আশ্রম হইতে নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের উচ্ছেদ হয় নাই। শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছেন—সে হৃদয়ে শকুন্তলা-প্রেম জীবন থাকিতে উচ্ছিন্ন হইবার নয়। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া দুষ্মন্ত যে ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করেন তাহাই তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের গাঢ়ত্বের পরিচয়। কিন্তু মহাকবি সে পরিচয় অপেক্ষা একটি সহস্রগুণে আশ্চর্য্য পরি-

চয় দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাস্মৃতি হারাইয়াছেন। হারাইয়া একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মনোহর গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন। করিয়া তাঁহার মন এক অলৌকিকভাবে গলিয়া গেল। সেভাব এই ঃ—

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

কই আমার ত কোন ইষ্টবস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে এই গীতশ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হইল কেন? অথবা কোন রম্য বস্তু দেখিলে বা কোন মধুর শব্দ শুনিলে সুখের অবস্থায়ও যে মানুষের মন আকুল হইয়া উঠে, সে বোধ হয় তখন পূর্ব্বজন্মের কোন সুদৃঢ় প্রণয়ের বস্তুকে অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করে।

কি কোমল, কি গম্ভীর, কি পবিত্র-ভাব! এ ভাবের গাঢ়তা বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! যে বন্ধুত্ব জন্মান্তর-পরিগ্রহেও স্মৃতিপথে থাকে সে বন্ধুত্ব কত পবিত্র, কত গাঢ়, কত মিষ্ট। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শকুন্তলার অস্ফুট স্মৃতি আজিও তাঁহার মনকে এই অলৌকিকভাবে পরিপূরিত করিতেছে। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তচিত্ত আজ শকুন্তলাসম্বন্ধে মহাপ্রলয়গ্রস্ত। কিন্তু সেই মহাপ্রলয়কেও ভেদ করিয়া সেই প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রলয়েও সে রকম প্রেমের লয় নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম যথার্থই গাঢ়তম, পবিত্রতম, কোমলতম। কেনই বা সে প্রেম সে রকম না হইবে? শকুন্তলা শুধু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা দুষ্মন্তকে পরাজয় করেন নাই। তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তিনি সেই পুরুষপ্রধানকে পরাজয় করিয়াছেন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা যে কয়দিন দম্পতিভাবে কণ্বের আশ্রমে ছিলেন, তাঁহাদের সে কয়দিনের জীবন-প্রণালীর বিষয় মহাকবি কিছু বলেন নাই। সে বিষয়টি তিনি পাঠকের দৃষ্টি হইতে যবনিকাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। একটিবারমাত্র একটি মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনিকার একটি পার্শ্ব সরাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া মহাকবি এক আশ্চর্য্য নৈতিক বিপ্লব দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পুরুষপ্রধান, বীরপ্রধান দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে বসিয়া শকুন্তলাময় হইয়াছেন, পুরুষের পৌরুষভাব হারাইয়া রমণীর রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরবসভায় শকুন্তলা বলিতেছেন ঃ—

ণং একস্সিং দিঅহে ণোমলিআ মণ্ডবে ণলিনীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হত্থে সন্নিহিদং আসি তক্খণং সো মে পুত্ত

কিদহ্মো দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদহ্মো উবট্ঠিদো। তুএ অঅং দাব পটমং পিঅউ ত্তি অনুঅম্পিনা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্মিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেণ কিদ পণহ্মো। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্মসদি দুবে বি এত্থ আরণ্ণআ ত্তি।

একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকা-মণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকটে আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে সে আসিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জঙ্গলা কি না।

যে দুষ্মন্ত বীরবিক্রমে শাণিতশর হস্তে হরিণ তাড়না করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুষ্মন্ত সেই আশ্রমে বসিয়া একটি বালিকার সহিত বালিকার ন্যায় হরিণের শুশ্রূষা করিতেছেন! কঠিনহৃদয় পুরুষপ্রধান কোমলহৃদয় বালিকা হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় সসাগরা পৃথিবীর রাজাকে পরাজয় করিয়াছে! এই নৈতিক পরাজয়ের গুণেই দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম এত কোমল, এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ। সে প্রেম এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল। এবং সেই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ দুষ্মন্ত হিন্দুপতির পদগৌরব বুঝিয়াও কশ্যপাশ্রমে শকুন্তলার কাছে নতশিরে নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে প্রেমের তুলনা নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই। সে প্রেম একটি আশ্চর্য্য শক্তি। সেই শক্তির গুণেই কোমলতাময়ী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সে প্রেম একটি মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আহত হইয়া শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পান নাই। সে প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বিশ্বাস। দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া একটি অবধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলেন। এদিকে অবধারিত সময় অতীত হইয়া গেল। অনসূয়া দুষ্মন্তের উপর চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন :—

পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ণ মে উইদেসু বি ণিঅকরণিসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দানিং সাকামো হোদু

জেন অসচ্চসদ্ধে জণে সুন্নহিঅআ পদং কারিদা।

কিন্তু শকুন্তলার রাগ হইল না। তিনি পতিকে সন্দেহ করিলেন না, গালি দিলেন না। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে, সন্দেহশূন্যমনে পুনরায় পতিদর্শনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণকালে চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীকে সকাতরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি অনসূয়াকে বলিলেন :—

হলা পেক্খ নলিনীপত্রন্দরিদং বি সহঅরং অদেক্খস্তী আতুরা চক্কবাই আরড়দি দুক্করং অহং করেমি।

সখি, দেখ, চক্রবাক্ নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

এ কথায় রাগ বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। এ স্নেহের কথা, আদরের কথা, হৃদয়ের মিষ্টতার কথা। অবিশ্বাসীর সম্বন্ধে রমণী এমন কথা কয় না। আবার তখনই তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে যদি দুষ্মন্ত তোমাকে, চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও। কথাটি শুনিবামাত্র শকুন্তলা একটিবার মাত্র যেন শিহরিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া পথিমধ্যে সেই অঙ্গুরীয়টিই হারাইয়া ফেলিলেন! প্রেমময়ী সরলাবালা পৃথিবীকে সরলহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা দেখাইলেন। সে হৃদয়ে প্রেমের বস্তুসম্বন্ধে সন্দেহ স্থান পায় না। অগাধ প্রেম বিশ্বাসমূলক। যেখানে অগাধপ্রেম সেই খানেই এই রকম সরলতা। শকুন্তলার প্রেম এত অগাধ, এত বিশ্বাসমূলক, এত সরলতাময় না হইলে, তিনি সখীদ্বয়ের উপদেশ শুনিয়া অগ্রে অঙ্গুরীয়টি বস্ত্রাঞ্চলে আঁটিয়া বাঁধিতেন এবং মধ্যে মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতেন সেটি যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় কোন কোন বিজ্ঞ পাঠিকা বলিবেন যে শকুন্তলা বড় বোকা মেয়ে। আমরা বলি যে এমন সুমিষ্ট বোকা মেয়ে জগতের আর কোন কবির কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই। শকুন্তলা অগাধপ্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে অবিশ্বাস করেন নাই এবং পতির নিকটে অন্যায়াচরণ আশঙ্কা করেন নাই। সরলাবালার প্রথম আশঙ্কা পতির কথা শুনিয়া জন্মিয়াছিল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব যখন দুষ্মন্তকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন দুষ্মন্ত বলিলেন :—

কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

ইঁহাকে কি আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি?

এবং তখনই শকুন্তলা ভাবিলেন :—

হিঅঅং সংপদং দে আসঙ্কা।*

---

* Monier Williams এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন :—O my heart, thy

এখন আমার হৃদয়ের একটি আশঙ্কার কারণ জন্মিল।

শকুন্তলার প্রেমের আর একটি প্রধান উপাদান সম্ভ্রম। শকুন্তলা যাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে সেই হৃদয়ের পূজ্য দেবতা বলিয়া সম্ভ্রম করেন। দুঃখভাগিনীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখপূর্ণ সময়ে এই পতি-সম্ভ্রম তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত এবং মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল। পতিকর্ত্তৃক কুলটা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্তলা পতিহীনার ন্যায় মলিনবেশে ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল কঠোর ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিয়াছেন। সহসা সেই পতির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। কিন্তু দুষ্মন্ত অনুতাপে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তখনও তিনি পতিকে পতি বলিয়া ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দুষ্মন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি কি করিলেন? 'জেদু অজ্জউত্তো,' আর্য্যপুত্রের জয় হউক, অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিবার পর বাষ্পাকুললোচনার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। শকুন্তলার দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ এখন মুহূর্ত্তসম্বদ্ধ হইয়াছে। যে দুঃখ অনেক বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, সেই দুঃখ এখন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভোগ করিতে হইল। যেন সুদীর্ঘ স্রোতস্বতী সহসা একমুষ্টিপরিমিত স্থলে গুটাইয়া পড়িয়া বিপরীত তেজে উৎসাকারে উঠিতে লাগিল। এ রকম মুহূর্ত্ত একটি ভয়ানক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় রমণী প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি হয় মূর্চ্ছাপন্ন হন, না হয় পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছা নিবারণ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সে পরীক্ষায় শকুন্তলার সে রকম কিছুই হইল না। তিনি আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যসহকারে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ গাম্ভীর্য্যের মূল পতি-সম্ভ্রম। যেখানে সম্ভ্রমের আধিক্য সেইখানেই অসীম শক্তি, অসীম গাম্ভীর্য্য—সেখানেই দুর্ব্বলতা দেখাইতে লজ্জা হয়, মন আপনিই দৃঢ় এবং মহিমাপূর্ণ হইয়া উঠে। সে শক্তি, সে গাম্ভীর্য্য, সে মহিমা অতীব মনোহর। যখন দেহ এবং মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা তখন যে অটল এবং গম্ভীর হইয়া থাকে সে জগতের একটি প্রধান সৌন্দর্য্য এবং আরাধ্য বস্তু। শকুন্তলা হিন্দুপত্নী বলিয়াই এত অটল, এত গম্ভীর, কেন না হিন্দুপত্নীই পতিকে শ্রেষ্ঠতম

worst misgivings are confirmed. যেন শকুন্তলা পূর্ব্বাবধি এই রকম আশঙ্কা করিতেছিলেন! কিন্তু তাহা হইলে শকুন্তলার চরিত্র, শকুন্তলার হৃদয় কলঙ্কিত করা হয়। বোধ হয় পণ্ডিতবর সে চরিত্র এবং সে হৃদয় বুঝিতে পারেন নাই।

বলিয়া পরম সম্ভ্রমের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুপত্নীর হিন্দুপত্নীত্ব কেহ যেন ঘুচায় না! হিন্দুপত্নীকে ইউরোপীয় পত্নীর ন্যায় সাম্যবাদিনী করিলে তাঁহার হিন্দুপত্নীত্ব ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, শুভাদৃষ্টবশত জগতের শুশ্রূষা যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম তাহার পক্ষে পুরুষজাতির সম্বন্ধে সাম্যভাব অপেক্ষা সম্ভ্রমের ভাব বেশী উপযোগী এবং উপকারী।

শকুন্তলার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, স্নেহ অগাধ, সম্ভ্রমকারিতা অপরিমেয় কোমলতা অনির্ব্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী। সে হৃদয়ের কাছে পুরুষপ্রধান দুষ্মন্ত চিরকালের জন্য পরাজিত। সে হৃদয়ের মৃদুমধুর নিশ্বাসে দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ দুষ্মন্তহৃদয় এক আশ্চর্য্য নৈতিকবিপ্লবে চিরসংস্কৃত। সে হৃদয় জগতের একটি আবশ্যকীয় মহোপকারী নৈতিক শক্তি। পুরুষজাতির সংস্কার এবং উন্নতির নিমিত্ত সে হৃদয়ের সৃষ্টি।

রত্নতত্ত্ব।

আমরা বঙ্গদর্শনে যে "রত্নরহস্য" নামক প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করি, এ প্রস্তাব তাহারই অবয়বমাত্র। পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবে মুক্তাসম্বন্ধীয় কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মুক্তার জাতিনির্ণয় প্রভৃতি প্রকাশ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার দোষ, গুণ, বর্ণ ও মূল্যাদি নিরূপণবিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিত হইল। পুরাতনকালের তত্ত্ববিৎ লোকেরা কিরূপে মুক্তাপরীক্ষা করিতেন, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

মৎস্যপুরাণের মতে মুক্তাফলের গুণ প্রধানতঃ ৮ আটটী এবং দোষও প্রধান করে ১০টী। তন্মধ্যে ৪টী মহাদোষ এবং ৬টি মধ্যম দোষ, অগ্রে ইহার যথাক্রমে গুণ সকল বর্ণনা করা যাইতেছে পশ্চাৎ দোষের বিষয় বর্ণিত হইবেক।

গুণ যথা।

"সুতারঞ্চ ১ সুবৃত্তঞ্চ ২ স্বচ্ছঞ্চ ৩ নির্ম্মলত্বপা ৪।
ঘনং ৫ স্নিগ্ধঞ্চ ৬ সচ্ছায়ং ৭ তথা-
স্ফুটিত ৮ মেব চা।
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানা
মশেষতঃ।

মৎস্যপুরাণ।

রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা মুক্তাফলের যে ৮টি মহাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকের নাম এই—সুতার (১) সুবৃত্ত

(২) স্বচ্ছ (৩) নির্ম্মল (৪) ঘন (৫) স্নিগ্ধ (৬) সচ্ছায় (৭) ও অস্ফুটিত (৮)।

"সুতার" নামক গুণ কাহাকে বলে তাহা উক্ত হইতেছে যথা—

তারকাদ্যুতিসংকাশং "সুতার" মিতি গদ্যতে।"

গগনমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট হইলে, মুক্তার সে গুণটির নাম "সুতার।" এই সুতার-মুক্তা অতি দুর্লভ।

সুবৃত্তগুণ কি তাহাও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নি-গদ্যতে।"

যাহা সকল দিকে সমান সুগোল তাহা "সুবৃত্ত।"*

স্বচ্ছ গুণ যথা—স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং।" ৪ প্রকার মহাদোষ ও ছয় প্রকার মধ্যম দোষ না থাকিলে, তাহা "স্বচ্ছ' বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

নির্ম্মল গুণ যথা—"নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং।" মলরহিত হইলেই সে নির্ম্মল ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

ঘনগুণ যথা—"গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।" যাহা ওজনে ভারি তাহা ঘন। এই ঘন মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধগুণ যথা—"স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎস্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।" যাহা স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) ম্রক্ষিতের ন্যায় দেখায়, তাহা স্নিগ্ধ গুণ বলিয়া খ্যাত।

সচ্ছায়গুণ যথা—"ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।" যে মুক্তার কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা সচ্ছায় মুক্তা নামে কথিত হয়। (মুক্তাফলের ছায়া কি? তাহা ছায়া-পরীক্ষাস্থলে প্রকাশ পাইবে।)

অস্ফুটিতগুণ—"ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎস্যাদস্ফুটিতং শুভম্।"

যে মুক্তার ব্রণ অর্থাৎ কোন প্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন নাই বা কোন প্রকার রেখা নাই, সেই (বেদাগ) মুক্তা অস্ফুটিত বলিয়া গণ্য এবং তাহা অতীব শুভদায়ক। বস্তুতঃ বেদাগ মুক্তাই মূল্যবান্।

মুক্তাসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট ৮টি গুণের কথা বলা হইল। বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন অন্য কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহা থাকিলে রত্নতত্ত্বপরীক্ষকেরা তাদৃশ মুক্তাকে মহারত্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেই কয়েকটি মহাগুণ এই—

"ভ্রাজিষ্ণু কমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরতীব চ।
শ্রবতীব চ স্বস্থানি তন্মহারত্ন সংজ্ঞিতম্।"

অপিচ,

"শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশত-যোজিতম্।"
শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেব-ভূষণম্।"

* মুক্তাফলের গঠন নানাপ্রকার (নিষ্কল, চিপিটক, ধান্য, প্রভৃতি) হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুবৃত্ত গুণের মুক্তা অতি মূল্যবান্।

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিবিশিষ্ট। কোমল—লাবণ্যযুক্ত। কান্তং—ইচ্ছোদ্রেককারী গুণবিশিষ্ট। মনোজ্ঞ—মনোহর। যদি এই সকল গুণ থাকে, আর স্ফূরণ হয় অর্থাৎ যদি আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় এবং তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তবে তাদৃশ মুক্তা মহারত্ন নামে ব্যবহৃত হয়। এবং যে মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ আকারবিশিষ্ট ও চন্দ্র-রশ্মিতুল্য ছায়াযুক্ত হয়, সে মুক্তা দেব-ভূষণ অর্থাৎ দুর্লভ। ফলতঃ গ্রন্থান্তরে মূল্যবান্ উত্তম মুক্তার সাধারণ লক্ষণ এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং
সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রং।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং।
যন্মৌক্তিকং তদ্‌গুণবৎ প্রদিষ্টং।"

'প্রমাণবৎ' অর্থাৎ দেখিতে বড়। 'গৌরব, অর্থাৎ ওজনে ভারি। রশ্মি অর্থাৎ তেজোময় লাবণ্য। যদি এই কয়েকটি গুণ থাকে, আর বর্ণ শুভ্র, গঠনে সুগোল, ছিদ্রে সমান ও সূক্ষ্মতা থাকে, দেখিলে অক্রেতারও আমোদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মুক্তার গুণ আছে, বলা যায়।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে এইরূপ মুক্তাসম্বন্ধীয় বহুতর গুণের বিচার করা হইয়াছে, বৃথা প্রস্তাববৃদ্ধির ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। মুক্তাসম্বন্ধীয় যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তত্তাবতের মধ্যে গরুড়পুরাণোক্ত কয়েকটি প্রবল প্রবল দোষের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মুক্তাসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ, ৬টি মধ্যম দোষ, এবং এতদ্ভিন্ন দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষও আছে। যথা—

"চত্বারঃ স্যু র্মহাদোষাঃ ষন্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতা স্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।"
"শুক্তি১লগ্নশ্চ মৎস্যা২ক্ষো জঠরশ্চা৩তি রক্ত৪কম্।
ত্রিবৃত্ত৫ঞ্চ চিপীট৬ঞ্চ ত্র্যস্রং৭ কৃশক৮ মেব চ॥
কৃশ৯পার্শ্বমবৃত্তঞ্চ১০ মৌক্তিকং দোষ-বস্তুবেৎ॥"

মুক্তাসম্বন্ধে চারিটি মহাদোষ এবং ছয়টি মধ্যমদোষ। সর্ব্বসমেত দশটি দোষ রত্নপরীক্ষকগণ কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। এই দশটি দোষের নাম ও লক্ষণ ক্রমে বলা যাইতেছে।

শুক্তিলগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জঠর ও অতিরক্ত; এই চারিটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যস্র, কৃশ, কৃশ-পার্শ্ব ও অবৃত্ত, এই ছয়প্রকার দোষ মধ্যম বলিয়া খ্যাত। প্রথমোক্ত শুক্তিলগ্ন প্রভৃতির লক্ষণাদি কিরূপ? তাহা উল্লিখিত কল্পক্রমধৃত গরুড়পুরাণের প্রমাণেই নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

১ শুক্তিলগ্ন—"যত্রৈকদেশে সংলগ্ন শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে

শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ সদোষঃ
কুষ্ঠকারকঃ।"

যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে ভগ্ন শুক্তিখণ্ড (ঝিনুকের শক্ত) সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা "শুক্তিলগ্ন" নামে খ্যাত এবং তাহা কুষ্ঠরোগের আকর্ষক।

২ মৎস্যাক্ষ।—"মীনলোচনসঙ্কাশো দৃ-
শ্যতে মৌক্তিকেতু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ
স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবম্।"

কোন কোন মুক্তার কোন কোন প্রদেশে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় একপ্রকার চিহ্ন দেখা যায়। ঐরূপ দৃশ্যটিকে মৎস্যাক্ষ বলে। এই মৎস্যাক্ষ মুক্তা ধারণ করিলে ধারকের পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩ জঠর।—"দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠ-
রং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
তস্মিন্ সন্ধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র-
সংশয়ঃ।"

যাহার দীপ্তি ও ছায়াবিহীন, তাহার নাম "জঠর।" এই জঠর জাতীয় মুক্তা ধারণ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৪ অতিরক্ত।—"মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়
মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ।
দারিদ্র্যজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ-
পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

কোন কোন স্থানের মুক্তায় প্রবালের ন্যায় রক্তাভা জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মুক্তা রত্নশাস্ত্রে "অতিরক্ত" নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা ধারণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে বলিয়া এই শ্রেণীর মুক্তা বর্জ্জন করিবেক।

৫ ত্রিবৃত্ত।—"উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি ব-
লয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তৎপ্রোক্তং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ শুরের ন্যায় রেখা থাকে তাহার নাম "ত্রিবৃত্ত।" এই ত্রিবৃত্ত মুক্তাধারণে সৌভাগ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৬ চিপীট।—"অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ
চিপীটং যন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন
তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা।"

যাহা "চিপীট" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অবৃত্ত মধ্যে গণ্য (অর্থাৎ সুগোল নহে) যে মনুষ্য এই "অবৃত্ত" মুক্তা-ধারণ করে, সে সর্ব্বদাই অযশোভাগী হয়।

৭ ত্র্যশ্র।—"ত্রিকোণং ত্র্যশ্রমাখ্যাতং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

ত্রিকোণাকারে যে মুক্তার গঠন নিষ্পন্ন হয়, তাহা "ত্র্যশ্র" নামে খ্যাত। ত্র্যশ্র মুক্তা সৌভাগ্যের হানিকর।

৮ কৃশ।—"দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং
প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্।"

দীর্ঘাকার মুক্তা "কৃশ" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই মুক্তা বুদ্ধিনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৯ কৃশপার্শ্ব।—নির্ভগ্ন মেকতো যচ্চ কৃশ-
পার্শ্বং তদুচ্যতে।"

যাহার কোন এক প্রদেশ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা নির্ভগ্ন অর্থাৎ বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে "কৃশপার্শ্ব" বলা যায়। এই কৃশপার্শ্ব মুক্তাও নিন্দনীয়।

১০ অবৃত্ত।—অবৃত্তঃ পিড়কোপেতং সর্ব্ব সম্পত্তি হারকম্।"

† পিড়কাযুক্ত মুক্তাফল "অবৃত্ত" নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবৃত্তমুক্তা ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, মুক্তাসম্বন্ধে গুণ ও দোষ যাহা পুরাতন রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমুদয় সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইল। পূর্ব্বে যে মধ্যে মধ্যে মুক্তাসম্বন্ধীয় ছায়া ও কান্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় পরে বিশদরূপে ব্যক্ত করা যাইবে। ফলতঃ কান্তি ও ছায়ার প্রভেদ এই যে, মুক্তার লাবণ্যবিশেষের নাম কান্তি আর বর্ণবিশেষের নাম ছায়া। "ভরতরসপ্রকরণ" নামক গ্রন্থে মুক্তাফলের কান্তির সহিত উপমা দিয়া "লাবণ্য কাহাকে বলে?" তাহা বুঝান হইয়াছে। মুক্তাতে যে একপ্রকার টল্‌টলে চিক্কণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই স্ত্রীশরীরের লাবণ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদাস সেন।
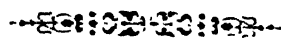
পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর।

শুনা যায়, বাঙ্গালার প্লীহাজ্বর ইদানীং দিল্লী, লাহোর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছে। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা স্পর্দ্ধার বিষয় বটে। ওলাউঠার জন্ম বাঙ্গালায়, এক্ষণে সেই ওলাউঠা পৃথিবী রসাতল দিতেছে। আবার বাঙ্গালার জ্বর বাঙ্গালার আল অতিক্রম করিয়াছে, এখন বাঙ্গালার নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বকণ্ঠে উচ্চারিত হইবে।

কুলবধূর ন্যায় বাঙ্গালার জ্বর চিরকাল বাঙ্গালায় বদ্ধ ছিল, কখন ঘরের বাহির হয় নাই, কখন এদিক ওদিক নজর করে নাই; এক্ষণে আবার এ নূতন প্রবৃত্তি তাহার কেন হইল বলা যায় না। বাঙ্গালির ছেলেরা ভারতবর্ষের সাবেক সীমা কেন উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়, কিন্তু জ্বর কেন আপন ঘরের বাহির হইল তাহা বুঝা যায় না।

বাঙ্গালার জ্বর পশ্চিমদেশে কেন গেল এই লইয়া এখানে সেখানে আন্দোলন হইতেছে; অনুসন্ধানে ইহা নিশ্চিত

† ফুসকুড়ির ন্যায় চিহ্নকে পিড়কা বলে।

হইয়াছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়ার পর পশ্চিমাঞ্চলে এই জ্বর গিয়াছে। কাজেই সকল তর্ক মন্দীভূত হইয়া শেষ দুইটি অকাট্য কারণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটি এই যে বাঙ্গালার জ্বর রেলের গাড়ি চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছে। অপর হেতু, এই যে রেলওয়েরদ্বারা পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হওয়ায় পশ্চিমে জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

উভয় হেতুই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গাড়ির সুবিধা হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালার জ্বর যে তীর্থযাত্রা করিতে যাইবে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আবার রেলওয়েদ্বারা পয়ঃপ্রণালী যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়। বিশেষতঃ, সকলেই বলে যে, কেবল রেলয়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেই এই জ্বর প্রবেশ করিয়াছে, দূরগ্রাম সমুদয় পূর্ব্ববৎ সচ্ছন্দে আছে।

কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, গাড়ী চড়ে জ্বর পশ্চিমে গিয়াছে; তাহারা সামান্য লোক হউক তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অধিক, অতএব বহুতর ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়িয়া অনকতক লোকের অনুসরণ করিতে পারা যায় না। আমরাও কাজেই বহুচেষ্টা করিয়া সেই বহুজনদলভুক্ত হইয়াছি।

আমরা একবার রেলওয়ে উঠিয়া হুগলী হইতে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, দুই এক ক্রোশ গেলে একটি ঝিল্লী অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকা মাঠ হইতে উড়িতে উড়িতে আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিল, এবং গাড়ীর ভিতর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিতেছে, কিন্তু তথাপি ঝিল্লী আপন বেগ বাড়াইল না; মাঠে যেরূপ নবাবি চালে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, উঠিয়া, নামিয়া উড়িতেছিল, সেইরূপ উড়িতে লাগিল এবং ক্রমে আমাদের সঙ্গে প্রায় দশ ক্রোশ পথ গেল। ট্রেণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি নীলকণ্ঠ বা কাক উড়িতেছিল, তাহারা দুই মিনিটের মধ্যে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু ঝিল্লী দশক্রোশ পথ ক্রীড়া করিতে করিতে গেল। মাঠে উড়িলে ঝিল্লী শতহস্তও ট্রেণের সঙ্গে যাইতে পারিত না; কিন্তু গাড়ীর ভিতর উড়িতেছিল বলিয়া দশক্রোশ গেল। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে, ঝিল্লী যে বায়ুতে উড়িতেছিল, সে বায়ু গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, মাঠের বায়ুর ন্যায় গাড়ীর পশ্চাতে পড়িতেছিল না। যদি এ কথা সত্য হয় যে, গাড়ীর ভিতরের বায়ু গাড়ীতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার বায়ু প্রত্যহ বহুপরিমাণে পশ্চিমে চালান যাইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। নিত্য ত অল্প গাড়ী যায় না! বাঙ্গালার বিষ এক্ষণে কাজেই পশ্চিমে অনায়াসলভ্য হইয়াছে। এই জন্য রেলওয়ের ধারেই বাঙ্গালার জ্বর প্লীহা, দেখা যায়, অন্যত্র একেবারে নাই।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তমবৎসর।

৭৯ সংখ্যা।

নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর মত।

রেণ্টকমিশনের রিপোর্ট বাহির হই- । প্রায় বৎসরাবধি ধরিয়া এই রিপোর্ট প্রস্তুত হইযাছে। যেমন বড় ঝড় বৃষ্টির আগে সব নিথর হইয়া যায়, জল থমথমে মারিয়া যায়, গাছপালার পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না, রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজনৈতিকক্ষেত্র সেই রূপই ছিল। যেমন নিস্তব্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে চারিদিক্ আলোড়িত হইয়া উঠে, নিস্তব্ধ সংবাদ-পত্রসমূহমধ্যে ২১শে জুলাইয়ের রিপোর্ট পড়িয়াও ঠিক তাহাই হইয়াছে। রিপোর্ট বিল ও কাগজপত্র লইয়া স্পেশাল গেজেটখানির পত্রসংখ্যা ৫০৪। সকলের পড়িবার অবসর হয় নাই, হইবার কথাও নাই অথচ সকলেই আপন আপন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেহ বলিলেন, হাজার রিপোর্ট কর, আর বিলই কর, রায়তের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে কিছু হইবে না। কেহ বলিলেন, বাপু যা ছিল বেশ ছিল, আবার কেন ঘুমন্ত বাঘ জাগান হয়। কেহ বলিলেন, জমীদারের সর্ব্বনাশ হইল, কেহ বলিলেন, প্রজার শোষণ করাই রাজার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে কলিকাতা রিবিউ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

The permanant settlement is a great accomplished fact in Bengal, and can already claim an antiquity of nearly a century ; it has only just recovered from the position of unstable equilibrium into which it was—we still cling to the belief—unintentionally thrown by the Act X of 1859. The elaborate draft Bill in two parts is designed to upset it, it does not

purpose this and that minor alteration in the multiform system of rights which has grown under the shadow of the permanant settlement, but it deliberately aims a decisive blow at its fundamental condition;

'—But that two handed engine
at the door
Stands ready to smite, once and
smite no more.'

অর্থাৎ দশসালা বন্দোবস্তে যে সব স্বত্ব জমীদারকে দেওয়া হইয়াছিল, ৫৯ সালের ১০ আইনেই তাহার প্রায় সবই লোপ হইয়াছে, যাও কিছু ছিল এইবার তাহাও গেল। আইন সাঁকারির করাত হইয়া দাঁড়াইল আগু হইলেও কাটিবে পিছু হইলেও কাটিবে।

এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্রের লেখা। যেমন কলমের জোর, তেমনি লেখার বাঁধনি, তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কিন্তু হইলে কি হয় লেখা দেখিলেই বোধ হয় কোন উকীলের বক্তৃতা; কেবল মক্কেলের দিকেই টান। লেখার সবই ভাল কেবল গৌতম আর আরিষ্টটালের পিণ্ডদান ও আদ্যশ্রাদ্ধ। আজি কালি যদি গৌতম ঋষি সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহাকে Fallacy chapterএর হেত্বাভাস ছল জাতিনিগ্রহস্থানের উদাহরণের জন্য আর কোথাও যাইতে হইত না। এক আশুবাবুর প্রবন্ধমধ্যেই সব পাইতেন। প্রবন্ধটী ইংরেজিতে লিখিত; কিন্তু ইংরেজি যেই পড়িয়াছে সেই হাসিয়াছে বাস্তবিক ইংরেজিতে তাহার খণ্ডন অনাবশ্যক। এইজন্য বাঙ্গালায়ই তাহার খণ্ডন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যুক্তিখণ্ডনের পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক State Literature এর উপর বড় চটা, তাঁহার মতে আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মিনিট, রিপোর্ট, ও অন্যান্য লেখালেখি চলে সে সকল ত্যাগ করাই লোকের কর্ত্তব্য। তিনি চান যে, লোকে আইনে যা আছে তাহারই অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করুক। কিন্তু আইনের অর্থবিষয়ে সন্দেহ হইলে যেখানে ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবে, সেখানেও মিনিট রিপোর্ট ইত্যাদির পাঠের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের মতে ঐ রিপোর্ট আদি অমূল্য, উহারা আইনের অর্থবৈশদ্য পক্ষে যেরূপ সাহায্য করে এত আর কিছুতেই করে না। লেখক ষ্টেট লিটরেচরের উপর চটা অথচ আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিও Pemberton Leigh সাহেবের মত উদ্ধার করিতে কসুর করেন নাই। (৩৫৯ পৃঃ)

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কণ্ট্রাক্ট বই ত নয়। যেমন নোট কণ্ট্রাক্ট তেমনি উক্ত বন্দোবস্তও কণ্ট্রাক্ট। চুক্তি অতি জটিল এজন্য অনেকে উহার অনেক

প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। তথাপি উহা চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এই চুক্তিতে বর্ত্তমান জমীদারদল যে লাভ-প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা তাহার পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের মতে উহা চুক্তি নহে উহা আইন; ব্যবস্থাপক সমাজদ্বারা বিধিবদ্ধ; উহা হইতে অনেক চুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু উহা নিজে চুক্তি নহে। যদি চুক্তি হয় কে কে সে চুক্তি করিল? গবর্ণমেণ্ট আর জমীদার। প্রজা এ চুক্তির মধ্যে কেহ নহে। যাহার দ্রব্য তাহার মত না লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সামান্য কর্ম্মচারীকে ভূস্বামী বলিয়া প্রকাশ করিবার গবর্ণমেণ্ট কে?

পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যদি চুক্তি হয় তবে উহা চোরের চুক্তি আইনমতে উহার কোন মূল্য নাই। যদি আশুবাবুর কথামত উহা চুক্তি,সিদ্ধ চুক্তিই হয়, তবে উহা দ্বারা কি প্রজাদের ভূস্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই। উহা কি যথেচ্ছাচার প্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? তাহা হইলে এক কলমের ঘায় ৩ কোটী প্রজার সমস্ত জমীস্থ স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া অল্প কতক ধনী লোককে ভূমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করা,ঘোর মূর্খতার কর্ম্ম হইয়াছে। এমন পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

আরও এক কথা, যদি এই বন্দোবস্ত চুক্তিই হয়—যদি উহা আশুবাবু যাহা বলিয়াছেন তাই হয়,—যদি সমস্ত ইতিহাসের মুণ্ডপাত করিয়া সমস্ত যুক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তথাপি জমীদারেরা চুক্তিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম রেগুলেশনের সপ্তম ধারায় লিখিত আছে—

To discharge the revenues at the stipulated periods without delay or evasion and to conduct themselves with good faith and moderation towards their dependant Talukdars and Ryots, are duties at all times required from the proprietors of land and a strict observance of those duties is now more than ever incumbent upon them in return for the benifits which they will themselves derive from the ordes now issued.

যদি দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তবে প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও সে চুক্তির এক করার। কিন্তু জমীদারেরা কি এই করারমত কাজ করিয়াছেন? তাঁহারা কি প্রজাদিগের প্রতি সত্য সত্যই good faith and moderation দেখাইয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজিও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে খোদকস্ত রায়তের নাম লোপ হইয়াছে। পরগণা

নিরীথ,—যাহার অধিক খাজনা আদায় করা চিরদিন আইনবিরুদ্ধ,—প্রথাবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ,—জমীদারেরা উঠাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র আইনসঙ্গত হউক আর নাই হউক, খাজনার বৃদ্ধি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় কত প্রজা দেশত্যাগ করিয়াছে। কত স্থানে গৃহদাহ গ্রামদাহ করিয়া তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের প্রতি এতই অত্যাচার করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় নির্জ্জীব, নিরীহ প্রজাগণও আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই কি তাঁহাদের good faith and moderation? কর্ণোয়ালিস তাঁহাদিগকে যে করারে দশশালা বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি দিয়াছেন সে করার কি ভঙ্গ হয় নাই? একপক্ষ হইতে করার ভঙ্গ হইলে সে চুক্তি কি বাতিল ও নামঞ্জুর হয় না? অতএব শুদ্ধ এই এক করারভঙ্গ অপরাধ বশতঃ দশশালা বন্দোবস্ত কি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়?

কিন্তু বাস্তবিক দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তি নহে--উহা ব্যবস্থাপকসমাজ হইতে বিধিবদ্ধ আইন। নচেৎ দুইপক্ষ চুক্তি করিয়া তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লোপ করা দস্যুর চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃত ভূস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করা চুক্তির কর্ম্ম নয়। আইন ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারে না। এবং দশসালা বন্দোবস্তের আইনে তাহাও করে নাই।

আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রজাই ভূমির মালিক। আমাদের যে মণ্ডল ও পাটোয়ারী প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজার স্বত্বই সাব্যস্থ করিয়া দিতেছে। জমীর দরুণ খাজানা (rent) আমাদের দেশে ছিল না। মনুতে তাহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত কোন পুস্তকে খাজানা দিবার উল্লেখ নাই। কাহার কত করে রাজস্ব দিতে হইবে,সেই সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন "ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠ দ্বাদশ এব বা," অর্থাৎ ধান্যের ষষ্ঠ অংশ অথবা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশ রাজাকে করস্বরূপ দিতে হইবে। রাজার জমী কর আর নাই কর তোমাকে রাজস্ব দিতে হইবে। এইজন্য ঋষিরা বনে কুড়াইয়া যে অকৃষ্টপচ্য ধান্য সংগ্রহ করিতেন, তাহারও ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিতেন। প্রজারা সকলই রাজাকে কিছু না কিছু দিত, কেহই রেয়াত পাইত না। কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সকলেই রাজস্ব দিত অথচ হয় ত তাহারা কেহই জমি করিত না। এইরূপ করের নাম বরং রাজস্ব revenue হইতে পারে কিন্তু উহা খাজানা নহে। সময়ে সময়ে বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট যেমন নানা প্রকার টেক্স বসান সেইরূপ আমাদের দেশে চিরস্থায়ী টেক্স ছিল জমির খাজনা স্বতন্ত্র ছিল না। সেই টেক্স বা রাজস্ব কখন কখন রাজারা বৃদ্ধি করিতেন।

সময়ে সময়ে তাঁহারা কর রেয়াতও করিতেন। প্রজা ক্ষীণ এবং রাজা অত্যাচারী হইলে দুর্ব্বহকরভার তাহারা কষ্টে সৃষ্টে বহন করিত কিন্তু ফাক পাইলে তাহারা বিদ্রোহ করিতেও ছাড়িত না। এই রূপে ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকার কালে প্রজার টেক্স ছাড়িয়া ভূমির টেক্স হয়,সেই টেক্স কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া, আকবরের সময় এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। ইহার নাম আসল জমা। ক্রমে মুসলমানেরা নানা কারণবশতঃ আরও কিছু কিছু আদায় করিত, তাহার নাম আবওয়াব। বৃটীষ গবর্ণমেণ্টও দেওয়ানী পাইয়া অবধি বরাবর ঐরূপ আবওয়াব আদায় করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম আইন দ্বারা যখন জমীর স্বত্ব চিরকালের জন্য জমীদারকে দেওয়া হয় তখন এই আবওয়াব ইত্যাদি সমস্ত আসল জমাভুক্ত হইয়া যায়। এবং তাহার পর আবওয়াব ইত্যাদি আদায় করা এককালীন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (১৭৯৩ শালের অষ্টম আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারা) অর্থাৎ প্রজার নিকটহইতে কোন বাবে আর অধিক কর লইব না, স্বীকার করাইয়া এবং সেই অবর্দ্ধনীয় কর নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার জমীদারের উপর দিয়া গবর্ণমেণ্ট জমীদারকে চিরদিনের মত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব দশশালা বন্দোবস্ত বলিলে উহা শুদ্ধ জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায় না উহাতে প্রজার সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়। এ কথা আমরা যে আজি বলিতেছি এরূপ নহে আমাদের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশুবাবু State Literature উপর বড় চটা। এইজন্য তাহা ছাড়িয়া আইনের কথা ধরিয়া দশশালা বন্দোবস্তের ঐ অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে আমাদের একটি কথা কেবল বলিতে হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি প্রজার সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল তবে জমীদারকে ভূস্বামী করিবার লাভ কি? প্রজার খাজানা যদি বৃদ্ধি করিতে না পারিলেন তবে জমীদার ভূস্বামী হইলেন আর না হইলেন তাহাতে ক্ষতিই বা কি, বৃদ্ধিই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে লর্ড কর্ণোওয়ালিস্ বাঙ্গালার জমীদারেরা যে কি ধাতুর লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জমীদারেরা যে আশী বৎসরের মধ্যে চিরপ্রচলিত পরগণানিরিখ উঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। খাজানা ও করসম্বন্ধে যে সব নূতন নূতন মত উনবিংশ শতাব্দীতে বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার সময়ে হয় নাই। তিনি শোর সাহেবের আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন জমীদারের উপস্বত্ব বৃদ্ধির দুইটী মাত্র উপায় থাকিবে। পতিত ভূমির পুনরুদ্ধার এবং উৎকৃষ্টতর শস্য উৎপাদনে প্রজাদিগকে প্রবর্ত্তন করা। জমীদার, যে খাজনা বৃদ্ধির জন্য উৎপীড়ন করিয়া আপনার লাভবৃদ্ধি

করিবে এবং প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে ইহা তাঁহার একেবারে অভিপ্রায় ছিল না। কার্য্যেও তিনি, তাহার কোন পথ রাখিয়া যান নাই। তৎপ্রণীত অষ্টম আইনের ধারাগুলি উদ্ধৃত করা উচিত কিন্তু স্থানাভাবপ্রযুক্ত কেবল দুইটী ধারা উদ্ধৃত করা গেল।

54. The impositons upon the Raiyats, under the denomination of abwab, mathout, and other appellations, from their number and uncertainty having become intricate to adjust, and a source of oppression to the Raiyats, all proprietors of land and dependent Talukdars shall revise the same in concert with the Raiyats, and consolidate the whole with the assal into one specific sum.

In large Zemindaries or estates the propriators are to commence this simplification of the rents of their Raiyats in the Parganas where the impositions are most numerous, and to proceed in it gradually till completed; but so that it be effected for the whole of their lands by the end of the Bengal year 1198 in the Bengal districts, and of the Fasli and Wilayate year 1198 in the Bihar and Orissa districts, these being the periods fixed for the delivery of pattas, as hereafter specified.

55. No actual proprietor of land or dependent Talukdar or farmer of land, of whatever description, shall impose any new abwab or mathaut upon the Raiyats, under any pretence whatever.

Every exaction of this nature shall be punished by a penalty equal to three times the amount imposed; and if at any future period, it be discovered that new abwab or mathaut have been imposed the persons imposing the same shall be liable to this penalty for the entire period of such impositions.

আশুবাবুও অনেক ধারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত যে ৫৪ ও ৫৫ ধারার উপর সমস্ত নির্ভর করে, সেই দুইটি না দিয়া তাহার কেবল marginal note দুইটি তুলিয়া দিয়া ঠিক উল্টা বুঝাইয়াছেন। আমরা ঐ ধারার ব্যাখ্যাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব।

যে সব নিয়মাবলীতে জমীদার বাধ্য হইবেন, তাহার প্রথম এই। আসলনামা ভিন্ন কেহ প্রজা বা তালুকদারের

নিকট খাজানা আদায় করিতে যাইতে পারিবেন না।

২য়। আবওয়াব ইত্যাদি আসল জমা ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৩য়। ১১৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সর্ব্বত্র আবওয়াব আদি জমাভুক্ত হইয়া যাইবে। কোন্ প্রজাকে কত জমা দিতে হইবে, তাহা স্থির এবং নির্ণীত করিতে হইবে।

৪র্থ। ইহার পর কেহ আর নূতন আবওয়াব লইতে পারিবে না। যদি কেহ লয়, তাহাকে ৩ গুণ জরিমানা দিতে হইবে। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণ হয় যে, কোন জমীদার বরাবর আবওয়াব লইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বরাবর যত আবওয়াব আদায় করিয়াছেন, সমস্ত জরিমানা দিতে হইবে।

৫ম। জমীদার ও প্রজার প্রায়ই খাজানামাত্র লইয়া সম্বন্ধ থাকিবে। প্রজা যে কোন প্রকার শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে এরূপ প্রথা আছে, যে অন্য প্রকার শস্য উৎপাদন করিলে অধিক রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে সেই প্রথাই বলবৎ থাকিবে।

৬ষ্ঠ। প্রজাদের রাজস্ব কি নিয়মে লইতে হইবে, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিবার পাট্টা দিতে হইবে। ঐ পাট্টায় প্রজাকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লেখা থাকিবে।

৭ম। পাট্টায় যেখানে হার ধরিয়া রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে হার এবং যেখানে শস্যে রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে শস্যদানের নিয়মের পাকা বন্দোবস্ত থাকিবে।

৮ম। জমীদারেরা পাট্টার উক্ত নিয়মানুযায়ী ফরম প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের অনুমতি লইয়া দেওয়ানী আদালতে রেজেষ্টরী করিবেন।

৯ম। জমা নির্ণীত এবং স্থিরীকৃত হইয়া গেলে জমীদার যদি প্রজাকে সেই জমীর পাট্টা না দেয়, তাহা হইলে রায়তের পাট্টা লইতে মোকদ্দমা করিবার সমস্ত ব্যয় জমীদারকে দিতে হইবে।

১০ম। রায়ত কিম্বা পেটাও ইজারদারদিগের সহিত এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা যদি এই সকল নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা বন্দোবস্তের মেয়াদের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। জুয়াচুরি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে, সে বন্দোবস্ত বলবৎ হইবে না।

১১শ। কোন জমীদার নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত খোদকস্ত রায়তের পাট্টা রদ করিতে পারিবে না। যে সকল কারণবশতঃ পাট্টা না মঞ্জুর হইবে তাহা এই। জুয়াচুরি করিয়া পাট্টা লইলে, পরগণা নিরিখ হইতে তিনবৎসরের মধ্যে রাজস্ব কম হইলে, জুয়াচুরি করিয়া রাজস্ব রেয়াত পাইলে, কিম্বা পরগণার জরীপ হইলে।

১২শ। ১১৯৮ শালের মধ্যে জমী-

দারেরা সকল প্রজাকে পাট্টা দিবেন। ১১৯৮ শাল অতীত হইয়া গেলে, প্রজার সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন প্রকার বন্দোবস্ত, আইনানুমোদিত হ-ইবে না। যে সকল জমীদার আবওয়াব ইত্যাদি জমাভুক্ত করিয়া প্রজাকে পাট্টা না দিবেন, তাঁহারা রাজস্বের জন্য নালিশ করিলে সে নালিশ না মঞ্জুর হইবে।

এই সমস্ত ধারার অর্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, জমীদারও প্রজার সহিত তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন। যে জমা স্থির হইবে তাহার উপর আর এক পয়সা লইতে পারিবেন না।

বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের কাগজপত্র দেখিয়া,মোট আদায়ের ৯ ভাগ নিজে লইলেন এবং একভাগ জমীদারের জন্য রাখিয়া দিলেন, কিন্তু প্রজার বেলা প্রজা কত দিতে পারিবে এবং তাহার উৎপন্ন কত কিছুই না দেখিয়া আবওয়াব ইত্যাদিতে সে যাহা যথার্থ দিত, তাহাই তাহার ন্যায্য দেয় বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। প্রজার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন যাহাতে না হয়, লর্ড কর্ণোয়ালিশ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্ণোয়ালিশের সমস্ত আইনগুলির মধ্যে প্রজার উপর রাজস্ববৃদ্ধির নামও নাই। বরং পূর্ব্বে আবওয়াব প্রভৃতি নানা কারণে প্রজার নিকট যে অধিক রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা চিরকালের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রজার খাজানা চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল আইনে কেবল ইহাই দৃষ্টি হয়।

নিয়মমত রাজস্ব দিলে প্রজার যোত উচ্ছেদ করা আমাদের দেশে কখন ছিল না, কর্ণোয়ালিশের আইনেও যোত উচ্ছেদের কোন বিধান নাই। যে কৃষক একবার কৃষিকার্য্যের জন্য* ভূমি লইল, সে যতদিন রাজস্ব দিবে,ততদিন সে ভূমি তাহারই থাকিবে এই আমাদের দেশে চিরন্তন প্রথা। যোত ছাড়াইয়া দেওয়া ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা, এ দেশীয় লোকের অরুচিকর, তবে প্রজা দুর্ব্বল ও জমীদার সবল এ জন্য প্রজারা জমীদারকে খুসী করিবার জন্য নজর প্রভৃতি সময়ে সময়ে দিত, কিন্তু রাজস্বের উপর একপয়সা বৃদ্ধি করিতে তাহারা কখন চায় না, এবং এখনও অর্থাৎ দশ আইন পাস

* মৌরসী, মকররী, মেয়াদী প্রভৃতি পাট্টা বাস্ত, উদ্বাস্ত, বাগাতপ্রভৃতি স্থলেই চলিত, কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি লইলে ঐরূপ পাট্টা চলিত নহে, কৃষকেরা প্রায় পাট্টা লয় না, ১৭৯৩, ১৮৫৯, ১৮৬৮ শালে পাট্টা লইবার এত সুবিধা করিয়া দিলেও অতি অল্প লোকেই পাট্টা লইয়াছে। কৃষকরায়ত একটু পুরাণ হইলেই তাহারা কদীমী রায়ত কহিত। তাহাদের স্বত্ব প্রায় মৌরুসীর ন্যায়।

হইবার পরও অনেক জায়গায় জমীদার চারিপয়সা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে চাহিলে প্রজারা জমীদারকে দশটাকা নজর দিবে, জমীদারের আমলাকে দশটাকা ঘুষ দিবে, তথাপি সে চারিটী পয়সা বৃদ্ধি দিতে চাহিবে না; কর্ণোয়ালিশের আইনে যখন ঐ নজরাদি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যখন আবার ১১৯৮ শালের মধ্যে আবওয়াব আদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্বের মোট স্থির করিয়া সেই রাজস্বে পাট্টা দিবার কথা রহিল, না দিলে রাজস্বের নালিশ চলিবে না এমত বন্দোবস্ত রহিল, তখন সে পাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয় ত কি?

প্রজাদিগের রক্ষার জন্য বিশেষ বিধান করা আবশ্যক বলিয়া লোকে যখন কর্ণোয়ালিশকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, তখন তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, শত শত বৎসর হইতে প্রচলিত স্থানীয় হার এবং পরগণানিরিখ কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই চিরন্তনপ্রথা প্রজাদিগের পরিত্রাণ করিবে। কিন্তু বাঙ্গালি জমীদার যে কতদূর স্বার্থপর, নৃশংস এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কত গর্হিত, ন্যায়বিরুদ্ধ ও জঘন্য কার্য্য করিতে পারেন তাহা উদারচেতা লর্ড কর্ণোয়ালিশ কিছুই জানিতেন না। জানিলে তিনি আর রাজস্বনির্ণয় এবং পাট্টাদান কার্য্যের ভার ঐ জমীদারদের হস্তে সমর্পণ করিতেন না; সেটা নিজেই করিয়া দিতেন। জমীদারদের হাতে দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, ঐ সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় নাই, যাহাও বা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার সর্ব্বনাশ বই আর কিছুই হয় নাই। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার কবডেন ক্লবের প্রবন্ধে এই রেকর্ড না রাখাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান ভুল ও বঙ্গীয় প্রজার প্রধান অনর্থ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রায়তেরা জানিত, জমী করিব খাজানা দিব। খাজানা বাড়ান, যোত ছাড়ান এ সকল তাহাদের পক্ষে নূতন; এবং যখন, দশশালা বন্দোবস্তে উহার কথা নাই, তখন উহা রায়তের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ক্যাম্বেল সাহেব লিখিয়াছেন, "There are in them (regulations) expressions which would seem to imply that no more is to be taken from any class of ryots, old or new, than the customary rates in the neighbourhood."

লর্ড কর্ণোয়ালিশ জমীদারী ফেরাবীর তলা পর্য্যন্ত বুঝুন আর নাই বুঝুন, তিনি জমীদারদের তত বিশ্বাস করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বটা ঠিক ঠিক আদায় হইয়া যায় সেই দিকেই তাঁহার অধিক নজর ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কতকটা নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি প্রজার রক্ষার্থ পূর্ব্বোক্ত ধারাসকল প্রণয়ন করিয়াও একটি ক্ষমতা নিজ

হস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেটি এই—

It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will whenever he may deem it proper enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of dependent Talukdars, Ryots and other cultivators of the soil, and no Zemindar independent Talukdar or actual proprietors of land shall be entitled on this account to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectably agreed to pay.

এই ধারার প্রকৃত অর্থ এই যে রায়তদের রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আইন করিবেন, জমীদার সেইজন্য অবধারিত খাজানা দিতে পারি না বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আশু বাবু বলেন উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ১৭৯৩ শালের দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধ হইতে একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এবং সেটি বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়াছেন। সেটি এই—

No power will then exist in the country by which the rights vested in the landholders by the regulations can be infringed or the value of the landed property affected.

অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে যদি জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাই এ দেশের মধ্যে কাহারও না রহিল তবে গবর্ণরজেনেরল ইন্ কৌন্সিল উক্ত স্বত্বে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? অর্থাৎ প্রজার রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনেরলেরও আইন করার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ৯৩ শালের প্রথম আইনের অষ্টম ধারার অন্যরূপ অর্থ।

কিন্তু আশুবাবু প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিবার সময় গোড়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা রিবিউ ৩৮৮ পৃষ্ঠা। "None but a fool or madman will deny the power of the legislature to redistribute property in land and indeed private property of every other description." কিন্তু তিনি আবার নিজেই বলিয়াছেন, যে দেশের মধ্যে জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। এইরূপে তিনি আপনার পদেই আপনি কুঠার মারিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় রেগুলেশনের উপরোক্ত যে পদটী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা "চক্ষুরোগেসমুৎপন্নে কর্ণৌছিত্বা কটিং দহেৎ।" এই অশ্ব চিকিৎসার বচনটি মনুষ্যচিকিৎ-

সায় ব্যবহৃত করিলে যেরূপ ফল হয় তদ্রূপ ফলপ্রসব করিয়াছে। আমরা স্থান অভাব প্রযুক্ত দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধটী তুলিয়া দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে পাঠকগণ দেখিতেন যে ঐ রেগুলেশন দ্বারা কেবল মাল আদালত উঠিয়া যায় ও তাহার কার্য্য দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হয়। তাহার মধ্যে প্রজার স্বাপক্ষ আইন করিবার ক্ষমতা কাহারও রহিল না এমন কোন কথাই নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

আশুবাবুর উদ্ধৃত পদের কেবল উপর এবং শেষ অংশ পড়িলেই উহার অর্থ বোধ হইবে—এই জন্য আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম, আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কথা কহিব না। উদ্ধৃত অংশটুকু এই—

The collectors of the revenue must not only be divested of the power of deciding upon their own acts but rendered amenable for them to the courts of judcature and collect the public dues subject to a personal prosecftion for every exaction exceeding the amonnt which they are authorized to demand on behalf of the public and for every diviation from the regulations prescribed for the collection of it; no power will then exist in the country by which the rites vested in the land-holders by the regulations can be infringed or the value of landed property affected.

অর্থাৎ কালেক্টর নিজে অত্যাচার করিয়া নিজেই বিচারপতি হইলে জমীদারের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার যে সম্ভাবনা তাঁহার থাকিত তাহা আর থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সমাজের এবং গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতার সহিত ঐ power শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। আশুবাবু তাহা পাকা উকীলের ন্যায় গোপন করিয়াছেন।

তিনি Right Hon'ble T. Pemberton Leaguerএকটি রায় হইতে একটি পদ উদ্ধার করিয়া বলেন যে রাজকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী সুন্দররূপে চালাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য East Indian Company জমীদারকে ভূস্বামীরূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদের সদর জমা চিরকালের জন্য স্থির করিয়া দিয়া সুশাসনের সর্ব্বপ্রথম সোপান করিয়া দিলেন। তিনি বলেন এই প্রথম সোপান ১৭৯৩ শালের ২২ শে মার্চের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণা পত্র!! আশুবাবু ঘোষণাপত্রেরও কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু অষ্টমধারার কি অর্থ তিনি করেন, কোন স্থানেই খুলিয়া বলেন নাই। তিনি বলেন আমরা উহার কি অর্থবোধ করি তাহা

ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িলেই অনুমান করিতে পারা যাইবে। এরূপ অর্থ অনুমান করিয়া লওয়ার ভার পাঠকের হস্তে দেওয়া বড় মন্দ নহে। তাঁহার ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া আমরা ত বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে যেন একটু একটু বোধ হয় যে, লোকে বুঝিবে জমীদারেরা পূর্ব্বে পুলিষ-বিচার প্রভৃতি যে সকল রাজকীয় ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই ক্ষমতা উচ্ছেদ করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিবার ভার গবর্ণর জেনেরল রাখিলেন। কিন্তু প্রথম রেগুলেশন বরাবর পড়িয়া আসিলে কখনই এরূপ অর্থ হয় না। সমস্ত প্রথম রেগুলেশনের মধ্যে জমীদারের দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদির নামও নাই গন্ধও নাই। সুতরাং মাঝে হইতে তাহার অষ্টমধারার জমীদারের ফৌজদারী ক্ষমতা নিষেধরূপ অর্থ কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি করিবার সময় জমীদারকে তাহার অনেক মূল্য Valuable consideration দিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার একটি এই যে হাজা সুখা, জন্মা অজন্মা, সমস্ত সত্বেও লাটের ঠিক তারিখে রাজস্ব আদায় দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জমীদারী নিলাম হইবে, আর যদি নিলামে রাজস্বের বাকি টাকা না উঠে তবে জমীদারের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। আশুবাবুর মতে এই Valuable consideration। তাঁহার মতে ইহা অতি কঠিন নিয়ম। কিন্তু মুরশিদ কুলিখাঁর বৈকুণ্ঠ, মুঙ্গেরের হাজত, কয়েদ, জমীদারী খাস করা, জমীদারীর খাস বন্দোবস্ত, জমীদারীর স্বত্বলোপ,* এ সকলের চেয়েও কি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এত কঠিন? হইতেও পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সাবেক আমলে জমীদারকে নবাব কয়েদ করিত, মারিত, না হয় অপমানই করিত। মুসলমানেরা ত টাকা লইতে পারিত না, সুতরাং তাহা অপেক্ষা কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দেওয়া বড়ই শক্ত। বড়ই Valuable consideration।

আশুবাবু যে আর এক কথা কেন বলেন নাই তাহা বলিতে পারি না। ৯৩ শালের চতুর্দ্দশ আইনের নবম দশম একাদশ ধারায় জমীদারকে বাকী খাজানার দায়ে কয়েদ করার যে কথা ছিল সেও ত দশশালা বন্দোবস্তরূপ চুক্তির এক অংশ। ১৭৯৪ শালের তিন আইনের ৩ ধারায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কয়েদ করার ক্ষমতা ত্যাগ করার দরুণ জমীদারের নিকট কি কিছু ক্ষতিপূরণ লইয়াছেন? লন নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট এখন প্রজার রক্ষার জন্য আইন করি-

---

* আমরা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পড়িয়াছি যে অনেক স্থলে মুসলমানেরা দুষ্ট জমীদারের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজাকে দিয়াছেন।

তেছেন জমীদারগণ নানা কথা তুলিতেছেন কেন? তাহার পর আশুবাবু footnoteএ লিখিয়াছেন।—

It would be interesting to compute the sum total of other real or personal property sold in the 75 years between 1793 and 1868।

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, জমীদারেরা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপায়ে যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত অংশ তাঁহার শতাংশের অর্দ্ধাংশও নহে। আর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রজার কি হইয়াছে, জমীদারেরা যাহা লোকসান দিয়াছেন তাহা আইন অনুসারেই দিয়াছেন। কিন্তু প্রায় তিন কোটী প্রজা তাঁহাদের শাসনের গুণে তাঁহাদের দয়াধর্ম্মের গুণে জমীর মালিক ঘুচিয়া প্রায় ইচ্ছাধীন রায়ত tenant at will হইয়া উঠিয়াছে।* অধিকাংশই লাঠী জুতা ও গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা ও মাঙ্গন মাথট ভিক্ষা গোমস্তার পার্ব্বণি হিসাবানা নজর ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ আদায়ের চোটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এত পুলিষ,দেওয়াণী ও ফৌজদারী কাছারী স্থাপন করিয়াও ত প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। এখনও জমীদারের নায়েব গোমস্তা মফস্বলে হর্ত্তা কর্ত্তা; এখনও নানা স্থানে তাহারা জরিমানা করে রামের ধন শ্যামকে দেয়, শ্যামের ধন হরিকে দেয়। কিন্তু গরিব প্রজাদিগের জন্য কথা কহেন এমন লোক কোথায়? জমীদারের দুগ্ধে চিনির ত্রুটি হইলে তাহা লইয়া চীৎকার করিবার লোক দেশশুদ্ধ মিলিবে কিন্তু গরিব প্রজার যে পান্তাভাতে একটু লবণও জুটিয়া উঠে না তাহা কে দেখিবে! কে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবে, কে তাহাদিগের দুঃখনিবারণ করিবে! যাহারা প্রজাদের একমাত্র ভরসা সেই শিক্ষিত যুবকদলও ক্রমে নানা কারণে জমীদারদিগের দলের সেনাপতি বা অন্নদাস হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

হে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল নির্জীব রায়তবৃন্দ! তোমরা ভরসা ত্যাগ কর। তোমাদের কেহই বন্ধু নাই,তোমাদের হইয়া দুকথা কয় এমন লোক একটিও নাই। ইংরেজী শিক্ষায় দেশের যে উন্নতি হইতেছে সে তোমাদের জন্য নহে। সে ধনবানের জন্য। জানিও, শিক্ষিতলোক জমীদার বা তালুকদারের জন্য। কেন না তাহারা পয়সা ব্যয় করিতে পারে। শিক্ষিতলোক তোমাদের কেহ নহে। তোমরা নিজে বুদ্ধিমান্ হইতে চেষ্টা কর লিখিতে পড়িতে ও আপন স্বত্ব বুঝিয়া লইতে শিখ। তোমরা নিজে আপন সাহায্য করিতে পারিলে ঈশ্বর তোমাদিগের সহায় হইবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট

* হপ্তমের অত্যাচারে যে কত প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার তালিকা লইলেও it would be interesting to compute.

তোমাদের রক্ষার্থ নানা যত্ন করিয়াও তোমাদের রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তোমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিলে তাঁহারাও সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন। তোমরাও বাঁচিয়া যাও নচেৎ তোমাদের ভরসা নাই। আশা নাই।
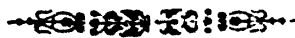
অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৫। ইহার অর্থ।

চতুর্থ প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ, কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধার্ম্মিক নন। তিনি বহুস্ত্রীসত্বেও শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেচ্ছাচারী দুরাচারের আসক্তি নয়। এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। এখনও বলি যে রিপুগ্রস্ত দুষ্মন্ত অসাধারণ চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার রিপু এবং ধর্ম্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়াছিল। ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়া দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়াছিল। সে পরিণয়ের অর্থ—ঘৃণাস্পদ-কামোন্মত্ত যথেচ্ছাচারীর কদর্য্যবাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণিক সম্বন্ধ নয়। সে পরিণয়ের অর্থ—জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের ফল কি হইল?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক নায়িকার যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদ। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া শকুন্তলা কশ্যপাশ্রমে থাকিয়া অনেকবৎসর ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনার ন্যায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়া অনাথার ন্যায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুষ্মন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্ব্বলোকোপেক্ষিতা অধমতমা কাঙ্গালিনীর ন্যায় ধূলিধূসরিত অঙ্গে মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়াছিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত।

নিরপরাধা সতী সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্ম্মিক-প্রধান দুষ্মন্ত অনুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জ্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্রপরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়কনায়িকার আত্মীয় বন্ধুগণের যন্ত্রণা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোক-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুষ্মন্তের অবস্থান কালে শকুন্তলার যে পীড়া হয় তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ কথা জ্ঞাপন করিলেন তখন যে পবিত্র ব্রহ্মচিন্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপস্যাশ্রম অকিঞ্চিৎকর সংসারাশ্রমের ন্যায় মোহমুগ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কণ্বের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল! শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' আর প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া যে কি করিয়াছিল তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কন্যার নিমিত্ত যারপর নাই কাতর এবং শোকাকুল। তিনি কন্যার দুঃখে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সানুমতীকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়াদিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভাল বাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল,শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুষ্মন্তের রাজপুরীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাতুর। তাঁহার রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চির-প্রচলিত-বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনা-পুরের রাজবাটী যেন একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ!

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল। আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত মহা পরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য্য ভুলেন নাই। আমরা বলিয়াছি যে সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও আমরা সেই কথা বলি। কিন্তু আরো একটি কথা আছে। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্ত্তন হয়, বৃদ্ধ কঞ্চুকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিলেই চলিবে:—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভি র্ন প্রত্যহং সেব্যতে।

তিনি এখন পূর্ব্বের মত মনোহর বস্তুতে প্রীত হন না এবং অমাত্যবর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্তের যন্ত্রণা রাজকার্য্যবিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। অমাত্যগণের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়েই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্টসাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ অমাত্য-বর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থা-ভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও এককালে দোষশূন্য নয়—ঘোর অনিষ্টকারী না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যবিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুষ্মন্তের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থা-ভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার যন্ত্রণা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়া-ছিল। তিনি ধর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর সে কোন অবস্থাতেই চিত্ত-ধর্ম্ম একেবারে হারায় না। দুষ্মন্তও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষায় গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্ত-ধর্ম্ম বর্দ্ধিতগৌরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যন্ত্রণাবিহ্বলাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করেন তখন এইরূপ বলিয়াছিলেনঃ—

বেত্রবতি মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দী-য়তামিতি।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আর্য্য পিশুনকে গিয়া বল যে অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় হ-ইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

যন্ত্রণায় দুষ্মন্তের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই এবং সেই জন্য তিনি আজ বিচারা-সনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর কি লঘুতর সকল কার্য্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল গুরুতর কার্য্য পর্য্যালোচনা করি-তেছেন। প্রজাবৎসল রাজকার্য্যানুরক্ত দুষ্মন্ত আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য করিতে বাধ্য। তবে দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান, চিত্তসংযমে অমিতবল, রাজধর্ম্মপ্রতি-পালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধান পুরুষপ্রধা-

নই রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত না হইলে আজ ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিল :—স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার আত্মীয়-স্বজনের অমঙ্গল; ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল। কার্য্য দুইটী লোকের কিন্তু তাহার ফল কোটি কোটি লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুলিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেই প্রকার হইয়াছিল। "By the introduction of the Prince in his political power, Shakspeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered: the Prince intercedes between the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution of society and the common good."* সেক্সপীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেন না তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নায়কের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে তাঁহার পাঠক সেই মহাসত্য বুঝিতে পারেন। সে সত্য এই—ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দেখিলাম যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাসা এই—বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্ব্বাসার শাপ। দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তপস্যাশ্রমে সর্ব্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা

* Dr. Ulrici র Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠা।

করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুষ্মন্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনসূয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিস্সং অগ্‌ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি।

আপনার ন্যায় অতিথিলাভে তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে। ওলো শকুন্তলে, উটজে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর। এই পা ধুইবার জল।

আবার যখন শকুন্তলা রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন অনসূয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

সখি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

মহাকবি দেখাইলেন যে শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্ত্তব্যতা এবং উৎকর্ষ সকলই বুঝেন। তার পর তিনি দেখাইলেন যে শকুন্তলা দুষ্মন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন, অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, সে যদি সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন তাহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, অগ্রে সমাজ পরে আপনা — অগ্রে পরের চিন্তা পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দ্বারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অশুদ্ধ, অতি নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এ কথার অর্থ এই যে প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটী প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন। তিনি পবিত্রমনে পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন পবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ ছিল। সেই জন্য তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন

করিয়া থাকেন তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে ভুলিবেন তাঁহারই অদৃষ্টে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটী অর্থ এই যে, রমণীর ন্যায় যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ হয়, তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ। রমণীর যে অন্তর্লীনতার ভাব তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা আত্মসম্বন্ধে হইলে সমাজবিরোধী। সে ভাব অধিক প্রশ্রয় পাইলে সমাজের অনিষ্টসাধন করে। সেই নিমিত্ত সে ভাবকে শিক্ষা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষা সহজে লাভ হয় না এবং হইবার নয়। শকুন্তলা জন্মাবধি পরোপকারব্রতে ব্রতী থাকিয়াও সে ভাব দমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে, দাম্পত্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিকপরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অনুচিত। আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দি না, কেন না আমরা ইহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহমুগ্ধকারী বলিয়া সমাজসম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর। এবং সেইজন্যই আমরা বলি যে দম্পতির প্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অনুকূল করা কর্ত্তব্য। দুষ্মন্ত-নিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই। তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।

শকুন্তলার মোহ দুর্ব্বাসার শাপের একটী কারণ বটে। কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর একটী কারণ আছে। শকুন্তলা সমস্ত বাহ্যজগৎ ভুলিয়া দুষ্মন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে দুষ্মন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন। দুষ্মন্তও তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন। শুনিয়া দুষ্মন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ।

বেশ কথা।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই। দুষ্মন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গুরীয় সওয়ায় যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না। দুষ্মন্ত নিজেইত পরে মাধব্যকে বলিয়াছিলেন– মাধব্য তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই, এবং প্রখরবুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়াছিলেন যে আপনি

শকুন্তলার বিষয়ে আমাকে যে রকম বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে তাহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অন্য প্রমাণ থাকিলে দুর্ব্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্য্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের অন্য প্রমাণ ছিল না, কেন না সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? না দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপু। দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপুই দুর্ব্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ভূত সমস্ত অনিষ্টের অবান্তর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুষ্মন্ত রিপুগ্রস্ত বটে কিন্তু দুরাচার নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলনপ্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতরাজ্যের রাজ্ঞী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ হইয়া তিনি কণ্বের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন, শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং সমস্ত ভারতরাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয় সকল সময় এক কথা কয় না।

অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।

(অভিজ্ঞানশকুন্তল, পঞ্চমাঙ্ক)

যাহার হৃদয় অপরিজ্ঞাত তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরিতায় পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা। সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্যচরিত্রে যাহা কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দুষ্মন্তচরিত্রের বিশ্লেষণে আমরা এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আত্মেতর ভাবের কাছে আত্মভাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতালাভ করে না। সমাজসেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্ত্বসংযুক্ত হয়। নচেৎ পশুপ্রবৃত্তির ন্যায় হেয় হইয়া থাকে। দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে হীনতা এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেন না তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না। সমাজই উন্নত-

নীতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্দীপক। এবং সেই জন্যই সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত* স্ত্রীপুরুষের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণি গ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য।

কিন্তু দুষ্মন্ত যে চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, ইহা কি ভয়ানক কথা! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই। দুষ্মন্ত সকল গুণের আধার। তিনি রাজা হইয়া, সমগ্রভারতের রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসবিদ্বেষী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্রি বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং বিচিত্র প্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদপ্রমোদ গুলিও পুরুষত্বব্যঞ্জক। বিশাল ধনুর্ব্বাণহস্তে মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়; শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসীমসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অনুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থ আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিতে পারেন। তিনি গুরুজনসম্ভ্রমকারী কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশীল। তিনি সৎপ্রবৃত্তির প্রশস্ত আধার—বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি আত্মশাসনে বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ। তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে স্খলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপুর কি অসীম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দুমনীয় কার্য্য! এ কথা অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটেও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্য

* সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত উদ্বাহ—এ কথা বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজসংস্কারক-নিন্দিত হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। বাইবেলের ত কথাই নাই—তাহাতে লেখে যে বিবাহ না করিতে পারিলেই ভাল হয়।

জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল বলিয়া রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞান শকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতেও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব রোমিও এবং জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে বাহ্যজগৎ অনুকূল থাকিলে রিপুসেবা দূষণীয় নয়। কিন্তু উন্নত-নৈতিক-নিয়ম-শাসিত আধ্যাত্মিক জগৎ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয়ের সম্বন্ধে যাহা দূষণীয় তাহা সকল সময়েই দূষণীয়। বাহ্যশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্ব্বল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল। মানবপ্রধান মনু বলিয়াছেন--

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

এবং কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন:—

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়াঃ।
নে দৃশারাজ সৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ।

অতএব বাহ্যশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়কনায়িকার জন্য দুঃখিত হই। কিন্তু দুষ্মন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত ভাবিত হই। যখন দেখি যে রোমিওতে প্রণয় এবং রিপুন্মত্ততা বই আর কিছুই নাই তখন মনে হয় যে আর কোন মানসিক শক্তি থাকিলে রোমিওর ন্যায় রিপুন্মত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে হয় না। কিন্তু যখন দেখি যে দুষ্মন্ত সমস্ত মানসিক শক্তির আধার হইয়াও রিপুন্মত্ততাবশত বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু দুষ্মন্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। এদিকে মানবজাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার উদয় হয়। মনুষ্যমাত্রেই আজিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতনীতি, উন্নত চিত্তসংযম-শক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথার অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকব্বর সা। আকব্বর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার 'নওরোজের' কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎও বলেন যে মানুষের বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে, তাহার রতিপ্রবৃত্তি অন্যান্য সকল প্রবৃত্তির অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালি

দাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল। কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিকৃতি। পুরুষের অর্থ —জগতের সূক্ষ্ম, অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অপলাপ্য, পরিবর্ত্তনশীল উপাদান। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্ত-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটি মর্ম্ম এই যে, দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি আমরা দেখি যে, তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে দুষ্মন্তের ন্যায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না। যেন তাঁহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান নাই। অধিকন্ত, তৃতীয় প্রস্তাবে শকুন্তলা-চরিত্রের ব্যাখ্যা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শকুন্তলার মন concrete সম্বন্ধ, দুষ্মন্তের মন abstract প্রিয়; শকুন্তলার হৃদয় জড়জগৎসাপেক্ষ, দুষ্মন্তের হৃদয় তাহার বিপরীত। এই এক কথা। আবার দেখি যে, পবিত্র তপস্যাশ্রমে রিপুসেবারূপ জড়জগতের কার্য্য হইতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মাত্মক ঋষিকুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে সংসারাশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন; এবং দেবতুল্য কশ্যপ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে পুনর্ম্মিলিত দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে, বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্ত্তি। আবার কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে কালিদাস সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন, এবং কুমারসম্ভবে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন। এবং সেই কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন:—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নি-
স্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং
ভস্মাবশেষঃ কথমেব মুক্তঃ।

বোধ হয় আজিও হরকোপানল সমুদ্রে বাড়বানলের ন্যায় নিশ্চয়ই তোমাতে জ্বলিতেছে। নচেৎ, হে মন্মথ, তুমি ভস্মাবশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিক ভাবে মিলন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদবশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষেরদ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতিরদ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখাইলেন, এবং বসুমতী, হংসপদিকা, প্রভৃতি রাজ্ঞীদিগকে দুষ্মন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত। এবং জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যমাত্রই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলেই স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপেরদ্বারা দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুষ্মন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়, প্রকৃতি যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্। মানুষ চেষ্টা করিলে উক্ত নিয়ম সম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সে চেষ্টা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয়। প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি। সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে। করিলে তবে সংসারাশ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে। সংসারাশ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল। সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ পাপ-রুধিরে এবং যন্ত্রণার হাহাকাররবে* রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া

---

* বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষেও সেই রব শুনা যায় না?

উঠিবে। আরো একটি কথা আছে। দুষ্মন্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দুইটী পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ, মানসিকশক্তি প্রবল হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই। অতএব ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ নাও হইতে পারে। সেইজন্য মানসিকশক্তির সহিত সমাজ-শক্তি যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে সেই প্রণালী এবং নিয়মের বলে লোকের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলার দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়; এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী। তিনি দেখাইয়াছেন যে উভয়প্রকার বিবাহই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির ফল এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তির প্রতিপোষক। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহা শক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিকশক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সৎ, প্রকৃতি অথবা জড়জগৎ মিথ্যা এবং অ-সৎ—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনি সত্য; পুরুষও যেমন সৎ, প্রকৃতিও তেমনি সৎ, পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ। অভিজ্ঞান শকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কায়াবিশিষ্ট দেখা যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ—ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন, একটী মহাপ্রভাবশালী, একটী বিষম সত্য—অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে?

চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আর্য্যাবর্ত্তে মগধনামে যে জনপদ ছিল বৈদিক সময়ে তাহাকে কীকট বলিত। বিখ্যাত জরাসন্ধ নৃপতি মগধদেশে নিজ রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতেই এই দেশ মগধনামে পরিচিত। মগধের অধুনাতন নাম বেহার প্রদেশ। জরাসন্ধ যযাতিপুত্র পুরুর বংশোৎপন্ন এবং মগধবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের আদিপুরুষ। গয়ার পূর্ব্বস্থিত রাজগৃহে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক নৃপতি এবং ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়েন। বারানসী নগরীতে জরাসন্ধ যে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। দ্বাবিংশতিজন নৃপতি জরাসন্ধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে মগধবংশের স্থিতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত আছে, অর্থাৎ এই দ্বাবিংশতিজন ভূপাল একসহস্রবৎসর মগধসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয় সুনীক নামে তাঁহার দুরাত্মা সচিবের হস্তে নিহত হন। রাজ্যলুব্ধ সুনীক তাঁহার পুত্র প্রদ্যোতকে মগধসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর পরে পঞ্চদশজন মহীপতি মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরাণের মতে চারিশত নবতি বৎসর। মহারাজ মহানন্দী ইহাঁদিগের পঞ্চদশতম। ইহাঁর মহাপদ্ম নামে এক তনয় জন্মে। এই মহাপদ্মই ইতিহাসে নন্দনামে প্রোথিত হইয়াছেন। মহাপদ্মনন্দ শূদ্রাগর্ভ সম্ভূত ছিলেন। ইহাঁর প্রতাপ এবং বীরত্ব বহুদুর বিদিত হইয়াছিল। কেহই তাঁহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। যদ্যপি ইনি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সামাজিক প্রতিপত্তি স্থির ছিল। মহাপদ্মনন্দের নব পুত্র জন্মিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঔরসে মুরানাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তনামে আর এক পুত্র হইয়াছিল। এই চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এ প্রস্তাবে সঙ্কলিত করিব।

নন্দের পরলোকগমনান্তর তাঁহার নব পুত্রেরা রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজ্যের অংশ দিতে অসম্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদপ্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় তক্ষশীলানিবাসী চাণক্যপণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাণক্যের সহিত তাঁহার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন তিনি দেখিলেন যে, চাণক্য তক্রসেচনপূর্ব্বক কতক-

গুলি কুশাঙ্কুরের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন এবং তাঁহাকে আপনার কার্য্যোপযোগী ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতাদৃশ সহায়প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন।

গ্রীসদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদপ্রদেশে ছিলেন, তখন মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং বিপাশা-নদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বাচালতা ও স্বাধীনভাবে বাক্যপ্রয়োগ হেতু সেকন্দর তাঁহার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন না করিলে, নিশ্চয় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতেন। পরে তিনি কুসুমপুরে পলায়ন করেন, তথায় নবনন্দ নরপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ে রাজগৃহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে সংস্থাপিত হয়। কখন যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। নন্দনরপতিগণ প্রজারঞ্জনদ্বারা প্রজাবর্গের পরম অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষস নামে জনৈক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের অতিপ্রাচীন সচিব ছিলেন। রাক্ষসের অকৃত্রিম স্বামিভক্তি এবং রাজ্যের হিতচিন্তনহেতু সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত।

একদা চাণক্য রাজবাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন কারণবশতঃ তিনি নন্দ-নৃপতিগণকর্ত্তৃক অপমানিত এবং সভা হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এই নিষ্কারণ অবমাননা জন্য তিনি নন্দনৃপতিদিগের ধ্বংস সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল। চাণক্যের মন্ত্রণা ও বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নিজ ভ্রাতৃগণকে উপাংশুনিহত করেন এবং সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া চাণক্যকে নিজের মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে উগ্রধন্বানামক একজন নন্দপুত্রদিগের পক্ষীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের উপায় কল্পনা করিলে, তিনি নেপালরাজা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং উগ্রধন্বাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনে দৃঢ়তররূপে সমাসীন হয়েন।(১) এ বিষয়ে আমরা আমাদিগের মতামত প্রকাশিত করিব না।

এ দিকে অমাত্যরাক্ষস স্বচক্ষে চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দনৃপতিগণের সমুচ্ছেদ সন্দর্শন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া মলয়কেতুনামক জনৈক পার্ব্বতীয় রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ইহার সহিত

(১) Asiatic Researches vol V.

মিলিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মলয়কেতুকে কুসুমপুর আক্রমণ করিতে বলিলেন। মলয়কেতু সমুদায় নন্দরাজ্য পাইবেন বলিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসের মন্ত্রণাকৌশলে কুলূতদেশের অধিপতি চিত্রবর্ম্মা, মলয়দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীরাধিপ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুদেশভূপাল সিন্ধুসেন এবং বহুতুরঙ্গসৈন্যশালী পারসীকপতি মেঘাক্ষ প্রভৃতি ম্লেচ্ছরাজগণ মলয়কেতুর সহায় হইল। অন্যান্য পার্থিবগণও মলয়কেতুর পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকার করিল। ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্তের সহোযোগী প্রধানপুরুষগণ মলয়কেতুর সহিত যোগ দিল। কুসুমপুরে জৈত্রযাত্রার জন্য খশ, মাগধ, চেদি ও হুনসৈন্যগণ সমাগত হইতে লাগিল। গান্ধার ও যবনভূপাল গণ এবং শকভূপতিগণ সজ্জিত হইতে লাগিল। সত্বরই কুসুমপুর অবরোধ করিতে মলয়কেতু স্বসৈন্যে গমন করিলেন এবং দিন দিন নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই উৎসাহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই ভাবিল চন্দ্রগুপ্তের আর রক্ষা নাই। অমাত্যরাক্ষস কেবল এই যুদ্ধবিগ্রহের ভরসায় না থাকিয়া চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের নিমিত্ত এক বিষময়ী কন্যা গোপনে নিয়োজিত করিলেন, এবং যন্ত্রনির্ম্মাণ, বিষপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কয়েকজন প্রণিধি প্রেরণ করিলেন এবং অন্যান্য অনেক নীতিকৌশল প্রয়োগ করিলেন।

অমাত্যরাক্ষসের এই সকল কৌশলদেখিয়া নীতিজ্ঞ চাণক্য ভীত হইলেন না, ক্রমে তাহা অন্যথা করিতে আরম্ভ করিলেন। চাণক্য প্রথমতঃ নিজ আজ্ঞাবহ অনুচরগণকে এবং কার্য্যনিপুণ চরদিগকে মলয়কেতু এবং রাক্ষসের নিকটে দাসত্ব স্বীকার করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সত্বরেই উভয়েরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য হইয়া উঠিল। অমাত্য রাক্ষস তাহাদিগের দ্বারা যে যে কার্য্য করিতেন,চাণক্য তৎসমস্ত জানিতে পারিতেন; অমাত্যরাক্ষস কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহার সেবকবর্গ চাণক্যের লোক এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যুক্ত। কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ এবং কোন্ ব্যক্তি বিপক্ষ, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত চাণক্য নানাভাষাকুশল চরসকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহারা ভিন্ন ভিন্ন বেশধারণ পূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করত তত্রস্থ লোকদিগের আচারব্যবহার অবগত হইতেছিল এবং কুসুমপুরবাসী নন্দনরপতির অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবদিগের গূঢ় ব্যাপার ও উপায় নিপুণরূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষ তিনি রাক্ষসের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগকে পর্য্যন্ত স্ববশে আনিলেন।

চাণক্য জানিতেন যে অমাত্যরাক্ষস

স্বার্থশূন্য, ভক্তিসহকারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন এবং কি প্রকারে প্রভুর শ্রেয়ঃ হইবে তাহাই অনন্যচিত্তে চিন্তা করিতেন। অনেক লোকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্পৎশালী প্রভুকে সেবা করে; কিন্তু রাক্ষস সেরূপ ছিলেন না। চাণক্য বিবেচনা করিলেন যে রাক্ষসকে হস্তগত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করাইবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রাক্ষসের বুদ্ধি, বিক্রম এবং ভক্তি, এই ত্রিবিধ গুণ ছিল বলিয়াই চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যাহাদিগের বুদ্ধি, বিক্রম ও ভক্তি এই তিন গুণ থাকে, তাহারাই প্রকৃত ভৃত্য এবং তাহাদের হইতেই স্বামীর সর্ব্বকালেই যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং চাণক্য রাক্ষসকে হস্তগত করিতে যতদূর সাধ্য যত্ন করেন। প্রথমতঃ রাক্ষস ও মলয়কেতুর বিচ্ছেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চাণক্য এক কৌশল করিলেন; রাক্ষসের নামমুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত একখানি পত্র চন্দ্রগুপ্তের নিকটে প্রেরণ করিলেন, সেই পত্র পথিমধ্যে চাণক্যের প্রেরিত মলয়কেতুর বিশ্বস্ত সেবকদিগের দ্বারা ধৃত এবং মলয়কেতুর সমীপে আনীত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসের প্রতি মলয়কেতুর সন্দেহ বদ্ধমূল হইলে তিনি অমাত্য রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবং তদ্বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষস পত্রের মর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন; সুতরাং তিনি সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। ইহাতে মুগ্ধবুদ্ধি মলয়কেতু রাক্ষসকে অপমানিত এবং স্বসকাশ হইতে দূরীভূত করিলেন। এবং চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতি পাঁচজন মিত্ররাজকে মারিয়া ফেলিলেন। এই জন্য অপরাপর রাজারা "মলয়কেতু অতি অবিবেচক দুর্ব্বৃত্ত" ইহা বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ ভয়বিহ্বল সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তিরক্ষার নিমিত্ত মলয়কেতুর সেনানিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর ভদ্রভট, পুরুষদত্ত প্রভৃতি চাণক্যপ্রেরিত প্রধান-পুরুষগণ মলয়কেতুকে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। তৎপরে রাক্ষস দুঃখিতান্তঃকরণে কুসুমপুরে আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চাণক্য তাহা জানিতে পারিয়া আর একটী কৌশলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। একদিন চন্দ্রগুপ্তের সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং আপনি অমাত্যরাক্ষসকে প্রণাম করিয়া যথাবিহিত বহুমানপুরঃসর চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। অমাত্যরাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে "বিজয়ী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে রাক্ষস হস্তগত হইলে চাণক্য তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন অ-

মাত্যরাক্ষস অগত্যা তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপশ্চাৎ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমীপে রাক্ষসের নানাবিধ সদ্‌গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বের চিহ্নস্বরূপ শস্ত্রপ্রদান করিলেন। অমাত্যরাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের শস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে রাজপুরুষেরা মলয়কেতুকে হস্তপদে বদ্ধ করিয়া দ্বারদেশে স্থাপিত করিল। রাজপুরুষেরা কি করিতে হইবে এই বিষয় চাণক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, চাণক্য বলিলেন যে এক্ষণে অমাত্যরাক্ষস রাজকার্য্য করিবেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন কর। রাক্ষস তখন চন্দ্রগুপ্তকে বলিলেন, "রাজন্, তুমি ত জানই যে আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম, অতএব ইহার প্রাণরক্ষা কর।" চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তিনি বলিলেন "চন্দ্রগুপ্ত, অমাত্যরাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা রক্ষা করা উচিত।" তদনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে নিজ পৈতৃক রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত রাজের জীবনীর এই স্থানে মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক শেষ হইয়াছে। এই নাটকে চাণক্যের বুদ্ধিচাতুরী এবং রাক্ষসের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি অতি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের জীবনীর শেষভাগ পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বায়ুপুরাণে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল আটাইশ বৎসর নিরূপিত আছে। কুমারিকাখণ্ডে এবং অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত কলিযুগের ২৭৯০ বৎসরে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদাতীরস্থিত শুক্রতীর্থে গমন করেন। এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৮২ অব্দ চলিতেছে। সুতরাং শুক্রতীর্থে গমন ৩১২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে কলিযুগের ২৬৯০ বৎসর গত হইলে নন্দরাজা এবং তাহার একশত বৎসর পরে অর্থাৎ ২৭৯০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আরম্ভ হইবে। ইহা কুমারিকাখণ্ডের সময় নিরূপণের সহিত মিল হয়। স্কন্দপুরাণের বচন—

"ততোপি ত্রিসহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যন্নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ [illegible]
যাতি।"

অর্থাৎ তিনসহস্র বৎসরের তিনশত দশ বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে নন্দরাজ্যের আরম্ভ। অনেকে "ত্রিসহস্রেষু" স্থানে "দ্বিসহস্রেষু" পাঠ করিয়া একসহস্র বৎসর পশ্চাতে ফেলেন। ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্মানন্দ এবং তাঁহার সুমাল্য প্রভৃতি অষ্ট পুত্র ছিল। এই মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁহার পুত্রগণ একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন। ভাগবতের মতে ইঁহারা পরীক্ষিৎ নৃপ-

তির জন্মের ১৫১০ বৎসর (এতদ্বর্ষসহস্রঞ্চ শতং পঞ্চ দশোত্তরং) পরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং একশত বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার মতে পরীক্ষিৎ কলিযুগের অশীতি অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং কলিযুগের ১৬৯০ অব্দে নন্দরাজ্য কাল। অতএব ১৭৯০ কলির অব্দে বা ১৩১২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সময়ের ঐক্য হয় না। প্রাচীন ভারতের কোন রাজার সময়নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তবে চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ে যাহা কিছু পুরাণাদিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠকমহাশয়কে উপহার দেওয়া গেল, তিনি ইহার ভিতর হইতে সারগ্রহণ করিবেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল চৌত্রিশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৌদ্ধমতে চন্দ্রগুপ্ত ৩৯৬ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরাণমতে তিনি ২৫ বৎসর নিরুপদ্রবে মগধরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। কোন কোন মতে ২৯২ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত নিজপ্রতাপ ভারতবর্ষের অনেকত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গ্রীক্ বা যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর তটে চন্দ্রগুপ্তনগরী নামে এক নগরী সংস্থাপিত করেন। তত্রত্য লোকেরা চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস বিশেষরূপে অবগত আছে। মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতা এবং টীকাকার উভয়েই তদ্দেশীয় লোক। যবনসেনানী সেলিউকস্ ভারতবর্ষে নিজ অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আর একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত স্বসৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবনদিগের আক্রমণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহা এই আক্রমণ। মগধরাজ্য পরাক্রান্ত না থাকিলে যবনহস্ত হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা ভার হইত। চন্দ্রগুপ্তের সহিত যবনসেনাপতির সন্ধি ৩০২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল। প্রকৃতিবর্গ মগধরাজ্যের শান্তিচ্ছায়াতে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কালহরণ করিত, কোন উপদ্রব বা অত্যাচারের শঙ্কা ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর গঙ্গার উপকূলে স্থিত এবং পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ ও একক্রোশ প্রস্থে বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ইহা বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান ছিল। নদীর বক্ষে শত শত বণিক্‌পোত ভাসিতে দেখা যাইত। নগরের মধ্যে নানাশ্রেণীর কারু শিল্পকর বাস করিত এবং অগণ্য পণ্যবহুল বিপণি ও আপণমালা রাজপথের শোভাসম্পাদন করিত

হস্তিগণ অলঙ্কৃত সুচারু হাওদা পৃষ্ঠে করিয়া গম্ভীরপদবিক্ষেপ পূর্ব্বক রাজপথে ইতস্ততঃ বিচরণ ও যাতায়াত করিত। অশ্বারোহিগণ তুরঙ্গমপৃষ্ঠে বিচিত্রগতিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য্য এবং ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির কার্য্য করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় রণকুশল সেনাপতি এবং অতি সুবিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। তাঁহার চারিলক্ষ বেতনভোগী স্থির সৈন্য (standing army) ছিল। তিনি মৃগয়াশীল ছিলেন এবং শরাসনধারিণী যবনীগণপরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে সভ্যতার আলোক সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। জাতিভেদ এবং পৈতৃকব্যবসায়ানুসরণপ্রথা সম্যক্ প্রচলিত ছিল। রাজ্যের নানাবিভাগে সুযোগ্য রাজপুরুষদিগেরদ্বারা সুচারুভাবে রাজ্যশাসনকার্য্য ও শান্তিবিধান সম্পাদিত হইত। প্রজাদিগের গৃহে সুখ শান্তি বিরাজমান ছিল। প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত। বণিক্ ও শিল্পীরা রাজ্যের বিবিধপ্রকারে উন্নতিসাধন করিত। তাহারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে স্বস্বকার্য্য করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজাকে কর দিত। অধুনাতন ইংরেজরাজ্যে ব্যবসায়ীরা এবং শিল্পীরা আইনদ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নিরাপদে স্বস্বকার্য্য করে বলিয়া রাজাকে কর দিয়া থাকে। অস্ত্রনির্ম্মাণ এবং পোতনির্ম্মাণের স্বতন্ত্র কার্য্যালয় ছিল এবং সেই সেই স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ও পোত সকল নির্ম্মিত হইত। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। প্রতিবৎসর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া এক মহাসভা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রাজ্যের ও প্রজাদিগের উন্নতির উপায়চিন্তা করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্ব্বিধ রাজবৃত্ত সম্যক্ সাধন করিতেন। ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন, সেই অর্থের বর্দ্ধন, তাহার রক্ষণ এবং সৎপ্রকারে তাহার ব্যয় এই চারিটী কার্য্যই তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। চন্দ্রগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পৌত্র অশোক বৌদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসময়ে সমাজে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মত প্রচলিত হইয়া সমাজকে অল্পকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিবার উপযোগী করিতেছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রের সময়ে মগধরাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছিল। মগধরাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব।

যখন শাক্যসিংহ মগধে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মগধ দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যখন আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মগধ সাতিশয় উন্নত, সমৃদ্ধ ও প্রবল। এই দুইশত বা

আড়াইশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সমবায় হইয়া মগধসাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। কি কারণে এই রাজ্যসকল সমবেত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষে যে রাজ্যের রাজা পরাক্রান্ত তাঁহার রাজ্যেই প্রজাদিগের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। মগধসাম্রাজ্য অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিল বলিয়াই প্রজাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যও নিরাপদ ছিল। মগধরাজগণ পূর্ত্তাদিকার্য্যদ্বারা প্রজাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। মগধরাজ্য তৎকালে ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ হইয়াছিল। যখন সেকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্চনদপ্রদেশের রাজগণ তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু মগধের গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল এবং তিনি আর পূর্ব্বদিকে না আসিয়া পঞ্চনদপ্রদেশ হইতেই স্বরাজ্যাভিমুখে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। কিছুদিন পরে আবার যখন সেকন্দরের অন্যতম সেনানী সেলিউকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখনও মগধ হইতে ভারতরক্ষা হয়। সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্য না থাকিলে বোধ হয়, ভারতবর্ষ কিছুদিন গ্রীকদিগের অধীনে থাকিত। মুদ্রারাক্ষসের শেষে যে যবনদিগের আক্রমণের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় সেলিউকসের আক্রমণের কথা। অতএব মগধ হইতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান উপকার সাধিত হয়। একটি প্রকৃতিদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি। দ্বিতীয়টী ভারতবর্ষের বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষাসাধন। যতদিন মগধের বলবিক্রম বিদ্যমান্ ছিল, ততদিন আর কোন বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। মগধরাজ্য হইতে আর একটী উপকার হইয়াছে। তাহা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্যবিস্তার। ইহা অশোকরাজের সময়েই ঘটে। অশোক নৃপতির রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান ও সিংহলদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয় এবং তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল, তৈলঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিকমত প্রচার করেন। এইটি মগধসাম্রাজ্যের তৃতীয় উপকার। ইহার বিশেষ বিবরণ এ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া আমরা অদ্য ইহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। সময়ান্তরে ইহা বিবৃত করিবার অভিলাষ রহিল।

র স।

মাধবীলতা।

২০

পরদিবস প্রাতে মাতঙ্গিনী একজন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিল, "আয়ি, আমার চাকুরীতে ইস্তফা—ঠাকুরাণী আমায় খুঁজিলে তাঁহারে বুঝাইয়া বলিও আমি চলিলাম।" বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তুই কোথায় চলিলি?"

মাত। তা এখনও ঠিক জানি না।

বৃদ্ধা। কেন চলিলি?

মাত। আর চাকুরী করিব না।

বৃদ্ধা। কি করে খাবি?

মাত। ঘটকালী করে।

বৃদ্ধা। ও আবার কি কথা? তা একটু থেকে যা, ঠাকুরাণী উঠিলে তাঁরে বলে যাস্।

মাত। তাঁরে বলা হবেনা।

বৃদ্ধা। কেন?

মাত। তাঁরে দেখিলে যাইতে পারিবনা।

বৃদ্ধা। তা তোর গিয়ে কাজ কি?

মাত। আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল। বৃদ্ধা একবার ডাকিয়া বলিল, "তোর পাওনা পাইয়াছিস?" মাতঙ্গিনী কোন উত্তর করিল না। বৃদ্ধা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "মর! ছুঁড়ি পাগল হয়েছে না কি?"

মাতঙ্গিনী রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া একবার বাটীর দিকে ফিরিয়া চাহিল, সজলনয়নে মনে মনে বলিল, "মা নিদ্রা যাও,—নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও, এ দাসী তোমায় তোমার স্বামীর সিংহাসনে আবার বসাইবে।"

অপরাহ্ণে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন্দিরাভিমুখে গেল। পথে দুই একটি পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা মাতঙ্গিনীর প্রতি বিস্মিতলোচনে চাহিল। মাতঙ্গিনীর মনে পড়িল, যে সে যুবতী; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঞ্চল ধরিয়া মাথা নাড়িয়া সদর্পে চলিয়া গেল, মন্দিরের সম্মুখে পেঁাছিলে তিলার্দ্ধ ইতস্ততঃ না করিয়া প্রবেশ করিল; তথায় কেহ নাই দেখিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কালীদহতটে ব্রহ্মচারীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত, ব্রহ্মচারী আসিলেন না। ক্রমে রাত্রি একপ্রহর অতীত হইল, তখনও ব্রহ্মচারীর দেখা নাই। মাতঙ্গিনী অন্ধকার দেখিয়া একবারমাত্র কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে চাঞ্চল্য আর রহিল না। কালীদহের সোপানে বসিয়া মন্দিরের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাত্রি দুইপ্রহরের সময় ব্রহ্মচারী মন্দির হইতে বহির্গত

হইলেন দেখিয়া মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু সে দিকে মন না দিয়া নির্ভয়চিত্তে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "ভিখারিণী।"

ব্রহ্ম। অসময়ে ভিক্ষার নিমিত্ত কেন? আর আমি নিজে ভিক্ষুক আমার নিকট ভিক্ষা কিরূপ?

মাত। আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতে গেলে বোধ হয় এই ঠিক সময়। আর আপনার নিকট কেবল মাত্র একটি পরিচয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। কি পরিচয়?

মাত। আপনি রাজজামাতাকে চিনিতেন?

ব্রহ্ম। না—কিন্তু সে পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। রাজজামাতার নিবাস কোথায় ছিল আপনি জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—তক্ষপুর।

মাত। রাজজামাতার নাম কি ছিল জানেন?

ব্রহ্ম। জানি—বিজয়রাজ। কিন্তু আর কোন কথার আমি উত্তর দিব না। তুমি বল, তোমার এ সকল কথায় কি প্রয়োজন?

মাত। আমি বিজয়রাজকে খুঁজিতে যাইব—তাহাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার কি প্রয়োজন?

মাত। বিজয়রাজ আমার মাতার নিকট বহুকাল অবধি ঋণী আছেন, সেই ঋণ আদায় করিতে আমি তাঁহার নিকট যাইব।

ব্রহ্ম। কে তুমি?

মাত। আমি বিধবা—অনাথা।

ব্রহ্ম। কিন্তু যুবতী দেখিতেছি।

মাত। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর তাহা চিনিতে পারা উচিত হয় না।

ব্রহ্ম। এই অন্ধকারে একাকী যুবতীর প্রান্তরে আসা আরও উচিত হয় না।

মাত। বিপদ্‌গ্রস্তের সে বিচার থাকে না। অন্যেরও সে বিচার করা অন্যায়।

ব্রহ্ম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কে?"

মাত। আমায় যাহা দেখিতেছেন, আমি তাহাই। ইহার অধিক পরিচয় আর আমার নাই।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজকে তোমার মাতা যখন ঋণে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিচয় বিলক্ষণ আছে তবে তাঁহার পরিচয় দিতে তোমার আপত্তি কি?

মাত। কোন পরিচয় আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি আপনাকে ভক্তি করি, তাহাই আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার সহায়তা করিতে পারেন; আপনার ধর্ম্ম আছে; সহায়তা

না করেন, বলিয়া দিন তক্ষপুর কোন পথে যাইব।

ব্রহ্ম। বিজয়রাজের বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে; তক্ষপুরে তুমি অনর্থক যাইবে।

মাত। তাঁর আর কে আছে।

ব্রহ্ম। এক ভাই আছে।

মাত। আপনি তাঁরে চিনেন? তিনি কিরূপ ব্যক্তি?

ব্রহ্ম। আমি চিনি, কিরূপ ব্যক্তি তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তিনি এক্ষণে যুবা—আমরা বৃদ্ধ যুবার কিম্বা যুবতীর চরিত্র অনুভব করিতে পারি না।

মাত। তাঁর দুই একটি কার্য্য যদি দেখিয়া থাকেন, আমায় বলুন আমি অনুভব করিব।

ব্রহ্ম। আমি তক্ষপুরে অনেকদিন যাই নাই, যখন যাইতাম তখন ধনমদে তিনি উন্মত্ত ছিলেন। তাঁহার দাম্ভিকতা অতিশয় বলিয়া বোধ হইত। কোন রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। এমন কি তাঁহার জন্মদাতাকেও তিনি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার তাকিয়ায় লাথি মারিয়াছিলেন। আর পিতাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

মাত। পিতাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন কি, বুঝিলাম না। তাঁহার পিতা রাজা ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ বরখাস্ত করিয়াছিলেন?

ব্রহ্ম। তাঁহার জন্মদাতা রাজা ছিলেন না। তিনি রাজার দেওয়ান্ ছিলেন। রাজা সেই দেওয়ানের পুত্রকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। বিজয়রাজের ভাই এমনি কৃতঘ্ন যে রাজ্য পাইবামাত্রই দেওয়ানের দেওয়ানী কাড়িয়া লইলেন।

মাত। কেন, তাহা কিছু জানেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি ঠিক জানিনা, কাল মাহাত্ম্যে এসকল ঘটে।

মাত। এখন দেওয়ান্ কে?

ব্রহ্ম। বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি যে বিজয়রাজের সময় যে সকল আমলা ছিল, তাঁহার ভাই তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া নিজ নিজ কর্ম্ম দিয়াছেন আর তাঁহার জনকের নিয়োজিত সকল লোককে তাড়াইয়াছেন।

মাত। দুইটিই শুভ সম্বাদ, এখন তক্ষপুরের পথ বলিয়া দিন, আমি আমার ঋণ আদায় করিতে পারিব।

ব্রহ্ম। এই দুইটী পরিচয়েই তুমি কি বুঝিলে?

মাত। আমি এই বুঝিলাম যে বিজয়রাজের ভাই বুদ্ধিমান্—জনকের শঠতা বুঝিয়াছেন।

ব্রহ্ম। তাহা আমি ত কিছুই বুঝি নাই—ভাল, তুমি তক্ষপুরে যাইবে, তোমার সঙ্গে আর কে যাইবে?

মাত। আপনি যাইবেন।

ব্রহ্মচারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখ কিছুই দেখিতে

পাইলেন না। মাতঙ্গিনী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মুহূর্ত্তেক মধ্যে মন্দিরপ্রবেশ করিয়া কমণ্ডলু আনিয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "চলুন।"

ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া আবার মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; মাতঙ্গিনী বলিল, "ভাবিতেছেন কি? আপনাকে যাইতে হইবে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার আর কেহ নাই যে আমার সঙ্গে যাইবে। আমি যুবতী, অন্যে আমার সঙ্গে গেলে ভাল দেখাইবে না, অতএব আপনি যাইবেন। আপনার এখানে থাকিয়া কি লাভ? কাহার উপকার করিবেন? আমার সঙ্গে গেলে আমার উপকার হইবে। অতএব চলুন।"

ব্রহ্ম। তোমার নাম কি?

মাত। আমার নাম "মাতঙ্গিনী।"

ব্রহ্ম। তোমার বড় সাহস।

মাত। বড় সাহস না হইলে বড় সহায় ধরিতে আসি নাই।

ব্রহ্ম। তুমি আমায় বড় আশ্চর্য্যান্বিত করিলে, তোমার মত স্ত্রীলোক কৈ আমি ত কখন দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তুমি তক্ষপুরে গিয়া কি কর তাহা আমি দেখি।

মাত। তবে চলুন।

ব্রহ্ম। আজি নহে।

মাত। আজিই। বিলম্ব হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না। অন্ততঃ আজি যাত্রা করে কতকদূর গিয়া বিশ্রাম করিবেন।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চল, দেখা যাউক, ইহার পর আর কি আছে।"

তাহার পর উভয়ে তক্ষপুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

২১

যে অপরাহ্নে মাতঙ্গিনী ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, সেই অপরাহ্নে পুঁটুর মার প্রতিবাসিনী পদ্ম, কেশবিন্যাস করিয়া, রক্তবস্ত্র পরিয়া, মুখখানি তৈলে মার্জ্জিত করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; এমত সময় দুইজন অশ্বারোহী পথ দিয়া বেগে অশ্বচালনা করিয়া গেল। পদ্ম তাহাদের দেখিয়া অতি চঞ্চল হইলেন, "এইবার আসিতেছেন" বলিয়া বস্ত্র যথাস্থানে ন্যস্ত করিয়া যেন অন্যমনস্কে বাহিরে আসিলেন, যেন কিছু হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা খুঁজিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে পথিকদের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বারোহীদের পর কোন শিবিকা বা লোকজন না দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া আবার যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে অবধি পুঁটুর মার পরিচর্য্যায় রাজা দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি পদ্ম প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে এইরূপ বেশবিন্যাস করিয়া দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া পথের লোক দেখিতেন।

পদ্মের বয়স বিংশতি বৎসর কিন্তু দেখিলে ত্রিংশৎবর্ষীয়া প্রৌঢ়া বলিয়া বোধ হইত, শ্যামবর্ণা, বিপুলাঙ্গী, দীর্ঘনয়না, ভ্রূযুগ অতি স্থূল। পাড়ার যুবামহলে সুন্দরী বলিয়া পদ্মের পশার ছিল; কিন্তু পদ্ম দুশ্চরিত্রা বলিয়া তাহারা কখন সন্দেহ করিত না, অথচ পদ্ম ইদানীং মুখখানি তৈলমার্জ্জিত করিয়া দ্বারের অন্তরালে যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন,তাহা দেখিলে নিজ পাড়ার না হোক্, অপর পাড়ার যুবারা সন্দেহ করিলে করিতে পারিত।

পদ্ম যে কেন দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা কেবল সোহাগী দাসী বুঝিয়াছিল। অশ্বারোহীর পশ্চাতে সোহাগী পথ দিয়া যাইতেছিল, পদ্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া পদ্মের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ পদ্ম দ্বাররুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন, আর চারি পাঁচ দিবস সে দ্বারে আসিলেন না। সেই অবধি সোহাগীর প্রতি পদ্মের বিশেষ বীতরাগ জন্মিল। পাড়ার স্ত্রীলোকমধ্যে একদিন পুঁটুর মার কথা হইতেছিল, সকলেই তাহার নিন্দাবাদ, করিতেছিল। পদ্ম বলিল, পুঁটুর মার কোন দোষ নাই, যত দোষ ঐ সোহাগী মাগীর। ঐ ত এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে; রাজা কি নিজে দেখিতে এসেছিলেন, ঐ মাগীই ত সন্ধান দিয়াছিল। ঐ ত দ্বারের পাশে ছুঁড়িকে সেদিন দাঁড় করে রেখে গিয়াছিল। আর একজন বলিল, তা নয় এ সেদিনকার ঘটনা নয়, অনেক দিন অবধি কপাল পুড়েছে, দেখ নাই মাধবীলতা ঠিক রাজার মত? আগে ত কখন মিন্সেকে দেখি নাই, এখন কাণায় বুঝিতে পারে যে, মাধবীর হাতের গড়ন, ঠোঁটের গড়ন, মুখের গড়ন ঠিক রাজার মত।

পদ্ম। আমরা যখন পুঁটুর মার কাছে আদর করে বলিতাম, তোর পুঁটু যেন রাজকুমারী, পুঁটুর মা তখন মুখ টিপে টিপে হাসিত; এখন বুঝিলাম কেন হাসিত, ছুঁড়ি এদিকে শান্ত দেখিতে পাই, ভিতরে এতখানা? ভাল! জিজ্ঞাসা করি মাধবীলতার পেটে এর পর যে ছেলে হবে সে কি রাজার ধন দৌলত পাবে?

প্রথম প্রতিবাসী। তা কেমন করে পাবে? মাধবীলতা ত রাণীর গর্ভের সন্তান নয়, ছেলে মেয়ে কি হলেই হয়, বিবাহ করা স্ত্রীর গর্ভে না হলে কি বিষয় পায়?

পদ্ম। তবে, পরে রাজার রাজ্য কে পাবে? লোকে বলে রাজকুমার কোন্ ভট্টাচার্য্যদের ছেলে, তাহারা নাকিতাদের ছেলে নিতে এসেছিল।

প্র, প্রতিবাসী। সে আবার কি কথা? তবে রাজা কি অন্যের ছেলে চুরি করে এনেছিলেন?

দ্বি, প্রতিবাসী। তিনি সকল পারেন, সকল করেন,চোখের উপর দেখিতেছ না

বৃদ্ধ বয়সে কি কাণ্ড করিলেন। যারে এক রোগে ধরে ক্রমে তারে সকল রোগে ঘেরে।

পদ্ম। তা এখন আমাদের পাড়ার পোড়া কপালির দশা কি হবে? লোকে যে বলিতেছে তারে নাকি পাড়া ছাড়া করে দেবে, এ কথা কি সত্য?

প্র, প্রতিবাসী। সত্য মিথ্যা কেমন করে জান্‌ব বোন্‌। রাজা যাহার সহায়, প্রজায় তাহার কি করিবে? তবে নাকি রামসেবককে সকলে ধরে একদিন লজ্জা দিবে। সকলে বলিবে যে তোমার কালামুখ, তোমার মুখ পুড়ে গেছে।

দ্বি, প্রতিবাসী। তায় আর লাভ কি? যা হবার তা হয়ে গেছে, রামসেবক গোবেচারা তারে মনোদুঃখ দিয়ে আর লাভ কি?

পদ্ম। লাভ আছে বই কি, রাম দাদা শাদা লোক, এ সকল কিছুই জানেন না, তাঁরে বলে দিলে ছুঁড়িকে লয়ে তিনি এখান হইতে দুরে যাবেন, তাহা হইলে পাড়ার কলঙ্ক যাবে।

সোহাগী এই সময় উপস্থিত থাকিলে বলিত, "পাড়ার কলঙ্ক যাক্ না যাক্ পদ্মের কণ্টক যাবে।" পুঁটুর মাকে পদ্ম বাস্তবিক কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিতেন, পদ্ম জানিতেন যে, তিনি সুন্দরী, সৌভাগ্য পাড়ায় যাহা কিছু ঘটিবে তাহা তাঁহার ভিন্ন আর কাহারও সম্ভবে না। তিনি থাকিতে রাজার নজরে পুঁটুর মা পড়া অসঙ্গত হইয়াছে। তবে যে এ ঘটনা ঘটিয়াছে কেবল সোহাগীর অবিচারে, অতএব ভাবিলেন সোহাগী মরুক। কিন্তু আবার ভাবিলেন, পূর্ব্বে সোহাগীকে হস্তগত করিতে পারিলে, আজ আমারই অদৃষ্টে এই সকল সুখ ঘটিত। পুঁটুর মা চকখাকি আমায় বঞ্চিত করেছে।

পদ্মের মনে যেরূপ আলোচনা হইতেছিল, পাড়ার আরও দুই এক যুবতীর মনে সেইরূপ ভাব কিছু কিছু আসিয়াছিল। দুই একটি গৃহিনীরাও সেই মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের কন্যারা থাকিতে পুঁটুর মার অদৃষ্টে এই সৌভাগ্য উচিত হয় নাই, কাজেই পুঁটুর মার প্রতি তাহাদের সকলেরই বিষদৃষ্টি জন্মিয়াছিল। এই সকল গৃহিনীরাই পুঁটুর মার কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে রামসেবককে লজ্জা দিবার বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল।

পদ্ম বলিল, আমার ইচ্ছা হয়, আমি গিয়ে একবার কালামুখীকে দুকথা শুনাইয়া আসি। আমি এই ভাবি, তার মুখে ভাত উঠে কেমন করে।

পদ্মের মা। তোর সে সকল কথায় কাজ কি, তোর কি মাথা ব্যথা পড়িল যে, তুই দুকথা শুনাতে যাবি।

পদ্ম। আমার যে সহ্য হয় না।

বাস্তবিক পদ্মের অসহ্য হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় মাতাকে লুকাইয়া পদ্ম পুঁটুর মার খড়কীদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, পুঁটুর মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওলো,

কালামুখী একটা কথা বলি শুনে যাও।” এই আহ্বানে পুঁটুরমা পরমাপ্যায়িত হইয়া হাসি হাসিমুখে পদ্মের নিকট গেলেন। অনেক দিনের পর পদ্মের সহিত সাক্ষাৎ, ভাবিলেন পদ্ম তাঁহাকে কতই মিষ্ট কথা বলিবে, তাঁহার জন্য কতই আহ্লাদ করিবে, তাহাই হয় ত পদ্ম এই সময়ে একা আসিয়াছে। পুঁটুর মা আরও ভাবিলেন যে, আমার এত বস্ত্র, এত অলঙ্কার ত আবশ্যক নাই; ইহার কতক পদ্ম পরিলে তাহাকে কতই সুন্দর দেখাবে, অতএব এই সময় তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি কিছু দিই; চুপি চুপি বা কেন, আমি দিলে কে রাগ করিবে? তিনি (স্বামী) দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের দিকে ত একবার ফিরিয়াও চান না, তবে কেন তিনি রাগ করিবেন। সোহাগীই বা কেন বকিবে? তার কি ক্ষতি? হয় ত সে রাণীকে বলে দিবে, তা আমি তার হাতে ধরে তখন বারণ করিব।

এই ভাবিতে ভাবিতে পুঁটুর মা পুষ্করিণীর কূলে পদ্মের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্ম বলিলেন, “ওলো কালামুখী, বল দেখি, বুড়া রাজার মন কেমন করে ভুলালি?”

পুঁটুর মা। আমি ভুলাই নাই, পুঁটু ভুলাইয়াছে।

পদ্ম। তা বই কি! এরেই বলে পোরনামে পোয়াতি বত্তায়। হা কালামুখী! তোর মরণের কি আর জায়গা ছিল না; হয় ত বল্‌বি নইলে এ ধন দৌলত কোথা হইতে আসিত। তা অমন ধন কড়ির গলায় দড়ি, অমন কাপড় পরার গলায় দড়ি, অমন গহনা পরার গলায় দড়ি, ধিক্ তোরে, ছার কপালী!

পুঁটুর মা। কেন ঠাকুর ঝি, আমি কি করিলাম?

পদ্ম। আহা কিছু জানেন না, আবার বলেন কি করিলাম, রাজা তোরে এত ভালবাসে কেন, তোরে এত গহনাপাতি দেয় কেন, আর কাহাকেও দেয় না কেন?

পুঁটুর মা। আমি পুঁটুর মা বলে আমায় রাজা এই সকল দিয়াছেন, তিনি পুঁটুকে বড় ভালবেসেছেন।

পদ্ম। বলি, রাজা আর কাহারও পুঁটুকে ভালবাসেন না কেন, ছেলে মেয়ে ত আর অনেকের আছে। ঐ সকল কি ঢাকা থাকে? না বুঝিতে বাঁকি থাকে?

পুঁটুর মা। কি ঠাকুরঝি, তবে বল না রাজা আমায় কেন ভালবাসেন?

পদ্ম। আ মরি নেকি, কিছু জানেন না।

পুঁটুর মা। না সত্য বলিতেছি কই আমি ত কিছু জানি না।

পদ্ম। যখন রাজা তোর গলায় বঁটি দিবেন তখন ত বলিতে পারবিনে যে আমি কিছুই জানি না।

পুঁটুর মা। তোমার পায়ে ধরি ঠাকুরঝি

আমায় বলে দেও। আমি জানিনা এই জন্য এখন আমার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।

পদ্ম। তবে বলে দিব? একান্ত বলিতে হবে—না বলিলে তুমি মানিবে না? (কর্ণে দুই তিনটি কথা)

পুঁটুর মা তাহা শুনিয়া অবাক্ হয়ে পদ্মের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, পদ্ম চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এখন টের পাও গহনা পরা কেমন সুখের।"

২২

পরদিবস প্রাতে রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে যাইতে যাইতে একস্থানে দাঁড়াইলেন; একজন দাসীকে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" দাসী তৎক্ষণাৎ রাজভগিনীর মহলে প্রবেশ করিল। রাজা যষ্টিরদ্বারা ভূপতিত একটি বিল্বপত্র নাড়িতে লাগিলেন, আর আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে দুই একটি কথা বলিতে লাগিলেন। এমতসময় রাজভগিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন, এবং নতশিরে একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "দেখ দেখি, কি অন্যায়!" জ্যোৎস্নাবতীর ভয় হইল; ভাবিলেন, রাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন।

অনন্তরে রাজা আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বড় অন্যায়, বড় অসঙ্গত, কে এখানে বিল্বপত্র ফেলিয়া গিয়াছে, হয় ত এই বিল্বপত্রে আমি পূজা করে থাকিব।" এই বলিবামাত্র জ্যোৎস্নাবতী সযত্নে বিল্বপত্রটি তুলিয়া লইলেন; রাজা বলিলেন, "দেখ, যেন ভাল জায়গায় বিল্বপত্রটী ফেলা হয়। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি উত্তর দাও?" এই বলিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন; জ্যোৎস্নাবতী কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল? আমি ত সে সময় ছিলাম না।" জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সময়?"

রাজা। যে সময় রাণী প্রসব হন।

জ্যোৎ। আজ্ঞা করুন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

রাজা। রাণী কি সন্তান প্রসব করেন?

জ্যোৎ। এক মৃতকন্যা প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছিলাম।

তার পর রাজা আর কোন কথাই না শুনিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন; জ্যোৎস্নাবতী বলিতে লাগিলেন, "এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা আছে।" রাজা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, সভায় গিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্যেরা যে কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; রাজকুমার আমার পুত্র নহেন। রাণী মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, আমি বিশেষ করিয়া তদন্ত করায় সকল কথা

জানিতে পারিয়াছি; অদ্য ভট্টাচার্য্যদিগের আসিবার কথা আছে—এখনই আসিবেন; আমার ইচ্ছা যে ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র লই।"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাসদ সকলে বিমর্ষ হইলেন। দেওয়ান্ মহাশয় ভ্রূকুটী করিয়া একবার রাজার দিকে কটাক্ষ করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

এই সময় পিতম পাগলা আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না দেখিয়া সে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার রাজার দিকে, একবার দেওয়ানের দিকে, একবার চূড়াধনের দিকে চাহিল; কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইবে কি অপেক্ষা করিবে ভাবিতেছিল, এমতসময় রাজা বলিলেন, "পিতম, আমার দশা এখন তোমারই মত হইল।"

পিতম দেওয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

দেওয়ান্ কোন উত্তর দিলেন না। একজন সভাসদ বলিলেন,

"রাজকুমার ভট্টাচার্য্যদিগের পুত্র প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।"

শুনিবা মাত্র পিতম হাসিয়া রাজার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার মত রাজা দুই একটি দেখেছি, কিন্তু এমন অকর্ম্মা দেওয়ান্ আমি কখন দেখি নাই।"

দেওয়ান্‌জীর কর্ণে শেষ কথাটি গেল। দেওয়ান্ আপনা আপনি বলিলেন, "আমি সত্যই অকর্ম্মা দেওয়ান্।"

রাজা। এ সকল কথা যাক্, এখন কি কর্ত্তব্য তোমরা আমায় পরামর্শ দাও। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

পিতম। পরামর্শ আপনি এখন কেবল চূড়াধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। চূড়াধনবাবু বড় পরামর্শী। চূড়াধনবাবু ভুবনেশ্বরের পরামর্শী।

এই কথা শুনিবামাত্রই চূড়াধনবাবু কলের পুত্তলীর ন্যায় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়ান্ চূড়াধনবাবুর প্রতি একবার কটাক্ষ করিয়া পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রূপ?"

পিতম। আমার মনে নাই।

এই বলিয়া পিতম চলিয়া গেল। কতকদূর গেলে একটা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় আসিয়া পিতমের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; পিতম ষাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, কেমন আছ?" ষাঁড় মুখ তুলিয়া মাথা নাড়িল, অল্প অগ্রসর হইয়া পিতমের স্কন্ধের দিকে গলা বাড়াইয়া দিল; পিতম যত্নে তাহার গলায় হস্তমার্জ্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ভৈরব, তোমার উদরের সংবাদ বল, তুমি ত আমার মত উদরপরায়ণ লোক, বল দেখি গত কল্য কি জুটিয়াছিল? আমার মত বৃক্ষতলে পড়িয়া কি কেবল দন্তঘর্ষণ করিয়াছিলে? তোমার বড় দোষ, কেহ তোমায় না ডাকিলে তুমি যাও না। লোকে তোমায় কেন ডাকিবে? কে তুমি? লোকের

তোমায় কি দরকার? তোমার বিরাট-মূর্ত্তিতে কে ভুলিবে? তোমার কোমলতা কে দাঁড়াইয়া দেখিবে? তোমার এই প্রস্তরস্তূপে নবপল্লবের কোমলতা চিনিয়া কে তোমায় বাহবা দিবে; তুমি আমার নিরেট মেঘ, তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি একবার স্নান করে আসি।"

এই বলিয়া পিতম আপনার ঝুলি ভৈরবের শৃঙ্গে ঝুলাইয়া গাত্রবস্ত্র তাহার পৃষ্ঠে ফেলিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে নামিল। এই সময় অনেক ছেলে আসিয়া জুটিল; তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ভৈরবকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, ভৈরব "ছালনা তলার" বরপাত্রের ন্যায় গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের কোন কথা গ্রাহ্য করিল না। পিতম আসিলে তাহার জলসিক্ত অঙ্গ দেখিয়া ভৈরব পিতমের গাত্রলেহন করিতে আরম্ভ করিল। বালকেরা হাসিয়া বলিল, "পিতম, তোমায় ভৈরব বৎস ভাবিয়া আদর করিতেছে?" পিতম হাসিয়া উত্তর করিল, "আর আমায় কে আদর করিবে?" ছেলেরা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "আমরা আদর করিব।" এই বলিয়া সকলেই পিতমকে ঘেরিয়া ধরিল, কেহ হস্তে, কেহ জানুদেশে, কেহ পৃষ্ঠদেশে চুম্বন করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এই সময় দুই চারিজন প্রতিবাসী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দূরে দশরথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া রাজপুত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। ক্রমে পিতমকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি রাজকুমার দশরথ শর্ম্মার পুত্র?" পিতম বলিল, "দশরথের পুত্র রাম। অনেক দিন তিনি বনে গেছেন।"

প্রথম প্রতিবাসী। পিতম, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি এখন রাজবাটীতে গিয়া থাক--কি শুনিতে পাও? এ রাম দশরথের পুত্র কি?—না সে কথা মিথ্যা?

পিতম। সে কথা ভুবনেশ্বর বলিতে পারেন, সে দিন রাত্রে তাঁহার মন্দিরে বসে কথা হয়। তাহা শুনিয়া খোদ পাষাণ ভুবনেশ্বর দশরথকে বারণ করিলেন; বলিলেন, "চূড়াধনের কথা শুনিস্ না।"

এই শুনিবামাত্র একজন বালক গাইয়া উঠিল, "ভুবনেশ্বর কথা কয়। ছেলে দশরথের নয়।" সকলে হাসিয়া বলিল, "বেশ্ বেশ্।" অমনি তার সকল বালকেরা নৃত্য করিতে করিতে একত্রে গাইতে লাগিল:—

ভুবনেশ্বর কথা কয়।
ছেলে দশরথের নয়॥

দশরথ তাহা দূর হইতে শুনিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখপ্রতি চাহিলেন; ছেলেরা সেইদিকে গাইতে গাইতে যাইতে লাগিল; দশরথ তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া গালি দিলেন,

"এ ত বড় মজার খেলান" বলিয়া বালকেরা অধিকতর আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া আরও গাইতে লাগিল; শেষ দশরথ হস্তে ইষ্টক লইলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন; তিনি শুনিলেন না দেখিয়া অগত্যা তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যেখানে প্রতিবাসীরা দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন।

পিতম যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে সকলে স্থির করিয়াছিল যে দশরথের দাবি মিথ্যা, প্রথম যখন দশরথ দাবি উপস্থিত করেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিল; রাজার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইয়া কতই কথা, কতই পরামর্শ, কতই নিন্দা করিয়াছিল। নিন্দা এ সংসারে পরম সুখ; দশরথের দাবি উপলক্ষে সে সুখভোগ হইয়া গিয়াছে, আর তাহাতে রস নাই, তখন নিন্দার স্রোত ফিরিবার সময় হইয়াছে, কাজেই প্রতিবাসীরা যখন দশরথের দাবি মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবার উপলক্ষ পাইল, আবার তাহারা চরিতার্থ হইল, একজন তখন বলিল, "ঠিক কথা,এমন কি কখন হইতে পারে? রাজা কেন পরের ছেলে চুরি করে আনিবেন? তাঁহার পুত্র না হইলে তিনি অনায়াসে পোষ্যপুত্র লইতেন; তাঁহার কিসের দুঃখ? দেশে এত ছেলে থাকিতে তিনি কেন লক্ষ্মীছাড়া দশরথের পুত্র লইতে যাইবেন। আমাদের ছেলে হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা। এ মিথ্যা দাবি বোধ হয়। টাকা পাইবার প্রত্যাশায় দশরথ এই দাবি সাজাইয়াছে।"

দ্বি, প্রতি। তাহার আর সন্দেহ নাই, নতুবা পিতম এ কথা বলিবে কেন? পিতম ত পাগল নহে, পিতম সিদ্ধপুরুষ; কেবল ঠাট করে ফেরে—যেন কতই পাগল, কিন্তু কিছুই নয়—সকল জানে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে কি হয়েছিল তাহা পর্য্যন্ত জানে।

তৃতীয় প্রতিবাসী। পিতম কি বলিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

প্র, প্রতি। বুঝিতে পারিলে না? চূড়াধনবাবু দশরথকে কিছু টাকার লোভ দেখাইয়া এই কার্য্যে নামাইয়াছেন। রাজকুমার যদি দশরথের সন্তান বলিয়া জনরব থাকে, তাহা হইলে রাজার অবর্ত্তমানে চূড়াধনবাবু রাজ্য পাইবেন।

চতুর্থ প্রতি। সেই দেঁতো কটাচুলা হারামজাদা! তার আমি হাড় ভাঙ্গিব—

এমত সময় দশরথের সঙ্গীরা উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপারখানা কি,ছেলেরা এ কি বলে?"

প্র, প্রতি। যাহা সত্য, তাহাই বলে।

চতুর্থ, প্রতি। দশরথ শর্ম্মাকে সঙ্গে করে একবার রাজবাটীতে যাও, ব্যাপার শুনিতে পাবে দেখিতেও পাবে। চূড়াধনবাবু ধরা পড়েছেন, দশরথকে ধরিতে

সিপাহী এখনই যাইবে; কিন্তু ঐ দেখিতেছি তিনি আপনিই ধরা দিতে আসিতেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে রাত্রে যে পরামর্শ হয়ে ছিল, তাহা এখন প্রকাশ হয়েছে।

দশরথ এই সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গীরা বলিল,"দশরথ,এই সকল ভদ্র লোকে কি বলিতেছেন, শুন। তুমি কি একদিন রাত্রে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গিয়া চূড়াধনবাবুর পরামর্শ মতে এই মিথ্যা দাবী উপস্থিত করে ছিলে? তাহা হইলে এই সময় বল, আমাদের আর কেন মজাও, একথা রাজসভায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

দশরথ চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সকলের মুখপ্রতি চাহিলেন, শেষ পলায়ন-উন্মুখ। এই সময় একজন প্রতিবাসী বলিল, "সে গুড়ে বালি! সিপাহীরা আগতপ্রায়।"

দশরথ। আপনাদের সাক্ষাতে বলিতেছি আমি এক পয়সা লই নাই; আমি ত টাকার প্রত্যাশী নই?

এই সময় একজন বালক বলিল, "ঐ সিপাহী আসিতেছে।" দশরথ আর ফিরিয়া চাহিলেন না,পলাইলেন।

২৩

দশরথ পলাইলে পর এই সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। যে অধ্যাপক পূর্ব্বে দশরথের পক্ষ হইয়া দেওয়ান্‌কে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া যোড়করে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের অপরাধ হইয়াছে, দশরথ বাচস্পতি শোকবিহ্বল হইয়া কেবল পরের পরামর্শে রাজকুমারকে দাবি করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে পরামর্শ হয়, তাহা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা সে পরামর্শের কথা পূর্ব্বে শুনি নাই; তাহা হইলে কদাচ দশরথের সঙ্গে আমরা আসিতাম না। দশরথ এক্ষণে পলাইয়াছেন, তিনি নিতান্ত পরের পরামর্শে এই কুকার্য্য করিয়াছেন; অতএব আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে সে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনি ক্ষমা করেন। তাহার অপরাধ গুরুতর নহে, যিনি তাঁহাকে লওয়াইয়াছেন, তিনিই প্রধান অপরাধী।"

রাজা কথা কহিবার পূর্ব্বেই দেওয়ান্‌ বলিলেন, "যিনি প্রধান অপরাধী তাহা আমরা জানিয়াছি, এক্ষণে আপনারা বিদায় হউন।"

ভট্টাচার্য্যেরা বিদায় হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মৃতকন্যার কথাটা কি, আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেওয়ান্‌। এখনই বুঝিতে পারিবেন, আমি রামিধাইকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে রাজদাসীদের ডাকিয়া এই রাজসভায় সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়।

রাজা। আবশ্যক নাই, আমি স্বয়ং তাহাদের জিজ্ঞাসা করে আসিতেছি।

রাজা উঠিয়া গেলে, চূড়াধনবাবু বিমর্ষ-মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "পিতম পাগল বিলক্ষণ ধূর্ত্ত, এক কথা রটাইয়া দশরথ বাচস্পতিকে ভাল ভয় দেখাইয়াছে। নিশ্চয় পিতম পাগল দশরথকে পথ হইতেই তাড়াইয়াছে।"

দেও। সম্ভব। পিতম ধূর্ত্ত না হইলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম রাজসভায় বলিয়া ফেলিত।

চূড়াধন। যেখানে আপনার মত দেওয়ান্ উপস্থিত, সেখানে পাগলেরও বিজ্ঞতা জন্মে।

দেও। যেখানে আপনার মত ব্যক্তি থাকে, সেখানে বিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহা না হইলে বিয়াদবি হয়।

এই সময় একজন নকিব আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সভা বরখাস্ত, রাজা বাহাদুর অসুস্থ হইয়াছেন।"

সভাভঙ্গ হইলে রাজা অন্দর হইতে আসিয়া এক নির্জ্জন ঘরে অতি বিমর্ষভাবে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ হইল। রাণীর মহলে গিয়া রাজা বড় যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলেন। রাণীকে মৃত কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া রাজার প্রতি-খর দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অদ্য প্রাতে জ্যোৎস্নাবতী আমায় বলিয়াছিলেন যে, তুমি এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলে; তাহাই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই কথা শুনিবামাত্র রাণী অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতী আমার পরম শত্রু; সেই প্রথমে রটাইয়াছে যে, রাজকুমার আমার সন্তান নহে। তাহারই বলে ভট্টাচার্য্যেরা আসিয়াছিল। আপনার ভগিনী নিজের সংসার জ্বালাইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে আমার সংসার শ্মশান করিতে বসিয়াছে। তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলে একবার তাহার শ্বশুর তাড়াইয়াছে, এবার আমি তাড়াইব। আপনি তাড়াইতে না দেন, আমি নিজে সংসার ত্যাগ করে যাব, আপনি ভগিনী লয়ে রাজ্য করুন।"

রাজা। স্থির হও, আমার বলিতে ভুল হইয়াছে, হয় ত ভুলে আমি জ্যোৎস্নাবতীর নাম করিয়াছি।

রাণী। আমি আর সে সকল স্তোক-বাক্য শুনিতে চাই না। এখনই পাল্কী আনিতে পাঠান, হয় তাহাতে জ্যোৎস্নাবতী উঠিবে, নতুবা আমি উঠিব।

এই বলিয়া রাণী বেগে জ্যোৎস্নাবতীর মহলে গেলেন। রাজা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

অপরাহ্নে একজন পরিচারিকা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিল, "রাজভগিনী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো-

থায় গেলেন?” পরিচারিকা উত্তর করিল, “জানি না।” রাজা উত্তরীয়দ্বারাচক্ষু আ-বৃত করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতে রাজসভায় সকলে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন, রাজা অন্যমনস্কে কি ভাবিতেছেন, এমতসময় কতকগুলি শিবিকাবাহক আসিয়া জানাইল, “রাজভগিনী কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিকা ত্যাগ করে পদব্রজে গেলেন, আমরা এত মিনতি করিলাম, তিনি শুনিলেন না; বলিলেন, আর আমার “পাল্কীর প্রয়োজন কি? এখন আমি কাঙ্গালিনী।”

শুনিবামাত্র রাজা গাত্রোত্থান করিলেন; পিতম পাগলা অন্যমনস্কে দূরে বসে ছিল, উঠিয়া গেল; এই সময় দেওয়ান্ মহাশয়কে একজন জানাইল যে রামিধাই উপস্থিত। রামি প্রণাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইল; রাজা কক্ষান্তরে যাইতেছিলেন, রামি ধাইকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাণীর কি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল?”

রামি ধাই। প্রথমে এক কন্যা।

রাজা। তবে কি রাজকুমার রাণীর গর্ভে জন্মে নাই।

রামি ধাই। রাজকুমারও আপনার সন্তান; প্রথমে কন্যা জন্মে, পরে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হন। রাণী তখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, কন্যাটি জন্মিলে মৃত মনে করে আমরা তাহার সৎকার করিতে যাই, সেই সময় কোথা হইতে পিতম পাগলা আসিয়া তাহাকে লইয়া পলাইল; রাত্রে একটি ব্রাহ্মণের কন্যা সেই ভূমিষ্ঠ হইয়াই মরে, তাহার জননী সেই মৃত সন্তান ক্রোড়ে করে শুইয়া থাকে। কন্যাটি মরিয়াছে এ কথা বলিলে, অমনি কন্যাকে ক্রোড়ে টানিয়া চুমা খায়। সে ঘুমাইলে পিতম পাগলা তাহার ক্রোড় হইতে মৃতকন্যা চুরি করে মহারাজের কন্যাকে তাহার ক্রোড়ে রাখিয়া আসে। সেই ক্রোড়ে আপনার কন্যা জীবিতা হয়—অদ্যাপি জীবিতা আছে, আমরা ভয়ে এ কথা এপর্য্যন্ত বলিতে পারি নাই। এক্ষণে রাজভগিনী এসকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন, কাজেই বলিতে হইল।

রাজা। এ কি কাণ্ড শুনি!

দেও। অসম্ভব নহে; কিন্তু রামি বলিতেছে যে, মহারাজের মৃতকন্যা ব্রাহ্মণীর ক্রোড়ে দিয়া পিতম সেই ব্রাহ্মণীর মৃতকন্যা উঠাইয়া লয়, এ কথার তাৎপর্য্য ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, পিতমকে একবার এই সময় ডাকিলে ভাল হয়।

রাজা। এখনই ডাকিতে পাঠাও; কিন্তু তাহার নিকট সরল উত্তর পাওয়া দায়।

রামি ধাই। পিতম পাগলা যখন ভূমি হইতে মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া পলাইল, আমরা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ হইল, পাগলা হয় ত পিশাচ, সকলই

করিতে পারে। তাহার পর যখন পিতম মৃতদেহ লইয়া পুষ্করিণীতে নামিল, তখন আরও ভয় হইল। আমরা পলাইলাম, ভয়ে আর এ কথা মুখে আনি নাই। তাহার পর আমার ভগিনীর কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনিলাম। যখন পিতম ব্রাহ্মণীর সূতিকাগারে প্রবেশ করে, তখন আমার ভগিনী হারাধাই জাগ্রত ছিল, তাহাকে পিতম বলিল, "কোন কথা প্রকাশ করিস্ না তোর ভাল হবে।" তাহার পর যখন পিতম ব্রাহ্মণের মৃতকন্যা লইয়া গেল, তখন মহারাজের কন্যা কাঁদিয়া উঠিল। আমার ভগিনী উঠিয়া কন্যাকে দুগ্ধ খাওয়াইতে লাগিল।

রাজা। তবে তোমার ভগিনীকে ডাকিতে পাঠাও। পিতম কই ?

একজন পরিচারক বলিল, "পিতম ঐ আসিয়াছে।"

রাজা। পিতম,তুমি আমার কন্যাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ?

পিতম। আপনার ভগিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন? মরা কন্যার সম্বাদ লওয়া অপেক্ষা জীবিত ভগিনীর তত্ত্ব করা ভাল।

রাজার চক্ষে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া দেওয়ানকে বলিলেন, "উদ্যোগ করিতে বল, জ্যোৎস্নাবতীর সন্ধানে আমি স্বয়ং যাইব। সে পদব্রজে কোথায় বনে বনে বেড়াইতেছে; আমিও পদব্রজে তাহার অনুসন্ধানে যাইব। আমার ভগিনী এত কষ্ট পাইতেছে, আমি কি বলে পাল্কী চড়িব।"

দেও। পিতম, তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করি, স্পষ্ট উত্তর দাও; এ সময় পাগলামি কর না।

পিতম। পাগলের পাগলামি আছেই, পাগলের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। চূড়াধনবাবু কোথা, তাঁহাকে যে আজ বড় দেখিতেছি না।

রাজা। এখন আমার কন্যার সম্বাদ বল।

পিতম। আপনি কোন্ কন্যার কথা বলিতেছেন ?

রামি ধাই। যে কন্যা মরিয়াছে মনে করিয়া আমরা মাটীতে পুতিতেছিলাম, তুমি দৌড়িয়া আসিয়া লয়ে গেলে।

পিতম। কবে? আমার মনে নাই।

রামি ধাই। ঐ আমার ভগিনী আসিয়াছে। উহার নিকট সকল শুনুন; বল্ ত লা—এখন পিতম বলিতেছে কিছু মনে নাই।

হারা ধাই। মনে করে কি হবে, সে কন্যা ত আর এখানে নাই।

রাজা। কেন?

রামি ধাই। পাড়ার লোকেরা ব্রাহ্মণীকে ইদানীং বড় জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শেষ তিনি মেয়েটী লয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন।

রাজা। কাহার বাটীতে আমার কন্যা প্রতিপালিত হইত ?

পিতম। আপনার রামসেবকের বাটীতে।

রাজা। তবে নিশ্চয়ই মাধবীলতা আমার কন্যা!

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮১ সংখ্যা।

বঙ্গোন্নয়ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার রোগ।

বাঙ্গালায় যতপ্রকার অমঙ্গল আছে, ব্যাপক জ্বর* তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

দুর্ভিক্ষ, ওলাউঠা রোগ আপাততঃ অধিকতর ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ব্যাপক জ্বরে যদ্রূপ শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য হয়, তদ্রূপ অন্য কোন রোগেই হয় না। এই মহারোগের সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। নিদান অর্থাৎ রোগের কারণনির্ণয় অতি দুরূহ শাস্ত্র। দশব্যক্তি একত্র গঙ্গাস্নান যাইতে পথিমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে। একজনের সামান্য জ্বর হয়, একজন অবশিকাবে প্রাণত্যাগ করে, একজনের কফের কোপ হয়; একজনের সাংঘাতিক যক্ষ্মাকাশের সঞ্চার হয়। অবশিষ্ট ছয়ব্যক্তির কিছুই হয় না। যদি বৃষ্টিতে ভিজাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির জ্বরের একমাত্র কারণ হয়, তবে সকলেরই সামান্য জ্বর কেন না হইল? বস্তুতঃ রোগীর শরীরে নিহিত আভ্যন্তরিক কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল বাহ্যভৌতিক কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোগের প্রকৃত নিদান হয় না। পক্ষান্তরে ছয়ব্যক্তিকে সুস্থ দেখিয়া অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, যে রোগীর শরী-

* অনেকে এপিডেমিক্ জ্বরকে সংক্রামক জ্বর বলেন। বসন্ত, হাম ও উপদংশ রোগের যেমন সংক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়, জ্বরের তেমন কিছুই নাই। অনেক ব্যক্তিকে এককালে জ্বরাক্রান্ত দেখিয়া, সংক্রমণ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে। জ্বররোগীকে স্পর্শ করিয়া কাহারও জ্বর হয় না। এপিডেমিক্ জ্বরকে ব্যাপক জ্বর বলাই উচিত।

রের পূর্ব্বাবস্থাই রোগের মূলীভূত কারণ; বৃষ্টিতে ভিজা উপলক্ষমাত্র। অনেক কারণে রোগের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে পরিদৃশ্যমান কোন একটি কারণ সাধারণ লোকে জানিতে পারে; চিকিৎসক হয় ত সাধারণ লোকাপেক্ষা কিছু ভাল বুঝেন; কিন্তু সমস্ত আভ্যন্তরিক কারণের বিষয় অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতীত কেহই জানিতে পারেন না।

(১) ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলেন একপ্রকার বায়বা বিষ শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সবিরাম ও কখন কখন স্বল্পবিরাম জ্বরের উৎপত্তি হয়। এই বিষবায়ুর নাম ম্যালেরিয়া। রাজা দিগম্বর মিত্র বলেন ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ ভূমির নিম্নস্তরের আর্দ্রতা। এই মত সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত হউক বা না হউক, ইহা যে অনেকদূর সঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যেখানে ব্যাপক জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেখানকার বৃক্ষলতাদির বড় তেজ। বিশেষতঃ কচুগাছগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন এক একটি কলাগাছের তেউড়, এবং সিক্তভূমিবিলাসী রক্তএরণ্ড তথায় বিরাজ করে। ভূমির নিম্নস্তর প্রচুর রস না পাইলে বনা কচু ও লালভেরণ্ডার এমন তেজ হয় না।

হিমালয়াচলের সমস্ত জল নদী দিয়া নির্গত হয় না। অনেক জল সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা আর্দ্র করে; এই কারণেই হিমালয়ের তরাই এত অস্বাস্থ্যকর; এই কারণেই রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া ও চম্পারণের উত্তরভাগ এমন অস্বাস্থ্যকর।

পক্ষান্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, যে ১২৮৬ সনের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নদিয়া জেলা বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। সে বৎসরে জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব না হইয়া একবৎসর পরে কেন হইল? এই প্রশ্নের সদুত্তর আমরা কাহারও নিকট পাই নাই; কিন্তু আমরা বলিতে পারি এইরূপ দুই একটি উদাহরণ দ্বারা রাজা দিগম্বরের মতের খণ্ডন হয় না।

(২) অগভীর স্থির জলাশয় ম্যালেরিয়ার অতি প্রধান আকর। বিলময়প্রদেশে জ্বরের প্রাদুর্ভাব এই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইটালিদেশে পণ্টিন বিল হইতে শরৎকালে এত ম্যালেরিয়া উত্থিত হয় যে রাত্রিকালে পথিকগণ তাহার নিকট দিয়া চলিতে পারে না। চলিলেই জ্বর হয়। অগভীর জলাশয় যদি লবণাম্বু হয়, তাহা হইলে আরও অস্বাস্থ্যকর হয়। আমাদের দেশে লোণা লাগার যে সংস্কার আছে, তাহার মূল এই। কলিকাতার পূর্ব্বদিকে যদি ধাপা (salt-water lake) না থাকিত, তাহা হইলে কলিকাতা অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইত। কলিকাতার ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, রাজধানীর প্রধান প্রধান ডাক্তারসাহেবেরা একবাক্যে ঐ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে হিজলির

নিকটবর্ত্তী স্থান যে অস্বাস্থ্যকর তাহার কারণ এই যে অগভীর লবণাম্বু নিকটে আছে। এই কারণেই ২৪ পরগণা এবং যশোহরের দক্ষিণে সুন্দরবন অরাধিকৃত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের সুন্দরবন যে অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তথাকার নদীসকল পদ্মার বেণী; তাহারা প্রচুর-অলবণজল সমুদ্রে লইয়া যায়। ফ্রান্সে লাভেন্দে প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত কারণেই অস্বাস্থ্যকর ছিল। অগভীর খাল কাটায় লবণাম্বু বিলসকল প্রায় একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। তাহাতেই লাভেন্দে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

কয়েকবৎসর হইল কর্ণেল হেগ্ হুগলি জেলার ব্যাপকজ্বরের কারণানুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি আপন বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ করিয়াছেন, "কোন কোন বিলের একপারে বিলক্ষণ জ্বর, অপরপারে কিছুই নাই বলিলে হয়।" পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন বৈষম্যের কারণ কি? ইহার উত্তর এই হইতে পারে 'যদি দুই গ্রামের অন্যান্য বিষয়ে অবস্থা সমান হয়, তবে যে গ্রামে অধিক রৌদ্র পায় ও যাহাতে বায়ুসঞ্চালনের সদুপায় আছে, সেই গ্রাম অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। আর সর্ টমাস ওয়াটসন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে বিলের পার্শ্বে নিবিড় বৃক্ষাদি থাকিয়া যদি বিলের বায়ু প্রতিরোধ করে; তাহা হইলেও গ্রামের মঙ্গল।

(৩) নদী ভরাট হওয়া এবং নদীর স্রোত বন্ধ হওয়া মহা অনিষ্টের মূল। গত শতাব্দীতে কাশিমবাজার বাঙ্গালাদেশমধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্ম্মাণী, দিনেমার ও হিন্দুবণিকে নগর পরিপূর্ণ থাকিত। এখনও ভগ্ন অট্টালিকা, ভগ্ন মন্দির, ভগ্ন প্রস্তরময় ঘাট ও বিস্তৃত গোরস্থান বিদ্যমান আছে। সাবিভর হইয়া নগর উৎসন্ন গিয়াছে। তবে যে ইহার প্রাচীন গৌরব একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তাহা বঙ্গনারীভূষণ মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রসাদে।

কাশিমবাজারের অধঃপতনের কারণ এই যে ভাগীরথীনদীর গতি আগে সৈদাবাদের পূর্ব্বদিক্ দিয়া ছিল, এক্ষণে পশ্চিমদিক্ দিয়া হইয়াছে। তাহাতে নদীর ভূতপূর্ব্ব গর্ভ ম্যালেরিয়ার আকর বিল হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই মহামারি হয়; এক্ষণেও ঐ নগর জ্বরাকীর্ণ জনপদ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মুরশিদাবাদ জেলায় যেমন ভাগীরথী ভূতপূর্ব্ব খাত অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে, নদীয়া জেলায়ও যমুনা, বেতনা, ও কোদলার দুরবস্থা, যশোহরে ভৈরবের অপরিষ্কৃত জলপথ, ২৪ পরগণায় আদিগঙ্গা, লাউইনদী, সুতীনদীর অপরিষ্কার, হুগলী জেলায় কানানদী ও সরস্বতীর দুর্গতি মহা অস্বাস্থ্যের মূল হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষগণ বোধ হয়

প্রস্তুত করিয়া আপনাদের উদার রাজনীতির পরিচয় দিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিতে হয়; কিন্তু লুপ্তপ্রায় নদীগর্ভের সংস্কার করিলে দেশের যত হিত হয়, এমন আর কিছুতেই হইবে না। লোকে অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল জল পাইবে, নৌকাপথে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, এবং স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হইয়া যারপর নাই মঙ্গল হইবে। প্রভিন্‌স্যাল্ পব্‌লিকওয়ার্কস্ শেষের অধিকাংশ এই কার্য্যেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তা, প্র, চ।
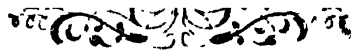
চাকুরীর পরীক্ষা।

বিবাহ উপলক্ষে যেরূপ কুলপরিচয়ের প্রয়োজন হয়, পূর্ব্বে চাকুরী উপলক্ষেও সেইরূপ প্রয়োজন হইত। তৎকালে বিশ্বাস ছিল যে, কর্ম্মদক্ষতা কেবল সৎকুলেই সম্ভব, অসৎকুলে দুর্লভ। সে বিশ্বাসের বিশেষ হেতুও ছিল; তৎকালে শিক্ষা কুলগত ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই, এক্ষণে শিক্ষা সকলকুলেই সম্ভব, কার্য্যদক্ষতাও কাজেই সকল কুলেই পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা কিছু কঠিন হইয়াছে।

যোগ্যব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যে অতি কঠিন তাহা সকলের সংস্কার নাই। সাধারণতঃ বিশ্বাস আছে যে, উপযুক্ত ব্যক্তিরাই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ বিশেষ জানেন, তাঁহাদের মত স্বতন্ত্র। এইজন্য ইংলণ্ডদেশের একজন প্রধান ব্যক্তি আপনাকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আপন কর্ত্তব্যকার্য্যের তালিকায় লিখিয়াছিলেন যে, আমি মন্ত্রী হইয়া কেবল যোগ্যলোককেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিব। তিনি জানিতেন যে এইটি বড় সহজ নহে, ইহার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। অযোগ্য ব্যক্তিরা অনুরোধের জয়পতাকা তুলিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের উল্লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। এইজন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না।

ইদানীং বিজ্ঞরাজপুরুষেরা অনুরোধের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সহজে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা। পরীক্ষা এক্ষণে সকল রা-

জ্যেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রায় ৩২ বৎসর হইল কতকাংশে আরম্ভ হইয়াছে।

পরীক্ষা দিয়া চাকুরী করা এক্ষণকার নিয়ম। যাহারা পরীক্ষা দিতে অসমর্থ অথচ চাকুরীর লোভ রাখে, কেবল তাহারাই পরীক্ষার বিদ্বেষী হওয়া সম্ভব। তদ্ভিন্ন যদি আর কেহ ইহার বিদ্বেষী থাকেন, তাহা হইলে হেতু অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উমেদার ব্যতীত সত্যই অনেক লোকে এই নিয়মের বিরোধী দেখা যায়; তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, উপযুক্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিতে গেলে পরীক্ষাই তাহার একমাত্র উপায়। অথচ আবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, "ভাল! পূর্ব্বকালের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটরা অযোগ্য কেন? পূর্ব্বেও তাঁহাদের পরীক্ষা ছিল এক্ষণেও ত সেই পরীক্ষা আছে।" আবার বলেন "উকীলদের পরীক্ষা পূর্ব্বে ছিল এখনও আছে, তবে পূর্ব্বকালের উকীল অপেক্ষা এক্ষণকার উকীলেরা ভাল কেন?"

এ কথার প্রথমেই আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটরা যে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অথবা এক্ষণকার উকীলেরা যে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ পুরাতন লোক, এই প্রস্তাবলেখক তাহার মধ্যে একজন। যাহারা উভয় সময়ের কর্ম্মচারী দেখিয়াছে, তাহাদের প্রমাণ গ্রহণ না করিলে আর প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাদের প্রমাণ যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে পরীক্ষাসত্ত্বেও এক্ষণকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটগণ অযোগ্য। পরীক্ষা সত্ত্বেও যদি এরূপ হয় তবে পরীক্ষার প্রয়োজন? যোগ্যব্যক্তি নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা যে একমাত্র উপায় অথবা বিশেষ উপায় তবে তাহা মিথ্যা হইল? অন্যদেশে পরীক্ষাদ্বারা যোগ্য লোক নির্ব্বাচন হইতেছে, অন্ততঃ কতকাংশে হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশে তাহার বিপরীত ফল কেন হয় তদন্ত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে যৎকালে আমাদের দেশে উপযুক্ত ব্যক্তি বড় পাওয়া যাইত না, তখন গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; আর এক্ষণে যোগ্যলোক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র শত শত পাওয়া যায়, অথচ যোগ্যলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয় না, ইহার হেতু কি? এই কথা লইয়া বাঙ্গালিরা মধ্যে মধ্যে গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকবৎসর অবধি একটা কথা রটিয়াছে যে ডিসরেলি সাহেব যখন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একবার তথায় কথা উপস্থিত হয়

যে ইংলণ্ড হইতে আর অধিক covenanted servant) কবনান্টেড সারবান্ট পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, এই সনদি সাহেবদের বেতনে ভারতবর্ষের অনর্থক অনেক অর্থব্যয় হইতেছে। বিশেষতঃ ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটদেরমধ্যে যেরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে অনায়াসে অধিকাংশ কার্য্য তাহাদের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ডিসরেলি সাহেব তাহাতে ভাবিলেন সনদি চাকরেরা বেতনদ্বারা ভারতের অনেক টাকা ইংলণ্ডে আনিতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা কম হইলে ইংলণ্ডের অর্থাগম কম হইবে। অতএব এই আশঙ্কায় ডিসরেলি সাহেব গোপনে নিষেধ করেন যে, আর যেন বিশেষ উপযুক্ত বাঙ্গালিকে উচ্চপদ না দেওয়া হয়, তবে এখানে সেখানে দুই একটি ভাল লোককে কর্ম্ম দিলে ক্ষতি নাই বরং না দিলে নিন্দা হইবে। অনভিজ্ঞ বাঙ্গালিমহলে এরূপ অমূলক কথা রটিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নিত্য যাহা হয়, তাহার সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে বাঙ্গালিরা দেবতাদের দোষারোপ করে সে বাঙ্গালিরা লোকনির্ব্বাচন সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রম দেখিলে যে ডিসরেলি সাহেবকে বা ইংরেজরাজশাসনকে দোষারোপ করিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? রাজমন্ত্রীর গোপনঅনুমতি সম্বন্ধে তাঁহাদের এতদূর বিশ্বাস যে তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া থাকেন "যদি গোপননিষেধ না থাকিবে তবে ব্যবসাদারেরা বা জমীদারগণ যে শ্রেণীর লোকদের কুড়ি কি পঁচিশ টাকায় চাকর রাখেন এক্ষণে সেই শ্রেণীর লোকদের গবর্ণমেণ্ট চারিশত পাঁচশত বেতন দিয়া কেন রাখিতেছেন।" আমরা স্বীকার করি ঐ শ্রেণীর লোক এক্ষণে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মধ্যে অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার হেতু গবর্ণমেণ্টের কোন কুঅভিসন্ধি নহে; গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইয়া কেবল পরীক্ষাদ্বারা সেই সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তাহাতে অনুপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে সে দোষ পরীক্ষার। তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। যোগ্য লোক নির্ব্বাচনের জন্য পরীক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সন্দেহ নাই কিন্তু উপযোগী পরীক্ষা এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই জন্য ভুল হইতেছে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ভুল চলিবে।

যখন গ্রেসাহেব গবর্ণর ছিলেন, তখন এই নিয়ম করা হয় যে পরীক্ষা করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে হইবে, নিযুক্ত করিয়া আবার তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইবে। পূর্ব্বে এ প্রথা ছিল না, নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আর কোন পরীক্ষা হইত না, গ্রেসাহেব তাহা প্রথম করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, আর অযোগ্য লোক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। নিযুক্তের পূর্ব্বে পরীক্ষা, নিযুক্তের পরে পরীক্ষা,

শুনিলে তাহাই আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রেসাহেবের সময় হইতেই আরও বিশেষরূপে অযোগ্য ও সামান্য লোক নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রেসাহেব বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, যাহারা সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব, যাহারা অনায়াসেই "সুপারিসের" যোগাড় করিতে পারে, সচরাচর তাহারাই ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়া থাকে; তাহারা অযোগ্য হইলেও ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহাদের বংশগৌরব নাই, অথচ যোগ্যব্যক্তি তাহারা এ পদ প্রায় পায় না; অতএব এ কুপ্রথার পথরোধ করিবার নিমিত্ত গবর্নর সাহেব সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা করেন তিনি পূর্ব্বাহ্নে নিয়মিত একটি পরীক্ষা দিয়া আপনার নাম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী রেজেষ্টরীতে লেখাইতে পারেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি কেবল সেই পরীক্ষোত্তীর্ণদের দেওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক যে পরীক্ষাটি বড় কঠিন নহে, একটু ইংরেজি, একটু অঙ্কশাস্ত্র, একটু ইতিহাস এই লইয়া সেই পরীক্ষা। আমাদের দেশে বালকেরা স্কুলে সচরাচর যাহা অধ্যয়ন করে কেবল সেই সম্বন্ধে এই পরীক্ষা। সরলচেতা গ্রেসাহেব এই নিয়ম বদ্ধ করিলে সামান্য কেরাণী, গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারগণ নাচিয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের অযোগ্যতা জানিত, তাহারা কস্মিনকালে হেড কেরাণী বা হেড মাষ্টার হইবার প্রত্যাশা করিত না এক্ষণে তাহাদের কপাল খুলিল, অনায়াসে পরীক্ষা দিয়া তাহারা ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইতে লাগিল। কেহ কেহ রহস্য করিয়া এই সকল ডেপুটিদের "গ্রের গাধা" বলিয়া থাকেন। গ্রে সাহেব আপনার ভুল শেষ বুঝিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই সেই পরীক্ষা বন্ধ করিয়াছিলেন। গ্রের সকল ডেপুটিই গাধা নহেন, গুণবান্ ব্যক্তি অনেকে আছেন সন্দেহ নাই।

গ্রে সাহেবের পর ক্যাম্বল সাহেব গবর্ণর হইলেন। তিনি জানিতেন বাঙ্গালিরা শিক্ষাদোষে দুর্ব্বল অতএব ব্যায়াম শিক্ষার উৎসাহ দিবার নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটিপদ বলিষ্ঠের পারিতোষিক স্থির করিলেন। তাহাদের প্রথমতঃ কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত সব্ ডেপুটিপদ নূতন সৃষ্টি করিলেন, যাহারা অশ্বারোহণে, সন্তরণে, পদসঞ্চালনে বিলক্ষণ পটু তাহারাই সব্‌ডেপুটি হইবার অধিকারী হইল। এই পদের নিমিত্ত সামান্যগত জরিপ জমাবন্দি আর একটু আইন জানিলেই হইবে এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ক্যাম্বল সাহেবের বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে আবার গ্রাম্য স্কুলমাষ্টারদিগের মধ্যে উৎসাহ পড়িয়া গেল। কেরাণি ও মুহুরিদলের সুবিধার জন্য গবর্ণর সাহেব হুকুম দিলেন যে তাহারা জরিপ জমাবন্দি প্রভৃতি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটি চাহিলে অনা-

য়াসে ছুটি পাইবে। সুবিধার আর সীমা রহিল না। সেই সকল মুহুরি, কেরাণি, গ্রাম্যশিক্ষক প্রথমে সব্‌ডেপুটি হইয়া এক্ষণে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ক্যাম্বল সাহেব হস্তপদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই জন্য কেহ কেহ রহস্য করিয়া তাহাদের "ক্যাম্বলি উট" (Campbell's Camel) বলেন।

কিরূপে অযোগ্য ও সামান্য ব্যক্তিরা ইদানীং ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটি পদলাভ করিতে পারিয়াছে তাহা বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়দ্বারা অনায়াসে অনুভব হইতে পারিবে। ইংরেজ কর্ম্মচারী এ দেশে প্রয়োজন ইহা বিলাতে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অযোগ্য বাঙ্গালিকে উচ্চপদে আসীন করা হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদি তাহাতে অযোগ্যব্যক্তির পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে সে দোষ পরীক্ষার।

পরীক্ষার দোষ গুণ দুই আছে। পরীক্ষার গুণ আছে বলিয়া সকল দেশেই পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, পরীক্ষা থাকিলে অনুরোধের বল হ্রাস হইয়া যায়। এক্ষণে বিনাপরীক্ষায়, কেবল অনুরোধের বলে, আর কেহ মুন্সেফ হইতে পারেন না। ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটিতে অদ্যাপি সে নিয়ম বলবৎ হয় নাই, হইবারও বিলম্ব আছে, তথাপি কথঞ্চিৎ সে নিয়ম গবর্ণর ক্যাম্বল সাহেবের সময়ে হইয়াছিল। একবার তিনি একজন জজসাহেবকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি একারেক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দিতে পারি না, তিনি উপযুক্ত হইলে অনায়াসে নেটিব সিবিলসার্ব্বিসের অর্থাৎ সব্‌ডেপুটি পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট অনায়াসে হইতে পারিবেন। পরীক্ষার প্রথা ছিল বলিয়া ক্যাম্বল সাহেব অনুরোধে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পরীক্ষার অকাট্য নিয়ম থাকিলে কেহ অনুরোধ করিতে আইসে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার বাধা কমিয়া যায়।

পরীক্ষা সঙ্গত ও শ্রেয়ঃ বলিয়া সর্ব্বত্রে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত পরীক্ষা হইলে তাহাই বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে আমাদের দেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রায় অসঙ্গত। যে কার্য্যে যে গুণ আবশ্যক তাহা উমেদারের আছে কি না নির্দ্ধারণ করাই পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে স্থির করা চাই যে, কোন্ পদের নিমিত্ত কি কি গুণ আবশ্যক। পূর্ব্বাহ্নে তাহা স্থির করিয়া পরীক্ষা করিলে সেই পরীক্ষা সার্থক হয়। নতুবা আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরীক্ষা করেন, সেইরূপ পরীক্ষা অনর্থক। যদি নিয়ম করা যায় যে বলিষ্ঠপদ দেখিয়া "ডাক রনার" নিযুক্ত করা যাইবে তাহা হইলে সঙ্গত হয়। কিন্তু যদি বলা যায়, বলিষ্ঠপদ দেখিয়া মাজিষ্ট্রেটী দেওয়া যাইবে

তাহা হইলে কে না উপহাস করে? বলিষ্ঠপদ মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যের নিমিত্ত যে তাহা বিশেষ আবশ্যক ইহা কেহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে কে তাহাতে কর্ণপাত করে?

• গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা লোকে পরীক্ষক ভাল, অনেককে গবর্ণমেণ্ট উকিলির ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দেন, তাহার পর লোকে তাহাদের বাছনি করে। গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষায় তাঁহারা সকলেই যোগ্য, লোকের পরীক্ষায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই অযোগ্য; তাহাই তাহাদের অবস্থার তারতম্য। উকিলদের আইনজ্ঞ হওয়া উচিত সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাঁহাদের আর গুটিকতক গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে কেবল আইন জানা বৃথা হয়। গবর্ণমেণ্ট সেই গুণগুলির পরীক্ষা একেবারে করেন না, কাজেই দেখা যায় আইনের পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতার সার্টিফিকেট হাসিল করিয়াও অনেক উকিল, অযোগ্য বলিয়া আদালতে প্রায় অগ্রাহ্য হইয়া থাকেন; কাজেই বলিতে হইবে এক্ষণে উকিলের যে পরীক্ষা আছে তাহা অসম্পূর্ণ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীসম্বন্ধেও সেইরূপ। তাহাদেরও কেবল আইনের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেই নিত্য দেখিতে পান যে, কেবল আইন জানি লেই মাজিষ্ট্রেট ভাল হয় না। আইনজ্ঞমাত্রেই যদি ভাল মাজিষ্ট্রেট হইত, তাহা হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে আর তারতম্য থাকিত না, সকলেই ভাল মাজিষ্ট্রেট হইতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে অনেকে অযোগ্য আছেন।

বিচারকদিগের পক্ষে আইন জানার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটগণ কেবল বিচারক নহেন, তাঁহাদের অন্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্য গুণ আবশ্যক; কেবল আইনের পরীক্ষায় সে সকল গুণের পরীক্ষা হয় না; বিশেষতঃ আইনের নিত্য পরিবর্ত্তন হয়, একসময় গুটিকতক আইনের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলে ভবিষ্যৎ আইনসম্বন্ধেও পরীক্ষা হইয়া রহিল এ কথা বলা অসঙ্গত। তবে বড় জোর এইমাত্র বলা যায় যে, একবার যে ব্যক্তি উদ্যোগ করিয়া আইনের পরীক্ষা দিতে পারিয়াছেন, তিনি উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহার স্মরণশক্তিও আছে।

কিন্তু উদ্যোগ আর স্মরণশক্তি কেবল এই দুই থাকিলেই লোকে বিচারাসনে বসিবার যোগ্য হয় এমত নহে। বিচারপতিদের নানাগুণ আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটিও পরীক্ষা করেন না, বোধ হয় করিতেও পারেন না। অপক্ষপাতিতা বিচারপতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এক্ষণে তাহার কোন পরীক্ষা নাই, এইরূপ শত শত বিষয়ের কোনটিরই পরীক্ষা হয় না, কেবল আইনের

পরীক্ষা হয়। অধিক কি যেটী সর্ব্বপ্রধান, সেই চরিত্রের পরীক্ষাই নাই। তাহাই বলিতেছিলাম গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা অতি অসম্পূর্ণ। একজন বিচারপতি মধ্যে মধ্যে কোর্টফি গোপনে আত্মসাৎ করিতেন, হঠাৎ ধরা না পড়িলে তিনি অদ্যাপি বিচারপতির উচ্চ আসনে আসীন থাকিতেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বিচারপতির পদ দিয়াছিলেন কাজেই লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য, না করিলে গবর্ণমেণ্টকে অবমাননা করা হয়। তাঁহাকে বিশ্বাস করিলেও লোকের সর্ব্বনাশ হয়। এঅবস্থায় সচ্চরিত্র দেখিয়া বিচারপতি করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ত্রুটি। যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া রাজপ্রতিনিধিরা চাকুরি বিতরণ করেন, তাঁহারা সেলামের উপর সেলাম লইয়া চলিয়া যান, কিন্তু পশ্চাতে কণ্টক রাখিয়া যান। সে কণ্টক সমাজের অঙ্গে বিদ্ধ হয় তাহাতে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি জন্মে।

চরিত্রের পরীক্ষা করা অতি কঠিন। সদ্বংশজাত হইলে সচ্চরিত্র হয়, ইহা পুর্ব্বের বিশ্বাস, অদ্যাপিও সে বিশ্বাস কতকাংশে আছে। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট পুর্ব্বে বংশ অনুসন্ধান করিতেন; শুনা যায় এক্ষণেও তাহা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার ফল বড় দেখা যায় না। ইতরবংশসম্ভূত অনেক লোক এক্ষণে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, যদি কর্ম্মচারী নিজে পবিত্র হন, তবে পূর্ব্বপুরুষ অপবিত্র বলিয়া কি হানি? কিন্তু পদাকাঙ্ক্ষীরা নিজে পবিত্র কি না, ইহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি না। অনেকের ধারণা যে এই অনুসন্ধানসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন উপায়ই নাই। তাহা সম্ভব। আমরা শুনিয়াছিলাম যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একবার একজন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে অনুসন্ধান করিতে একখানি "ডিমি অফিসিয়াল" পত্র লিখিয়াছিলেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে ব্যক্তিকে নিজে চেনেন না, অতএব উমেদারের নিবাস যে অঞ্চলে তথাকার ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটকে সেইরূপ এক পত্র লেখেন। ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নূতন আসিয়াছেন, কাহাকেও জানিতেন না, কাজেই তিনি থানার সব্ইন্স্পেক্টারকে লিখিলেন, সব্ইন্স্পেক্টার যথানিয়মে তলবি পরওয়ানা পাঠাইলেন। পরওয়ানা হস্তে দুইজন কনেষ্টবল উমেদারের বাটী আসিয়া দাঁড়াইলে বাবুর চক্ষুস্থির হইল, কনেষ্টবলদের সঙ্গে অগত্যা তাঁহাকে আসামির ন্যায় যাইতে হইল, তাঁহার অন্দরমহলে কান্না উঠিল, পাড়ার লোকেরাও "আহা" বলিয়া বিপদের সময় যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষ উমেদার বাবু দারগা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত

হইলে তিনি তাঁহার এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। নাম, ধাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, বিষয়সম্পত্তি, কি বিদ্যা, কত বিদ্যা, কেমন চরিত্র, আনুপূর্ব্বিক সকল প্রশ্ন করিয়া শেষ যথা-নিয়মে রোয়দাদে লিখিলেন যে এ ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও ভদ্রবংশ বটে। ইহাকে ডেপুটিমেজিষ্ট্রেটি দেওয়া যাইতে পারে।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে রহস্যের বিষয় বটে, কিন্তু আক্ষেপও হয়। চরিত্রের পরীক্ষা অতি কঠিন, কোন রাজ্যেও তাহা সুসম্পন্ন হয় না। ইংলণ্ড হইতে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যে সকল সনদি সাহেবকে এ দেশে জজ, মাজিষ্ট্রেটি পদের নিমিত্ত পাঠান হইতেছে তাঁহাদেরও চরিত্রপরীক্ষা হয় না। যেস্থলে চরিত্রপরীক্ষার কোন উপায় নাই, সেখানে বোধ হয় সকল লোকই সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, এবং সদাশয় বলিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ তাহার অন্যথা স্পষ্ট না দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ অনুভব ভিন্ন আর উপায় নাই।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ এই যে অনুরোধে "চাকুরী" দেওয়া অপেক্ষা পরীক্ষা করিয়া চাকুরী দেওয়া ভাল। কিন্তু প্রকৃত পরীক্ষা আবশ্যক; যে পরীক্ষা এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট করিয়া থাকেন তাহা অসম্পূর্ণ।

আমাদের আর একটু বলিতে ইচ্ছা যে অযোগ্য ব্যক্তি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলে যে ক্ষতি, তাহা গবর্ণর সাহেব বা কমিসনর সাহেবের নহে। ক্ষতি সমাজের।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

৬। অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয় অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনীয় বিষয়; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর প্রণয় রোমিও এবং জুলিয়েটের বর্ণনীয় বিষয়। দুই খানি নাটকের বর্ণনীয় বিষয় এক, কিন্তু বর্ণনার প্রণালী বিভিন্ন। দুষ্মন্তের প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক নাই; রোমিওর প্রণয়ের বাহ্যপ্রতিবন্ধক আছে। শকুন্তলার আত্মীয় স্বজন সকলেরই ইচ্ছা যে দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; রোমিওর আত্মীয় স্বজন কাহারো ইচ্ছা নয় যে জুলিয়েটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই প্রভেদ বশতঃ রোমিও এবং

জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল; অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগৎ অপেক্ষাকৃত প্রবল—রোমিও এবং জুলিয়েটে ঘটনার বাহুল্য; অভিজ্ঞানশকুন্তলে ঘটনার স্বল্পতা। যেখানে দ্বন্দ্ব মনে মনে সেখানে বাহ্যজগতের আবশ্যকতা কম; যেখানে দ্বন্দ্ব বাহিরে সেখানে বাহ্যজগৎ কাজে কাজেই প্রবল। অধিকন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী, সে নাটকের ব্যক্তিগণ একশ্রেণীভুক্ত না হইয়া, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কিন্তু যে নাটকে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নয় সে নাটকের ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হয় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলে বাহ্যজগৎ নায়কের প্রতিবাদী নহে এবং সেই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তি এক শ্রেণীভুক্ত, দুই একজন ছাড়া সকলেই দুষ্মন্তের স্বপক্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে মহর্ষি কণ্ব সর্ব্বাংশেই প্রধান।

মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞানশকুন্তলের আখ্যায়িকার ভিত্তিস্থানীয়। তিনি শকুন্তলার পালক পিতা। শকুন্তলার ঐহিক অদৃষ্ট তাঁহারই ইচ্ছানুগামী। তিনি ইচ্ছা করিলে শকুন্তলাকে যাবজ্জীবন তপশ্চর্য্যায় রাখিতে পারিতেন; তাঁহার ইচ্ছা না হইলে শকুন্তলা কখনই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। দুষ্মন্ত অগ্রে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পরে শকুন্তলাকে লাভ করিতে যত্নশীল হন। শকুন্তলাও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতেন বলিয়া দুষ্মন্তের প্রণয়লাভ করিতে অভিলাষিণী হন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা—এই দুই ব্যক্তির মূলে মহা-ঋষি কণ্ব। মহর্ষি কণ্ব অভিজ্ঞান শকুন্তলের মেরুদণ্ড।

কি চমৎকার মেরুদণ্ড! মহর্ষি কণ্বকে বুঝিয়া উঠা যায় না। কল্পনা তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়ায়। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য; তিনি ইহকাল এবং পরকাল; তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি; তিনি মোহ এবং বৈরাগ্য; তিনি চিন্তা এবং হৃদয়; তিনি শান্তি এবং তেজ। মহর্ষি কণ্ব ভারতের একজন প্রথিতনামা ঋষি। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব সুখ তুচ্ছ করিয়া, দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা বিনষ্ট করিয়া, জগতের মোহমুগ্ধকারী মায়াজাল কাটিয়া ফেলিয়া, দেহ, মন, আত্মা, সকলই ব্রহ্মসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর মর্য্যাদা, পৃথিবীর গৌরব ইহার কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এ সকলই তাঁহার কাছে সামান্য, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর। যে পার্থিবতায় সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ সে পার্থিবতা তাঁহার কাছে হতশক্তি, হতপ্রভা মহিমাশূন্য। পৃথিবীর মোহিনী শক্তি তাঁহার কাছে বিলুপ্ত। পার্থিব পদার্থে সহিত তাঁহার চিন্তা, তাঁহার হৃদয়, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা, তাঁহার কিছুরই স

নাই। পার্থিব পদার্থ তাঁহার চক্ষে নিকৃষ্ট, ক্ষুদ্রমনেরই যোগ্য। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে। তিনি মর্ত্তালোকে আছেন কিন্তু ব্রহ্মলোক তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান। পার্থিব পদার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে,কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের নিকট নাই। তিনি পার্থিব পদার্থে পরিবেষ্টিত, কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের শাসন অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি যেন মনুষ্যাপেক্ষা অনেক উচ্চতর মহাপুরুষের ন্যায় পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ করেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, আরাধনা—ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য, একমাত্র সুখ, একমাত্র অভিলাষ। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্ম বিষয়ক, তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মআরাধনায়, তাঁহার আশা ব্রহ্মপদে—তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে রহিয়াছেন। ব্রহ্মবলে তিনি বলীয়ান্। তিনি দুষ্মন্তের ন্যায় বীরপুরুষ নন; ক্ষত্রিয়যোদ্ধার ন্যায় তাঁহার বাহুবল নাই; তিনি শস্ত্রবিদ্যার অধিকারী নন। তথাপি তিনি শত্রুদমনে সক্ষম। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতপ্রদেশ রাক্ষসনামধেয় অনার্য্যজাতির বাসস্থান। রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে আসিয়া সময়ে সময়ে আশ্রমবাসীদিগের যজ্ঞকার্য্যের এবং তপশ্চর্য্যার বিঘ্নোৎপাদন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে থাকেন তখন তাহারা আশ্রমবাসীদিগের বৈরিতাচরণে সাহসী হয় না। দুষ্মন্তের আশ্রমপ্রদেশে অবস্থানকালে রাক্ষসেরা আশ্রম আক্রমণ করে। ঋষিগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া দুষ্মন্তের বাহুবলের প্রার্থনায় তাঁহাকে জানাইলেন যে—

কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি নঃ
ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। (২য় অঙ্ক।)

মহর্ষি কণ্ব উপস্থিত না থাকা হেতু রাক্ষসেরা যাগযজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। কণ্বের কি প্রতাপ! তিনি উপস্থিত থাকিলে দুরন্ত বলবিক্রমশালী রাক্ষসেরাও তাঁহার আশ্রমের নিকট আসিতে সাহস করে না। তাঁহার বাহুবল নাই। কিন্তু তাঁহার এমন কোন আধ্যাত্মিক বল আছে যাহার কাছে বাহুবলপ্রধান দুরাচার মন্ত্রাহতের ন্যায় হৃতসাহস এবং নির্বীর্য্য। কথাটি কাল্পনিক নয়। আধ্যাত্মিক তেজেরদ্বারা দৈহিকশক্তির অপনয়ন আমরা সকলেই স্বল্পপরিমাণে দেখিয়া থাকি। মহর্ষি কণ্ব আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার কাছে অসংখ্য দৈহিকবলপ্রধান রাক্ষস যে মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় নির্জীব হইয়া থাকিবে তাহা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মহাপুরুষের কাছে সহস্র সহস্র দুর্দ্দমনীয় দুরাচার বলবীর্য্যহীন ভীরুর ন্যায় ভগ্নোদ্যম এবং ভয়াকুল, সে মহাপুরুষের মহিমার কে ইয়ত্তা করিবে। তাঁহার অসীম এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কে পরিমাণ করিবে। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিস্তার এবং

গভীরতা কে বুঝিয়া উঠিবে। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি আত্মা; তিনি মানুষ নন, তিনি মন্ত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার বলে তাঁহার যেমন বাহ্যপ্রভাব, তেমনি বাহ্যজ্ঞান। অনতিবিলম্বে শকুন্তলার ভাগ্যে বিষম কষ্টভোগ আছে তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় হইয়া গেল। কিন্তু কাহারও কাছে পরিণয়সম্বাদ না পাইয়া ও আশ্রমে আসিয়াই—

সঅং তাতকস্সেণ এব্বং অহিণন্দিদং দিট্‌ঠিআ ধুমাউলিঅদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্স পাবএ এব্ব আহুই পড়িআ। বচ্ছে সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিপড়িরক্‌খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জামি ত্তি।

কণ্ব এ কথা কেমন করিয়া জানিলেন? প্রিয়ম্বদা বলেন যে তিনি এইরূপ আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন:—

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥

হে ব্রহ্মন্ তোমার কন্যাকে অগ্নিগর্ভা শমীলতার ন্যায় পৃথিবীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত দুষ্মন্তনিহিত তেজধারণ করিতেছেন জানিও।

আকাশবাণীর অর্থ কি? ইহা কি যথার্থই দেবলোকে উচ্চারিতবাক্য না ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনার আধ্যাত্মিকজ্ঞান? এ প্রশ্নের মীমাংসা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আকাশবাণীর অর্থ যাহাই হউক, এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, যে মহাপুরুষে আধ্যাত্মিকতা প্রবল তাঁহারই আকাশবাণীতে অধিকার—যাঁহার আধ্যাত্মিকতা কম তিনি দেশকাল অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াগোচর ঘটনায় জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। কণ্ব আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিকতার গুণে দূরে থাকিয়াও দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। বাহ্যজগৎ মহাঋষির আত্মার অধীন—আত্মার আজ্ঞাকারী—আত্মার ক্রীড়ার পদার্থ। যখন স্বামিভবনগমনার্থ শকুন্তলা বেশবিন্যাস করিতেছেন, তখন দুইজন ঋষিকুমার তাঁহার নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার আনয়ন করিল। গৌতমী চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বচ্ছ ণারঅ কুদো এদং।

বাছা, নারদ, এ সব কোথায় পাইলে? নারদ উত্তর করিলেন—

তাতকাশ্যপপ্রভাবাৎ।

গুরুপ্রধান কাশ্যপের প্রভাবে।
তখন গৌতমী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং মানসী সিদ্ধি।

তিনি কি তাঁহার মানসিকশক্তিদ্বারা এ সকল সৃজন করিয়াছেন?

কণ্ব মানসিকশক্তিদ্বারা সে সকল সৃজন করেন নাই বটে; কিন্তু যাঁহার

সম্বন্ধে এ রকম প্রশ্ন হইতে পারে তাঁহার মানসিকশক্তি যে একরকম অসীম তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যজগৎ তাঁহার অপরিসীম অনন্ত-গভীর আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভূত। তিনি বাহ্যজগতে না থাকিয়াও বাহ্যজগতের অধিকারী। তিনি যেন অনন্তাকাশে উঠিয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীকে তাঁহার নখদর্পণস্থ করিয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আত্মায় লীন হইয়া রহিয়াছেন। বাহ্যজগৎ তাঁহার নখদর্পণস্থ বলিয়াই তাঁহার বাহ্যপ্রভাব এত অনুভূত। পৃথিবী কেমন করিয়া তাঁহার ইয়ত্তা করিবে?

কণ্ব ধীর এবং গম্ভীরস্বভাব। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা এবং চিন্তাশীলতার ফল। অন্তর্দর্শী আত্মাপ্রধান ব্যক্তি-মাত্রেই গম্ভীর হইয়া থাকে। চিন্তা-শীল ব্যক্তি ধীর। অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্ক পাঠ করিতে করিতে কণ্বের ধীর এবং গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া মোহিত হইতে হয়—মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন কোন পূজ্যতম মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি—হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, মনে হয় যেন তাঁহার কাছে আসিয়া উন্নতি, এবং পবিত্রতালাভ করিয়াছি, অথচ তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হয় না, নিকটে যাইবার অযোগ্য বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্রাহতের ন্যায় থাকিতে হয়, হৃদয় আনন্দে, সম্ভ্রমে, ভক্তিরসে, প্রীতিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। শকুন্তলা আশ্রম হইতে যাত্রা করিতেছেন। এক সরোবরের ধারে আসিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিলেন যে, তাঁহার আর শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে আসা কর্ত্তব্য নয়। তখন কণ্ব একটি বৃক্ষ-মূলে বসিয়া মনে করিলেন যে, দুষ্মন্তকে পাঠাইবার উপযুক্ত সম্বাদ একটি স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। এই মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেদ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল যিনি মন্থন করিয়াছেন এবং উন্নতজ্ঞান যাঁহার প্রাণবায়ু তিনি আবার চিন্তা করিতে-ছেন যে কি রকম কথা বলিয়া পাঠাইব। ধীর এবং গভীর চিন্তাশীলব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রকম করে না। ইহা কণ্বের অসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রমাণ এবং কবিকল্পিত দুষ্মন্ত-চরিত্রের মহিমার প্রতি-পোষক। চিন্তা করিয়া মহাঋষি দুষ্ম-ন্তকে এই কথা বলিতে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে উপদেশ দিলেন :—

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ
কুলংচাত্মন
স্ত্বয্যস্যাঃকথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং
চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তি পূর্ব্বকমিয়ং দারেষু
দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূ-
বন্ধুভিঃ।

আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা ক-রিয়া, আর সুহৃৎস্বজনেরা যাহা কোন-

রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাঁকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে, বধুবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

যেমন মহাপুরুষ, কথাও তেমনি মহত্বপূর্ণ। শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু —'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' কিন্তু কণ্ব শকুন্তলার নিমিত্ত কি রকম সুখের কামনা করিলেন? তিনি এমন কামনা করিলেন না যে দুষ্মন্ত তাঁহাকে মহিষী-শ্রেষ্ঠ করেন এবং অন্যান্য ভার্য্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এত স্নেহের বস্তুর নিমিত্ত সেই কামনাই স্বাভাবিক এবং আর কেহ হইলে সেই কামনাই করিত। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না সে কামনা অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতমূলক। শকুন্তলা তাঁহার আদরের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মত মহাপুরুষ শকুন্তলার সুখের অভিলাষী হইয়া অপরের ক্ষতি এবং অনিষ্টকামনা করিতে পারেন না। শকুন্তলা তাঁহার যতই স্নেহের বস্তু হউন না, তাঁহার এইমাত্র কামনা যে দুষ্মন্ত ভার্য্যাগণের মধ্যে শকুন্তলাকে সমান আদরে দেখেন। শকুন্তলার ভাগ্যে তাহার অধিক থাকে, ভাগ্যগুণে হউক, তিনি সে কামনা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বার্থপরবশ হইয়া মোহান্ধ হন না। ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের মোহজাল অদৃশ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের চিন্তা সকলসময়েই ন্যায়মূলক। ন্যায়ানুবর্ত্তিতা উচ্চ, পরিশুদ্ধ চিন্তার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষণ। সে লক্ষণ মহর্ষি কণ্বের চিন্তায় বিশেষরূপে জাজ্জ্বল্যমান —কেন না শকুন্তলা-রূপ একটি বিষম মোহোৎপাদক বস্তু তাঁহার ন্যায়ানুবর্ত্তিতার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। তাঁহার চিন্তার উচ্চতা, উদারতা এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে মানবগুরু বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কণ্বের চিন্তার আর একটি রমণীয় উপকরণ আছে—সেটি তাঁহার শকুন্তলার প্রতি উপদেশে প্রকাশ। সে উপদেশ এই :—

সা স্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নী-জনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

তুমি এস্থান হইতে ভর্ত্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্য

কালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে।

ইহাতে এই কয়টি গুণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সম্ভ্রম, ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে প্রেম, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং নম্রতা। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে এই গুণগুলি থাকিলে সংসাররূপ রঙ্গভূমির সকল স্থানেই মানুষ মানুষের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গুণগুলি থাকিলে শুধু কুলবধূ কেন, সকল অবস্থার লোকেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। কণ্ব একটি কুলবধূকে যে উপদেশ দিয়াছেন সে উপদেশ সমস্ত মানবজাতির সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র। লেয়ার্টিসকে প্রদত্ত পোলোনিয়সের উপদেশের এত সারবত্তা এবং উপযোগিতা নাই। সে উপদেশ সকলের অনুসরণীয় নয়। কিন্তু কণ্বের উপদেশের এত উৎকর্ষ কিসে হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার উৎকর্ষের প্রধান কারণ হৃদয় অথবা হৃদয়ের কাছে স্বার্থপরতার অপলাপ। গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম—ইহার অর্থ, আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ না করা—ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা। পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হওয়া—ইহার অর্থ, দরিদ্র উপকারকের উপকার করা। সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া—ইহার অর্থ, অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করা। আর সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করা—ইহার অর্থ যে কি চমৎকার তাহা কি বলিব! ইহার অর্থ, *Love thine enemies*—যে কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া কোটী কোটী সুসভ্য এবং উন্নতমতি মনুষ্য এখনও যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন! এর কাছে কি পোলোনিয়সের উপদেশ দাঁড়ায়? সে উপদেশে হৃদয় কোথায়? সে উপদেশে জগতের আত্মা কোথায়? আবার এই উপদেশ দিয়া মহাঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কথং বা গৌতমী মন্যতে।

এই কথায় গৌতমীই বা কি বলেন?

রমণীর কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি বৃদ্ধা এবং প্রবীণা গৌতমীর মতসাপেক্ষ—গৌতমীকে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর উপদেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ইহাও তাঁহার নম্রতার এবং ন্যায়ানুবর্ত্তিতার সুন্দর পরিচয় দিতেছে। উচ্চতা, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা, নম্রতা, গভীরসহৃদয়তা, ধীরতা এবং সতর্কতা কণ্বের চিন্তার প্রধান লক্ষণ এবং উপকরণ।

ফলতঃ কণ্বের হৃদয় একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। সকল বস্তু, সকল জীব, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্তি স্নেহ এবং আদরের

জিনিস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার কালে তিনি আশ্রমের তরুলতা প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

তরুলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ এবং শুশ্রূষার উল্লেখ করিয়া মহর্ষি কণ্ব আপনার হৃদয়ের কি চমৎকারিত্বই দেখাইলেন! সে হৃদয় যথার্থই শকুন্তলার হৃদয়ের ন্যায় তরুলতাকে ভালবাসে এবং তরুলতার নিমিত্ত ভাবে। এবং সেইজন্যই মহর্ষি কণ্ব আজি তরুলতার কাছে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তরুলতার প্রতি মহর্ষি কণ্বের হৃদয় স্নেহ এবং ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। তিনিই ত শকুন্তলাকে তরুলতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যেমন তরুলতার প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার স্নেহ এবং মমতা। তিনি আশ্রমের সমস্ত মৃগ মৃগী এবং মৃগশাবকের ইতিহাস জানেন। যখন শকুন্তলার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার পুত্রসম মৃগটি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল তখন তিনিই ত শকুন্তলাকে বলিলেন যে :—

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টি পরিবর্দ্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

এত খবর যে রাখে এবং এমন করিয়া যে পশুপক্ষীর কথা বলে, পশুপক্ষী যথার্থই তাহার হৃদয়ের বস্তু—সে যথার্থই পশুপক্ষীর পিতামাতার স্থানীয়। শকুন্তলাও তাই বলেন। তিনি সেই অনুসরণকারী মৃগটিকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন :—

দাণিং বি মএ বিরহিঅং তুমং তাদো চিন্তাবেস্সই।

এখন আমি আবার চলিলাম ; এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন।

মহর্ষি কণ্ব সমস্ত জগৎকে ভালবাসেন, সমস্ত জগৎকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার হৃদয় স্নেহের উৎস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছিল। শকুন্তলা যখন তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে সম্বোধন করিলেন তখন তিনি বলহীনা রমণীর ন্যায় বলিয়া ফেলিলেন :—

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে
ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।

উটজ দ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলো-
কয়ন্তঃ॥

বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে খুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে তাহাহইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!

অটল, অনন্তপ্রসারিত, অভ্রভেদী, তুষারমণ্ডিত হিমাচল রবিকিরণস্পর্শে দরদর ধারায় গলিয়া যাইতেছে!

কণ্ব সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাশূন্য, পার্থিবতাপরিমুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মসর্ব্বস্ব, ঊর্দ্ধদর্শী। কিন্তু পৃথিবীতে না থাকিয়াও তিনি পৃথিবীময়। তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহার পরমস্নেহ ও শ্রদ্ধার বস্তু। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর কীটাণুকীটও তাঁহার কাছে আদৃত এবং সম্মানিত। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্মসম্বন্ধ, কিন্তু জগতের সকলই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মলোকে, কিন্তু জগতে যা যেখানে আছে, সকলই তিনি তাঁহার ব্রহ্মলোকে দেখিতে পান। তিনি চিন্তা, কিন্তু তাঁহারই নাম হৃদয়। তিনি মোহবিজয়ী তপস্বী, কিন্তু তাঁহারই নাম মায়া। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! আশ্চর্য্য বৈরাগী!

কণ্ব যেমন ধীর এবং শান্তপ্রকৃতি তেমনি তেজস্বী। তাঁহার তেজের প্রমাণ—শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত, কেন না শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত তাঁহারই শিষ্য এবং প্রতিনিধি। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতকে আমরা কণ্বের অংশ বলিয়া বিবেচনা করি, কণ্ব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বিবেচনা করি না। এবং সেই কারণে আমরা শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতেরদ্বারা কণ্বকে বুঝাইতেছি। শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত যখন তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করিলেন, তখন শার্ঙ্গরব অকুতোভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ধর্ম্মং
প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ।

গান্ধর্ব্ববিবাহরূপ অনুষ্ঠিতকার্য্যের অপলাপ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ বিমুখতাচরণ করা কি রাজার উচিত?

আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের সম্রাট্‌কে এ রকম কথা যে বলে সে পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করে না, সে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তাহার তেজ এবং মধ্যাহ্নরবির তেজ একই বস্তু। দুষ্মন্ত যখন আবার তাঁহাদের কথার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন :—

মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্যমত্তেষু।

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তিদিগেরই এইপ্রকার চিত্তবিকার হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গরব ঋষিকুমার। তাঁহার ধনবল, বাহুবল, লোকবল, কোন বলই নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনলে বোধ হয় যে তিনি কোন বলই গ্রাহ্য করেন না,

পার্থিববল, পার্থিবশক্তি, পার্থিবসম্পদ, তাঁহার কাছে কিছুই নয়। তাঁহার সাহস এবং তেজ দেখিলে বোধ হয় যে তিনি রাজার প্রজা নন, রাজার রাজা। তিনি রক্তমাংস নন, তিনি ব্রহ্মতেজ। তিনি শান্তি নন, তিনি প্রজ্বলিত হুতাশন। রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কি লাভ হইবে, তখন তিনি সক্রোধে বলিলেন :—

বিনিপাতঃ।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীতে অসীমমহিমামণ্ডিত পুরুসভায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বিনিপাতঃ।' মহর্ষি কণ্ব হিমাচলের ন্যায় দরদরধারায় গলিতেও পারেন এবং বিসুবিয়সের ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিতেও পারেন! কল্পনা তাঁহাকে কেমন করিয়া আঁটিবে! চিন্তা তাঁহাকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে!

যদিও মহর্ষি কণ্বের সম্পর্কে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত একই ব্যক্তি, কিন্তু কণ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মধ্যে অতি চমৎকার প্রভেদ লক্ষিত হয়—দুইজনকে প্রকৃষ্টরূপে দুই ভিন্নব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাঁহাদের কথা অতি অল্পই আছে এবং তাঁহাদিগকে একটির অধিক কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে স্বল্পপরিমিত স্থান মহাকবি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ, পরিষ্কার এবং স্বদ্বোধক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দুইজনে একই গুরুর শিষ্য, তাঁহাদের দুই জনের জীবনপ্রণালী একই রকম; তাঁহাদের দুইজনের শিক্ষা একইপ্রকার; তাঁহাদের দুইজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সকলই এক। কিন্তু তাঁহারা দুইজনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির লোক। শার্ঙ্গরব কিছু বাহ্যদর্শী, শারদ্বত কিছু অন্তর্দর্শী। নির্জ্জন, নিঃশব্দ, শান্তিময় আশ্রম হইতে আসিয়া হস্তিনাপুরের জনাকীর্ণ রাজবাটী দেখিয়া তাপসদ্বয় এক নূতন ভাব অনুভব করিলেন। কিন্তু সে ভাব শার্ঙ্গরবে একরকম, শারদ্বতে ভিন্নরকম। শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে বলিলেন :—

তথাপীদং শশ্বৎপরিচিত বিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

আমরা নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনেই থাকি। এই জনাকীর্ণ গৃহ অগ্নিবেষ্টিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু শারদ্বত শার্ঙ্গরবকে বলিলেন :—

অভ্যাক্তমিবঃ স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনম-বৈমি॥

স্নাতব্যক্তি যেমন অস্নাতকে, শুচি যেরূপ অশুচিকে, জাগরিত যেমন নিদ্রিতকে এবং বিমুক্ত যেমন বদ্ধকে দেখে আমি এখানে সেইরূপ বিষয়সুখাসক্ত লোককে বুঝিতেছি।

দুইজনে একই দৃশ্য দেখিলেন, কিন্তু সে দৃশ্য একজনের মনকে এক রকমে বিচলিত করিল, আর একজনের মনকে আর এক রকমে বিচলিত করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া শার্ঙ্গরবের এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড মনে হইল; শারদ্বতের শুচির তুলনায় অশুচি, পবিত্রতার তুলনায় অপবিত্রতা, জাগরণের তুলনায় নিদ্রা এবং মুক্তভাবের তুলনায় দাসত্বশৃঙ্খল মনে হইল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবের মনে বাহ্যজগৎ প্রবল করিল, শারদ্বতের মনে অন্তর্জগৎ প্রবল করিল। সে দৃশ্য শার্ঙ্গরবে বাহ্যজগৎমূলক কল্পনাকে মাতাইয়া তুলিল; শারদ্বতে অন্তর্জগৎনিহিত চিন্তাশক্তি প্রবল করিল। শার্ঙ্গরব সে দৃশ্য জড়জগতের সাহায্যে বুঝিলেন; শারদ্বত সে দৃশ্য নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্যে বুঝিলেন। শার্ঙ্গরব বাহ্যজগতের কবি; শারদ্বত অন্তর্জগতের কবি। শার্ঙ্গরব বাহ্যস্ফূর্ত্তি; শারদ্বত অন্তর্দৃষ্টি অথবা আধ্যাত্মিকতা। শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বতের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, ততক্ষণই সেই প্রভেদ লক্ষিত হয়। যখন রাজপুরোহিত তাঁহাদিগকে দুষ্মন্তের সম্মুখে লইয়া গেলেন তখন শার্ঙ্গরবই দুষ্মন্তের গুণ বর্ণনা করিয়া পুরোহিতের সহিত কথা কহিলেন। যখন অভিবাদনাদি সমাপ্ত করিয়া কণ্বপ্রেরিত সম্বাদ জানাইতে হইল, তখন শার্ঙ্গরবই তাহা জানাইলেন। যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত পরিণয় অস্বীকার করিলেন, তখন শার্ঙ্গরবই ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত বিষধরের ন্যায় তাঁহার উপর বাক্যবিষবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শার্ঙ্গরব যখন উন্মত্তের ন্যায় রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্তকে নকৃড়া ছকৃড়া করিতেছেন, তখন শারদ্বতের মনের অবস্থা কিরূপ? তাঁহার এই কথাতেই সে অবস্থার প্রকাশ:—

শার্ঙ্গরব বিরম ত্বমিদানীম্।
শকুন্তলে বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ।
সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ
প্রত্যয়প্রতিবচনম্॥

শার্ঙ্গরব, তুমি এখন থাম। শকুন্তলে, আমাদের যা বলিবার তা বলিলাম। এই মহামান্য রাজা এইরূপ কহিতেছেন। এখন যাহাতে ইঁহার মনে প্রত্যয় হয় এমন কথা তুমি কিছু বল।

শারদ্বত এ সময়েও স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি যেন কোন পক্ষেই নাই। তিনি যেন উভয়পক্ষের মধ্যবর্ত্তী বিচারক! শকুন্তলার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। তাঁহার কথা শুনিয়াও দুষ্মন্তের প্রত্যয় হইল না। তিনি শকুন্তলাকে চতুরা দুশ্চারিণী বলিয়া গালি দিলেন। শার্ঙ্গরব আবার রাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শারদ্বত নিস্তব্ধ—তিনি একটিও কথা কহিলেন না। অবশেষে যখন শার্ঙ্গরব পুরুসভায় দাঁড়াইয়া জ্ঞানশূন্য উন্মত্তের ন্যায় পুরু-

বংশের 'বিনিপাত' হইবে বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, তখন শারদ্বত এইমাত্র বলিলেন :—

শার্ঙ্গরবকিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি।)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং
গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী॥
গৌতমি গচ্ছাগ্রতঃ।

শার্ঙ্গরব, কথা কাটাকাটির আর দরকার কি? গুরুদেবের আদেশ অনুষ্ঠান করিলাম। চল আমরা ফিরিয়া যাই। (রাজার প্রতি)

এই তোমার স্ত্রী, ইহাকে এক্ষণে ত্যাগই কর বা গ্রহণই কর। স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছেই ত।

গৌতমি, চল, আগে আগে চল।

শারদ্বত আগেও যেমন, এখনও তেমনি—স্থির, গম্ভীর, অবিচলিত। তিনি দেখিলেন যে, দুষ্মন্ত বুঝিবেন না এবং তিনি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি তর্ক করিবার লোক নন। তিনি কলহ করিবার লোক নন। তিনি শার্ঙ্গরবের ন্যায় তর্কও করিলেন না, কলহও করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়। অল্প কথায়, সরল ভাষায়, তিনি সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। যেন উচ্চতম রাজসিংহাসনাপেক্ষা উচ্চতর বিচারাসন হইতে অপরাধীর অপরাধ ব্যক্ত করিয়া বিচারপতি উঠিয়া গেলেন। শার্ঙ্গরব মনে করিলে পেরিক্লিস হইতে পারেন, দিমস্থেনিস্ হইতে পারেন, সিসিরো হইতে পারেন, বর্ক হইতে পারেন মায়রাবো—ব্রিটীষ পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় মহাসভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হইতে পারেন। শারদ্বত বিচারপতি, কিন্তু তাঁহার যোগ্য বিচারাসন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার স্থান আধ্যাত্মিক জগতে। কিন্তু শার্ঙ্গরবই বল আর শারদ্বতই বল, মহর্ষি কণ্ব সকলেরই শ্রেষ্ঠ, সকলেরই গুরু, সকলেরই অধিনায়ক। মহর্ষি কণ্বের কে ইয়ত্তা করিবে!

কিন্তু কণ্ব যেমন সেই সকল ঋষি এবং ঋষিকুমারদিগের অধিনায়ক গৌতমী তেমনি তাঁহাদের অধিনায়িকা। গৌতমীকে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। এবং বোধ হয় যে বিদেশীয়েরা তাঁহাকে ভাল বুঝিতে পারেন না। ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রাচীনা, গম্ভীরপ্রকৃতি, মাতৃভাবযুক্তা গৌতমী—পরম পবিত্র দৃশ্য! আশ্রমে যতগুলি ঋষি তপস্বী আছেন তিনি সকলেরই জননীস্বরূপ—তিনি সকলকেই বাপু, বাছা, যাদু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে জননীবৎ স্নেহ এবং সম্মান করেন। আবশ্যক হইলে তাঁহার কাছে আসিয়া আব্দারও করেন —যথা শকুন্তলা :—

ইঅং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং

অজ্জাএ গোদমীএ নিবেদইস্সং।

সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে তিনিও তেমনি সকলকে ভালবাসেন এবং সকলের ভাবনা ভাবেন। শকুন্তলা পীড়িতা—প্রায় উত্থানশক্তিরহিত প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া তাঁহার উত্তপ্তদেহে সুশীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছেন এবং পদ্মপত্রদ্বারা বীজন করিতেছেন। ওদিকে গৌতমী তাঁহার মঙ্গলার্থ পবিত্র শান্তিজল আনিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সিঞ্চন করিয়া সযত্নভাবে তাঁহাকে আশ্রমকুটীরে লইয়া যাইতেছেন। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে কণ্বও যেমন শকুন্তলার নিমিত্ত দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদপ্রার্থনা করিলেন, গৌতমীও তেমনি শকুন্তলাকে বনদেবীদিগকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতে বলিয়া দিলেন। কিন্তু তার পর আর বেশী কথা কহিলেন না। একে ত তিনি বেশী কথা কন না, তাহাতে আবার তখন স্বয়ং কণ্ব যা বলিবার তা বলিতেছেন। কণ্ব যেমন তাঁহার পদমর্য্যাদা বুঝেন, তিনিও তেমনি কণ্বের পদমর্য্যাদা বুঝেন। তিনি নিস্তব্ধভাবে পিতাপুত্রীর সেই হৃদয়বিদারক বিদায়দৃশ্য দেখিলেন। কণ্ব তাঁহারই হস্তে শকুন্তলাকে সমর্পণ করিয়া আশ্রমকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে গৌতমী একটি প্রধান চরিত্র। পুরুষচরিত্রগণের মধ্যে কণ্বের যে পদবী, স্ত্রীচরিত্রগণের মধ্যে গৌতমীর সেই পদবী। কণ্ব যেমন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ভিত্তিস্বরূপ, গৌতমীও সেইরূপ। গৌতমী না থাকিলে নাটকের কার্য্য চলিতে পারে না। গৌতমীকে কণ্বের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে, কেন না গৌতমীর সাহায্যব্যতিরেকে কণ্ব তাঁহার নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে অক্ষম। এ কথার আরো একটি অর্থ আছে। শকুন্তলা রমণী। তিনি কণ্বের শাসনাধীন বটে। কিন্তু গৌতমীই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী এবং অধিনায়িকা। পুরুষ রমণীকে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু রমণী ভিন্ন রমণীকে রমণী করিতে পারে না। শকুন্তলার সম্বন্ধে গৌতমী কণ্বের একটি উৎকৃষ্ট অংশ।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের মেরুদণ্ড পাওয়া গেল। মহর্ষি কণ্ব সেই মেরুদণ্ড, এবং গৌতমী, শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত সেই মেরুদণ্ডের অন্তর্গত। সে মেরুদণ্ডের এক অর্থ মহর্ষি কণ্ব আর এক অর্থ ইহলোক এবং পরলোক, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, জ্ঞান এবং মোহ, স্ত্রী এবং পুরুষ, শান্তি এবং তেজ, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য। সেই মেরুদণ্ডের অর্থও যা পূর্ব্বপ্রস্তাববিবৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থও তাই। সেই চমৎকার মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত মিলিত হইলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনুসূয়া সেই মিলনকার্য্যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চক্ষু

কর্ণস্বরূপ। তাঁহাদের সাহায্যেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তকে চিনিলেন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার প্রিয় সখী। এমন সখী কিন্তু কেহ কোথাও দেখে নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িতে পড়িতে বোধ হয় যে শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, এবং অনসূয়া এই তিনটিতে একটি। তিনটি একত্রে প্রতিপালিত; তিনটির একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন; তিনটির একই কাজ; তিনটির এক চিন্তা, এক হৃদয়। তিনটি পরস্পর যে কত ভালবাসে তা বলিতে পারা যায় না। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম হইতে শকুন্তলার আশ্রমত্যাগ পর্য্যন্ত সে ভালবাসার যে কত প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসার রকম দেখিলে মোহে অভিভূত হইতে হয়—মনে হয় বুঝি স্বর্গে আসিয়া স্বর্গের সুরকন্যাদিগের ভালবাসা দেখিতেছি। শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া পরস্পরের প্রাণবায়ু, পরস্পরে পরস্পরের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারেন। এমন সরল পবিত্র এবং মিষ্ট সখ্যভাব আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু সকল বিষয়ে এক হইয়াও তিনজনে তিনটি ব্যক্তি। শকুন্তলার এবং প্রিয়ম্বদার একই বয়স, কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়ার বয়স তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম। শকুন্তলা এবং প্রিয়ম্বদা যৌবনের তরঙ্গে পড়িয়াছেন; কিন্তু বোধ হয় যেন অনসূয়াকে সে তরঙ্গ এখনও ভাল রকম লাগে নাই, এখনও যেন অনসূয়া হইতে সে তরঙ্গ যৎকিঞ্চিৎ দূরে আছে। শকুন্তলা যখন তাঁহার প্রিয় বন-জ্যোৎস্নার শোভা একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, অনসূয়ে, শকুন্তলা কেন অমন করিয়া সহকারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। অনসূয়া বলিল," আমি জানি না; তুমি আমাকে বলিয়া দেও। শকুন্তলা যখন একটি বৃক্ষের সম্মুখে একটু হেলিয়া দাঁড়াইলেন, তখন অনসূয়া কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেম, শকুন্তলে, একটু ঐ রকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন যে তুমি ঐরকম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে ঠিক্ বোধ হইতেছে যেন কেশরবৃক্ষটির একটি রমণীয় লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। কিন্তু এত রসের কথা শুনিয়াও অনসূয়ার মুখে কথাটি নাই। অনসূয়া কেবল তরু লতা লইয়াই ব্যস্ত। শকুন্তলা অনসূয়াকে তাঁহার বুকের বল্কল একটু আল্গা করিয়া দিতে বলিলেন। অনসূয়া কোন কথা না বলিয়া বল্কল আল্গা করিয়া দিলেন। কিন্তু প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে। প্রিয়ম্বদা রঙ্গ করিতে ভাল বাসেন; শকুন্তলা রঙ্গ

বুঝেন, কিন্তু রঙ্গ করিতে পারেন না; অনসূয়া রঙ্গ করিতে শেখেন নাই। অনসূয়া কিছু বালিকা বালিকা রকম। যখন দুষ্মন্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা তিন জনেই কিছু জড়সড় হইলেন। কিন্তু অনসূয়াই অগ্রে দুষ্মন্তের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার প্রস্তাব করিলেন, এবং প্রিয়ম্বদা ও শকুন্তলাকে তাঁহার কাছে বসিতে আহ্বান করিলেন. সকলে বসিলে পর প্রিয়ম্বদার জানিবার ইচ্ছা হইল যে অভ্যাগত ব্যক্তি কে? কিন্তু তিনি নিজে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; অনসূয়াকে চুপি চুপি বলিলেন, এই মহাশয় ব্যক্তি কে? অমনি অনসূয়া বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলিয়াই অকুতোভয়ে এবং অবিচলিতভাবে দুষ্মন্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রিয়ম্বদা কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু অনসূয়া আগ্রহসহকারে শকুন্তলার ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি একবার লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেমন বলিতেছিলেন তেমনি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ইতিহাস শেষ হইল এবং দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে কণ্বের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন, তখন বালিকা আর কোন কথা বলিল না, তখন প্রিয়ম্বদা ঠাকুরাণী ঘটকালী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শকুন্তলাকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে অনসূয়া নিস্তব্ধ। তার পর যখন সকলে আশ্রমকুটীরে যান, তখন শকুন্তলা অনসূয়াকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমার পায় কাঁটা ফুটিয়াছে এবং বল্কল গাছের ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। শকুন্তলার মনে কাঁটা ফুটিয়াছে,ঠাট্টার ভয়ে প্রিয়ম্বদাকে বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, তাই সরলা বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন। তার পর যখন শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিমিত্ত মৃতপ্রায়, তখন অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার সত্বর এবং গোপনীয় ভাবে মিলন হইতে পারে। প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে কি রকমে গোপনীয়ভাবে মিলন হয় ইহাই বিবেচ্য বিষয়, সত্বর মিলনের বিষয়ে কোন ভাবনা নাই। অনসূয়া যেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন কথা? তখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিলেন যে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন দুষ্মন্তের হাব ভাবে বুঝা গিয়াছিল তিনি শকুন্তলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। বালিকা অনসূয়া এত বুঝে না। এখন সব বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও মিলনের কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী মদনলেখোর প্রস্তাব করিলেন। অনসূয়া সরলা বালিকা, প্রিয়ম্বদা পাকা ঘটকী।

তার পর যখন দুষ্মন্ত উপস্থিত হইলেন তখন অনসূয়া তাঁহাকে বসিতে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাজের কথা প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী কহিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জ্জনে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল তখন প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণীই একটা ছল করিয়া অনসূয়াকে লইয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়াটি ফুলের কুঁড়ি—এখনও ফুটে নাই, কিন্তু ফোট ফোট। শকুন্তলা-ফুলটি ফুটিয়াছে—কিন্তু নববিকসিতপদ্মের ন্যায় সে ফুলের প্রায় সমস্ত গৌরব পাপড়ি ঢাকা। প্রিয়ম্বদাঠাকুরাণী গোলাবফুল—কুঁড়ি ফুটিয়াছেমাত্র, কিন্তু তাইতেই চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছেন। অনসূয়ার কিছু ভারি রকম প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার তুলনা আছে। প্রিয়ম্বদা হাস্যময়ী চপলা—তাঁহারও তুলনা আছে কিন্তু শকুন্তলার তুলনা নাই—তিনি নারীপ্রকৃতির প্রতিমা অথচ একটি ভুবনমোহিনী রমণী।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে দেখিয়াছি যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অভিপ্রায়—জড়জগৎ এবং অন্তর্জগতের সম্বন্ধপ্রকাশ। অভিজ্ঞান শকুন্তলে জড়জগতের শক্তি এবং অন্তর্জগতের শক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের দুইটি ভাগ আছে। একভাগে জড়জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার ঐন্দ্রিয়িক মিলনের কথা,—প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না, তাঁহাদের সাহায্যেই ঐ মিলন ঘটিল। আর একভাগে অন্তর্জ্জগতের চিত্র অর্থাৎ দুষ্মন্তের মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির কথা,—বৃদ্ধ কঞ্চুকী, বেত্রবতী, মাতলি এবং অন্তরীক্ষস্থিত স্বয়ং ইন্দ্রদেব এই ভাগের প্রধান চরিত্র, কেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুষ্মন্তের মানসিকশক্তি বিজ্ঞাপিত। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার স্মৃতিলাভ করিয়া শকুন্তলার মোহে অচেতনপ্রায় তখন ইন্দ্রদেব তাঁহাকে দেবশত্রুদমনার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহার মানসিকশক্তির চমৎকার পরিচয় দেওয়াইলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষস্থিত। মহাকবি তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে আনয়ন করেন নাই। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেই বুঝেন। মহাকবি তাঁহাকে অন্তরীক্ষে রাখিয়া দুষ্মন্তের বীরত্বের চিত্র বেশী জাজ্জ্বল্যমান এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। মাতলি ইন্দ্রের সারথি। সারথির কার্য্যে মাতলি অদ্বিতীয়। সপ্তমাঙ্কে বর্ণিত রথযাত্রা মাতলির সারথিত্বের অপূর্ব্ব পরিচয়। বেত্রবতী প্রভৃতি রাজভক্তি এবং রাজকার্য্যানুরাগের চমৎকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বড়ই মনোহর চরিত্র। তিনি রাজসেবায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একটি অশীতিবর্ষীয় অমায়িক এবং গম্ভীরপ্রকৃতি বৃদ্ধবর যষ্টির উপর ভর দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার

মুখে দুষ্মন্তের প্রশংসা ধরে না, কেন না দুষ্মন্ত যেমন নামেও রাজরাজেশ্বর, কাযেও তেমনি রাজরাজেশ্বর।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপন্যাসের আরও একটি অংশ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগতের এবং জড়জগতের যুদ্ধে জড়জগৎ জয়ী হইয়াছিল। বীরপ্রধান দুষ্মন্তের রিপুর শাসনে পদস্খলন হইয়াছিল। ধর্ম্মবীর দুষ্মন্ত রিপুর শাসনে ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মরূপ কণ্বকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে গিয়া দুষ্মন্ত তাঁহার নিজের এবং শকুন্তলার মেরুদণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মহাপাপ হইল। নৈতিক নিয়ম অথবা Law তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিয়ম অথবা Law অতি কঠোর পদার্থ। সেই কঠোরতা দুর্ব্বাসায় প্রতিফলিত। পাঠক এইখানে মনে রাখিবেন যে দুর্ব্বাসা শুধু নিজের নাম করিয়া শাপ দেন নাই, সামাজিকনিয়মের নাম করিয়াও শাপ দিয়াছিলেন। নিয়ম যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, দুর্ব্বাসাও তেমনি আমাদের চক্ষের অগোচর—তিনি সকলের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শাপ দিয়া গেলেন। প্রিয়ম্বদা ছুটিয়া গিয়া শকুন্তলাকে শাপমুক্ত করাইবার জন্য তাঁহাকে কত অনুনয় করিলেন। কিন্তু নিয়ম যেমন নির্দ্দয় তিনিও তেমনি নির্দ্দয়। তিনি কোন কথা শুনিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তিনি কেবল এই কথা বলিয়া গেলেন যে, অভিজ্ঞানাভরণ দর্শন করাইলে শাপের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু শকুন্তলা সে অভিজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি সে অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিলেন না। তখন অদৃষ্ট আসিয়া তাঁহাকে এবং দুষ্মন্তকে অনন্তযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। মনুষ্যের সুখ দুঃখ শুধু নিয়মাধীন নয়; অদৃষ্ট (chance) অথবা দৈবও তাহার একটি প্রধান কারণ। কি পাপী কি পুণ্যবান, অদৃষ্ট সকলেরই সহায়তা করে, তাহাতে আবার দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা মহাভ্রমে পড়িয়াও পবিত্রচিত্ত। মহাকবি রাজযোটক পাইলেন। অদৃষ্ট দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সহায় হইল। এবং অদৃষ্ট সহায় হইয়া তাঁহাদের পতিপত্নীসম্বন্ধ সমস্ত পৃথিবীকে প্রমাণ করিয়া দিল। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। এখন আবশ্যক হইলে সমস্ত সমাজ তাঁহাদের পরিণয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে সক্ষম। হৃদয়ের অভিজ্ঞান সামাজিক অভিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল। উপেক্ষিত নিয়ম বিজয়ী হইল। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাও পুনর্ম্মিলিত হইলেন। অদৃষ্ট নিয়মের পোষকতা করিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অদৃষ্টের অর্থ—ধীবর, রাজশ্যালক, প্রহরিদ্বয়, ইত্যাদি। এই কয়জনের চিত্র অতি চমৎকার। কি কথাবার্ত্তার প্রণা-

নীতে, কি স্বভাব-চরিত্রে, ধীবর যথার্থই ধীবর, প্রহরিদ্বয় যথার্থই প্রহরিদ্বয়, রাজশ্যালক যথার্থই শ্যালকরাজ—বেশ মজার মানুষ। লোকে বলিয়া থাকে যে সেক্সপীয়র কি উচ্চ কি নীচ, কি গম্ভীর কি হাল্কা, সকল রকম চরিত্র আঁকিতে সুনিপুণ। অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িলে, মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারা যায়। কণ্ব, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, কঞ্চুকী, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, রাজশ্যালক, ধীবর, প্রহরী—এই কয়খানি চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্য-চরিত্রের একসীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সমস্তই কালিদাসের আয়ত্তাধীন। আবার যখন শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখা যায় তখন ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবি নবপ্রসূতশিশুসন্তান হইতে মুমূর্ষুবৎ বৃদ্ধবর পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান।

পালামৌ।

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই একজন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেকদিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে সেস্থান কোন্ দিকে, কতদূরে। অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে এই বিবেচনায় ইন্‌লাণ্ড ট্রান্সিট কোম্পানীর

(Inland Transit Company) ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড়প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে,গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ. টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থে সেই ঘাটে অসিতেছে চাপরাসি তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহাদের যুবতীরা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে,আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক একবার দেখিতেছে। শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটীতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উটিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা।" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালি বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালি।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে, যে,যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুইবৎসরবয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাঁধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট. আনন্দ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বাল্য-

কালে পাহাড় পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চুণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্দ্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। তাহার স্থানে স্থানে চারি পাঁচখানি ইষ্টক গাঁথিয়া এক একটি চূড়া করা হইয়াছে। আবার সর্ব্বোচ্চ চূড়ার পার্শ্বে এক সর্পফণা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হরিত, পীত,নানাবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, পাছে সর্পের প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে এই জন্য ফণাটী কিছু বড় করিতে হইয়াছে। কাজেই পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা ফণাটি বড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মিস্ত্রির গুণ নহে, বৈরাগীরও দোষ নহে। সর্পটী কালীয়দমনের কালীয়; কাজেই যে পর্ব্বতের উপর কালীয় উঠিয়াছে, সে পর্ব্বতের চূড়া অপেক্ষা তাহার ফণা যে কিছু বৃহৎ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈরাগীর এই গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া বাল্যকালেই পর্ব্বতের অনুভব হইয়াছিল। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে, যে পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ান্‌কে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অধিক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচমিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বতসম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালির পক্ষে বড় কঠিন ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহারসম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানি

লেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর সাবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাই-তেছি,তাঁহার সহিত আমার কখন চাক্ষুষ হয় নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যা-তিও যথেষ্ট শুনিয়াছি; সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রী-কাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদা-ইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্র-বধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহা-দের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসি-পরিত্যাগী গৃহী। ঋ-ষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যা-ইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলঙ্কার দেখা-ইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতির পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারাণ্ডায় গুটিকত বাঙ্গালি বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্র-সর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভি-বাদন আমি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা, অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ,

কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

প্রথম সম্ভাষণ সমাপন হইলে পর স্নানাদি করিতে যাওয়া গেল। স্নান গোছলখানায় ইংরেজি মতেই হইল, কিন্তু আহার ঠিক হিন্দুমতে হয় নাই, কেন না তাহাতে পলাণ্ডুর আধিক্য ছিল। পলাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মের বড় বিরোধী। তদ্ভিন্ন আহারের আর কোন দোষ ছিল না, সঘৃত আতপান্ন, আর দেবীদুর্ল্লভ ছাগমাংস, এই দুইই নির্দ্দোষী।

পাকসম্বন্ধে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু পিঁয়াজ উল্লেখ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। পিঁয়াজ যাবনিক শব্দ এই ভয়ে পলাণ্ডুর উল্লেখ করিয়া সাধুগণের মুখ পবিত্র রাখিয়াছি; কিন্তু পিঁয়াজ পলাণ্ড এক দ্রব্য কি না এ বিষয়ে আমার বহুকালাবধি সংশয় আছে। একবার পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন বৃদ্ধরাজা জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় মেদিনীপুরে দুই একদিন অবস্থিতি করেন। নগরের ভদ্রলোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে, তিনি কি প্রধান, কি সামান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময় তাঁহাদের মধ্যে একজন যোড়হস্তে বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ হিন্দুচূড়ামণি, কিন্তু আসিবার সময় আপনার পাকশালার সম্মুখে পলাণ্ডু দেখিয়া আসিয়াছি।" বিস্ময়াপন্ন রাজা "পলাণ্ডু!" এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদারকের নিমিত্ত স্বয়ং উঠিলেন, নগরস্থ ভদ্রলোকেরাও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রাজা পাকশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে, একজন বাঙ্গালি পিঁয়াজের স্তূপ দেখাইয়া দিল। রাজা তখন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা পলাণ্ডু নহে; ইহাকে পিঁয়াজ বলে। পলাণ্ডু অতি বিষাক্ত সামগ্রী, তাহা কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়। সকল দেশে তাহা জন্মে না; যে মাঠে জন্মে সে মাঠের বায়ু দূষিত হইয়া যায়, এই ভয়ে সে মাঠ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না। সে মাঠে আর কোন ফসল হয় না।"

রাজার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেকে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। পলাণ্ডু আর পিঁয়াজ এক সামগ্রী কি না তাহা পশ্চিমপ্রদেশে অনুসন্ধান হইতে পারে, বিশেষতঃ যে সকল বঙ্গবাসীরা সিন্ধুদেশঅঞ্চলে আছেন বোধ হয় তাঁহারা অনায়াসেই এই কথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহাব

চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্য-স্থলে আর একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা বলিল, "চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাষ্টরমহাশয় থাকেন।" এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র বালকদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্য-কতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর একঘরে দেখি এক কাঁদি সুপক্ক মর্ত্তমানরম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলি-তেছে, পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে। লোকে সচরা-চর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে; কিন্তু আমি তাহা কোনরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে "কলাকাঁদির হিসাব" দেখিয়া বরং আরও চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষ-য়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। তাহারা যথার্থই নীচ। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলি-তেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি একে-বারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। কিন্তু এরূপ লোক অতি অল্প।

"কলাকাঁদির ফর্দ্দ" সম্বন্ধে বালকদের সহিত কথা কহিতে কহিতে জানিলাম যে, একদিন একজন চাকর লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুইটি সুপক্ক রম্ভা উদরস্থ করিয়াছিল, গৃহস্থের সকল বিষয়েই দৃষ্টি আছে, সকল বিষয়েরই হিসাব থাকে, কাজেই চুরি ধরা পড়িল। তখন তিনি চাকরকে ডাকিয়া চুরির জন্য জরিমানা করিলেন। পরে তাহার লোভ পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত যত ইচ্ছা কাঁদি হইতে রম্ভা খাইতে অনুমতি করিলেন। চাকর উদর ভরিয়া রম্ভা খাইল।

অপরাহ্নে আমি উদ্যানে পদচারণ করিতেছি, এমত সময় গৃহস্থ "কাছারী" হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পরে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাগান, পুষ্করিণী, সমুদয় দেখাইতে লাগিলেন। যেস্থান হইতে যে বৃক্ষটি আনাইয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালে "কলাকাঁদি" সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা তখনও আমার মনে পুনঃপুনঃ আলোচিত হইতে-ছিল; কাজেই আমি কদলীবৃক্ষের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আমার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে রম্ভা জন্মে না; কিন্তু আপনার

বাগানে যথেষ্ট দেখিতেছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "এখানে বাজারে কলা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাহার বাটীতেও পাওয়া যাইত না, লোকের সংস্কার ছিল যে, এই প্রস্তরময় মৃত্তিকায় কলারগাছ রস পায় না, শুকাইয়া যায়। আমি তাহা বিশ্বাস না করিয়া, দেশ হইতে 'তেড়' আনিয়া পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট হইতে 'তেড়' লইয়া সকল সাহেবই বাগানে লাগাইয়াছেন। এখন আর এখানে কদলীর অভাব নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা উদ্যানের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় দুইটি স্বতন্ত্র ঘর দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ বলিলেন, "উহার একটিতে আমার নাপিত থাকে, অপরটিতে আমার ধোপা থাকে। উহারা সম্পূর্ণ আমার বেতনভোগী চাকর নহে, তবে উভয়কে আমার বাটীতে স্থান দিয়া একপ্রকারে আবদ্ধ করিয়াছি, এখন যখনই আবশ্যক হয়, তখনই তাহাদের পাই। ধোপা, নাপিতের কষ্ট পূর্ব্বে আর কোন উপায়ে নিবারণ করিতে পারি নাই।"

সন্ধ্যার পর দেখিলাম, শিক্ষকসম্মুখে বালকেরা যে টেবিলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে তথায় একত্র একস্থানে তিনটি সেজ জ্বলিতেছে। অন্য লোকে যাঁহারা কদলীর হিসাব রাখেন না, তাঁহারা বালকদের নিমিত্ত একটি সেজ দিয়া নিশ্চিন্ত হন, আর যিনি কদলীর হিসাব রাখেন, তিনি এই অতিরিক্ত ব্যয় কেন স্বীকার করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল জন্মিল। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহা অপব্যয় নহে, অল্প আলোকে অধ্যয়ন করিলে বালকদের চক্ষু দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা; যথেষ্ট আলোকে অধ্যয়ন করিলে চল্লিশের বহু পরে 'চাল্‌সা' ধরে।"

উচ্চপদস্থ সাহেবেরা সর্ব্বদাই তাঁহার বাটীতে আসিতেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালিরা ছোট বড় সকলেই তাঁহার সৌজন্যে বাধ্য ছিলেন, যে কুঠীতে তিনি বাস করিতেন, সেরূপ কুঠী সাহেবদেরও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; কুঠীটী যেরূপ পরিষ্কৃত ও সুসজ্জীভূত ছিল, তাহা দেখিলে যথার্থই সুখ হয়, মনও পবিত্র হয়। মনের উপর বাসস্থানের আধিপত্য বিলক্ষণ আছে। যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায় তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত ও ক্ষুদ্র। যিনি বিশ্বাস না করেন তিনি বলিতে পারেন যে যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বাঙ্গালির মন ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত হইত। আমরা একথা লইয়া কোন তর্ক করিব না, আমরা যেমন দেখিতে পাই সেই মত লিখিয়াছি। যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছি তাঁহা

মন "কুঠীর" উপযোগী ছিল। সেরূপ কুঠীর ভাড়ায় যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে সে ব্যক্তি যদি কদলীর হিসাব রাখে তাহা হইলে কি বুঝা কর্ত্তব্য?

রাত্রি দেড়প্রহরের সময় বাহকস্কন্ধে আমি ছোটনাগপুর যাত্রা করিলাম। তথা হইতে পালামৌ দুই চারি দিনের মধ্যে পৌঁছিলাম। পথের পরিচয় আর দিব না, এই কয়েক ছত্র লিখিয়া অনেককে জ্বালাতন করিয়াছি, আর বিরক্ত করিব না, এবার ইচ্ছা রহিল মূল বিবরণ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, তবে যদি দুই একটি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলি তাহা হইলে বয়সের দোষ বুঝিতে হইবে।

প্র, না, ব।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে বাঙ্গালির উৎপত্তি কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালি আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালির উৎপত্তি ত জানাই আছে; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ করিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি, ও শাক্যসিংহের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল আমরা সেই জাতির সন্তান: এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালির উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালি বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালি বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি; কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি ইহারাও কি তাঁহাদিগের সন্ততি? তাহা যদি নিশ্চিত না হয় তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল, ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ

নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালির অতি অল্প-ভাগ। বাঙ্গালির মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্দ্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেকদিনের পর ইউরোপ হইতে আর্য্যশব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্য্যবংশ। কিন্তু এই আর্য্যশব্দ আর বেদের আর্য্যশব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিকঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটী আর্য্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুষ; যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্য্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না; হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আর্য্য নহে। তবে আর্য্যশব্দের অর্থ কি ?

এই প্রভেদের কারণ কি ? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্য্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্য্যবংশীয় এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি ? আর্য্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল ? অনার্য্য কাহারা কোথা হইতেই বা আসিল ? একদেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন ? আর্য্যের দেশে অনার্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্য্যের দেশে আর্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে ? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল।

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পুঁতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি তৈয়ারি করিয়া, বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া, দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষাসৃষ্টি করিয়াছে। এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয়, যে দশজন একত্র বসিয়া, যুক্তি করিয়াছে, যে এসো আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি, যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ করি। এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এমতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে

না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী কলকল করে, মেঘ গরগর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস ফোঁস করে। আমরাও যে সকল কাজ করি তাহারও শব্দ আছে। বাঙ্গালি "সপ, সপ" করিয়া খায়; "গপ গপ" করিয়া গেলে; "হন হন" করিয়া চলিয়া যায়, "ভুপ দাপ" করিয়া লাফায়। এইরূপ নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে "মৃ"; মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে "স্র" নিশ্বাসের শব্দ হইতে "অস্।" সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে, যে তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজিও বলি, "আলো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।" পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে "ঘরটি ঝরঝর করিতেছে।"

"মৃ" "স্র" "অস্" প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল—কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু "মৃ" বলিলে কিপ্রকারে, "মারিলাম" "মারিল" "মারিব" "মারিয়াছি" "মারামারি" "মরণ" "মার"—এতপ্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে মৃ ধাতুর সঙ্গে অন্যপ্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ, সর্ব্বত্র একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কিপ্রকারে সেই সকল গঠন, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষা সকলের যেপ্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন ধাতুর কোনপ্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই ইহাদিগকে "সংযোগের অসাপেক্ষ" (Isolating) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনামদেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ, প্রত্যয়াদি, ধাতুদ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে একপ্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (compounding) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (inflecting) বলে।

পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, ইহুদী, গ্রীক, লাটিন, ইংরেজি, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু, এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তিও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্ব্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্ব্বনামগুলি যে অবস্থাভ্রষ্ট ধাতু ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হৌক বা না হৌক; ধাতু বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায়, যে ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম, একই, কেবল দেশকাল ভেদে কিছু রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে ঐ দুইটী ভাষা উভয়েই একটী আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগুলি এক-পরিবারভুক্ত।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত; এবং সংস্কৃতমূলক পালিপ্রভৃতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষা; ও আধুনিক পারসী; প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন; লাটিনসম্ভূত ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি রোমান্সজাতীয় ভাষা, টিউটনবংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জর্ম্মান, ওলন্দাজি ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেলটিক ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্যদেশের কেলিক, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রুসপ্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা,—সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না,—সক

* এই শ্রেণীবিভাগ অগস্ত শ্লেচর নামক জর্ম্মানলেখককৃত। মাক্ষমূলর প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর একপ্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেন—শেমীয় ও আর্য্য। কিন্তু শেমীয় ও আর্য্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া দাঁড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি বিরুদ্ধ। শ্লেচরের যে গ্রন্থে ঐতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম—Compendium der Verylei-chenden Grammatik der Indo-German ischen Sprachea. আমি জর্ম্মান জানি না, হণ্টর সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই বিজ্ঞানের সার সঙ্কলন করিলাম।

সেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু একদিন ছিল। যেমন কোন গৃহে, কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনী বাস করিতেছে দেখিয়া অনুমান করি যে ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয়া বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাতি ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্য্যজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্য্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা, তাহারা আর্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে এই সকল ভাষা, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্য ভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্য্য জাতি। কোল, সাঁওতাল, মেছ কাছাড়ি অনার্য্যজাতি। আর্য্য ও অনার্য্য এ ভেদের তাৎপর্য্য এই। এখন আর্য্যদিগের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি —যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষীয়েরা বলিতে পারেন—ভারতই আর্য্যভূমি—ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আর্য্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে। তবে আর্য্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্যদেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতিপ্রাচীনকালেও মনু যবনপ্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

কর্জননামা একজন পাশ্চাত্য লেখকের সেই মত*—এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্তা এল্‌ফিনষ্টোনও কতক সেইদিকে টানেন।† কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মত এই যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন—অন্যত্র হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতি বাস করিত। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পা-

* Journal Roy. Asiat. Soc, vol XVI, pp 172-200 ডাক্তার মূর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Sanscrit Texts part II P 299.

† History of India, Vol I, P

র্ব্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এইস্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শ্লেগেল, লাসেন, বেন্‌ফী, মাক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক আদৃত।*

অতএব আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে, প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মূর বিবেচনা করেন, ঐ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জর্ম্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমহিমাময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালির শরীরে আছে। যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালির শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

বাল্মীকির জয়।

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার। মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ়নীল—বর্ণনার অতীব মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড় তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষ নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছ পালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজ রঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে

* ডাক্তার মূর সাহেবের Sanskrit Texts দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই মহৎ চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধূলার সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ কি হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ? একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারিদিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্‌রবে দুগ্ধের ফেণার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও বা কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা আবার পরক্ষণেই গভীর খড়, তাহার তলা কোথায় দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গভীর অথচ মনোহর, অভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমরা যে শরৎকালের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই শরৎকালের অমাবস্যারাত্রে হিমালয়ের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। সে শরৎ সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধিসময়ে।

২।

মানুষ মরিয়া কি হয়? কে বলিবে? কেহ বলে ভূত হয়, যাহাদের পিতা মাতা মরে তাহারা বলে তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা স্বর্গে যান না। যে সকল লোক পৃথিবীতে

সৎকার্য্য করিয়া যান তাহারা ঋভু* হয়েন, ইহাঁরা কোথায় থাকেন? কি করেন? কে বলিতে পারে! ইহাঁরা ছায়াপথের ওপারে কোন সুখময় ভবনে বাস করেন। উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তাহার মধ্যহইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায় দেখিতে কতই সুন্দর, কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে, কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া যে যাহার ঘরে গেল। ঋভুগণ আজি জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন টিব্যায় টিব্যায়†, চূড়ায় চূড়ায়, শিখরে শিখরে, ঋভুগণ দাঁড়াইয়া মহানন্দভরে গান ধরিলেন। মানবের সাধ্য কি সে গান বুঝে! কিন্তু সে শ্রুতিমনোহরস্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল। জগৎ নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, নক্ষত্র অচঞ্চল, দিকাল ছায়াপথ নিশ্চল, নিস্পন্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত স্তিমিত মহামোহ নিদ্রায় অভিভূতবৎ হইল। ঋভুগণ একতানস্বনে গান ধরিলেন। গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর পরিপূরিত করিয়া উন্মুক্ত ছায়াপথ দ্বারপথে অনন্তে নিলীন হইল।‡

মুগ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন। উহা সকলেরই কর্ণে সুধাধারাবৎ বোধ হইতে লাগিল। যেমন বড় সুখের সময়ে সুখসন্তানবৎ স্বপ্নবৎ অর্দ্ধচেতন অর্দ্ধ অচেতনবৎ মোহময় সুখময়, শান্তিময়, অমৃতময়, দূরস্থ মধুর সঙ্গীতধ্বনিবৎ কাণে কি জানি কি নিলীন হয় সেইরূপ সে গীতধ্বনি সকলের কর্ণে লাগিল। কেহই বুঝিল না কেন তাহাদের প্রাণ প্রফুল্ল হইল, অথচ সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল; কেবল তিন জন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনজনে গানে মত্ত হইয়াছিলেন, তিনজনে মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বর লক্ষ্য করিয়

*যে মানুষ সৎকর্ম্ম করিয়া মরণের পর দেবতা হয়েন বেদে তাঁহাকে ঋভু কহে।

†পাহাড়ের উচ্চ অংশকে পাহাড়িয়া টিব্যা বলে।

‡ গ্রন্থকার গানটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

হিমালয়চূড়ায় আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা ভারতের চূড়া, যতদিন ভারত থাকিবে, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে,যতদিন জগতে মাহাত্ম্যের মান থাকিবে, ততদিন ইহাঁদের নাম লোপ হইবে না।

৩।

প্রথম মহর্ষি বশিষ্ঠ, ষষ্টিসহস্র শিষ্যপরিবৃত হইয়া আপন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মনীতি উপদেশ দিতেছিলেন; কাহাকে বাক্য, বাচ্য, ব্যঙ্গ, কাহাকেও প্রমাণ, প্রমেয়, প্রয়োজন, সংশয়নির্ণয়, ছলজাতিহেত্বাভাস প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব, কাহাকে পঞ্চতন্মাত্রের সহিত লিঙ্গশরীরের ভেদাভেদ, কাহাকে বিবর্ত্তবাদী, কাহাকে পরিণামবাদী বুঝাইয়া দিতেছেন; কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন; শিষ্য বিবেচনায় কাহাকেও বা দশকর্ম্মও শিক্ষা দিতেছেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার শিষ্যসমূহ অন্যমনা, স্থির, নিস্পন্দ, শেষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শক্তিবিহীন হইলেন। গীতধ্বনিও বশিষ্ঠের কাণে গেল, তিনি যোগবলে জানিলেন ঋভুগণ আসিয়াছেন। তিনি অমনি যোগবলে হিমালয়ের শিখর লক্ষ্য করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া, ঋভুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান শুনিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয়,বিশ্বামিত্র। ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন সৈন্যচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ পথশ্রান্তিনিবন্ধন যে যেখানে পাইল সে সেইখানেই তাম্বু গাড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া কালিকার সৈন্যচালনার পরামর্শ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে আসিয়া বসিলেন, এমন সময়ে আকাশ আলোকময় হইয়া উঠিল, আর সেই সুমধুর গীতধ্বনি সকলের কাণে গেল। সৈন্যগণ যে যেভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল, নিস্পন্দ ও সুখমোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যে তাম্বু গড়িয়াছে তাহার বিছানা করা হইল না, যে গাড়িতেছে, তাহার অর্দ্ধেকেই শেষ হইল, আর যে গাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার ঐ পর্য্যন্ত। বিশ্বামিত্র গীতধ্বনি বুঝিলেন, অমনি চকিতের ন্যায় তিনলম্ফে এক টিব্যায় উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনে যে ঋভুদেব কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয়, বাল্মীকি। ইনি নিজ দস্যুদল সমভিব্যাহারে গিরিরাজের প্রাসাদে ডাকাতি করিতে গিয়াছিলেন। নিজে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া দুই পাঁচ জনকেও তথায় আনিয়া সিড়িভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেছেন, চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, রাজরক্ষিগণ কে কোথায় যাইবে স্থির করিতে

পারিতেছে না, কোথাও ডাকাইতে রক্ষী কাটিতেছে, কোথাও রক্ষীকে ডাকাইত কাটিতেছে, কোথাও ডাকাতে ডাকাত কাটিতেছে কোথাও রক্ষী রক্ষী কাটিতেছে। বাল্মীকি ক্রমাগত অসি আস্ফালন করিতেছেন আর সংকেতমত শিঙ্গা বাজাইতেছেন। এমন সময়ে আলোক ও গীতধ্বনি হইল। অমনি যে যেভাবে ছিল চিত্রপুত্তলিবৎ নিস্পন্দ হইয়া গেল। বাল্মীকি গান শুনিলেন ও বুঝিলেন। অমনি অস্ত্রত্যাগ করিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী টিব্যার আরোহণ করিলেন।

৪।

গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায় তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের জ্বালায় কেহ প্রাণ খুলিয়া গায় তখন আরও মধুর হয়, আবার যে গীত বুঝে সে গীতে অধিক মুগ্ধ যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কাণ না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূর্ণিত হইয়া গাইতেছেন, অন্তরের জ্বালাও আছে! তাঁহারা কি দেখিয়া গিয়াছিলেন আর এখন কি হইয়াছে! বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন বুঝিতেছেন ভাবগ্রহ করিতেছেন। কাণ মন প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে বাহিরের ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে জ্ঞান চৈতন্য হত তাঁহারা গায়কে মোহিত গায়কের ভাবে মোহিত গানে মোহিত সুরে মোহিত আর গানের ভাবে আরও মোহিত। গানে বলিতেছে সব ভাই ভাই এস ভাই ভাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব ভাই ভাই; সব আপন, সব প্রেম, প্রাণীমাত্রেই ভাই; এস কোলাকুলি করি এস সবে মিলে এক হই একতান-মনপ্রাণ হই। এ তে কে না মুগ্ধ হইবে, শুধু মুগ্ধ? মুগ্ধ হইতে মুগ্ধ, তাহা হইতেও মুগ্ধ যদি কিছু থাকে তাহাও হইতে হয়। তিন জনইত মুগ্ধ কিন্তু মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে একটি ভাবনাস্রোতঃ সকলেরই মনে বহিতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ভাবিতেছেন না কিন্তু ভাবনা থামাইতেও পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলে ইচ্ছার মত শক্তি নাই কিন্তু যখন সমস্ত মন উদ্বেল হয় সমস্ত মন দ্রব হইয়া একদিকে স্রোতঃ চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ইচ্ছার সাধ্য কি নিবারণ করে।

বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রসাদ, আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ মিটাইয়া তুলিয়াছি। আমি সব ভাই ভাই করিবার যোগাড় করিয়াছি, নিজে ক্ষত্রিয়ের পুরোহিত হইয়াছি। লাঘব স্বীকার করিয়াছি এই ভাবনাস্রোতঃ যত বাড়িতেছে ততই তিনি আরও উন্মত্ত হইতেছেন।

বিশ্বামিত্র ভাবিতেছেন আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এক করিয়া আনিয়াছি আমার শাসনে সব ভাই ভাই হইয়া যাইবে, যতবার তাঁহার এই ভাবনা হইতেছে ততই তাঁহার মুগ্ধভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। আর বাল্মীকির অন্তরের অন্তরে ভাবনা কি? হায় আমি কি করিতেছি আমি কেবল আমার ভাইএদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!!! আমার এ কলঙ্ক কিসে যায়, এ দারুণ জ্বালা কিসে নিবাই; কিরূপে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। গান যত জমিয়া আসে তাঁহার আকুলভাব আরও বৃদ্ধি হয় ক্রমে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল তিনি কাঁদিয়া ঋভুদেবের পায়ে জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শরীর ধূলায় লুঠিতে লাগিল, দেব রক্ষা কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কহিয়া দেও, প্রাণ আর বাঁচে না।

দেবমাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে! সহসা বাল্মীকির মন প্রফুল্ল হইল। কে যেন অন্তরের অন্তরে বলিয়াদিল ভয় নাই ভয় নাই, পাপত্যাগ কর, ভাই ভাই করিয়া গান করিয়া বেড়াও, তোমার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর কিন্তু ভয় নাই তুমি ভাই ভাই গাইয়া বেড়াও তোমার জীবনে তুমি কিছু সুখ পাইয়া মরিবে, কিন্তু তোমার আত্মা এই পৃথিবীতেই থাকিবে, যেখানে ঘোর অত্যাচার সেইখানেই উহার উপস্থিতি হইবে, যেদিন পৃথিবীময় ভাই ভাই হইয়া উঠিবে সেইদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ঋভু হইবে ঋভুরাজ হইবে তোমার সুখের শেষ থাকিবে না।

অল্পক্ষণেই বশিষ্ঠের আত্মপ্রসাদ নৈরাশ্যরূপে পরিণত হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন কিছু হয় নাই তাঁহার সব চেষ্টা বিফল হইবে।

বিশ্বামিত্রের বোধ হইল তাঁহার ঘোর বিপদ সম্মুখে, তিনি যেন কত পাপ করিয়াছেন কিন্তু তিনি সে কথায় কাণ দিলেন না বীরজনসুলভ আত্মমদে মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় পূর্ণ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে গানে মুগ্ধভাব অন্তরিত হইল। শেষ এই যে ভাবনাস্রোত তাহাতেই তিনি জলমগ্ন হইলেন, ডুবিয়া রহিলেন, পূর্ব্বে সকল ইন্দ্রিয় কাণে উঠিয়াছিল এক্ষণে ফিরিয়া হৃদয়ের তলে তলে লুকাইয়া হৃদয়ের খেল দেখিতে লাগিল। ঋভুগণ যে কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেলেন তাহা টেরও পাইলেন না, তখন যে রাত্রি নাই তাহা তাঁহাদের জ্ঞানও নাই, আত্মচিন্তায় যে মগ্ন তাহার আবার দিন রাত্রি কি?

৫।

এদিকে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে যতদূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন বোধ হয় লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না বোধ হইল আকাশ

প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন এসময়েও সেই প্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল আবার নক্ষত্র জলিল আবার আকাশ স্থির হইল আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল। যেমন বড় ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ড শেষ হইলে সমস্ত বাড়ী খাঁ খাঁ করিতে থাকে সমস্ত বিশ্বসংসার তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি আপন আপন টিব্যায় ভাবনায় ডুবিয়াছিলেন কতক্ষণ ছিলেন কে বলিতে পারে? ক্রমে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন সমস্তই অন্যরূপ, শরৎ—আকাশে ভানূদয় হইয়াছে, নক্ষত্র কোথায় লুকাইয়াছে, প্রভাতবায়ু প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে নির্ঝরশব্দ কাণ জুড়াইয়া দিতেছে তিনজনেরই রজনীর বৃত্তান্ত স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। বাল্মীকি যখন উঠিয়া দেখিলেন সে গানও নাই সে দেবও নাই তিনি শোকে আকুল হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বশিষ্ঠ প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য যোগবলে আশ্রমে যাইতে যাইতে দেখিলেন বিশ্বামিত্র নামিতেছেন; অমনি সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া দুজনে পদব্রজে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন।

যার কাজ সেই করুক।

চিরকালই কথা আছে যার কাজ সেই করে। যদি অন্যে অন্যের কাজ করে, তবে সে কাজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়। কিন্তু আমাদের এমনি অদৃষ্ট মন্দ, আমাদের সকল কাজই পরে করে। আমরা কেবল আহার করি, দুই হাত নাড়িয়া দুইপাটী দাঁত ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে সংতর্পণে—কন্টক হইতে পৃথক্‌কৃত সর্ষপতৈলভর্জ্জিত মৎস্যদেহ সমভিব্যাহৃত—বরিশালোৎপন্ন লঘুপাক বালামাভিধেয় তণ্ডুলজাত অন্নরাশি গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। তাহাও শুনিয়াছি কাহার কাহার গৃহিণী মাছের কাঁটা বাছিয়া গরাসগুলি পাকাইয়া রাখেন, কর্ত্তার কার্য্যের মধ্যে উত্তোলন, প্রবেশন ও গলাধঃকরণ। আমাদের দে-

শের কাজ ত আটশত বৎসর ধরিয়া পরে করিয়া আসিতেছে। আমার সঙ্গে আমার ভাইয়ের ঝগড়া হইলে সাহেবে তাহা মিটাইয়া দিবে। আমার দেশে বর্গী আসিলে আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাকে তাড়াইবে। আমাদের সীমা-প্রদেশে অত্যাচার করিলে স্কটলণ্ডের পাহাড়ীরা তাহাদের তাড়াইবে, আমাদের দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে জর্ম্মাণীর ইঞ্জিনিয়ার তাহা সারিয়া দিবে। আমাদের কাজ ভাল হয় না, ভাল হলেও খরচটা বেশী হয়, কিন্তু তা হলে কি হয় আমরা আমীর, সব কাজ পরকে দিয়া করাইয়া লই। অথবা আমরা (genius) জিনিয়স। জিনিয়সের বোল এই Never do yourself what you can have another to do for you. আমাদের বঙ্গভূমিতে সবাই মনে করেন আমি জিনিয়স, আমার কাজ চুপ করিয়া, কাণে তুলা দিয়া বসিয়া থাকা আর অন্যের কাজ এই যে আমার আহার যোগায়। পরে যতক্ষণ করে, ততক্ষণ আমরা হাত পা নাড়ি না। শেষ পরে না করিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না।

সে যাই হউক, এটা ঠিক্ যে,যার কাজ তাহারই করা উচিত। আমার বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় জল বাঁধে তাহা পরে মেরামত করিয়া দেয়, আমার বাড়ীর পাশের বন পরে কাটিয়া দিয়া যায়, এটা একান্ত দুঃখের বিষয়। দুঃখের বিষয় হইলেও আমরা করি না, রাস্তায় জল বাঁধিয়াছে, বর্ষার সময় না হয় নাই বাহির হইলাম; যদিই বাহির হইলাম, না হয় একবার একটু পায়ে জল লাগিল, তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের মনের ভাব ঠিক্ এই। কিন্তু আমরা ব্যতীত অন্য যে কেহ এ ব্যাপার দেখে, সেই ঘৃণা করে, এই জন্য ইংরেজ বাহাদুর কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের আপনকর্ম্ম জোর করিয়া করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতে আমাদের ঘৃণা হয় না, আমরা আপন কর্ম্ম করি না। টেক্স না দিলে ঘটী, বাটী কাড়িয়া লইয়া যায়, এইজন্য টেক্স দিই, কিন্তু তাহার পর আবার পরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকি; আর কিছুই দেখি না।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের মধ্যহইতে মিউনি-সিপাল কমিসনর লন, তাঁহারা কর্ত্তার কথায় আজ্ঞা হাঁ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন। কর্ত্তা সাহেব হইলে, না বলিবার কাহারই ত যো নাই, যদি বাঙ্গালি হইলেন, তবে বরং দুই একজন ঠোঁটকাটা দুই একটি কথা বলিলেন। যেই চর্ম্ম-পাদুকচরণে, উষ্ণীষমস্তকে, দিব্যশুভ্র-বর্ম্মাচ্ছাদিতসর্ব্বকলেবর, সুগন্ধিদ্রব্যে সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া যশোদার নন্দ-দুলাল মিউনিসিপাল সভায় উপস্থিত হইলেন, অমনি সব চুপ। কেবল মধ্যে মধ্যে "আজ্ঞা হাঁ" নতুবা "যো হুকুম।" ভিন্ন আর কথা নাই।

এখন গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিজের কাজ নিজে করাইতে চান, আমরা তাহা করিতে পারি না, গবর্ণমেণ্ট আমাদের কর্ম্ম শিখাইতে চান, গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা আমাদের তাহা শিখিতে দেন না, এই অকর্ম্মারা যদি কেহ কর্ম্ম করিতে চান, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি যাহা বলেন, আমরা তাহাতে কেবল "হাঁ" দিয়া যাই। তিনি কেবল হাঁ দিবার মত কমিসনর নির্ব্বাচন করিয়া লন। ইহার এক উপায় আছে,—আমরা নিজে যদি মেম্বরনির্ব্বাচন করিতে পাই, তাহা হইলে চেয়ারম্যানের ধামাধরাগণ আর বড় কমিটীতে স্থান পায় না, সেই এক ভরসা আছে; অতএব যেখানে যেখানে স্থানীয় মিউনিসিপাল শাসন আছে, নিজে মেম্বরনির্ব্বাচন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক, নহিলে কমিটী তোমাদের অর্থশোষণ করিবে, তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তোমাদের কাছে বড় হইয়া, কর্ত্তার কাছে হাতযোড় থাকিবে। আর তোমাদের কোন কাজ হইবে না। তাই বলি যার কাজ সেই করুক। তোমাদের কমিসনর তোমরাই নির্ব্বাচন কর এ বিষয়ের আইনও আছে।

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮২ সংখ্যা।

বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত।

প্রচলিত অলঙ্কার-কণ্টকিত বাঙ্গালা ভাষা আমার আয়ত্ত নহে, তথাপি একটা কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার নিরলঙ্কৃত ভাষায় সে কথাটির চটক হইবে না, সুতরাং লোকে তাহা পড়িবে না, তথাপি পড়াইতে আমার ইচ্ছা। কথাটী স্পষ্ট করিয়া, পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু আমি বলিতে পারিলাম না আর একজন পরে বলিবে এই ভরসায় অপেক্ষাও করিতে পারি না।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসীদের মধ্যে কতলোক পড়িতে পারে? তুমি বলিবে বিস্তর; গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, পাঠশালা ও স্কুল আছে, পাঠকের সংখ্যা বিস্তর হওয়াই সম্ভব। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বিস্তর বলিলে সংখ্যা অনুভব হয় না। বাঙ্গালায় প্রায় দুইকোটী পুরুষ বাস করে, তাহাদের মধ্যে কত লক্ষ পড়িতে সক্ষম? বিংশতি লক্ষ? না, আরও অল্প? এক্ষণে সূক্ষ্ম হিসাব হইতে পারে না; একটা মোটামুটি অনুভব করিয়া লইতে হইবে। গ্রামের অর্দ্ধেক বালক পাঠশালায় যায় না। যাহারা যায়, তাহাদের অর্দ্ধেক—বরং কিছু অধিক হইবে—অক্ষরপরিচয় অবধি অপেক্ষা করে না, পাঠশালার পীড়নে পলায়ন করে। যদি শতকরা চল্লিশজন বালক পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অক্ষরপরিচয়ের পূর্ব্বে কুড়িজন পাঠশালা ত্যাগ করে, বাকি কুড়িজনের মধ্যে দশজন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তে রামায়ণ প্রভৃতি ছাপার পুঁথি কষ্টে একপ্রকার পড়িতে পারে, আর বাকি দশজন অপেক্ষাকৃত ভাল-

রূপ শিক্ষা পায়। কেবল এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের গণ্য করিলে বাঙ্গালায় কুড়ি-লক্ষ লোক পড়িতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রতিশতে দশজন হিসাবে পড়িতে পারে। যদি কেহ বলেন, বাঙ্গালায় পাঠকসংখ্যা এত হইবে না, তাহাতেও আপত্তি নাই; কুড়িলক্ষ পাঠক কাটিয়া দশলক্ষ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রতিশতে পাঁচজন যে পড়িতে পারে ইহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই দশলক্ষের মধ্যে কয়জন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন? কোন্ বাঙ্গালা পত্রিকার দুইহাজারের অধিক গ্রাহক আছে? সকল পত্রিকার গ্রাহক একুন করিলে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশহাজার হইবে, দুইকোটি পুরুষের মধ্যে দশ হাজার!

যে বাঙ্গালায় সামান্য পর্ব্বোপলক্ষে নিমেষমধ্যে দশহাজার লোক একস্থানে এক মাঠে উপস্থিত হয় সেই বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের গ্রাহকও দশহাজার! পর্ব্বোপলক্ষে বাঙ্গালায় বোধ হয় প্রতিবৎসরে প্রায় আটলক্ষ টাকার মাটীর পুতুল বিক্রয় হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের নিমিত্ত তাহার চতুর্থাংশের একাংশও ব্যয় হয় না। তুমি বলিবে সংবাদপত্রের এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, তাহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে? সংবাদপত্রের মাহাত্ম্য সমাজসম্বন্ধে; তাহা পরে বলিতেছি। সকল দ্রব্যেরই মহত্ত্ব আছে; যে পুতুল ক্রয় করিলে পয়সা জলে গেল মনে করিয়া থাক, সেই পুতুলেরও মাহাত্ম্য আছে; সমাজসম্বন্ধে তাহার ক্রম অস্পষ্ট, কিন্তু গুরুতর। পুতুল বালকের নিমিত্ত; ক্রীড়ার সামগ্রী; কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, পুতুলের কোনরূপ আধিপত্য সমাজের উপর আছে কি না কে তাহার তদন্ত করিতে যাইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, বঙ্গশিশু কিপ্রকার পুতুল লইয়া খেলা করে? কেবল 'মাটীর হরিণ,' 'মাটীর পক্ষী,' 'মাটীর বৌ' 'মাটীর খোকা।' পরে শিশু বয়ঃপ্রাপ্তে নিজেই সেই মাটীর খোকা দাঁড়াইয়া যায়। যে জাতির ইচ্ছা, সেই জাতির পুতুল সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে যে কতকটা পুতুলের প্রকৃতি অনুসারে সেই জাতির প্রকৃতি। পুতুলের ক্রম অস্পষ্টভাবে প্রত্যেক জাতির অস্থিমজ্জায় আছে।

সংবাদপত্রসম্বন্ধে আরও অধিক বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া দেখিলে জাতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বুঝা যায়, কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র দেখিয়া আমাদের প্রকৃতি বুঝা যায় না। বলিতে গেলে, আমাদের সংবাদপত্র নাই; যাহা আছে, তাহা ইংরেজিপত্রের অনুকরণ, তাহা কোনক্রমেই আমাদের প্রকৃতিব্যঞ্জক নহে। বাঙ্গালা সংবাদপত্র কতকটা বিজাতীয় বলিয়া বাঙ্গালিরা তাহা পড়িতে পারে না; সেইজন্য দশলক্ষ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র

দশহাজার লোক সংবাদপত্রের গ্রাহক। অতএব সাধারণোপযোগী দুই একখানি সংবাদপত্র বঙ্গে আবশ্যক। কেবল এই কথা বলিবার নিমিত্ত আমি এত মাথামুণ্ড বকিতেছি।

লোকে যত একভাবে ভাবিবে, ততই তাহাদের জাতিসম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ভিন্ন আর কে এখন বহুলোককে একবিষয়ে একদিকে ভাবাইবে, একরূপ আলোচনা করাইবে? সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য অধিকাংশ লোকের মন একসূত্রে বদ্ধ করা, একদিকে মনের গতি নির্দ্দেশ করা। তুমি বলিবে পূর্ব্বে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এ সকল কিছুই ছিল না তখন জাতিবন্ধনের সূত্র কোথা হইতে আসিয়াছিল? সংবাদপত্র ছিল না সত্য, কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল। রামায়ণ আর মহাভারত আমাদের জাতিবন্ধনের মূল ছিল; ইহা পড়িতেন অল্প লোকে, কিন্তু শুনিতেন সকলেই। শুনিতেন কথকের মুখে; কথকেরা তাহা বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমাদের পূর্ব্বগামী বাঙ্গালিরা সেই বিকৃতব্যাখ্যার ফল। তাঁহাদের ব্যবহার, বিচার, যুক্তি, চিন্তা, সামাজিকতা এই সমুদয়ের মূল কথকের কথকতা। কথকতা আর বড় নাই, এক্ষণে সংবাদপত্র; সাময়িকপত্র সেই কথকতার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বের কথক; এক্ষণকার সম্পাদক। উভয়ের উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র।

কয়েকজন কথকেরদ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রস্তুত ভাল হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা করিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন বাঙ্গালা সম্পাদকগণদ্বারা প্রস্তুত হইবে। কথকের কার্য্য সহজ ছিল। তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন, আবালবৃদ্ধ সকলে শুনিত, সকলে বুঝিত। ন্যূনকল্পে এককোটী লোক তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিল, বুঝিয়াছিল। সম্পাদকের সে উপায় নাই; তাঁহাদের বক্তৃতা ভাল হউক, মন্দ হউক, এককোটীর স্থলে কেবল দশহাজার না হয় পঞ্চাশহাজার লোক শুনিয়া থাকে, পড়িয়া থাকে।

কিন্তু সম্পাদকের কথা শুনিবার নিমিত্ত দশলক্ষ লোক প্রস্তুত হইয়াছে, সম্পাদকেরা সে সকল লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। হেতু প্রথমতঃ অনুভব হয় সম্পাদকগণের অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ হয় ত তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা। অযোগ্যতা এইজন্য বলি যে, যে গুণে দশলক্ষ লোক আকৃষ্ট হইবে, সে গুণ তাঁহাদের থাকিলে এই দশলক্ষ লোক অবশ্য তাঁহাদের হস্তগত হইত; সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে যাহা তাঁহারা লেখেন, হয় ত সে সকলের কোন উদ্দেশ্যই নাই। কোন্ পত্রিকা কি উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইতেছে তাহা আমি জানি না, বুঝিতেও পারি না; সম্পাদকেরা

রূপ শিক্ষা পায়। কেবল এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের গণ্য করিলে বাঙ্গালায় কুড়ি লক্ষ লোক পড়িতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রতিশতে দশজন হিসাবে পড়িতে পারে। যদি কেহ বলেন, বাঙ্গালায় পাঠকসংখ্যা এত হইবে না, তাহাতেও আপত্তি নাই; কুড়িলক্ষ পাঠক কাটিয়া দশলক্ষ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রতিশতে পাঁচজন যে পড়িতে পারে ইহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই দশলক্ষের মধ্যে কয়জন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন? কোন্ বাঙ্গালা পত্রিকার দুইহাজারের অধিক গ্রাহক আছে? সকল পত্রিকার গ্রাহক একুন করিলে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশহাজার হইবে, দুইকোটি পুরুষের মধ্যে দশ হাজার!

যে বাঙ্গালায় সামান্য পর্ব্বোপলক্ষে নিমেষমধ্যে দশহাজার লোক একস্থানে এক মাঠে উপস্থিত হয় সেই বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের গ্রাহকও দশহাজার! পর্ব্বোপলক্ষে বাঙ্গালায় বোধ হয় প্রতিবৎসরে প্রায় আটলক্ষ টাকার মাটীর পুতুল বিক্রয় হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের নিমিত্ত তাহার চতুর্থাংশের একাংশও ব্যয় হয় না। তুমি বলিবে সংবাদপত্রের এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, তাহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে? সংবাদপত্রের মাহাত্ম্য সমাজসম্বন্ধে; তাহা পরে বলিতেছি। সকল দ্রব্যেরই মহত্ত্ব আছে; যে পুতুল ক্রয় করিলে পয়সা জলে গেল মনে করিয়া থাক, সেই পুতুলেরও মাহাত্ম্য আছে; সমাজসম্বন্ধে তাহার ক্রম অস্পষ্ট, কিন্তু গুরুতর। পুতুল বালকের নিমিত্ত; ক্রীড়ার সামগ্রী; কেহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, পুতুলের কোনরূপ আধিপত্য সমাজের উপর আছে কি না কে তাহার তদন্ত করিতে যাইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, বঙ্গশিশু কিপ্রকার পুতুল লইয়া খেলা করে? কেবল 'মাটীর হরিণ,' 'মাটীর পক্ষী,' 'মাটীর বৌ' 'মাটীর খোকা।' পরে শিশু বয়ঃপ্রাপ্তে নিজেই সেই মাটীর খোকা দাঁড়াইয়া যায়। যে জাতির ইচ্ছা, সেই জাতির পুতুল সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে যে কতকটা পুতুলের প্রকৃতি অনুসারে সেই জাতির প্রকৃতি। পুতুলের ক্রম অস্পষ্টভাবে প্রত্যেক জাতির অস্থিমজ্জায় আছে।

সংবাদপত্রসম্বন্ধে আরও অধিক বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়া দেখিলে জাতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বুঝা যায়, কিন্তু আমাদের সংবাদপত্র দেখিয়া আমাদের প্রকৃতি বুঝা যায় না। বলিতে গেলে, আমাদের সংবাদপত্র নাই; যাহা আছে, তাহা ইংরেজিপত্রের অনুকরণ, তাহা কোনক্রমেই আমাদের প্রকৃতিব্যঞ্জক নহে। বাঙ্গালা সংবাদপত্র কতকটা বিজাতীয় বলিয়া বাঙ্গালিরা তাহা পড়িতে পারে না; সেইজন্য দশলক্ষ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র

দশহাজার লোক সংবাদপত্রের গ্রাহক। অতএব সাধারণোপযোগী দুই একখানি সংবাদপত্র বঙ্গে আবশ্যক। কেবল এই কথা বলিবার নিমিত্ত আমি এত মাথামুণ্ড বকিতেছি।

লোকে যত একভাবে ভাবিবে, ততই তাহাদের জাতিসম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ভিন্ন আর কে এখন বহুলোককে একবিষয়ে একদিকে ভাবাইবে, একরূপ আলোচনা করাইবে? সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য অধিকাংশ লোকের মন একসূত্রে বদ্ধ করা, একদিকে মনের গতি নির্দ্দেশ করা। তুমি বলিবে পূর্ব্বে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এ সকল কিছুই ছিল না তখন জাতিবন্ধনের সূত্র কোথা হইতে আসিয়াছিল? সংবাদপত্র ছিল না সত্য, কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল। রামায়ণ আর মহাভারত আমাদের জাতিবন্ধনের মূল ছিল; ইহা পড়িতেন অল্প লোকে, কিন্তু শুনিতেন সকলেই। শুনিতেন কথকের মুখে; কথকেরা তাহা বিকৃতি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমাদের পূর্ব্বগামী বাঙ্গালিরা সেই বিকৃতব্যাখ্যার ফল। তাঁহাদের ব্যবহার, বিচার, যুক্তি, চিন্তা, সামাজিকতা এই সমুদয়ের মূল কথকের কণ্ঠতা। কথকতা আর বড় নাই, এক্ষণে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র সেই কথকতার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বের কথক; এক্ষণকার সম্পাদক। উভয়ের উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র।

কয়েকজন কথকেরদ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রস্তুত ভাল হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা করিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন বাঙ্গালা সম্পাদকগণদ্বারা প্রস্তুত হইবে। কথকের কার্য্য সহজ ছিল। তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন, আবালবৃদ্ধ সকলে শুনিত, সকলে বুঝিত। ন্যূনকল্পে এককোটী লোক তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিল, বুঝিয়াছিল। সম্পাদকের সে উপায় নাই; তাঁহাদের বক্তৃতা ভাল হউক, মন্দ হউক, এককোটীর স্থলে কেবল দশহাজার না হয় পঞ্চাশহাজার লোক শুনিয়া থাকে, পড়িয়া থাকে।

কিন্তু সম্পাদকের কথা শুনিবার নিমিত্ত দশলক্ষ লোক প্রস্তুত হইয়াছে, সম্পাদকেরা সে সকল লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। হেতু প্রথমতঃ অনুভব হয় সম্পাদকগণের অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ হয় ত তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা। অযোগ্যতা এইজন্য বলি যে, যে গুণে দশলক্ষ লোক আকৃষ্ট হইবে, সে গুণ তাঁহাদের থাকিলে এই দশলক্ষ লোক অবশ্য তাঁহাদের হস্তগত হইত; সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে যাহা তাঁহারা লেখেন, হয় ত সে সকলের কোন উদ্দেশ্যই নাই। কোন্ পত্রিকা কি উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইতেছে তাহা আমি জানি না, বুঝিতেও পারি না; সম্পাদকেরা

নিজে হয় ত তাহা বুঝিলে বুঝিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে নিজের অর্থাগম ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য অনুভব হয় না, অথচ এদিকে তাঁহাদের অর্থাগমও দেখি না। অর্থাগম হয় না তাহা তাঁহাদের নিজের দোষ, যে স্থলে দশলক্ষ পাঠক প্রস্তুত আছে, সে স্থলে অর্থের ভাবনা কি ?

দশলক্ষ পাঠক প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। পুরুষানুক্রমে অনেককাল যত্ন না করিলে তাহা হয় না; আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তাহা হইয়া রহিয়াছে। তাহা সামাজিক নিয়মবিস্ফারণে হউক, অথবা পূর্ব্বপুরুষের প্রযত্নে হউক, বাঙ্গালায় দশলক্ষ লোক পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু বহুকালের এই উদ্যোগ আমাদের দোষে বৃথা হইতেছে অথচ সম্পাদকেরা তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি এই দশলক্ষ লোককে পড়াইতে পারিতেন, বাঙ্গালা নূতন হইত, বাঙ্গালির সামাজিকতা কতই বাড়িত।

দুই একজন মহানুভব সম্পাদক স্বপ্ন পীড়িতের ন্যায় "একতা! একতা!" বলিয়া শয্যায় শুইয়া চীৎকার করেন। কেহ বা বায়ুগ্রস্তের ন্যায় মাথা কাঁপাইয়া, দন্ত বিকট করিয়া, অনৈক্যের নিমিত্ত বাঙ্গালিকে গালি দেন। গালি দিয়া ফল কি? পত্রিকা কয়জন পড়ে, তোমার কথা কয়জন শুনে, একতা জন্মে এরূপ কি উপকরণ তোমার পত্রিকায় থাকে? তুমি কি লিখিয়া থাক যে তাহা পড়িয়া সকল বাঙ্গালি সেই কথা আপনা আপনি একভাবে আলোচনা করিবে?

এক্ষণকার বাঙ্গালির সাধারণতঃ আলোচনা করিবার কিছুই নাই; তাহাদের যাহা দিবে, তাহারা তাহাই আলোচনা করিবে। আলোচনার পথ দেখাইয়া দাও, তাহারা সেই পথে চলিবে; কেহ কেহ অন্যপথে গেলেও যাইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রদর্শিত পথে যাইবে। একবিষয় পরস্পর সকলে একই প্রণালীতে ভাবিলে ফল ঐকমত্য।

আমি নিজে ঐকমত্যের গোঁড়া নহি, বরং অনেক সময় মতের অনৈক্যে উন্নতি সম্ভব বিবেচনা করি। কিন্তু অন্যকে সে মতাবলম্বী করিতে চাহি না। যদি এক্ষণে বাঙ্গালার সামাজিক উন্নতি চাও, তবে বাঙ্গালার দশলক্ষ লোককে পড়াইতে চেষ্টা কর, তাহার পর বঙ্গসমাজ নিশ্চয় নূতন হইবে।

দশলক্ষ লোক পড়াইবার চেষ্টা করা কঠিন। যাঁহারা এই চেষ্টা করিবেন এবং ক্রমে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা বঙ্গমাতার সার্থক সন্তান, তাঁহারা ইংরেজি উপাধিধারী "ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া" "নাইট কমাণ্ডার" অথবা বাঙ্গালা উপাধিধারী, রাজাবাহাদুর, মহারাজবাহাদুর অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য ও মান্য।

বিশেষ জানি না যে, কে এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মান্য। তিনি যিনিই হউন, অনুসন্ধান করিলে হয় ত দেখা যাইবে যে, ধনাঢ্য রাজবংশোদ্ভব বলিয়া তিনি মান্য। তাঁহার মান্যের হেতু জন্ম! তিনি নিজের কার্য্যের নিমিত্ত মান্য কি গণ্য নহেন; যদি তিনি কখন কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হয় ত কেবল অনুরোধে। আবার হয় ত সে কার্য্য চাঁদা দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা চাঁদার জন্য মান্য, তাঁহারা অবশ্য মান্য, তাঁহাদের চাঁদায় দেশের অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদিত হয়, যাঁহারা চাঁদা দেওয়ান তাঁহারা আরও মান্য। কিন্তু যাঁহারা চাঁদা করান তাঁহারাই সৎকার্য্যের মূল। তাঁহারা নিজে প্রায়ই নির্ধন, এ পৃথিবীর ভাল কার্য্যই নির্ধনেরদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; এস্থলে বিলাতের ইতিহাস নাড়া দিয়া এ কথা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ধনসম্পন্ন, তাঁহারা প্রায় বিলাসভোগী হইয়া পড়েন, সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিবার তাঁহাদের সাবকাশ থাকে না, প্রবৃত্তিও হয় না। এ সংসারে কার্য্যক্ষম কেবল নির্ধনেরা। অতএব যদি কখন বঙ্গসমাজের দশলক্ষ লোককে পড়াইবার উদ্যোগ হয়, তাহা নির্ধনেদের দ্বারা হইবে।

যাঁহারা নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল আপন চেষ্টায় বাঙ্গালার দশলক্ষ লোককে পড়াইতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গসমাজ নূতন হইবে, তাঁহারা যথার্থই বাহাদুর, তাঁহাদের ছিন্নবস্ত্র হইলেও তাঁহারা পূজ্য, তাঁহাদের বাহাদুরী কেহ দেখিবে না সত্য, কিন্তু যে দেখিবে সেই বুঝিবে।

এক্ষণে কি উপায়দ্বারা তাঁহারা বঙ্গসমাজকে পড়াইবেন। মনে কর, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দুই চারিজন বাঙ্গালার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এই ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দুইটিকে পারেন, দশটীকে পারেন, যত লোককে পারেন, পড়িবার প্রবৃত্তি দিবেন, কিন্তু প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিরা কি পড়িবে? সকলেই পড়িতে পারে এরূপ সংবাদপত্র কি সাময়িকপত্র ত কিছুই নাই। যে সকল সংবাদপত্র আছে, তাহাতে জর্ম্মাণদেশের রাজনীতি, অথবা রুসদেশের কাটিস্কফ নটিস্কফ প্রভৃতির মন্ত্রণা বা ঘটনা লিখিত থাকে, তাহাতে বাঙ্গালির সহানুভূতি কেন জন্মিবে। যে সকল সাময়িকপত্রিকা আছে, তাহাতে হয় ত বিলাতি দর্শনের কচকচি, না হয় অন্য মাথামুণ্ড লিখিত থাকে, লোকের তাহা ভাল লাগে না, যাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, তাহা কে তাহাদের দিবে? যাঁহারা বিশেষ বিদ্বান্ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত লেখা তাঁহাদের সাধ্য নহে; বিদ্যাভারগ্রস্তেরা লিখিতে গেলে বিদ্যার ভেল্কী লাগে, তাঁহারা যাহা লেখেন, লোকে তাহা বুঝে না, কেবল

বিদ্বানেরা পরস্পর বুঝেন। তাহাই বোধ হয় সেকালের সংস্কার ছিল, "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া।" যে বিদ্বানের লেখা বুঝা যায় না তিনি যেন নিদ্রিত থাকেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, তবে বাঙ্গালার দশলক্ষ লোকের নিমিত্ত কে লিখিবে? আমরা বলি যে, যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি অপর সাধারণ লোকের সহিত মন মিলাইতে পারেন; যাঁহারা বুঝেন, লোকেরা কিরূপ চিন্তা করে; সে চিন্তার প্রণালী কি; কোন্ কথার পর তাহাদের কোন কথা মনে আইসে;—তাঁহারাই এক্ষণে সাধারণের লেখক হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প, অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া কঠিন।

অতএব এক্ষণে পরামর্শ আবশ্যক। যাঁহারা সংসারী, যাঁহারা কূপে পতিত হইয়া সাগর ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ পরামর্শের অনধিকারী। যাঁহারা স্ত্রীর কণ্ঠ রত্নে ভূষিত করুন, তাঁহারা নির্বিঘ্নে সংসার চালাইতে থাকুন, তাঁহারা বাঙ্গালা চালাইবার কেহই নহেন। তাঁহারা আপন ঘরের উন্নতি ভাবুন, বাঙ্গালার উন্নতি ভাবিবার ভার তাঁহাদের নহে? যে যুবারা সংসারের ক্ষুদ্র আয়তনে এপর্য্যন্ত বদ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারাই এ পরামর্শের বিশেষ অধিকারী। অতএব তাঁহারা পরামর্শ করুন।

পরামর্শের বিষয় এই যে, কোন সর্ব্বজনীন পত্রিকার এক্ষণে অনুষ্ঠান করা উচিত কি না? যদি তাহা উচিত বোধ হয়, তবে সাধারণযোগ্য লেখক জুটিলে কার্য্য আরম্ভ হইবে এরূপ বিবেচনা করিয়া অপেক্ষা করা উচিত কি না। সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে দুই একখানি নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে কি না। তাহার পর পরামর্শ কিরূপে দশলক্ষ লোকের হস্তে সেই পত্রিকা সমর্পিত হইতে পারে।

রত্নরহস্য।

মুক্তা।

আমরা "রত্নরহস্য" মুকুটার্পণ করিয়া যে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে মুক্তার জাতি ও গুণাগুণ বিচারিত হইয়াছে। অদ্য সেই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব, পরে রত্নান্তরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

মুক্তাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান বক্তব্য সকল বলা হইয়াছে, কেবল "বেধকার্য্য" ও মূল্যকল্পনাপ্রণালী বলিতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং মূল্যকল্পনাতেই প্রস্তাবের শেষ হইবে।

বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজ নহে। ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত ছিদ্র করা যায় না। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল চয়ন করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সংস্কৃত করিতে পারিলে তবে তাহা সুখবেধ্য হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা যে প্রক্রিয়ারদ্বারা মুক্তা সুখবেধ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে প্রক্রিয়া রত্নশাস্ত্রে অতি উত্তমরূপে উপদিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারভাণ্ডে,
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ,
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্ন ভাণ্ডম্।*
জম্বীরজাত রসযোজনয়া বিপকম্॥
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃত পিণ্ডমূলৈঃ কুর্য্যাৎ
যথেচ্ছ মিহ মৌক্তিক মাশুবিদ্ধম্॥

শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল আহরণ করিয়া, অন্য এক শূন্য গর্ভ শুক্তির মধ্যে রাখিয়া পুটিতকরতঃ "দার†" নামক দ্রব্যেরদ্বারা ভাণ্ডরচনা করিয়া তন্মধ্যে রাখিবেক। যে পরিমাণ পাকে কিঞ্চিৎ স্ফোটতা (উচ্ছূনতা) জন্মে, সেই পরিমাণ পাক হইলে মুক্তাসকল ভাণ্ড হইতে বাহির করিবে। একমাসকাল ধান্য রাশিমধ্যে স্থাপন করিবে। একমাস

* "অন্নভাণ্ডং" পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে "অন্যভাণ্ডম" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কোন পাঠ যথার্থ, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। যাহারা মুক্তার শোধনাদি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাই এরূপ পাঠাপাঠের বিচার করিবার যথার্থ অধিকারী।

† এই "দার" দ্রব্যের বাঙ্গালা নাম কি তাহা আমরা জানি না। অভিধানগ্রন্থে দেখা যায়, "দার নামে একপ্রকার ওষধি আছে" কেহ কেহ "দারুভাণ্ডে" এরূপও পাঠ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, কাষ্ঠনির্ম্মিত কি বনজ ওষধিনির্ম্মিত পাত্র যে কিরূপে পাকক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

পরে সেই সকল মুক্তা অম্লযুক্ত অন্য ভাণ্ডে জামির লেবুর রসসংযোগে পাক করিবে। পরে মদনবৃক্ষমূলের সূক্ষ্ম ও মৃদু কুচী প্রস্তুত করিয়া ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে মুক্তাসকলে ইচ্ছানুরূপ ছিদ্র করা যাইবে।

শোধন বিধি।

শুক্তিগর্ভে থাকা অবস্থায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সুকান্তি থাকে না। মণিকারেরা প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা তাহার মালিন্য দূর করিয়া অতি উত্তম কান্তিযুক্ত করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য-বৃদ্ধি ও নির্ম্মলীকরণসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে।

মৃল্লিপ্ত মৎস্যপুটমধ্যে গতন্ত কৃত্বা,
পশ্চাৎপচেত্তমু ততশ্চ বিতানপত্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুধায়াং
পকন্ততোঽপি পয়সা শুচি চিকণেন।
শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্র নিঘর্ষণেন
স্যান্মৌক্তিকং বিমল সদ্গুণকান্তিজালম্।

অর্থ এই যে, মুক্তাসকল মৃত্তিকালিপ্ত মৎস্যপুটযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উশীর মূলযুক্ত দুগ্ধে পাক, তৎপরে উষ্ণজলে প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্রবে পাক, তৎপশ্চাৎ পুনরপি কেবল জলে পাক করিবে। অনন্তর নির্ম্মল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রেরদ্বারা মার্জ্জন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারাই মুক্তাসকল নির্ম্মল ও ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, এবং সংগুণ ও সুকান্তি ধারণ করে।*

কৃত্রিমতা পরীক্ষা।

মুক্তা অতি মূল্যবান্ ও সুন্দর পদার্থ। ভারতবাসীরা ইহাকে মহারত্ন বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। আদর ও মূল্যের আধিক্য থাকিলেই তৎসঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা ঘটিয়া থাকে। মুক্তাও মূল্যবান্ ও আদরের বস্তু বলিয়া দুষ্টলোকেরা তাহাতে কৃত্রিমতা করিয়া থাকে। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেব লিখিয়াছেন, যে, সিংহলদেশের কৌশলী মনুষ্যেরা অতি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাদিগের মনোহরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাচের ন্যায় শুভ্র "তার" রজতে তৎ শতাংশ হেম (সুবর্ণ) যোগ দিয়া পারদমধ্যে রক্ষাকরতঃ একপ্রকার মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে মুক্তা দেহভূষণমাত্র, ফলাফল কিছু নাই।† যুক্তিকল্পতরু বলেন, মুক্তার যদি কৃত্রিমতা সন্দেহ হয়, তবে তাহার পরীক্ষার্থ এইরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। যথা—

* যুক্তিকল্পতরুধৃত সংস্কৃত বাক্যটির সংস্কৃতানুরূপ অর্থ এইরূপ; পরন্তু মুক্তাব্যবসায়ীরা যে কিরূপ করিয়া থাকেন তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই।

† "শ্বেতকাচসমং তারং হেমাংশশতযোজিতম্। রসমধ্যে প্রধার্য্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণম্॥ এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলা জনাঃ"—ইত্যাদি।

"যস্মিন কৃত্রিম সন্দেহঃ কচিদ্ভবতি
মৌক্তিকে।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়ে-
জ্জলে।
ব্রীহিভির্মর্দ্দনীয়ং বা শুষ্ক বস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
যত্তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদ-
কৃত্রিমম্।"

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহা জলে ও উষ্ণ সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল কিম্বা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দেখিবেক অথবা শুষ্কবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্যদ্বারা ঘর্ষণ করিবেক। এইরূপ করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবেই সে মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে।

সিংহলীয় শিল্পীরা যেমন নানা উপাদানে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে পারিত, তেমনি ব্যাড়ি প্রভৃতি মুনিরাও তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন।

* কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে কৃত্রিম মুক্তাপরীক্ষাসম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বচন আছে। তাহা এই—

" ক্ষিপেৎ গোমূত্র ভাণ্ডে তু লবণক্ষার-
সংযুতে।
স্বেদয়েদ্বহ্নিনা বাপি শুষ্কবস্ত্রেণ বেষ্ট-
য়েৎ।
হস্তে মৌক্তিক মাদায় ব্রীহিভিশ্চোপ-
ঘর্ষয়েৎ।
কৃত্রিমং ভঙ্গমাপ্নোতি সহজঞ্চাতি
দীপ্যতে।।"

কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, সন্দেহ হইলে তাহা লবণ ও ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবেক, অথবা বহ্নিদ্বারা স্বেদ লাগাইবেক। অনন্তর শুষ্কবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিবেক। যদি কৃত্রিম হয়, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবেক, আর যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না, প্রত্যুত নির্ম্মল দীপ্তিযুক্ত হইবেক।

মূল্য ব্যবস্থা।

যুক্তিকল্পতরু, গরুড়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার দোষ, গুণ, ও শোধনবিধি প্রভৃতি যেরূপ বিচারিত হইয়াছে, তাহা বলা হইল, মূল্যের নিয়মও উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে, এক্ষণে তাহারও কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ভার, তেজ, কান্তি এবং অন্যান্য গুণনিচয় (যাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে) অনুসারেই মুক্তার মূল্যাবধারণ করা হইত। এখন আর প্রায় সেরূপ প্রথা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে

"ব্যাড়ির্জ্জগদে জগতাংহি মহাপ্রভাব সিদ্ধোবিদগ্ধহিত তৎপরয়াদয়ালুঃ'
ইত্যাদি।।

যেরূপ আকারের মুক্তা যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহা বৃহৎসংহিতার বচননিচয় আলোচনা করিলেই জানা যায়। তাহাতে লিখিত আছে,

"মাষক চতুষ্টয়ধৃত মৌক্তিকস্য শতাহতাত্রিপঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজো গুণযুতস্য।"

৪ মাষক* পরিমিত অর্থাৎ ২০ রতি ওজনের মুক্তা যদি তেজ ও সুতার সুবৃত্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত হন, তবে তাহার মূল্য শতগুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ অর্থাৎ ৫৩০০০ শত কার্ষাপণ। যুক্তিকল্পতরুর অন্য প্রমাণ এই—

একস্য শুক্তি প্রভবস্য শুদ্ধ,
মুক্তামণেঃ শাণক সম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকানি
ত্রিভিঃ শতৈ রভ্যধিকানি পঞ্চ।"

শুক্তিজাত বিশুদ্ধ মুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ ৪ মাষা পরিমিত হয়, তবে তাহার একটির মূল্য ৫ অধিক তিনশত সহস্র কপর্দ্দক। অপিচ—

"চতুঃসহস্রং লভতেঽস্যমূল্যম্"

তাদৃশ গুণযুক্ত মুক্তা যদি তদপেক্ষা অর্দ্ধমাস ন্যূন ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য চারিসহস্র কপর্দ্দক হইবে।

বৃহৎসংহিতায় অন্য এক প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"মাষকদলহান্যাঽতো
দ্বাত্রিংশৎ বিংশতি স্ত্রয়োদশ চ।
অষ্টৌ শতানি চ শতত্রয়ং
ত্রিপঞ্চাশতা সহিতম্।"

পূর্ব্বোক্ত ৪ মাষা পরিমাণ হইতে যদি মাষকদল অর্থাৎ একমাষার এক চতুর্থাংশ হীন হয়, তবে তাদৃশ অর্থাৎ ৩৷৷ মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৩২।২০।১৩।৮০০।৩০০।৫৩ কার্ষাপণ। উক্ত গ্রন্থে মূল্যঘটিত বচন অনেক আছে। তাহার অপর একটি বচন এই—

"যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াৎ গুরুত্বে
তেতস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টম্।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থ এই যে, যে মুক্তা গুরুত্বে ৩ মাষা পরিমাণ হয় তাহার মূল্য দুইসহস্র কার্ষাপণ।

পূর্ব্বকালে এইরূপ নিয়মে কপর্দ্দক অর্থাৎ কড়ির বিনিময়ে মুক্তারত্ন ক্রীত বিক্রীত হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য কি তাম্রাদি মুদ্রার বিনিময় সময়েও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মুক্তার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অনুসারে রত্নশাস্ত্রে যেরূপ

* "মাষ" শব্দের অর্থ অনেক। মাষশব্দে তন্নামক কলায় ও পরিমাণবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। পরিমাণসম্বন্ধেও নানা মত দৃষ্ট হয়। এখানে মাষশব্দের অর্থ ৪ গুঞ্জা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবেক। যেহেতু মণি, মুক্তাসম্বন্ধে ঐরূপ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে বিস্পষ্ট উক্তি আছে। যথা—"পঞ্চভির্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা। চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্মণি বেদিভিঃ" ইত্যাদি।

মূল্য অবধারিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কলন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু এক্ষণে নূতন প্রথাই প্রবল। অপিচ, নিয়ামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি এস্থলে ব্যক্ত করিলে "মুক্তা কত বড় হইবার সম্ভব?" এই এক কুতূহল চরিতার্থরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। অতএব, কুতূহল চরিতার্থতার জন্য অন্য ফল না থাকিলেও এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করা গেল।

গুঞ্জা ...	১ কুচ।	ভিক্কা...	১১ ধরণ
মাষক ...	৫ ,,।	দার্ব্বিক ...	১৬ ,,।
শাণ......	২০ ,,।	সুপূর্ণ...	২০ ,,।
কৃষ্ণল		শিক্য......	৩০ ,,।
রূপক		সোম...	৪০ ,,।*
ধরণ			

বৃহৎসংহিতা অপেক্ষা "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে মূল্যসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ৬ রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর স্বকৃত কল্পদ্রুমে কেবল যুক্তিকল্পতরুর বচনমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতার একটি বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্যসম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত ও বিস্পষ্ট নিয়ম না থাকিলেও "মাষক" পরিমাণ হইতে মূল্যের অতি সুনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। "মাষক" হইতে "শাণ" পর্য্যন্ত নামগ্রাহী মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন এক সাধারণ নিয়ম নাই। "শাণ" হইতেই তাদৃশ সাধারণ নিয়ম আবদ্ধীকৃত হইয়াছে। যথা—

শাণাৎপরং মাষক একমেকং
যাবদ্বিবর্দ্ধেত গুণৈরপীদম্॥
মূল্যান্ তাবৎ দ্বিগুণেন যোগ্য
মপ্যোত্তা নাবৃষ্টিহতেহপি দেশে॥

"শাণ" পরিমাণের পর, ওজনে যত মাষা অধিক হইবে, অনাবৃষ্টিহত দেশেও তাহার প্রত্যেক অধিক মাষার মূল্যের দ্বৈগুণ্য স্থির থাকিবেক। ভোজদেবকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে,

"সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মোত্তম মধ্যমানাং
যন্মৌক্তিকানামিহ মূল্য মুক্তম্।
তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতু কার্য্যম্
গুণৈর্বিহীনস্য হি তৎপ্রদিষ্টম্।"

যতক্ত রত্নশাস্ত্রে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, উত্তম ও মধ্যমাদি মুক্তার যেরূপ মূল্যাবধারণ করা হইয়াছে, তাহা, যে সে মুক্তার জন্য নহে। মুক্তার যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি সেই সকল গুণ থাকে, তবেই সে মুক্তা নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যোগ্য।

"যত্ চন্দ্রাংশুসংকাশ মীষদ্বিম্বফলাকৃতি,
স্বমূল্যাৎ সপ্তমং ভাগ মবৃত্তস্যাপ্নুয়াত্

তৎ

---

* বৃহৎসংহিতা ও যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে পরিমাণবোধক "নিকরশীর্ষ" "রূপ্য" "চূর্ণ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শব্দ আছে, তদ্দ্বারা অনুমান হয়, যে, প্রাচীনকালে কেহ না কেহ উল্লিখিত পরিমাণের বৃহৎমুক্তা দেখিয়াছিলেন।

যে মুক্তার দীপ্তি চন্দ্রাংশুসদৃশ অর্থাৎ মধুবশুভ্র, কিন্তু আকৃতি ঈষৎ বিম্বফলের ন্যায় অর্থাৎ সুগোল নহে, সে মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তমভাগেব এক ভাগ হইবেক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেকবিধ হইয়া থাকে। মুক্তার গঠন যতই বিলক্ষণ হউক, সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক। গোলতার তারতম্যানুসারে বিষমগঠনের মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ,

"পীতকস্য ভবেদর্দ্ধ মবৃত্তস্য ত্রিভাগতঃ।
বিষমব্যস্ত জাতীনাং ষড়্ভাগং মূল্য মাদিশেৎ।"

গুণযুক্ত ও অবৃত্ত মুক্তা অপেক্ষা পীতক জাতীয় মুক্তার অর্দ্ধ মূল্য হইয়া থাকে। আর বিষম ও ব্যস্তজাতীয় মুক্তাসকলের মূল্য প্রকৃতাবস্থ মুক্তা অপেক্ষা ছয়ভাগের একভাগ হয়।

অর্দ্ধরূপাণি সস্ফোটাৎ পঙ্কচূর্ণাণি যানিচ।
অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকারবন্তিচ॥
একদেশ প্রভাবন্তি সকলাশ্লেষিতানি চ॥
যানি চাতকবর্ণানি কাংসাবর্ণানি যানি চ।
মীননেত্রসবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংবৃতানি চ॥
সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পদাংশিকম্॥

যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, কি অর্দ্ধরূপ, এবং যে মুক্তা পঙ্কচূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণবিন্দুবিলিপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সাররহিত, যাহা করকার ন্যায় আকারযুক্ত, যাহার একদেশমাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে সুসূক্ষ্ম শুক্তিখণ্ড আশ্লিষ্ট থাকে, যাহার বর্ণ চাতকবর্ণের সদৃশ, অথবা কাংসাবর্ণের সদৃশ কিম্বা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত অথবা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তাব মূল্য প্রকৃত অপেক্ষা একচতুর্থাংশ।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তার মূল্যসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা থাকিলেও এই স্থানেই শেষ করা গেল। যেহেতু একপ প্রস্তাবের কুতূহল চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবহারযোগ্য ফল নাই।

আর এক কথা—কল্পদ্রুমঅভিধানে যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়পুরাণের বচন ভিন্ন বৃহৎসংহিতা ও মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের একটি কথাও লিখিত হয় নাই। এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তাহারসম্বন্ধীয় দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা বিধেয় বোধ হইতেছে। হারের যে ভাগকে আমরা "নহর" বলি, তাহার সংস্কৃত নাম "লতা।" কোন কোন স্থানে "হার" বলিয়াও উল্লেখিত হয়। বৃহৎসংহিতা বলেন, ভূষণবেত্তা পণ্ডিতেরা পৃথক্ পৃথক্ নহরযুক্ত মুক্তাহারের পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া থাকেন যথা— "ইন্দ্রচ্ছন্দ" "বিজয়চ্ছন্দ" "দেবচ্ছন্দ" "অর্দ্ধহার" "হার" "রশ্মিকলাপ" "গুচ্ছ" "অর্দ্ধগুচ্ছ" "মাণবক"

"অর্দ্ধমানবক" "মন্দর" "হারফলক" "নক্ষত্রমালা" "মনিসোপান" "চাটুকার" "একাবলী" "যষ্টি।"

দীর্ঘে চতুর্হস্ত এবং লতায় (নহর) অষ্টাধিক সহস্র।* এরূপ মুক্তাহারের নাম "ইন্দ্রচ্ছন্দ" ইহা দেবতাদের ভূষণ। ইহার অর্দ্ধেক হইলে "বিজয়চ্ছন্দ" অষ্টাধিক শতসংখ্যক নহরের মুক্তাহার "দেবচ্ছন্দ" নামে কীর্ত্তিত হয়। একাশীতি লতাযুক্ত হইলে "হার" এবং চতুঃষষ্টি হইলে "অর্দ্ধহার।" ৫৪ কিম্বা ৬৯ নহর হইলে "রশ্মিকলাপ" ৩২ হইলে "গুচ্ছ" এবং ২০ হইলে "অর্দ্ধগুচ্ছ। ১৬ হইলে "মানবক" ১২ হইলে "অর্দ্ধমানবক" ৮ হইলে "মন্দর" ৫ নহর হইলে "হারফলক।" ২৭ হইলে "নক্ষত্রমালা" অথবা "মুক্তাহস্ত" কিম্বা মধ্যমনি এবং স্বর্ণগুলিকা থাকিলে তাহাকে "মনিসোপান" বলা যায়। একপ হার যদি তরলক অর্থাৎ মধ্যমণিযুক্ত হয় তবে তাহাকে "চাটুকার" সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইচ্ছানুরূপসংখ্যক মুক্তাহারদ্বারা যে মণিহীন ও হস্তপরিমিত মালা প্রস্তুত হয় তাহার নাম "একাবলী" আর সেই একাবলী মালার মধ্যস্থলে যদি মনি থাকে, তবে তাহার নাম "যষ্টি।" এই সংজ্ঞাসমূহের নির্ণায়ক বৃহৎসংহিতার বচনসমূহ এই—

সুরভূষণং লতানাং
সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দো নাম্না
বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥
শতমষ্টযুতং হারো
দেবচ্ছন্দো হ্যশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো
রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ॥
দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো
বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্মাণবকো
দ্বাদশভিশ্চার্ধমাণবকঃ॥
মন্দর সঙ্গোঽষ্টাভিঃ
পঞ্চলতা হার ফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতি মুক্তা
হস্তো নক্ষত্রমালেতি॥
অন্তর মণিসংযুক্তা
মণিসোপানং স্বর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তদ্
বিজ্ঞেয়ং চাটুকার মিতি॥
একাবলী নাম যথেষ্ট সংখ্যা
হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে
যষ্টীতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা॥

এইস্থানেই রত্নরহস্যের "মুক্তা" প্রস্তাব সমাপ্ত হইল। শাস্ত্রান্তরে এত-

* কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক "নহর" নহে, অষ্টোত্তর সহস্র "মুক্তা।"

দপেক্ষা অধিক কথা থাকিলেও বাহুল্য-ভয়ে গ্রহণ করা হইল না। মুক্তাবলী নামক গ্রন্থে মুক্তার অনেকগুলি নাম একত্র পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছে। যথা——

"অন্তঃসারং শৌক্তিকেয় সিন্দুরত্ন চ মৌক্তিকম্"

ইত্যাদি ক্রমে দৃষ্ট করিবেন॥

শ্রীরামদাস সেন।

মাধবীলতা।

২৮

মাধবীলতার মাতা, পদ্মের মুখে আপনার কলঙ্ক শুনিয়া প্রথমে অপঘাত মৃত্যুকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মরিলে পুঁটুর কি উপায় হইবে, এই কথা স্মরণ হইলে আর মরিতে পারিলেন না, রাত্রিশেষে নিদ্রিত পুঁটুকে বক্ষে করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন এই স্থির করিলেন।

সেই রাত্রে পুঁটুর মা বহুক্ষণ অবধি নিদ্রিত পতির পদসেবা করিলেন, তাহার পর স্বর্ণালঙ্কারগুলি একে একে অঙ্গচ্যুত করিয়া আপনার "টেপারির" মধ্যে রাখিয়া তাহার চাবি রামসেবকের যজ্ঞোপবীতে বাঁধিয়া দিলেন। আপনার সঙ্গে কি লইবেন, একবার এই কথা তাঁহার মনে আসিল, তাহার পর কেবল "পুঁটুর "চুলের দড়িগুলি" যত্নে অঞ্চলাগ্রে বাঁধিলেন। স্বামীর খড়ম দুইখানি পালঙ্কের নিকটে ছিল তাহার ধুলা ঝাড়িয়া হস্তমার্জ্জনা করিয়া যথাস্থানে রাখিলেন, তাহার পর দীপনির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না। ঝটিকাপ্রপীড়িত তৃণের ন্যায় পুঁটুর মার অন্তর থরথর কাঁপিতেছিল, যে ঝটিকার বেগে মহাতরু উন্মূলিত ও নিপতিত হয়, সামান্য তৃণের উপর সেই বেগ প্রধাবিত হইলে তৃণ উন্মূলিত হয় না, মরেও না, কেবল অনবরত ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে; কষ্টের সীমা থাকে না। পুঁটুর মার দশা সেইরূপ হইয়াছিল।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। যাত্রার সময় উপস্থিত দেখিয়া পুঁটুর মা শয্যা হইতে উঠিলেন। স্বামীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিত রামসেবকের পাদমূলে

মস্তক রাখিলেন, অমনি চক্ষে জল আসিল, পুঁটুর মা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার পর স্বামীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। জন্মের মত যাইবার সময় একবার স্বামীকে না দেখিয়াই বা কিরূপে যান; পুঁটুর মা সুতরাং প্রদীপ জ্বালিলেন, আলোকে নিদ্রিত স্বামীর স্নেহময় মুখ আরও স্নেহপূর্ণ দেখিয়া পুঁটুর মার চক্ষে আবার জল আসিল। রামসেবককে পুঁটুর মা নিত্য নিদ্রিত দেখেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি ত আর কখন এরূপ দেখেন নাই। চক্ষু মুছিয়া পুঁটুর মা রামসেবকের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; বাল্যকাল হইতে রামসেবক পুঁটুর মাকে যত আদর করিয়াছিলেন, যত যত্ন করিয়াছিলেন, সে আদর, সে যত্ন, সে স্নেহ, সমুদয় যেন তাঁহার মুখে অদ্য একত্রিত হইয়াছে; সজলনয়নে কেবল সেই প্রেমময় মুখ দেখিতেছিলেন। আবার দেখিলেন নিদ্রিত স্বামী যেন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। পুঁটুর মার আর যাওয়া হইল না, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিলেন। প্রদীপনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমায়া কতকটা অন্ধকারাবৃত হইল, তখন ক্রমে পদ্মকে আবার স্মরণ হইল, স্মরণমাত্রেই কলঙ্করটনা বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় পুঁটুর মার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, আর শয়ন করা হইল না। প্রাতে স্বামী সেই কলঙ্ক অবশ্য শুনিবেন, এই মনে হইবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না। পুঁটুর মা পুঁটুকে বক্ষে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। ঠাকুরঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহদেবতা শালগ্রামকে প্রণাম করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ঠাকুর! বৃদ্ধা শাশুড়ি রহিলেন, যেন তাঁর কোন পীড়া না হয়। আর যিনি তোমার নিত্য পূজা করেন, তাঁহার যেন কোন বিপদ্ না হয়।" পুঁটুর মা আবার প্রণাম করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধা শাশুড়ির দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, উদ্দেশে তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আশীর্ব্বাদ কর, পথে যেন আমার পুঁটুর কোন বিপদ্ হয় না।" এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দুই এক পদ যাইতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে স্বামীর দ্বারের দিকে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিবামাত্র স্বামীর নিঃসহায় মূর্ত্তি মনে পড়িল, আর একবার তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ফিরিলেন কিন্তু দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তক নত করিয়া নিদ্রিত স্বামীর উদ্দেশে আবার প্রণাম করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে মুছিতে পুঁটুর মা খড়কীদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন।' পথে আসিয়া পুঁটুকে অঞ্চলদ্বারা আবৃত করিলেন, জলাহরণ উপলক্ষে নিত্য দীর্ঘিকায় যাতায়াত তাঁহার অভ্যাস ছিল, অতএব অভ্যাসবশতঃ

সেই দিকেই চলিলেন। নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে, স্নিগ্ধবায়ু ধীরে ধীরে আসিতেছে, অথচ অঙ্গস্পর্শ করিতেছে না, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বৃক্ষ সমুদয় নিস্পন্দ রহিয়াছে, গৃহমাত্রেরই দ্বার রুদ্ধ, পথে কেহ নাই, পুঁটুর মা এ সকল কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি অভ্যাসবশতঃ একেবারে পুষ্করিণীর কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অল্প রাত্রি আছে। তথায় দাঁড়াইয়া পুঁটুর মা ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর অজ্ঞাতে রাত্রিকালে বাটীর বাহির হইয়াছেন, রামসেবক হয় ত এতক্ষণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন, এতক্ষণ হয় ত অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার এতক্ষণ দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে যে, তাঁহার স্ত্রী পতিব্রতা নহে। এই কথা মনে হইবামাত্র পুঁটুর মা শিহরিয়া উঠিলেন, লজ্জায় মৃতবৎ হইলেন, অবনতমুখে সরোবরকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণের পর মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ম্লানশশী যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি আপনার গৃহ মনে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, জন্মের মত তিনি গৃহসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সময় নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। পুঁটুর মা দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে, এখনই লোকে যাতায়াত আরম্ভ করিবে, অতএব তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া প্রান্তরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিয়দ্দূর গেলে পর সূর্য্যোদয় হইল। পুঁটুর মা আবার কতকদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, শান্তিশতগ্রাম আর দেখা যায় না; কেবল রামসীতার মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। তাহার রৌপ্যচূড়া সূর্য্যকিরণে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে, পুঁটুর মা সেইখানে দাঁড়াইয়া রামসীতাকে প্রণাম করিলেন; মাথায় হাত দিয়া পুঁটুকেও প্রণাম করাইলেন। পুঁটু ক্রোড় হইতে কখন ক্ষুদ্র পদ দোলাইতেছে, কখন হাত তুলিয়া পক্ষীদের ডাকিতেছে, কখন মাতার মুখে হাত দিয়া মাতাকে টানিতেছে। কিন্তু পুঁটুর মা পুঁটুর সঙ্গে আর পূর্ব্বমত কথা কহিতেছেন না, অন্যমনস্কে পথ অতিবাহিত করিতেছেন। কোথা যাইবেন স্থির নাই। প্রথমে পিত্রালয়ে যাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কলঙ্ক মনে পড়ায়, আর সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং যত্র তত্র চলিতে লাগিলেন। কাহাকেও পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন না; কোথায় যাইবে যাহার স্থির নাই, পথের কথা সে কি জিজ্ঞাসা করিবে? পুঁটুর মা নিজে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। প্রথমে একজন ছিন্নবস্ত্রা বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল, "বাছা, কোথা যাবে?" পুঁটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ

করিয়া বলিলেন, "আমি বাপের বাড়ী যাব।" এই উত্তরে বৃদ্ধা পরিতৃপ্ত হইয়া গোময়সঙ্কলন করিতে করিতে বলিল, "তা, যাও বাছা; যাবে বই কি; বাপের বাড়ী যাবে না!" বৃদ্ধা একবার করিয়া কথা কহে, আর একবার করিয়া গোময়সন্ধানে চারিদিক্ দেখে। বৃদ্ধার শ্রোতা আবশ্যক করে না, পুঁটুর মা চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তখনও বলিতে লাগিল, "চিরকাল কি শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিতে হয়?"—"যাও বাছা! জন্ম জন্ম বাপের বাড়ী যাও, বাপের কাছে কে? শ্বশুর বল, শাশুড়ী বল, বাপের কাছে কে?"—"এই যে আমি একা পড়ে থাকি; বাতের কামড়ে চীৎকার করি, পাড়ার পোড়াকপালীরা কে একবার এসে জিজ্ঞাসা করে! মোলো!—সকলেই আপনার ঘরে ঘরে শুয়ে থাকে, পেট পেতে শুয়ে থাকে।"—"ওলো! চিরকাল কিছু সমান যায় না! আমারও এককালে সকল ছিল। আমার মানুষ ছিল, গোরু ছিল, ঢেঁকি ছিল।"—"আর এখন ঢেঁকি ঠেঙ্গাইতে পারি না, বুড়া হয়েছি,"—"এমন কপালও করে এসেছিলাম, ভালখাগীরা কি এত ভাল কাজ করেছিল যে, সকল সুখ তাদের জন্যে।"—"চোখখাগীরা কলসী কাঁকে পথে চলেন, যেন চোখে কাণে দেখতে পান না।" বৃদ্ধা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আপনা আপনি এইরূপ কথা কহিতেছে। অন্য সময় হইলে পুঁটুর মা দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতেন।

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুঁটুর মা যখন রামপুর নামে একখানি অপরিচিত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয়প্রহর; গ্রামপ্রান্তে একটি দীর্ঘিকায় স্নানার্থ গ্রাম্যলোকেরা যাতায়াত করিতেছিল। পুঁটুর মাও স্নান করিবেন মনে করিলেন, কতকদূর গিয়া দেখেন, পথপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দুইজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। দুইজনেই যুবতী, পুঁটুর মার ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন, ইহারা আমাকে দেখিয়া হয় ত উপহাস করিবে, হয় ত কি কটু বলিবে। নিকটে অন্য পথ থাকিলে, পুঁটুর মা সেই পথে যাইতেন, এক্ষণে অনন্যগতি হইয়া যুবতীদের দিকে সঙ্কোচিত পদে চলিতে লাগিলেন, এক একবার সভয়ে তাহাদের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। এই সময় একজন ঈষৎ স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা পশ্চাৎ হইতে যুবতীদের বলিল, "এখনও দাঁড়ায়ে কেন? বেলা যে গড়িয়ে গেল।" যুবতীরা সভয়ে ভূমি হইতে আপন আপন কলসী তুলিয়া কক্ষে সংস্থাপন করিতে করিতে পশ্চাৎ ফিরিল। পুঁটুর মাকে দেখিয়া বৃদ্ধা একটু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাছা?" পুঁটুর মা মাথা অবনত করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

আবার বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটি কি তোমার?" পুঁটুর মা মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় একজন যুবতী অগ্রসর হইয়া পুঁটুর গাল ধরিয়া আদর করিল।

বৃদ্ধা। বাছা, তুমি কি লোকের মেয়ে?

পুঁটুর মা। ব্রাহ্মণের।

বৃদ্ধা। কোথায় যাবে?

পুঁটুর মা কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে লোক কই?

পুঁটুর মা কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথা? তোমার বাপের বাড়ী কোথা?

পুঁটুর মা তথাপি কথা কহিল না।

বৃদ্ধা। তবে বুঝিছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধা আপন কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে পশ্চাৎ ফিরিলেন, তাঁহার কন্যা এক একবার পুঁটুর মার প্রতি ফিরিয়া চাহিতেছিল, দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "চলিয়া চল! গৃহস্থের বউ ঝির ওসকল লোককে ফিরে দেখা কেন।"

কন্যা উত্তর করিল, মেয়েটি বড় সুন্দর, বৃদ্ধা তাহাতে বিরক্তিসহকারে বলিল, "অমন সুন্দরের গলায় দড়ি! যে লোক গৃহস্থের মেয়ে নয়, সে আবার সুন্দর কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র পুঁটুর মার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, নিকটস্থ এক নির্জ্জন আম্রকাননে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষতলে বসিলেন। মাধবী ধূলায় ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি বৃক্ষে মাথা হেলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণের পর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অস্পষ্টস্বরে আপনা আপনি বলিলেন, "বুঝেছি, সকলই আমার দোষ। পোড়া লজ্জার ভয়ে আমিই আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।"

বাস্তবিক কথা সত্য, কেবল লজ্জার ভয়ে মাধবীলতার মা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কলঙ্কের কথা স্বামী প্রাতে শুনিবেন এই লজ্জায় তিনি পলাইয়াছিলেন। এখন কলঙ্কের কথা শুনা দূরে থাকুক, সন্দেহেরও স্থল রহিল না। এতক্ষণ রামসেবক জানিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা। তাহাই মাধবীলতার মা বলিতেছিলেন, "সকলই আমার দোষ।" আর উপায় নাই, আর গৃহে যাইবার পথ নাই। পথে পথে বাস, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন, এই এখন মাধবীলতার মার অদৃষ্টের লিখন। তিনি দার্শনিক নহেন যে, অদৃষ্ট লইয়া তর্ক করিবেন। কার্য্যকুশলী নহেন যে, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন করিবেন। মহাতেজাও নহেন যে, অদৃষ্টের আয়ত্তাতীত থাকিবেন— অদৃষ্ট যতই পীড়ন করুক, তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে কষ্ট অনুভব না করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিবেন। মাধবীলতার মাতা সামান্যা; অদৃ-

ষ্টের ভয়ে অতি ভীতা,কষ্টের স্পর্শমাত্রেই পরাজিতা,চক্ষের জল তাঁহার একমাত্র সহায়। পিতৃমাতৃ সম্মুখে চক্ষের জল সহায় হইলে হইতে পারে,কিন্তু অদৃষ্টের সম্মুখে তাহা কিছুই নহে, অশ্রুবর্ষণে কোন ফলই হয় না; তথাপি অদৃষ্টের পীড়নে সামান্য লোকেরা কাঁদে, মাধবীলতার মাও সামান্য লোকের মত কাঁদিলেন। সাধারণতঃ লোকে চক্ষের জল মুছিয়া, অদৃষ্টের প্রদর্শিতপথে চলিতে থাকে, মাধবীলতার মাও চক্ষের জল মুছিয়া অদৃষ্টপ্রদর্শিতপথে চলিবেন অর্থাৎ ভিক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। "আমার অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে?" এই বলিয়া পুঁটুর মা দাঁড়াইলেন, পুঁটুর ধূলিধূসরিত অঙ্গ যত্নে ঝাড়িয়া ক্রোড়ে লইয়া গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

লজ্জাভয়ে অনর্থক আর ইতস্ততঃ না করিয়া, একটি গৃহস্থের খড়কীদ্বারে গিয়া "জয় রাধে" বলিয়া দাঁড়াইলেন। "জয় রাধে" বলিবার সময় একবার তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিলেন, ঘর প্রাচীর দেখিয়া পুঁটু আহ্লাদে মাতৃক্রোড়ে দুলিয়া হাসিতে লাগিল, মাতা তাহার আহ্লাদ বুঝিতে পারিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই সময় একজন গৃহস্থকন্যা ভিক্ষা আনিল, পুঁটুর মা অঞ্চলাগ্রে তাহা লইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। গৃহস্থকন্যা বলিল, "ভিখারিণী একবার ফের ত।" পুঁটুর মা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিলেন। গৃহস্থকন্যা বলিল, "তুমি নূতন ভিখারিণী! বুঝিয়াছি, তোমার কপাল পুড়েছে! কুলকলঙ্কিনী!"

ভিখারিণী ফণিনীর ন্যায় মাথা ফিরাইয়া একবার গৃহস্থকন্যার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, আর কোন উত্তর না করিয়া সদর্পে অঞ্চল হইতে ভিক্ষোপার্জ্জিত চাউল ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। পুঁটুর মা স্বভাবতঃ ভীরু ও লজ্জাশীলা, কেন তাঁহাতে বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইল, তাহা বুঝা যায় না। গৃহস্থকন্যার রূঢ়বাক্যে পুঁটুর মার চক্ষে কণামাত্র জল আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইল।

২৯

যে রাত্রে পুঁটুর মা গৃহত্যাগ করিয়া যান, সেই রাত্রের প্রথমভাগে সোহাগী চাকরাণী শয়ন করিয়া পান চর্ব্বণ করিতে করিতে অপর আর এক চাকরাণীকে বলিতেছিল, "ওলো! মেনকার মা, আমার আর এখানে চাকরী করা হলো না।"

মেনকার মা। কেন লা?

সোহা। এখানে কোন সুখ নাই, যাঁর কাছে থাকি, তাঁর না আছে সক, না আছে পছন্দ, না আছে কিছু। আজ এত করে চুয়া চন্দন মিলাইয়া একটু বুকে দিতে গিয়াছিলাম, তাঁর মনে ধরিল না, তিনি বলেন ওতে বড় দুর্গন্ধ। এমন পছন্দ যার তার

পায়ে নমস্কার, আমি কাল সকালেই চলে যাব।

মেন। সকালে কেন, এখনই যা না।

সোহা। রাত্রি অন্ধকার, এখন আমার সঙ্গে কে যাবে ?

মেন। যম যাবে।

সোহা। যমের ভাব বুড়ার সঙ্গে ? তোর মত বুড়া মাগী পেলে যম বড় খুসী হয়, আমাদের কাছে যম কই আসে।

প্রাতে মেনকার মা উঠিয়া দেখিল যে, সোহাগী সত্যই চলিয়া গিয়াছে। ক্ষণবিলম্বে জানিল যে পুঁটুর মাও বাটী নাই, অতএব রামসেবকের বৃদ্ধা মাতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই পোড়ার মুখী সোহাগীর সঙ্গে ঠাকুরাণী কোথায় গিয়েছেন ?"

বৃদ্ধা। কি জানি বাছা ! সোহাগী সঙ্গে গেছে ? তবে আর ভাবনা কি ? এখনই আসিবে।

মেনকার মা। পোড়ার মুখ সোহাগীর !

পুঁটুর মা কুলত্যাগী হয়েছে, এ কথা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে পুরুষমহলে মহাকোলাহল বাধিয়া গেল। পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিল, "আমিই সর্ব্বাগ্রে বলেছিলাম যে,রামসেবকের স্ত্রী কুলটা।"

প্রথমকোলাহল মন্দীভূত হইয়া আসিলে সকলে রাজার উদ্দেশে তিরস্কার আরম্ভ করিল। সকলেরই স্থির প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, সোহাগীকে রাজা কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। অতএব রাজার প্রতি লোকের ক্রোধ বিষম হইয়া উঠিল। কোথায় তিনি রামসেবকের স্ত্রীকে লুকাইয়াছেন প্রথমতঃ কেবল এই সন্ধান করা সকলের পরামর্শসিদ্ধ হইল।

পুঁটুর মার অনুসন্ধান করিতে যুবারাই আপনা আপনি ব্রতী হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে একদল—অধিকাংশই টোলের ছাত্র—স্মৃতিশাস্ত্রের তক্তা হস্তে বাহির হইলেন, যেখানেই রুদ্ধদ্বার দেখেন, সেইখানেই তাঁহারা দ্বারভেদ করেন। তাহার পর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে,রাজভগিনীর অনুসন্ধানচ্ছলে রাজা নগরত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "আর নগরে অনুসন্ধান করা বৃথা, রাজা যেখানে, রামসেবকের স্ত্রীও সেইখানে।"

শেষ একদিন সকলেই একত্র হইয়া রামসেবককে অনুরোধ করিলেন যে "তুমি একবার নিজে রাজার নিকট যাও,মাধবীলতার সম্বাদ লইয়া আইস।" রামসেবক সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থিমুক্ত করিতেছিলেন, নতশিরে তাহাই করিতে লাগিলেন। যে অবধি রাজানুগ্রহে রামসেবক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করিত

না, কেহ তাঁহার বাটীতে আসিত না, এক্ষণে তিনি সমাজে ঘৃণিত ও পতিত হইয়াছেন,শুভানুধ্যায়ী পল্লীবাসীদের সুত রাং যাতায়াত আরম্ভ হইল। রামসেবক তাঁহাদের কথার প্রায় উত্তর দিতেন না অথচ অসম্মানও করিতেন না। তাঁহার পত্নীর কথা কেহ উপস্থিত করিলে তিনি উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে তামাক সাজিতে বসিতেন।

রামসেবকের স্ত্রী গৃহত্যাগী হইবায় অধিকাংশ প্রতিবাসিনীরা হাস্য পরিহাস-দ্বারা পরস্পরকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। কেবল পদ্ম-এ সম্বন্ধে বড় অধিক কথা কহে নাই। পদ্ম হিংসাপরবশ হইয়া পূর্ব্বরাত্রে পুঁটুর মাকে তিরস্কার করিয়াছিল, তখন তিরস্কারের ফল অনুভব করে নাই, পরে পদ্ম যখন শুনিল যে, মাধবীলতার মাতাকে গোপনে রাজা লইয়া গিয়াছেন, তখন পদ্ম নিশ্চয় বুঝিল যে, তাঁহার তিরস্কারই ইহার মূল। তিনি তিরস্কার না করিলে, মাধবীলতার মা সোহাগীদ্বারা রাজাকে কোন কথা জানাইত না, রাজাও তাঁহাকে লইয়া যাইতেন না; সোহাগী সঙ্গে আছে,এক্ষণে হয়ত তাহার পরামর্শে মাধবীলতার মা রাজার নিকট তিরস্কারের কথা বলিয়া দিবে, পদ্ম এই ভাবনায় মৌনাবলম্বী হইয়াছিলেন।

যখন পদ্মের মনে এই সকল আলোচনা হইতেছিল তখন সোহাগী এক উচ্চ রাজপথ দিয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাইতেছিল, সঙ্গে দুই চারিজন বৈষ্ণব আর অনেকগুলি বৈষ্ণবী ছিল,গলায় নূতন কণ্ঠী,হস্তে নূতন খঞ্জনী,পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র,মুখে মধুর গৌর নাম। পুঁটুর মার গৃহত্যাগবার্ত্তা সোহাগী কিছুই জানিত না। কোন সঙ্গীর অনুরোধে সোহাগী হঠাৎ কণ্ঠীধারণ করিয়াছিল। সোহাগী কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাপ্রিয়, একটু গাইতেও ভালবাসে, যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিলে আর কিছুই চাহে না, পাঁচজন রসিকা বৈষ্ণবীর সহিত নবদ্বীপে যাইতে তাহার বিশেষ সাধ হইয়াছিল, অতএব আর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কেবল পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে একবার রাজবাটীর দুই একজন দাসীকে বলিয়াছিল, "আমরা কাল এক জায়গায় যাব।" দাসীরা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবি, সোহাগী হাসিয়া উত্তর করিল, "বলিব না।"

দাসীদের মুখে রাণী যখন শুনিলেন যে সোহাগীর সঙ্গে পুঁটুর মা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বুঝিলেন যে, পুঁটুর মা কুলত্যাগী হইয়াছে, নতুবা সোহাগী সঙ্গে কেন? দুই একদিন পরে দাসীদের কথার ভঙ্গীতে যখন তিনি বুঝিলেন যে লোকে এই সম্বন্ধে রাজার কলঙ্ক রটাইয়াছে, তখন রাণী কিছু চমৎকৃতা হইলেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি মনে মনে এই রটনার হেতু বিবেচনা করিতে লাগিলেন। হেতু নিতান্ত অমূ-

লক বোধ হইল না, পূর্ব্বকথা আলোচনা করিতে করিতে মনে হইল, রাজা মাধবীলতাকে এত ভালবাসেন কেন? তাহার নিমিত্ত এত অর্থব্যয় করেন কেন? তাহার মাতাকেই বা এত অলঙ্কার দিবার তাৎপর্য্য কি? মাধবীলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল রাজার মত কেন? দেখিলে মাধবীলতাকে রাজার কন্যা বলিয়া বোধ হয়, এইজন্য হয় ত এখন যমজসন্তানের জন্মকল্পনা করা হইয়াছে। রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

জ্যোৎস্নাবতীর উপলক্ষে রাজার প্রতি রাণীর মন পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ ভার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আরও বিশেষ হইল, তিনি মনে করিয়াছিলেন, জোৎস্নাবতীর অনুসন্ধানে রাজা আপনি যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, লোক পাঠাইলেই ত হইত; তবে রাজা নিজে যে গেলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত। তাহার পর এক্ষণে রাণী বুঝিলেন যে, জোৎস্নাবতীর অনুসন্ধান কেবল ছলমাত্র, মাধবীলতার মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য। রাণী সর্পীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি।"

রাণী নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে একবার সদর্পে উঠিয়া কক্ষান্তরে গিয়া প্রিয়তমা দুই একজন পরিচারিকাকে ডাকিলেন। অতি তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে মাধবীলতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে সেই আমার স্ত্রীধনের অর্দ্ধাংশী হইবে। দাসীরা প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু রাণীর চাঞ্চল্য কেবল নিজ সন্তান মাধবীলতার নিমিত্ত, এই বুঝিয়া তাহারা নিরুদ্বেগে বলিল, যে মাধবীলতার অনুসন্ধান বিধিমতই হইতেছে, দুই একদিনের মধ্যে সে সম্বাদ পাওয়া যাইবে। রাণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "সে সকল অনুসন্ধান আমি চাই না, আমার ইচ্ছা যে আমার নিজের লোকে এই অনুসন্ধান করে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাণীর দৃষ্টি আবার পূর্ব্ববৎ প্রখর হইয়া উঠিল। দাসীরা সভয়ে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল।

পরদিবস রাজা ইন্দ্রভূপ প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রাজভগিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই শিবিকারোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। শিবিকায় বসিয়া অনুসন্ধান বড় হয় না, তথাপি তিনি চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গেলেন, কিন্তু রাজভগিনী পথে কোথাও বসিয়াছিলেন না, সুতরাং রাজা ইন্দ্রভূপ তাঁহার দেখাও পাইলেন না। তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শাস্ত্রালাপ করিত, সুতরাং রাজভগিনীর অনুসন্ধান করিবার আর তাঁহার সাবকাশ থাকিত না। শেষ তিনি হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজা, রাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াই অন্তঃপুরে গেলেন। রাণী তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মন্দগমনে নিকটে উপস্থিত হইলেন। একজন দাসীকে তাম্বুল আনিতে বলিয়া, রাজার শারীরিক কুশলবার্ত্তা কিঞ্চিৎ ঔদাস্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে জন্য মহারাজের যাওয়া হইয়াছিল, তাহার মঙ্গল ?"

রাজা। মঙ্গল আর কেমন করে বলিব, জ্যোৎস্নাবতীর জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও সাক্ষাৎ পাইলাম না। শেষ আর কি করি, আমি পথে পথে বেড়াইলে ত বিষয়কার্য্য চলে না, সুতরাং ফিরে আসিতে হইল ; তবে বড় দুঃখ রহিল যে রাজকন্যা এই কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

রাণী। কে রাজকন্যা ? মাধবীলতা ?

রাজা। না আমি জ্যোৎস্নাবতীর কথা বলিতেছি, তি—

রাণী। আপনার মাধবীলতাব মা যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রাজা। তাহা জানি ; আমি তাহা এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বেই শুনিয়া গিয়াছিলাম।

রাণী। সাক্ষাৎ হইয়াছিল ? সেই জন্য কি এত বিলম্ব ?

রাজা। সে নিমিত্ত আমি এক্ষণে ব্যস্ত নহি ; আমি এখন ব্যস্ত জ্যোৎস্নাবতীর নিমিত্ত ; তাহার অনুসন্ধান কিরূপে পাইব !

রাণী। মাধবীলতার জন্য আপনি যে ব্যস্ত হইবেন না, তাহা কতক বুঝিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাণী হঠাৎ কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, তুমি ব্যজন কর, আমার আসিতে বিলম্ব হবে।

উভয়ে উভয়ের শেষ কথার অর্থ বিপরীত ভাবিলেন। রাজা বুঝিলেন যে, মাধবীলতার জন্য আমি বড় ব্যস্ত নহি, এ কথা বলায় রাণীর অভিমান হইয়াছে। হওয়াই সম্ভব, কেন না রাণী তাহার গর্ভধারিণী, স্নেহ কোথা যাবে ? এদিকে রাণীর নিশ্চয় ধারণা হইল যে, মাধবীলতার মাতা কোন নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, নতুবা রাজা কেন বলিয়া ফেলিবেন যে, মাধবীলতার নিমিত্ত বড় ব্যস্ত নহেন।

সে দিবস রাজার সহিত রাণীর আর সাক্ষাৎ হইল না। পরদিবস সাক্ষাৎ হইলে রাজাও বিশেষ যত্ন করিয়া অধিক কথা কহিলেন না, তাঁহারও কিঞ্চিৎ মন ভার হইয়াছিল। তিনিও স্থির করিয়াছিলেন যে, নিরপরাধা জ্যোৎস্নাবতীর গৃহত্যাগ কেবল রাণীহইতে ; রাণীর নিমিত্ত তিনি আপনার ভগিনীকে বাটী হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এ অকার্য্য তাঁহাকে

কেবল রাণীর ভয়েই করিতে হইয়াছিল। রাণীই এ অনর্থের মূল।

ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরস্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা দুই একবার যত্নসহকারে রাণীর সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রাণী সে যত্ন গ্রহণ করেন না দেখিয়া রাজা প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, শেষ অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। যেখানে স্ত্রীপুরুষে অসদ্ভাব, সেখানে মঙ্গল নাই এ কথা রাণীকে একদিন বুঝাইবেন রাজা মনে মনে স্থির করিলেন।

রাণীও মনে মনে স্থির করিলেন যে, মাধবীলতাকে কদাচ রাজবাটীতে স্থান দিবেন না, তজ্জন্য রাজসংসার যদি ছারেখারে দিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য মনে করিবেন। জারজকন্যাকে রাজকন্যা পরিচয় দিয়া কখন রাজা রাজকুমারের সমযোগ্য করিতে পারিবেন না।

৩০

দেওয়ান্‌মহাশয় মাধবীলতাকে অনুসন্ধান করিবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিগ্রামে পাইক, গোমস্তা, বিশেষতঃ দরিদ্র, ভিক্ষুক, ঠাকুরবাড়ীর পুজারি, অতিথিশালার ভাণ্ডারী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিতেন। এইরূপে গ্রামে গ্রামে, জিজ্ঞাসা করায়, একস্থানে একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী বলিল "আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন বোধ হয় আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ক্রোড়ে একটি একবৎসরের কন্যা আছে।"

দেওয়ান। কোথায় দেখিয়াছিলে?

বৃদ্ধা। এই গ্রামের প্রান্তভাগে বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চক্ষের জলে অঞ্চল ভিজাইলেন তবু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। আমি তাঁহার কন্যার নিমিত্ত একটু দুধ আনিতে গেলাম, কিন্তু আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে আজ চারি পাঁচ দিনের কথা।

দেওয়ান্‌মহাশয় সেই বৃক্ষতলে গিয়া অনুভব করিলেন যে, মাধবীলতার মা পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, অতএব পাল্কী আরোহণ করিয়া সেই দিকে গেলেন। অপরাহ্নে প্রান্তর হইতে দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নগর, বহুতর দেবমন্দিরে সুশোভিত, তাহার ত্রিতল অট্টালিকাসমূহ শ্বেতকপোতসমাকীর্ণ, লোককোলাহল অতিদূরব্যাপী। দেওয়ান্ ভাবিলেন, এ নগরে মাধবীলতার উদ্দেশ পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

এই সময় একটি পুষ্করিণীর কূলে দাঁড়াইয়া পুঁটুর মা দেওয়ানের পাল্কীখানি দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন যে, এই পাল্কী যদি আমাদের রাজার হয়,তবে তাঁর পায়ে পুঁটুকে ফেলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রাণত্যাগ করি। রাজা অবশ্য

পুঁটুকে প্রতিপালন করিবেন, তিনি পুঁটুকে ভালবাসেন। পুঁটু আমার কত শান্ত মেয়ে। এই যে রৌদ্রে রৌদ্রে আমি তাকে বুকে করে ফিরিতেছি, পুঁটু তবু ত কাঁদে না, যেন পুঁটুর তাতে আরও আহ্লাদ বেড়েছে, পুঁটু হাসিতেছে, কাক ডাকিতেছে, হাত ঘুরাইতেছে, আয় আয় করে চাঁদ ডাকিতেছে। *** না। পুঁটুকে রাজার কাছে রেখে মরিতে পারিব না, রাজার বাটীতে পুঁটুকে কে দেখিবে। রাজা কি সভা ফেলে পুঁটুর কাছে বসে থাকিবেন? না. দাসিমাগিরা পুঁটুকে ফিরে চেয়ে দেখিবে? পুঁটু কাঁদিলে কে তাকে বুকে করিবে? বাপরে! আমি পুঁটুকে ফেলে একদণ্ডের জন্য মরিতে পারিব না।" মাধবীলতার মা একা দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, পুঁটু তখন তাঁহার ক্রোড়ে ছিল না।

এই সময় তাঁহার অতি নিকট দিয়া দেওয়ান্‌মহাশয়ের পাল্কী চলিয়া গেল; কিন্তু দেওয়ান্ কিম্বা পরিচারকগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না; তিনিও জানিতেন না যে, তাঁহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ং রাজদেওয়ান্ যাইতেছেন। দেওয়ান্ নগরে প্রবেশ করিয়া কোন এক প্রধান ব্যক্তির বাটীতে অবস্থান করিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, সকলকেই তিনি মাধবীলতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ভিখারী, পূজারী, কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। মাধবীলতার মা এই নগরে এক গৃহস্থের বাটীতে কুটুম্বকন্যা বলিয়া রক্ষিতা হইয়াছিলেন। দেওয়ান্ কোন সম্বাদ না পাইয়া অগত্যা বিবেচনা করিলেন যে, যে গ্রামে বৃদ্ধার মুখে পুঁটুর মার প্রথম সম্বাদ পাইয়াছিলেন, সেই গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করাই উচিত; অতএব প্রাতে তথায় ফিরিয়া গেলেন।

পথিমধ্যে পিতম পাগলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, পিতম কোন সম্ভাষণ করিল না দেখিয়া, দেওয়ান্ তাঁহাকে ডাকিলেন। পিতম আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

দেওয়ান্ পিতমকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিলেন; পিতম তখনও কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া, আপনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাইতেছিলে?"

পিতম। এই দিকে।

দেওয়ান্। এই দিকে কোথা?

পিতম। তা এত জানি না। তুমি কোথা গিয়াছিলে?

দেওয়ান্। রাজকন্যা মাধবীলতার অনুসন্ধানে।

পিতম। সন্ধান হইল না বোধ হইতেছে।

দেওয়ান্। কোন অনুসন্ধানই পাইলাম না।

পিতম। ভালই হইয়াছে।

দেওয়ান্। কেন?

পিতম। সে অনেক কথা; তুমি যদি রাজার মঙ্গল ইচ্ছা কর, মাধবী-লতার নাম করিও না; মাধবীলতা রাক্ষসী, অথবা আর কিছু; যে তাহার সংশ্রবে আসিবে, সেই কষ্ট পাইবে: অতএব তুমি পলাও। মাধবীলতা নিজে দুরদৃষ্ট, মনুষ্যরূপে জন্মিয়াছে; অতএব তুমি পলাও। অদৃষ্ট মানিয়া থাক। অদৃষ্ট—যাহা দেখা যায় না, যাহা বুঝা যায় না? অদৃষ্ট অজ্ঞানের ওয়ারিস; অজ্ঞান জানেন না যে অদৃষ্ট তাঁহার গর্ভজ, তাহাই বড় গোলযোগ বাঁধিয়াছে।

দেওয়ান্। আমি জানিতাম না যে, তুমি অদৃষ্টবাদী।

পিতম। অদৃষ্টবাদী সকলেই; অদৃষ্টের শত নাম আছে, এক একজন এক এক নামে তাঁহার অর্চ্চনা করে। কালভেদে দেশভেদে অদৃষ্টের নাম স্বতন্ত্র। অদৃষ্ট চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; অদৃষ্ট মরে না, অদৃষ্টের কেবল নাম মরে; তাহার একটি নাম যায়, আর একটি নাম হয়। মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইলে অদৃষ্টের কি হয় বলা যায় না। কিন্তু দেবতারা ত সর্ব্বজ্ঞ, তবে তাঁহারা কেন অদৃষ্টের বশবর্ত্তী? মহাদেব অদৃষ্টের দৌরাত্ম্যে ব্যাকুল। এক এক দেবতার এক একপ্রকার অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বহুরূপী, প্রত্যেকের নিকট স্বতন্ত্র রূপ; আমার নিকট অদৃষ্টের রূপ ছিন্নমস্তা, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিদেবী। জগতের প্রকৃতি কি তাহা জান? আকৃতি হইতে প্রকৃতি বুঝিবে! প্রকৃতি-দেবী আপনার মাথা আপনি কাটিয়া আপনি আপনার রুধির পান করিতেছেন, ছিন্নমস্তার রূপ কে কল্পনা করিয়াছিল জান? ঘোর অদৃষ্টবাদীর এ কল্পনা! কল্পনা নহে, ইহা সত্য সত্যই অদৃষ্টের মূর্ত্তি; অদৃষ্ট আর প্রকৃতি এক। আমার সহিত তর্ক করিও না। আমি স্বচক্ষে এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, একদিন রাত্রি আড়াইপ্রহরের সময় একরূপ পৈশাচিক শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শয্যা হইতে দেখি আমার গবাক্ষের নিম্নে কোন এক স্থান হইতে বহুতর গৃধিনী, শকুনী, উঠিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের পক্ষসঞ্চালনের শব্দে হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। সকল পক্ষীই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের একদিকেই বেগে যাইতেছে, দেখিয়া আমি গবাক্ষের নিকটে গেলাম। যে দিকে পক্ষীরা ছুটিতেছে, সেই দিকে ধীরে ধীরে নেত্রপাত করিলাম, তথায় দেখি, স্বর্গ মর্ত্ত স্পর্শ করিয়া এক রুদ্র-রূপিণী যুবতী দাঁড়াইয়া আছে; আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়া, আপনিই আবার আপনার রুধির পান করিতেছে। বামকরস্থ ছিন্নমস্তক উন্নতমুখে রক্ত-ধারার উল্লম্ফন, ও প্রপতন দেখিতেছে, হাসিতেছে, আর তাহা পান করিতেছে। উৎপ্রেক্ষিত রক্তের আভায়, অন্ধকারও রক্তবর্ণ হইয়াছে। আকাশ, তৃণ, সমু-

ময়ই রক্তাক্ত! সেই ছিন্নমস্তকের মুক্ত-কেশ অগ্নিবৎ তরঙ্গ তুলিয়া অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিতেছে। স্বর্গে, মর্ত্তে, আকাশে, চারিদিক্ ব্যাপিয়া গম্ভীর, "ব্যোম্" শব্দ স্থির-ভাবে শব্দিত হইতেছে। তেত্রিশকোটী দেবতা করযোড়ে স্তব করিতেছেন, হে জগন্মাতঃ! কেন মা, তোমার শুষ্কমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছ? ক্ষমস্ব, ক্ষমস্ব, আবার এ মূর্ত্তি কেন, আমরা যে ভয় পাইতেছি।" মহাদেব কেবলমাত্র হাসিয়া বলিলেন, "প্রকৃতি দেবি! তুমিই সত্য, তোমার এইরূপই সত্য, তোমার এইরূপ আমার মনোমোহিনী।" মহাদেবের কথায় রুদ্ররূপিণী ঈষৎ হাসিয়া ক্রমে ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেলেন। আর কোথাও কেহ নাই, আমি দাঁড়াইয়া, ভাবিতে লাগিলাম "প্রকৃতিদেবী কি ছিন্নমস্তা? এই কি প্রকৃতির যথার্থ মূর্ত্তি? তবে হে প্রকৃতি! আমাদের কেন ঠকাও? তোমার এই ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ঢাকিয়া কেন নিয়ত মোহিনীমূর্ত্তিতে আমাদের চোখে চোখে বেড়াও?—কেন ফুল ফুটাও, কেন বা কোমললতাবল্লরী দোলাও, কেন পাখী উড়াও, কেন জ্যোৎস্না মাখ, কেন চন্দ্রমণ্ডলবিরাজিত অনন্তনক্ষত্রসনাথ কিরীটি মাথায় পর? এখন বুঝেছি! আমি আর ঠকিব না।"

দেওয়ান্। তুমি মাধবীলতার সন্ধান করিতে পার?

পিতম ছিন্ন মস্তার মূর্ত্তি আলোচনা করিতে করিতে এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল, সে দেওয়ানের উপস্থিতি তাহার একেবারে স্মরণ ছিল না। দেওয়ান্ কথা কহিলে তাহার চৈতন্য হইল। তখন দেওয়ানের কথার কোন উত্তর না করিয়া পিতম ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইহার পর দেওয়ান্মহাশয় শান্তিশক্ত গ্রামে গিয়া দেখেন, চূড়াধনবাবুর প্রতি রাণীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; স্ত্রীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া, চূড়াধনবাবু রাণীকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেওয়ান্ ভাবিলেন, "আরম্ভ এই; শেষ কোথা?"

বাল্মীকির জয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পর্ব্বত হইতে নামিবার সিঁড়ি থাকিলে বড় ভাল হইত, বড় বড় ধাপওয়ালা চাঁদপাল ঘাটের মত যদি সিঁড়ি থাকিত, বোধ হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহাতে উঠিত, কিন্তু তাহা নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কখন গাছের ডাল ধরিয়া, কখন ঝরনার ধার দিয়া, কখন উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া, কখন আবার নিম্ন হইতে উচ্চমুখে, কখন পাহাড় বেড়িয়া কখন বরাবর নামিয়া, আসিতে হয়। কখন এমনি ভয় হয় যে পা একটুকু সরাইলেই পড়িয়া যাইতে হয়। কখন ভয় হয় প্রকাণ্ড পাথর মাথায় আসিয়া পড়িবে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে অবলীলাক্রমে গল্প করিতে করিতে নামিতেছেন। বিশাল বক্ষ, তেজঃপুঞ্জ, বশিষ্ঠ, প্রকাণ্ড দেহ; মুখকান্তিতে একজনের অসাধারণ শৌর্য্য আর একজনের অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইতেছে। উভয়ে গল্প করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিয়া যাইতেছেন। গল্পের বিষয় সহজেই, অনুভব করা যাইতে পারে। গতরাত্রের ঘটনাবলী—

বশিষ্ঠ বলিলেন "যাহাতে ভাই ভাই হয় তাহার কি উপায় করিতেছেন?"

বিশ্বামিত্র। তাহার আবার উপায় কি? প্রায় সমস্ত জগৎ, জয় করিয়াছি, আর অল্প বাকী, এই টুকু হইলেই এক রাজার অধীনে সব প্রজাই ভাই ভাই হইয়া উঠিবে।

বশিষ্ঠ। আপনি কি মনে করেন, একশাসন আর ভ্রাতৃভাব একই জিনিস।

বি। তাহার আর সন্দেহ কি?

বশিষ্ঠ। রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ বিপ্লব চৌর্য্য দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় কেন?

বিশ্বামিত্র দক্ষিণ হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "এই হস্তের বলে সে সমস্ত নিবারণ করিব।"

বশিষ্ঠ। বলিলেন মন?

বি। মনে যাহাই থাকুক প্রকাশ করিতে দিব না?

বশিষ্ঠ। তবে আর ভাই ভাই হইল কই, মনে বিদ্বেষ থাকিলে ভ্রাতৃভাব হয় কই?

বিশ্বামিত্র। আপনারা জনকতক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদেরই মাত্র মন অত্যন্ত ক্রুর, মনোভাব লুকাইয়া কাজ করিতে পারেন, অন্যলোকে কাজে না করিতে পারিলে মনেও কিছু করিবে না।

বশিষ্ঠ দেখিলেন নির্ব্বোধকে বুঝান দায়,তিনি কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার [illegible] বলিলেন "ব্রাহ্মণের উপর আপনার এত রাগ কেন? ব্রাহ্মণ আপনার কি করিয়াছে?"

বি। আমার কিছু রাগ নাই, আমার কিছু করে নাই, কিন্তু আমার বোধ এই যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার প্রথম বিবাদ

হইবে। কারণ, উহাদের বুদ্ধি বড় পেঁচাও, আপনার কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য উহারা সব করিতে পারে।

বশিষ্ঠ। বলেন কি মহাশয়! ব্রাহ্মণ বরং সকলের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলার জন্য বিশেষ উদ্যোগী, তাহার সাক্ষী দেখুন আমি ক্ষত্রিয়ের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছি, ইহাতে লাঘব থাকিলেও স্বীকার করিয়াছি।

বিশ্বা। রাজপৌরোহিত্যে লাঘব আছে তাহা স্বীকারই করি না। বিশেষ আর আপনি যে, বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর আপনি কি মতলবেই বা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই কে জানে।

বশিষ্ঠ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন, আপনি যে মতলবেই আসুন, আর ব্রাহ্মণের যত কুমন্ত্রণাই থাকুক, বিশ্বামিত্র এই ভুজবলে সমস্ত শাসিত করিবে, সমস্ত পৃথিবী একশাসন এবং একমন, একপ্রাণ, করিয়া দিয়া যাইবে।

বশিষ্ঠ দেখিলেন, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। চুপ করিয়া পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রও দেখিলেন, অকারণ ব্রাহ্মণের মনঃক্ষুণ্ণ করিয়া ভাল করেন নাই, তিনিও খানিক চুপ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না, আমি আপনাকে অকারণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছি ক্ষমা-করুন, আর যদি কোন বাধা না থাকে, আমার শিবির নিকট, আজি আতিথ্য-গ্রহণ করুন।" বশিষ্ঠ সম্মত হইলেন। মহা আদরে বশিষ্ঠের আতিথ্য করা হইল, এবং কিঞ্চিৎ জাঁকসহকারে তাঁহাকে যে সকল অপার রত্নরাশি নানাদেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা দেখাইলেন, এবং উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইবার সময় বিশ্বামিত্রকে আপন তপোবনে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

২

বিশ্বামিত্র যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ বহুদূর হইতে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি যখন উপস্থিত হন, তখন তপোবন, শাল, তাল, তমাল, পিয়াসাল, হিন্তাল প্রভৃতি প্রকাণ্ড-কায় বনবৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, তলায় লতাগুল্মাদির লেশমাত্র নাই, সব পরিষ্কার, সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যাইবার একটু পরেই সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল; হঠাৎ বন উদ্যানে পরিণত হইল, প্রকাণ্ড তপোবন নানাপ্রকার শরতের ফুলের কেয়ারিতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন একখানি গালিচা পাতিয়া দিয়াছে। কোথাও শাদা, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে শাদা, কোথাও নীল ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে নীল, কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গিতে ভঙ্গীতে রাঙ্গা, কোথাও সবুজ, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে

সবুজ, কোথাও পীত, কেমন এক রঙ কমিয়া আর এক রঙ বাড়িয়া যাইতেছে যেস্থলে ফুলের রঙে বৈচিত্র্য হইতেছে না, সেস্থলে উপলে সে দোষ পুরাইয়া দিতেছে। গালিচার চারিপার্শ্বে নানাজাতীয় গন্ধপুষ্প তাহার বাতাসে চারিদিক ভর ভর করিতেছে, প্রকাণ্ড গালিচা ঠিক মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবরে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি তলাপর্য্যন্ত মার্ব্বল পাথরে বাঁধান;জল এমনি স্বচ্ছ,তলার মার্ব্বল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। এই গালিচার অবিদূরে প্রকাণ্ড আট্টালিকা দ্বার কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত। দ্বারে খুদিয়া স্বর্ণাক্ষরে লেখা।

স্বাগতং গাধিকুল তিলকস্য
বিশ্বামিত্রস্য।

বিশ্বামিত্র প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াও এরূপ অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। হীরা, মতি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎকৃষ্ট প্রস্তরে বাটীর আদ্যন্ত নির্ম্মিত, আর তাহার উপর পরশুরামের যুদ্ধকাহিনী চারিদিকে তোলা করিয়া অঙ্কিত, কোথাও ক্ষত্রিয়শোণিতহ্রদে পরশুরাম পিতৃতর্পণকরিতেছেন, কোথাও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, আর ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এরূপ যুদ্ধ একুশটা যুদ্ধ একুশটি দেয়ালে লেখা রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, বশিষ্ঠ তাঁহার আতিথ্যের জবাব দিতেছে, এবং তাঁহার সহিত যে, কথোপকথন হইয়াছিল তাহারও জবাব দিতেছে। মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল, হিংসা জন্মিতে লাগিল। আপাততঃ মনোভাব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন। মহানন্দে পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদি দর্শন, সমাপন হইল, যাইবার সময় বশিষ্ঠ যথোচিত উপঢৌকন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্চর্য্য কোথা হইতে আসিল। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাশয় আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন। বাস্তবিক সে ধেনু আর কিছুই নহে, বশিষ্ঠের সর্ব্বগ্রাহিণী বিদ্যামাত্র। বিশ্বামিত্র বলিলেন, তবে অল্প উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না। বিশ্বামিত্র আর ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, বলিলেন, আপনি দিবেন না, কিন্তু আমি অপহরণ করিব। বলিয়াই আপন লোক জনকে গোরু চুরি করিতে হুকুম দিলেন। এ দিকে অতিথি সর্ব্বদেবময়;—ওদিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ। বশিষ্ঠ মহাবিভ্রাটে

পড়িয়া গেলেন। বশিষ্ঠ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। লোকে ধেনু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, ধেনু যাইবার সময় কাতরনয়নে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "কি করি বাছা, অতিথি, রাজা, প্রবল-প্রতাপ দিগ্বিজয়ী তোমায় অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমিই ইহার প্রমাণ।" বলিবামাত্র নন্দিনী হুঙ্কার ছাড়িলেন, হুঙ্কারশব্দে আকাশ পাতাল ফাটিয়া গেল। আর অগণিত-সংখ্যক পারদ, পারস, চীন, সান, মান প্রভৃতি নানাজাতীয় সেনা রণসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া তথায় তাঁহার ত্রাণার্থ উপস্থিত হইল।

৩

ধেনু লইয়া মহাবিবাদ বাঁধিয়া উঠিল, একদিকে ক্ষত্রিয়সেনা আর একদিকে যবনসেনা মধ্যস্থলে নন্দিনী। পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা কোনমতেই ছাড়িতেছে না। যবনগণ গাভী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টাকরায় যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, যবন ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্যে যুদ্ধ—ব্রাহ্মণ দর্শক। দীর্ঘ দীর্ঘ তরবারি দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ষা, আর প্রকাণ্ড ধনুক টঙ্কারে টঙ্কারে মেঘ গর্জ্জন অনুভব হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র স্বসৈন্যের অভিনেতা, ব্রাহ্মণপক্ষে অভিনেতা কেহই নাই, বশিষ্ঠ অতিথির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, এবং পুত্র ও শিষ্যগণকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ক্রমে রক্তপাত আরম্ভ হইল, ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলি রক্তে কর্দ্দম হইল। তখন বিশ্বামিত্র হুকুম দিলেন, "গোরু মেরে ফেল।" গোরু এখন ক্ষত্রিয়দিগের করকবলিত ছিল, উহার প্রাণসংহারে উদ্যম করিবামাত্র গোরু দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল। স্ত্রীমূর্ত্তি স্বয়ং সরস্বতী, শ্বেতপদ্মাসনা শ্বেতবস্ত্রবিভূষিতা শ্বেতবর্ণচ্ছটায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ঝক্মারে, হস্তে শ্বেতবীণা, লাবণ্যে জগৎ আলো, তাহার উপর আবার শ্বেত পদ্মের সমস্ত বিভূষণ! বলিলেন, "রে, মূর্খ, আমি ব্রাহ্মণের বিদ্যা, তোরসাধ্য কি, তুই আমায় অপহরণ করিস্। আমি কুলক্রমে ব্রাহ্মণগৃহে বাস করিয়া থাকি, করিয়াছি ও করিব, তুই কি গায়ের জোরে আমায় হরণ করিতে পারিস, মনে করিয়াছিস। বিশ্বামিত্র বিস্ময়াপন্ন হইলেন, দেখিলেন, সরস্বতী আবার ধেনুমূর্ত্তিধারণ করতঃ বশিষ্ঠসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন, সমস্ত সৈন্য বায়ুতে মিশাইয়া গেল। বশিষ্ঠের নয়নে দরদর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তিনি স্বহস্তে ধেনুর গাত্রকণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের এই সর্ব্ব প্রথম পরাজয়। মনের ক্ষোভে, দুঃখে, হিংসায়, বিশ্বামিত্র আর গাভী বা বশিষ্ঠের দিকে চাহিতে পারিলেন না। ক্রোধে ধনুর্ব্বাণত্যাগ করিলেন, সৈন্য সামন্তকে আপন আপন

বাড়ী যাইতে বলিলেন, রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিলেন। বলিলেন।

ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং
ব্রহ্মতেজোবলং বলং

বলিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বশিষ্ঠ দেখিলেন, তাঁহার মনের আশা ব্যর্থ হইল।

বিশ্বামিত্র যে কেবল বাহুবলে সমস্ত ভুবন এক করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন, আর বাল্মীকি দস্যুদলত্যাগ করিয়া, অন্তরের জ্বালায় বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। তিনি সৈন্যদের সঙ্গে আসিলেন না। মন্ত্রী রাজ্য করিতে লাগিল। তাঁহার পরিবারেরা আজি আসেন, কালি আসেন, ভাবিয়া ক্রমে দিন, মাস, বৎসর, কাটাইয়া ছিল। বশিষ্ঠ আবার আপন মতলব অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল, বিশ্বামিত্র পক্ষীয়গণ তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল, বশিষ্ঠবংশের কি ভয়ানক পরিণাম হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ আছে।

এদিকে বিশ্বামিত্র একবারে ঘোরতর তপস্যায় মগ্ন হইলেন, ব্রাহ্মণ হইবেন, নিজহস্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দুই বল এক করিবেন, এবং সসাগরাধরার অদ্বিতীয় প্রভু হইবেন, সকলকে একশাসনে রাখিয়া একভাবে মিলাইবেন। এই তাঁহাদের মনস্থ হইল। তিনি হিমালয়ে এক অতিনিভৃত জঙ্গলময় দুর্গম্যস্থানে গমন করত, একেবারে ঘোরতর তপ আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনে, এক গ্রাস আহার, তাহার পর অর্দ্ধগ্রাস; তাহার পর এক দানা, তাহার পর অর্দ্ধ দানা; তৎপরে জলবিন্দু, তৎপরে আহার বন্ধ করিয়া তপ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত সমস্ত মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। দৃক্‌পাত নাই, কেবল ধ্যান। চক্ষু কোঠরগত হইল, নাসিকার মধ্য অস্থিমাত্র স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরের সমস্ত হাড়, কেবল চর্ম্মমাত্রে আচ্ছাদিত হইল। কেশরাশি বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পদের নখর বর্দ্ধিত হইয়া শিকড়ের মত মাটির মধ্যে পুতিয়া গেল। উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল। বিশ্বামিত্রের ধ্যান শেষ হয় না; ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তুগণ দেখে আর ধীরভাবে দূর দিয়া চলিয়া যায়।

এই ভয়ানক অবস্থায় বিশ্বামিত্র নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেন, কখন বোধ হইত সমস্ত জগৎ-বিশ্বসংসার, পরমাণু হইয়াগিয়াছে। মধ্যস্থলে একমাত্র তিনি, তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে

ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উঠিল, তাঁহার তেজে পরমাণু দগ্ধ হইতে লাগিল। শেষ নিজ শরীরও দগ্ধ হইতে লাগিল। দারুণ আন্তর জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন কতকগুলি পরমাসুন্দরী—যুবতী,—অপ্সরা কোথায় লাগে, তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের নিতম্ব-দোলন অতীব চমৎকার, তাহারা কেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কেহ মদনবিহ্বললালসাঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইতেছে, কেহ শরীরের অর্দ্ধ অংশে বসন-ত্যাগ করিয়া, কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ কটাক্ষবর্ষণ করিতেছে, কটাক্ষ কখন কোমল, কখন চঞ্চল, কখন ঠারে ঠারে হৃদয়ের অভিলাষ ছড়াইয়া দিতেছে। কখন অলস, কখন বিদ্যুৎবৎ, কখন চক্ষের পাতা কাঁপিতেছে, তাহার উপর কটাক্ষ বাণবৎ ঘন ঘন পড়িতেছে। কাহারও বেণী বদ্ধ কাহারও এলো, কাহারও অলক কুঞ্চিত, কাহারও বায়ুভরে দোলায়মান আর সকলেই নানা হাব ভাব বিকাশ করিয়া, কেবল বিশ্বামিত্র প্রতি আপনাদের আলস, মদনভাব প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, তাঁহার অন্তর-দাহ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, তিনি পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন।

আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কোটী সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, তেজে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, গা পুড়িয়া যাইতেছে, বিশ্বামিত্র পলায়ন করিয়া সূর্য্য সমূহ হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে সূর্য্যের তেজ মন্দ হইল, কিন্তু যেখানে গেলেন, সেখানে ভয়ঙ্কর শতসহস্র সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখেন ভয়ানককাণ্ড, নানাপ্রকার ভীষণাকার জন্তুগণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে। কাহার মুখ শূকরের মত সিংহের ন্যায় কেশর, যোজনবিস্তৃত লাঙ্গুল। কেহ ভীষণ পিশাচ, মাথার উপর চোখ, অর্দ্ধেকশরীর হাতে ভরা, দুই হাত আর দুই পা দিয়া, চারিদিকে আহার-সামগ্রী হাতড়াইতেছে, আর যাহা পাইতেছে অমনি উদরসাৎ করিতেছে। কাহারও দন্ত শূকরের ন্যায় কাহার হস্তীর ন্যায়, কাহারও মাথা পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায়, কাহার কেবল মস্তক, পদদ্বয় আছে কি না সন্দেহ। কোন স্ত্রী পিশাচীর কেবল স্তনদ্বয়—বৃহৎ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায়, আবার কাল। কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ হরিদ্রা, নানারঙে শোভিত। যখন এই ভয়ানক সৈন্য, সেনাপতির আদেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাঁহার আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কটাক্ষে পিশাচসেনা দূর হইয়া গেল। কাহার পদভগ্ন হইল, কাহার প্রাণনাশ হইল, কাহার মস্তক ক্ষত হইল। স্তনবতীর স্তনভার খসিয়া গিয়া তাহার শরীর হালকা হইল। এর মুণ্ড ওর

ঘাড়ে গেল ওর পা তাহার মাথায় গেল।

এইভাবে পিশাচসেনার ধ্বংস দেখিয়া, পিশাচসেনাপতি হাসি হাসি মুখে ভাব করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্র, তুমি অতি বড় পরাক্রমশালী—তুমি ভুজবলে সমস্ত জয় করিয়াছ। তুমি তপোবলে কটাক্ষে আমার পিশাচসেনা বিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিলে। অতএব তুমি আমার পুত্র হও; এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিতেছ, ইহার সমস্ত অসুর পিশাচ, দৈত্য, দানব, আমার অধীন, তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে। আমি অচিরাৎ তোমায় রাজা করিয়া দিয়া স্বয়ং বিলাসসুখভোগে নিরত হইব। অতএব তুমি আমার পুত্র হও। এই হিমালয়চূড়ার উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে অসংখ্য সমৃদ্ধরাজ্য চারিদিকে রহিয়াছে, সমস্ত তোমার হইবে। চীন, জাপান, মিসর, পারস্য, সব তোমার হইবে। এই যে সুন্দরীগণ তোমার প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্য; উহারা তোমার হইবে। যত মণি, মুক্তা, কাঞ্চনের খনি দেখিতে পাইবে, সমস্ত আমার। আমার প্রজার সংখ্যা নাই; তুমি আমার পুত্র হও, এই সমস্ত অতুলরাজত্বের একমাত্র অধীশ্বর হও, তোমার কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই। যতদিন তুমি রাজ্যে স্থির হইতে না পার, আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার রাজ্যের সমস্ত রক্ষা করিয়া দিব।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তুমি আমায় ব্রাহ্মণত্ব দিতে পার, নন্দিনী দিতে পার, বিদ্যা দিতে পার, সরস্বতী দিতে পার?" না, "পারি না। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিবার ক্ষমতা দিতে পারি। নন্দিনীর প্রাণনাশ করিয়া দিতে পারি, বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।" "তবে তোমায় দিয়া আমার কাজ হইবে না।" বলিয়া, বিশ্বামিত্র আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

এবার তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হয় না। ক্রমাগত নিশ্বাস বন্ধ করায়, ক্রমাগত এক বিষয়ক চিন্তা করায়, ক্রমাগত অনাহারে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল না। কিন্তু তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার কর্ণকুহর হইতে জাঁতার ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল, নাসিকা দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সেই শব্দের পর তাঁহার মস্তকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাশিচক্র দক্ষিণ হইতে বামদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছায়াপথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, দেখিতে দেখিতে তাহার মাথার খুলি অভ্যন্তরস্থ অগ্ন্যুত্তাপে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, বিশ্বসংসারে বুম করিয়া শব্দ হইল, শব্দ আকাশে গড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে ব্রহ্মাণ্ডের কপাল কপালিকা পৃথক হইয়া গিয়া সেই পথে শব্দ বাহির হইয়া গেল।

তাহার বাহির হইতে দূরস্থিত শতসহস্র অনবরত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনা গেল।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব স্তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। বিশ্বামিত্র ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহার উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মস্তকাস্থি নীচে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর সবল সতেজ ও কান্তিপুষ্ট হইল। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণত্ব না পাই, বেদমন্ত্র দর্শন ব্রাহ্মণের স্বত্ব ছিল, তাহা ত ছিন্ন করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। বলিয়া আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

২

বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডে যে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, আর কাহারও অবিদিত রহিল না। তখন ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে সিণ্ডিকেটে আহ্বান করিলেন। কণ্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি নারদাদি দেবর্ষি সব আসিয়া জুটিলেন। আকাশপথে সভা হইল, সভায় একজন শূদ্র রাজাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইল। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট মন্ত্র গায়ত্রীনামে ব্রাহ্মণমাত্রেরই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বলিয়া, স্বীকার করা হইল। কিন্তু ব্রহ্মা যেই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কোন ব্রহ্মর্ষি বা দেবর্ষি অনুমোদন করিলেন না। কেহ বলিলেন, বিশ্বামিত্র এখনই বিশ্বের প্রায় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিলোপ করিবে। কেহ বলিলেন, উহার দুরাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবলা, আজি ব্রাহ্মণত্ব পাইলে, কালি ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিবে। অতএব উহাকে সাহস দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। অনন্তর সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মাকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইলেন। ব্রহ্মার প্রতি ভার রহিল, তুমি ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন আর যাহাই চায় দিও। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মা, তোমার ধ্যানে তৃপ্ত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। কি বর চাহ, যদি অদেয় না হয়, তবে দিব।" "আমি ব্রাহ্মণত্ব চাহি, দিতে পার?" "না।" "আমি তোমার মত ব্রহ্মার বর চাহি না।" ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আবার যাইয়া ব্রহ্মর্ষিসভায় উপস্থিত হইলেন। এবং উহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই সম্মত হইল না। তখন পরামর্শ হইল সকলে গিয়া বিশ্বামিত্রকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অন্য কোন বরদানে তুষ্ট করা যাউক। বশিষ্ঠ একবার যাইতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও অন্যান্য সভাসদগণের অনুরোধে গেলেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন। বিশ্বামিত্র সমাগত বরদাতাগণের মধ্যে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন। এবং অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। সভাসদগণ বুঝাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণত্ব অতি সামান্য পদার্থ, তুমি যেরূপ উপযুক্ত, সেরূপ তপস্বী মহাপুরুষ, তুমি ক

ব্রাহ্মণের চূড়া। যখন ব্রাহ্মণমাত্রেই তোমার মন্ত্র পাঠ করিবে, জপ করিবে, নিয়ম করা গেল, তখন তোমার ব্রাহ্মণত্বের বাকী কি রহিল। ব্রাহ্মণত্বে অনেক কষ্ট; অনেক ব্রত, নিয়ম করিতে হয়। তুমি রাজা তোমার তাহা কষ্টকর হইবে।

বি। মহাশয় আমি যখন এত কঠোর তপ করিয়াছি, তখন কি তোমার ব্রাহ্মণের ব্রত পালন করিতে পারিব না?

"তুমি পারিবে না তা কি বলিতেছি, এত কষ্টে তোমার কাজ কি? তুমি ইন্দ্রত্ব লইবার জন্য চেষ্টা করনা কেন? তাহাই তোমার যোগ্যপদ। আর আমরা তোমার তপে সন্তুষ্ট হইয়া, আজি তোমায় রাজর্ষি উপাধি দিলাম। তুমি জান ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষির নীচেই রাজর্ষি, তোমায় তৃতীয়-শ্রেণীর ঋষি করিয়া দিলাম। তোমার ব্রাহ্মণত্বে কাজ কি? এই লহ রাজর্ষি-সম্ভ্রমসূচক পদকগ্রহণ কর।" বিশ্বামিত্র এই সমস্ত কথার চাতুরী বেশ বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ যে তাঁহার তপে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি পদক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মর্ষিগণ, তোমাদের চাতুরী বুঝিয়াছি। তোমরা আমায় স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না। আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার।' বশিষ্ঠ ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, কেমন বলিয়াছিলাম ত, ব্রাহ্মণত্ব এখনও পায় পাই, তাহাতেই এই। ঋষিরা আবার নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তুমি মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি, যাহার তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে, সে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আমরা তোমার বন্ধু, তোমায় এক উপদেশ দিই, কেন এত কষ্ট পাইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি ত অদ্বিতীয়। তুমি ব্রাহ্মণের উপর ব্রহ্মারও উপর; তবে কেন তুমি সৃষ্টিশ্রম স্বীকার করিতে চাও।"

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল কর, আমি তোমার সৃষ্টিতে থাকিতে পারি। ব্রাহ্মণ আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

ব্রহ্মাদি সকলে কোপে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোর যত শক্তি আছে কর। আমাদের সঙ্গে তোর কোন সম্পর্ক আর কোন সম্বন্ধ নাই।" বলিয়া ক্রোধভরে বেগে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্রও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যবেক্ষণার্থ ধবলাগিরির সর্ব্বোন্নত শিখরদেশে আরোহণ করিলেন।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনার্য্য।

আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণ্যভূমি তাহার প্রমাণ আর্য্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য্য রথ বলেন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সিন্ধুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে—কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে।*

যদি তাঁহারা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ, যে তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তার পর ব্রহ্মর্ষিদেশ, তার পর মধ্যদেশ, সর্ব্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।† বাঙ্গালা ব্রহ্মাবর্ত্ত, বা ব্রহ্মর্ষিদেশ, বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্ সময়ে, আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব—এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে আর্য্যের

---

* Vide Muir's Sanskrit texts Part II. Chapter II, Sect. XI. & Chapter III, Sect. III.

† সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং।
এতদ্দেশপ্রসূতশ্চ সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
হিমবদ্বিন্ধ্যয়ো র্মধ্যং যৎপ্রাগ্ বিনশনাদপি
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আ সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরনন্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ
মনু ২। ১৭—২২

পূর্ব্বে অনার্য্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য্য ও অনার্য্য উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য্য এখানকার আদিমবাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে তাহারা কোন ঐতিহাসিককালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্য্যেরা তৎপূর্ব্বে এখানে বাস করিত—কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্য্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন তখন অনার্য্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্য্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল? আর্য্যেরা ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যেরা যে তাহার পরে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে এমত কথা নহে। সত্য বটে এখনকার দিনে, বাঙ্গালার ন্যায়, বিস্তৃত, উর্ব্বর এবং জীবননির্ব্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে, যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব এ প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্য্যদিগের এখনকার বাসস্থান, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঐসকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্ত ভাগে বিশেষ উত্তরপূর্ব্বভাগে কতকগুলি অনার্য্যজাতির বাস আছে এবং তাহারাও যে আর্য্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্য্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্য্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ, আর তাহাদিগের বর্ত্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্য্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে আর্য্যেরা পরে এই অনার্য্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগকে জয় করিয়া, আর্য্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য্যস্থান সকলে পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। অনু-

গাঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্য্যনিবাস কদর্য্যস্থানেই অনার্য্যনিবাস। বিন্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্ব্বরা, পর্ব্বতে পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী তাহারা কদর্য্যস্থান সকল বাছিয়া লইবে, যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্য্যের পর অনার্য্য অসিয়াছে, এপক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে আগে অনার্য্য ছিল তার পর আর্য্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, এই পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ব বাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক, যে বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যরচনা আর কিছুই নাই। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদসংহিতায় "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" "অয়মেতি বিচাকশদ্ বিচিন্বন দাস আর্য্যম্"* ইত্যাদি বাক্যে আর্য্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যুশব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাসশব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।† তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্য্যেরা গৌর। তাহারা "বর্হিষ্মান্"—যজ্ঞ করে না—আর্য্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে—তাহারা "অব্রত"—আর্য্যেরা সব্রত—সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি—তাহাদের মার, আর্য্যদের বশীভূত কর! আর্য্যদের এই কথা। তাহারা অদেব—সুতরাং "বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে"—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা "অন্যব্রত"—"অমানুষ"—"অযজ্যান"—"অদেব।" তাহারা "মৃধ্রবাচ"—

* ঋচ ১। ৫১। ৮—৯। মূরধৃত। মক্ষমূলরধৃত। Sanskrit texts Part II. Chap. III. sect 1.

† ঋচ্। ১০। ৮৬। ১৯। মূরধৃত। Ib.

কথা কহিতেও জানেনা। ইত্যাদি।* ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায়, নিশ্চিত বুঝা যায় যে যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্য্যদিগের পরমশত্রু। আর্য্যেরা, ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া, ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য্য।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারিপার্শ্বে অনার্য্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত আছে। যথা—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়-
জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ
শকাঃ—
পারদা পহ্লবা শ্চিনাঃ কিরাতা দরদাঃ
খসাঃ

ইহাদিগের মধ্যে যবন পহ্লব আর্য্য অবশিষ্ট অনার্য্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্য্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র পুলিন্দ সবর মূতিব ইত্যাদি অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে উহারাই দস্যুনামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

দস্যূনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূন-
মূর্দ্ধজৈঃ
দীর্ঘকূর্চ্চৈ র্মহী কীর্ণা বিবৈর্হ রণ্ড
জৈরিব

ইহারা যে পরিশেষে আর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই, উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য,—আর্য্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান—যথা দ্রাবিড় আর্য্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল, আর্য্যেরা কেবল

* সজাতু ধর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ বিভিন্ন বিদ্ বি দাসীঃ। বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্য আর্য্যং সহোবর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র। ঋচ্। ১,১০৩,৩। মূরধৃত। St. ইত্যাদি বহুতর মন্ত্র।

প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য্য। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।† ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্যের সামঞ্জস্য এক রকম ঘটে না। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আর্য্যজিত নহে—অনার্য্যেরা সেখানে প্রধান—কতকগুলি আর্য্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংহভূম।

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্য্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আর্য্যীভূত, যে সে দেশে কেবল আর্য্যবংশ প্রাধান্যবিশিষ্ট এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্য্যভাষা। উত্তর পশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোন কোন আর্য্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যীভূত, যে সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব, ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালা দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও, বাঙ্গালারমধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যশোণিতের এত প্রবলস্রোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

* "Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities, they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects. *Muir's Sanskrit Texts, Part II.*

† মূরের দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয়পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্র সকল দেখ—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

জল।

যে যে উপাদানে মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত, তাহার মধ্যে জলের ভাগই অধিক; ১৫৪ ভাগের মধ্যে প্রায় ১১৬ ভাগ জল; অর্থাৎ চারিভাগের তিনভাগ জল। অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, স্নায়ু, ত্বক্ ইত্যাদি সকলগুলিতেই জল আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে মনুষ্যের দেহ ওজনে ৭৭ সের, তাহার শরীরে জল ৫৮ সের থাকে। শরীরে জলের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা জলের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঘটি ঘটি জলপান করিলে দেহ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহা নহে। শরীর এমনি চমৎকার কৌশলে নির্ম্মিত, যে ইহাতে কোন উপাদানের আধিক্য বা অল্পতা হইলে চলিবে না, সব ঠিক ঠিক চাই; বেশী কম হইলেই কল বিগড়িয়া যাইবে।

তৃষ্ণা পাইলেই আমরা জলপান করিয়া থাকি এবং জলপান করিলেই পিপাসা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কেন তৃষ্ণা পায় এবং কি কারণেই বা জলপানে তন্নিবৃত্তি হয় তাহা কয় জন জানে বা জানিতে ইচ্ছা করে? তৃষ্ণা পাইলেই জল খাইতে ইচ্ছা করে, এবং জল খাইলেই পিপাসার শান্তি হয় এই মাত্র জানি, তাহার আবার কারণ কি?

মনুষ্যদেহ অহরহঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা চলি, নড়ি, চিন্তা করি, বা চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকি, অথবা নিদ্রা যাই, কিছুতেই নিস্তার নাই; শরীরের কিছু না কিছু ব্যয়িত হইবেই হইবে। যখন খরচ এত অধিক, তখন রোজগারও তেমনি চাই, নচেৎ দেনায় সমস্ত নিলাম হইয়া যাইবে, মহাজনকে অচিরাৎ দেউলিয়া হইতে হইবে। শরীরের এই খরচ রক্তের হ্রাস, এবং ইহার রোজগার খাদ্য ও পানীয়। অন্যান্য ব্যবসায় যেমন রোকড় দৃষ্টে খরচ জানা যায়, শরীরের পক্ষে সেইরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা শোণিতহ্রাস অনুমিত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণাই ইহার রোকড় বহি। যখনই রক্তে জলের ভাগ কম পড়ে, তখনই আমাদের তৃষ্ণা বোধ হয়। যদিও আপাততঃ এরূপ বোধ হয় যে টাক্‌রা শুকাইয়া যাওয়াতে তৃষ্ণা পায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে শোণিতে জলের অংশ হ্রাস হওয়াই ইহার মূল কারণ। যেমন শরীরাভ্যন্তরে খাদ্যের অভাব ক্ষুধার প্রকৃত কারণ হইলেও আমরা পাকস্থলীতে ক্ষুধার অনুভব করি, তৃষ্ণার পক্ষেও সেইরূপ অপ্রধান কারণকে প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কারণ, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির টাক্‌রা ভিজাইয়া রাখিলে যে তৃষ্ণা

নিবৃত্ত হয় তাহা অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী, কিঞ্চিৎ পরে আবার যে তৃষ্ণা সেই তৃষ্ণা; পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়াদ্বারাই হউক, দেহে ক্ষত করিয়া শিরামধ্যে প্রবেশিত করিয়াই হউক, অথবা ত্বকের শোষণী-শক্তিদ্বারাই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইতেছে, ততক্ষণ একবারে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে যদি রক্তে জলের ভাগ কম পড়াই তৃষ্ণার কারণ হইল, তবে শুদ্ধ টাক্‌রা শুকাইলেই কেন তৃষ্ণা অনুভব হয়? ইহার কারণ বোধ হয়, যে অন্যান্য স্নায়ু অপেক্ষা মুখের ও টাক্‌রার স্নায়ু জলের অভাব অধিক অনুভব করে। যে সমস্ত জ্ঞান বাস্তবিক সমস্ত শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করে, তৎসমুদায়ও কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় হইতে যে অনুভূত হইতে পারে, তাহা ডাঃ ভকমানের (Volkmann) পরীক্ষাদ্বারা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

রক্তে জলের ভাগ কম হওয়া যে পিপাসার কারণ তাহার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। ক্লড বারনার্ড দেখিয়াছেন, কোন কুক্কুরের পাকস্থলীতে একটি ছিদ্র ছিল, কুক্কুর জলপান করিবামাত্র সেই ছিদ্র দিয়া সমুদায় জল বাহির হইয়া পড়িত। সুতরাং জল রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে না পারায় তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হইত না, আবার সে জলপানে প্রবৃত্ত হইত, জলও আবার নির্গত হইয়া যাইত। কুক্কুর এইরূপে পুনঃ পুনঃ জলপানে ক্লান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার জলপান করিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রটি বন্ধ করিবামাত্র পীত জল পাকস্থলীতে শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইত, এবং তজ্জন্য তৃষ্ণা এককালে নিবৃত্ত হইত।

ত্বকের শোষণীশক্তিদ্বারা জল দেহমধ্যে নীত হয়। এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছুকাল অনেক বাদানুবাদ চলে, অবশেষে ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার এডওয়ার্ডস্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে টিক্‌টিকীর লাঙ্গুল জলে ডুবাইয়া রাখিলে জল শোষিত হইয়া তাহার সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। ডাক্তার ম্যাডেন আধ ঘণ্টাকাল জলে সমস্ত শরীর মগ্ন রাখিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার দেহের ভার প্রায় ৫ ড্রাম ১ ইস্‌কুপল ৩ গেণ পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। জলের অংশ দেহমধ্যে শোষিত না হইলে দেহভার কিরূপে বর্দ্ধিত হইল? ডাঃ বারণও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দেহভার আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

যতটুকু জলপান করা উচিত, তদপেক্ষা অল্প জলপান করিলে কি কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা অদ্যাপি সম্যক্ নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ এই, যে যে তৃষ্ণাশান্তির ইচ্ছা এত প্রবল লোকে সেই ইচ্ছাকে কোন

মতে নিবৃত্ত ও অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না। কয়েকটীমাত্র পরীক্ষাদ্বারা এতৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প জল খাইলে Pulmonary Carbonic Acid অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয়, মল ও মূত্রত্যাগ কমিয়া আসে, এবং বহুদিন এই ভাবে থাকিলে শারীরিক ও মানসিকশক্তি কমিয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশীয় ব্যায়ামজীবি লোকদিগের মধ্যে এই একটি কুসংস্কার আছে যে, ব্যায়ামকারী যত অল্প জল খাইবে ততই ভাল। কিন্তু এটি বিষম ভুল। সাধারণতঃ শরীর হইতে যে জলীয় অংশ নিঃসৃত হয়, ব্যায়ামকালে তদপেক্ষা প্রায় ১২১০৪১ ভাগ অধিক জল নির্গত হয়। সেই অংশ পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য বরং অধিক পরিমাণে জল খাওয়া কর্ত্তব্য। তবে একবারে অধিক পরিমাণে জল না খাইয়া অল্প অল্প করিয়া বহুবার জলপান করা মন্দ নহে। শীতপ্রধানদেশে প্রত্যেক লোকের গড়ে প্রতিদিন ২৩ গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়; তন্মধ্যে শুদ্ধ পানার্থে যুবকের পক্ষে ৭০ হইতে ১০০ ঔন্স পর্য্যন্ত এবং বালকের পক্ষে ২০ হইতে ৩০ ঔন্স পর্য্যন্ত জল দরকার হয়। সেক্রেটারি অব ষ্টেট ১৮৬৮ সালে এই আদেশ করিয়াছেন, যে প্রত্যেক সৈন্য প্রতিদিন ১৫ গ্যালনের অতিরিক্ত জল পাইবে না। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জলের কিছু অধিক আবশ্যক, এবং আমরা স্বভাবতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু কলিকাতায় এখন কলের জল ব্যবহার হইতেছে, যত ইচ্ছা এখন তত জল পাওয়া যায় না, প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে যে পরিমাণ জল পাইয়া থাকেন, তাহাতে কলিকাতায় জলকষ্ট হইয়াছে অনেকে বলিয়া থাকেন। এই কারণেই আজ কাল জলের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য আন্দোলন হইতেছে।

পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে আবার জলের আবশ্যকতাও কমবেশী হইয়া থাকে। যে ঘোড়া প্রতিদিন ৪ ক্রোশ গাড়ি টানে, তাহার ৮ গ্যালন জলের দরকার হয়; কিন্তু সেই ঘোড়াই যখন আড়গড়ায় বাঁধা থাকে কোন কর্ম্ম না করে, তখন ৭ গ্যালন জলেই তাহার পর্য্যাপ্ত হয়। আবিসিনিয়ায় যুদ্ধযাত্রাকালে জাহাজে যে যে পশুর প্রাত্যহিক পানার্থ যে যে পরিমাণ জল লওয়া হইয়াছিল, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

হস্তী	২৫	গ্যালন।
উষ্ট্র	১০	,,
বড় বৃষ	৬	,,
ছোট ঐ	৫	,,
অশ্ব	৬	,,
টাট্টু ও অশ্বতর	৫	,,

অনেকে বলেন, "অবিশুদ্ধ জল পান করিলে কোন অপকার হয় না, কারণ এরূপ দেখা গিয়াছে, যে যে সকল বাগ্দী

প্রভৃতি জাতি বাদায় বাস করে, তাহারা প্রায়ই বাদার অপেয় জল পান করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য কেমন সুন্দর! শরীর কেমন বলিষ্ঠ!" দুইটী কারণে এ কথাটী আমাদের সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম, বাদার লোকে যে অপেয় বাদার জল নিত্য পান করে তাহা নহে, তাহারা যে দীপাকার স্থানে বাস করে, তথাকার পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলই প্রায় পান করে, তবে কার্য্যগতিকে কদাচ কখন বাদার জলও যে না খায় তাহা নহে, কিন্তু তজ্জন্য যে সামান্য অপকার জন্মে তাহা তাদৃশ বলিষ্ঠ দেহে কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। দ্বিতীয়, সকল বাগ্‌দীই যে বলবান্ ও সুস্থশরীর তাহার কোন প্রমাণ নাই; হইতে পারে যে যাহারা আমাদের নজরে পড়ে তাহারাই কেবল সুস্থকায়; দুর্ব্বল ও রুগ্নদেহ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আমাদের কারণ ঘটে না। আমাদের এরূপ বোধ করিবার অন্যতম কারণ এই যে, লোকে যে দিন অবিশুদ্ধ জল পান করে, সেই দিনেই কিছু পীড়িত হয় না, ইহার ফল অনেক পরে ফলে, কাজেই আমরা পীড়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপেয় জলপানের কোন সম্পর্ক নাই দেখিয়া ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করি। কিন্তু বাস্তবিক জলের দোষে অনেক পীড়া জন্মে, তন্মধ্যে উদরাময়, ওলাউঠা ও জ্বর সর্ব্বপ্রধান। কলিকাতা অপেক্ষা আজকাল পল্লীগ্রামে যে জ্বর অধিক, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতার জল অতি পরিষ্কার, কিন্তু পল্লীগ্রামের জল আবার তেমনি অপরিষ্কার। হিপোক্রেটিস বলিয়া গিয়াছেন, যে বাদার জলে প্লীহা বৃদ্ধি হয়।

জলের সহিত প্রধানতঃ এই সমস্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যথা—জান্তব, উদ্ভিদ বা ধাতব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ, নাইট্রোজন, অক্সিজেন, কারবনিক আসিড, কঠিন পদার্থচয় (Solid matters) চুণ, ম্যাগনিসিয়া, সোডা প্রভৃতি। কখন কখন ধাতুও জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, যথা আরসেনিক, ম্যাংগানিস, সীসা, তাম্র, দস্তা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে কোন কোন ধাতব ও জান্তব পদার্থ অতিশয় অপকারী; কিছু আরসেনিক প্রভৃতি ধাতু যে জলে মিশ্রিত আছে তাহা বিষতুল্য। সাধারণতঃ গ্র্যানাইট, বালী ও খড়িময় স্থানের জল বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কর্দ্দমময় স্থান ও বাদার জল প্রায়ই দূষিত ও অপেয়। কীটাণুপূর্ণ জল শরীরের পক্ষে অপকারী কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনফিউসোরিয়া নামক কীটাণুদ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু কতকগুলি কীটাণু দেহমধ্যে নীত হইলে অপকারও করিতে পারে। দূষিত জলপানে যে রক্তামাশয় রোগ জন্মে, তদ্বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য গল্প আছে। West Indies নামক দেশের অন্তর্গত Tertola গ্রামে আগমনমাত্র ত-

জন্য দূষিত জলপানে নাবিকগণের উক্ত রোগ হইত ; কিন্তু তথাকার অধিবাসিগণ বৃষ্টির জলপান করিয়া দিব্য সুস্থ থাকিত। নাবিকেরা কোন অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করিলে, সে ব্যক্তি একঘটী খাবার জল সঙ্গে করিয়া আনিত, প্রাণান্তেও জাহাজের জল পান করিত না।

পশ্চিমাঞ্চলের জলে যে যে পদার্থ মিশ্রিত আছে
তাহার তালিকা।

স্থানের নাম	প্রতি গ্যালনে কঠিন পদার্থের পরিমাণ		প্রতি গ্যালনে সাধারণলবণের পরিমাণ	
আগরা নগরের কূপ	৯৮	গ্রেণ	৩২.৪	গ্রেণ
গোয়ালিয়রের কূপ	১৫৫.২	,,	৪৪.১	,,
গোয়ালিয়রের সুখোপতিকাস্থ কূপ Happy valley	৩১.৮	,,	৭.১	,,
ঝান্সিস্থ কূপ	২৪.৬	,,	১.৭	,,
ফয়জাবাদস্থ কূপ	৫১	,,	১.৪	,,
বহরমপুরস্থ কূপ	৮১.৯	,,	৩২.৩	,,
অম্বালাস্থ কূপ	৭৭.৫	,,	১৫.৩	,,
রাউলপিণ্ডীস্থ কূপ	২৬.৪	,,	.৭৪	,,
সাগরস্থ কূপ	১৫৭.৮	,,	৩৮.৬	,,
সীতাপুরস্থ কূপ	১৮	,,	.৬	,,

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলে কি পরিমাণে কি কি দ্রব্য মিশ্রিত আছে নিম্নে তাহার এক তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

স্থানের নাম	প্রতি গ্যালনে সোডিয়মের পরিমাণ	প্রতি গ্যালনে সাধারণ লবণের পরিমাণ
ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জল	৪৮.৪ ...	.৬৭২
বাজারস্থ কূপ	১২০.৪	২৭.০২
কুন্জীপুর বাজারের কূপ	৬৯১.	১৭৩.৮
টি, সান্ডিস্ সাহেবের বাটীস্থিত কূপ ...	৩৪.১ ...	১.৬৩৭
ক্লিডন্যাও মন্দির সন্নিহিত কূপ	২৮.৩৫ ...	১.১৩

কি কি বস্তু জলের সহিত মিশ্রিত আছে, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। সাধারণতঃ যে যে লক্ষণ থাকিলে জল পানযোগ্য হইয়া থাকে,—তাহা এই পেয়জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইবে, তাহাতে স্বাদ বা গন্ধ কিছুই থাকিবে না, কোন প্রকার পদার্থ ইহার সহিত মিশ্রিত না থাকে, এবং ইহা বায়ুমিশ্র হয়, কঠিন পদার্থ প্রতি গ্যালনে ৮ গ্রেণের অধিক না থাকে, নাইট্রেট বা আমোনিয়া আদৌ না থাকিলেই ভাল হয়, তবে অতি স্বল্প পরিমাণে থাকিলে হানি নাই।

জলের যে যে দোষ যেরূপে বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে।

জান্তব পদার্থ—ফুটাইয়া লওয়া অনবরত নাড়া, বায়ুসম্পর্ক এবং কয়লা ও ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে।

Carbonate of Lime—ফুটাইয়া ও Caustic Lime মিশাইয়া।

Sodium Chloride—কয়লা ও বালি দ্বারা শোধিত করিয়া।

লৌহ—ফুটাইয়া এবং কিছুপরে চূণের জল মিশাইয়া এবং কিয়ৎপরিমাণে কয়লা দিয়া। লৌহ, তাম্র প্রভৃতির অংশ শুদ্ধ কয়লাদ্বারা অনেক কম করা যাইতে পারে।

Calcium, Magnisium, Sulphate এবং Chloride প্রভৃতি পদার্থ একবারে

কখন দূর করা যায় না বটে, কিন্তু কয়লাদ্বারা শোধন করিয়া লইলে ইহাদের পরিমাণ অনেক কম হইতে পারে।

আজ কাল আমরা যে কলের জল খাইয়া থাকি তাহা প্রায়ই সীসার নলদ্বারা আনীত হয়। কিন্তু এই জল অতিশয় অপকারী। বহুদিন সীসাব নল দিয়া জল আসিলে সীসা ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়, এবং সীসামিশ্র জলপান করিলে প্রায়ই পক্ষাঘাতরোগ হইয়া থাকে। ১ গ্যালন জলে $\frac{১}{২০}$ গ্রেনমাত্র সীসা মিশ্রিত থাকিলেই উক্ত পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এই দোষ পরিহারমানসে অনেকে অনেক প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে তার (Tar) দিয়া বার্ণিস্ করিয়া লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, স্বল্পায়াসসাধ্য ও কার্য্যকারক। সীসার নলের পরিবর্ত্তে পেটা লোহা বা কলাইকরা টিনের নল ব্যবহার করা ভাল। কেহ কেহ কৃত্রিম প্রস্তর ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন।

আমরা এতৎসম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। অনেকের বিশ্বাস আছে, যে জলে মদ মিশাইয়া খাইলে সেই জলের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। মাতালেরা নিজের দলপুষ্ট করিবার জন্য এরূপ বলিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞলোকে যে কেন এমন কথা বলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বোধ করি লোকের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদ খাইবার বাসনায় তাঁহারা এরূপ বলিয়া থাকেন। মদ মিশাইয়া অবিশুদ্ধ জল খাইলে এই লাভ হয়, যে দূষিত জলের অপকারের উপর মদের অপকারটুকুও আসিয়া জুটে। দান করিবার জন্য চুরি করায় যেরূপ পুণ্য, ইহাতেও সেইরূপ লাভ।

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮৩ সংখ্যা।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনার্য্যের দুই বংশ দ্রাবিড়ী ও কোল।

আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্য্যের বাস ছিল—তার পর আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্য্যেরা বন্য ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায়, বাঙ্গালার অনার্য্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্য্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে—কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটনগণকর্ত্তৃক ব্রিটেন জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেয়া ব্রিটন জয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েল্‌স্‌ কর্ণওয়াল্‌ বা ব্রিটানীপ্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে আর ব্রিটন্‌ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্ব্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের

সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্ম্মাণ্‌গণকর্ত্তৃক ইংলণ্ড-জয় ইহার উদাহরণ। আর্য্যগণ বাঙ্গালাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউটন্‌দিগের মত অনার্য্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন, বা নর্ম্মাণ্‌বিজিত সাক্সনের মত অনার্য্যেরা বঙ্গজেতা আর্য্য-দিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি, যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসী-দিগের মধ্যে অনার্য্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে, যে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্ব্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে, পেশোর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" "বেঙ্গল আর্ম্মি।" আর এক অর্থে বাঙ্গালা ততদূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্টগবর্ণরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই বাঙ্গালাশব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালি; আমরা সেই বাঙ্গালির উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্য্যজাতি বাঙ্গালার আর্য্য-কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছে তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি বাস করিতেছে—দুইই দেখিতে হইবে।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্‌মি, চুলকাটা মিশ্‌মি। তারপর অপরজাতি, তাহাও অনেক-প্রকার। যথা—পাদম্ মিরী দফ্‌লা, ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী, কোপয়ী, তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ব্বতের ভিতরে বাস করে, ভোটি, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত।) তার পর বাঙ্গালার পূর্ব্বদক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইন প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী, নওয়াতিয়া, প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিমদিকে, কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া ওরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই

আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্ব্বের অনার্য্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের তত্টা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী।

আমরা কেবল কয়টি প্রধান জাতির নাম করিলাম—আর ভিতর ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। সিজক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, ইহারা কলে কি একবংশসম্ভূত? আর্য্যেরা সকলেই একবংশসম্ভূত—আর্য্যশব্দের অর্থই তাই। কিন্তু "অনার্য্য" বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্য্য নহে—যাহারা আর্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয় এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদ্ভূত তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায়, যে ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আর্য্যগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে, যে তাহারা নানাবংশীয় তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিক্রিয়া এসকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিনশ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি) প্রথমশ্রেণীর ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তি-বিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারত-চৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য—আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব। দ্বিতীয়শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতি সকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলি জাতির ভাষা চৈনিকীয়—ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে—বা বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমায়। তাহারা অনেকেই আর্য্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্য্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্য্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরাণী-শ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সুসম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্য্যভাষাতে দ্রাবিড়ীভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্য্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জাতি—

কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন-জাতি।

যাহারা, অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে।* কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্য্যভাষাই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্যও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। এই কথা আরও প্রাঞ্জল করিবার জন্য বাঙ্গালার ষ্টাটিষ্টিকল্ আকৌণ্ট হইতে বেঙ্গল সিবিল্ সার্ব্বিসের রিজলি সাহেবের লিখিত কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। তিনি চুটীয়া নাগপুর বিভাগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেছেন, কিন্তু কথাগুলি সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খাটে।

"চুটীয়া নাগপুর প্রদেশের আদিমবাসীদিগের যতগুলি ভাষা আছে, সকল গুলিরই এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ভাষার যে গঠনকে প্রত্যয়বিশিষ্ট বলে (সংযোগ সাপেক্ষ) ঐ সকল ভাষাগুলিই সেইরূপ, এই জন্য এই ভাষাগুলি তুরাণী গোষ্ঠীর দক্ষিণ শাখার মধ্যে গণিত হয়। তন্মধ্যে উদয়পুর ও সরগুজার গোঁদ-জাতির ভাষা, আসল চুটীয়া নাগপুরের উরাঁও (ধাঁঙ্গড়) জাতির ভাষা, রাজমহলের পাহাড়ের পাহাড়িয়া দিগের ভাষা প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের সুসভ্য ভাষা সকলের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই জন্যে আচার্য্য মাক্ষমুলার্ এই ভাষাগুলিকে তামুলী ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সান্তালি মুণ্ডারি ও সিংহভূমের হো বা লড়কা কোলদিগের ভাষার সঙ্গে তামুলিক ভাষা সকলের সঙ্গে কোন শব্দে ঐক্য নাই। এজন্য মাক্ষমুলার সে গুলিকে ভিন্ন শ্রেণীতে বসাইয়া মুণ্ড নাম দিয়াছেন। ১৮৬৬ সালে ভারতীয়জাতিগণসম্বন্ধে সার্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ যে গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে বাঙ্গালা বেহার ও বানারস্ প্রদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা হইতে হায়দরাবাদ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের সম্মুখ পর্য্যন্ত আর পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত হইতে মধ্য ভারতবর্ষস্থ নাগপুর রাজ্যের সুসভ্য অংশ পর্য্যন্ত যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, তত্র বাসী অনার্য্যজাতিগণকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দ্রাবিড়ী অনার্য্য, অর্থাৎ যাহারা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা সকলের সদৃশ ভাষায় কথা কয়, দ্বিতীয় কোলারীয় বা উত্তরবাসী অনার্য্য, যাহারা মাক্ষমুলারের বর্ণিত মুণ্ড জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে। এই শেষোক্ত ভাষানিচয়ের দূরস্থিত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে যে সম্বন্ধ এবং যে সকল জাতিমধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহাদের আদি কি, এ সকল তত্ত্ব তৎকালে অনিশ্চিত রহিল। তুরাণী ভাষা সম্বন্ধে মাক্ষমুলার যে পত্র প্রচার করেন

তাহাতে বলিয়াছিলেন এই সকল ভাষার সঙ্গে অন্য কোন ভাষার সম্বন্ধ নাই। আর হজ্‌সন সাহেব তাঁহার প্রণীত কোচ বোড়ো ও ধিমাল জাতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, যে এই সকল ভাষাও তামুলিক। তবে যে দ্রাবিড়ী জাতি হইতে কোল বংশীয় ভাষা সকল ভিন্ন প্রকৃতি-গ্রস্ত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ এই যে মধ্যভারতবর্ষে নিবিড় জঙ্গলে পড়িয়া এই সকল জাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" হজ্‌সন সাহেব যে দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের সঙ্গে পূর্ব্ব-বাঙ্গালানিবাসী জাতিদিগের সম্বন্ধ সংস্থাপিত করণে ইচ্ছুক, আর তিনি যে তামুলিক শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা বুঝাইয়া দিয়া সর্‌জর্জ্জ ক্যাম্বেল্‌ দেখাইয়াছেন, যে সিংহভূমনিবাসী হো জাতিদিগের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ী ভাষা সকলের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণের ঐক্য আছে। যথা কোলীয় দ্রাবিড়ী ভাষাসকলে প্রকৃত প্রস্তাবে লিঙ্গভেদ নাই, অচেতনপদার্থ মাত্রই ক্লীবলিঙ্গ। প্রয়োজন মতে শব্দের অগ্রে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষণ শব্দে বিভক্তি নাই। অথবা তারতম্যবাচক শব্দ নাই। সর্ব্বনামের উত্তম পুরুষের বহুবচনের এবং তাহার সম্বন্ধ পদের দুইটি রূপ আছে, একটিতে মধ্যমপুরুষ বাদ, আর একটির ভিতরে মধ্যম পুরুষ থাকে। কিংবদ অদ্যাদি অর্থ বাচক সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়া পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। "যে মানুষগিয়াছে" না বলিয়া তাহারা "গত মনুষ্য" বলে। পক্ষান্তরে কোলবংশীয় ভাষাসকল দ্রাবিড়ী বংশীয় ভাষানিচয় হইতে অধিক পরিমাণে বিভক্তিসম্পন্ন। কোলে রীতিমত দ্বিবচন আছে দ্রাবিড়ীতে নাই। অধিকন্তু কোলীয় ভাষার শব্দকোষ অধিকতর সম্পূর্ণ। অতি সামান্য শব্দ ব্যতীত নিকটবর্ত্তী ভাষা হইতে যে অধিক শব্দগ্রহণ করিয়াছে এমত কোন চিহ্ন কোলবংশীয় ভাষায় নাই। যথা সংখ্যা নির্ব্বাচনকরণে গোন্দেরা দ্রাবিড়ী ভাষায় দশের বেশী গণিতে পারে না; ওরাঁওয়েরা চারির বেশী নয়। রাজমহলের পাহাড়িয়া দুইয়ের বেশী নয়। অবশিষ্ট সংখ্যা তাহারা হিন্দি হইতে গ্রহণ করে। কোল সাঁওতাল জাতি আপন আপন ভাষায় অনেক উচ্চ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণিতে পারে।

"অতএব এ পর্য্যন্ত কোল বংশীয়-দিগের আদিনির্ণয়সম্বন্ধে কেবল ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, দ্রাবিড়ীদিগের সঙ্গে তাহাদিগের দূরসম্বন্ধ থাকিতে পারে। ভাষার গঠনে যে সম্বন্ধের চিহ্ন আছে তাহাই সূচিত হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণেল ড্যাল্‌টন্‌ সাহেব বাঙ্গালার জাতিনির্ণয় সম্বন্ধীয় নিজ গ্রন্থে বিবেচনা করেন যে, কোলবংশীয়েরা যে দূর উত্তরপূর্ব্ব হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হজসন্‌ সাহেব বলিয়াছেন যে কিরা-

ভীয় প্রভৃতি নেপালপ্রদেশের বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতির ভাষায় সর্ব্বনামগুলিতে কোল বা মুণ্ডভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। ড্যাল্টন্ সাহেব নিজ মতের পোষকতায় উহার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আর পেগুপ্রদেশে তালাইঙ্গ বা মোননামে একজাতি আছে, তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসকলের চৈনাদিকজাতীয় ভাষা হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক একটি ভাষা ব্যবহার করে। সেই ভাষা চুটীয়া নাগপুর ও সিংহভূমের হো বা মুণ্ডদিগের ভাষার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। ড্যাল্টন্ সাহেব তাহাও দেখান। আর ব্রহ্মদেশীয় জাতিদিগের ইতিবৃত্তে কর্ণেল ফেয়ার, জে, আরলোগান সাহেবের একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। লোগান সাহেব বলেন যে, কোলদিগের ভাষা ও মোন্ আনাম্গোষ্ঠীয় ভাষায় কিং যদ্ তদাদি সর্ব্বনাম, নির্দ্দেশবাচক সর্ব্বনাম ও সংখ্যাবাচক সর্ব্বনামের ধাতুগত একতা প্রমাণ হইয়াছে। উভয়জাতীয় ভাষাই শাব্দিক মূলে এক কাণ্ডের দুই শাখা। দ্রাবিড়ী অপেক্ষা তিব্বত ব্রহ্মভাষাদির সঙ্গে তাহাদিগের অতিশয় সাদৃশ্য আছে।"

এখন লোগান সাহেব আরও দেখাইয়াছেন, যে আসামের খাসিয়া ও কোলদিগের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য আছে; আর সিংহভূমের হো ও খাসিয়াদিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও সমাধিচিহ্ন প্রভৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।*

ইংরেজলেখকেরা এই বংশের "কোলাধার" নাম দিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে কোলবংশ বলিব।

অতএব বাঙ্গালার তুরাণীয় অনার্য্যজাতির মধ্যে দুইটী বংশ পাওয়া যাইতেছে—দ্রাবিড়বংশ ও কোলবংশ। ইহাদের মধ্যে কোন জাতি বাঙ্গালার আদিমবাসী?

সে মীমাংসা অতি কঠিন। সমগ্র ভারতসম্বন্ধে ডাং মুরের যে মত নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ করিতেছি।

"উত্তরের অনার্য্যগণ এবং দক্ষিণের অনার্য্যগণ এক বংশসম্ভূত কি না এই প্রশ্নসম্বন্ধে ডাক্তার কল্ডওয়েলের মত এই, যে দ্রাবিড়ীদিগকে ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী মনে করা যাইতে পারে, অন্ততঃ ইহারা উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে প্রথমে ছড়াইয়া আইসে। কিন্তু আর্য্যেরা আসিয়া ইহাদেরই দেশাধিকারী দেখিয়াছিলেন কি তৎপূর্ব্বেই অন্য কোন শক জাতিকর্ত্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা নিরুপণ করা তত সহজ নহে। এবিষয়ের সুনিশ্চিত মীমাংসা না করিয়া, দ্রাবিড়ী ও উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষাসকলের অনার্য্যমূলক ভাগের সহিত আপাতপ্রতীত প্রভেদ দেখিয়া ডাং কল্ডওয়েল স্থির

* "*Statistical Accounts of Bengal Vol. XVI P. 255.*"

করিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ী ভাষা শকভাষার প্রাচীনতর অবস্থা। যদি এই মীমাংসা ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, যে উত্তর ভারতবর্ষীয় অনার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা দ্রাবিড়ীদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, এবং আর্য্যগণকর্ত্তৃক উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে তাহারাই দ্রাবিড়ীদিগকে উত্তর ভারতের অনেক অংশ হইতে বিচ্যুত করে। ফলতঃ ডাং কল্ডওয়েলের মতে দ্রাবিড়ীরা উত্তর ভারতবর্ষ হইতে আর্য্যগণকর্ত্তৃক দূরী-ভূত হয়েন নাই। সংস্কৃত বা দ্রাবিড়ী ভাষায় এই দুই জাতির মধ্যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহের কাথাবার্ত্তা নাই। সুতরাং আদৌ ইহাদিগের পরস্পর সখ্যেতরভাব অসম্ভব। যে সকল আর্য্য-পূর্ব্ব শক জাতীয়েরা উত্তরবিভাগ হইতে দ্রাবিড়ীদিগকে বিতাড়িত করে আর কোল সাঁওতাল ভীল ডোম প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের আদিমবাসী, ইহাদিগকে এক মনে করা অনুচিত। কোল ভীল সাঁও-তাল প্রভৃতি অনার্য্যজাতিরা দ্রাবিড়ীদের তাড়নায় অরণ্যে আশ্রয় লইয়া থাকিবে বা ভুটানজাতির ন্যায় উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। ডাক্তার কল্ডওয়েল মনে করেন এই সকল আরণ্যজাতির ভাষার সহিত উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষা সকলের অনার্য্য ভাগের কোন নৈকট্য নাই।"

অতএব পূর্ব্বে যে মতের সংক্ষেপ বিস্তার করা গেল সেই মত অনুযায়ী আমরা ভারতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে চারিটি ভিন্ন স্তবকে পাইতেছি।

প্রথম—সর্ব্বপ্রাচীন—কোল, সাঁও-তাল, ভীল প্রভৃতি বন্যজাতি, ইহারা উত্তরপূর্ব্বপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আ-সিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়—দ্রাবিড়ী, ইহারা উত্তরপশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, এবং স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, অথবা অন্যান্য পশ্চাদ্গামী অনার্য্যদলকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াই হউক, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

তৃতীয়। শেষকথিত শক বা অনার্য্য-দল, যাহারা উত্তরপশ্চিমপথে আসিয়া-ছিল, ইহাদিগেরই ভাষার সংযোগে সংস্কৃত হইতে উত্তরভারতের প্রাকৃত ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।

চতুর্থ। আর্য্যগণ।*

তৃতীয়শ্রেণীস্থ শকজাতির কোন চিহ্ন বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। অতএব কোলবংশ ভিন্ন অন্য কোন অনার্য্যজাতি যে দ্রাবিড়ীদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসি-য়াছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি। বাঙ্গালাভাষায় যে সকল অনার্য্যমূলক শব্দ আছে, তাহা কোল-বংশীয়দিগের ভাষা হইতে প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কোন প্রমাণ আমরা দেখি নাই। ডাক্তার হণ্টর কতকগুলি উদা-

* *Muir's Sanskrit Texts Vol. II P.* 485 to 487.

গ্রন্থে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

"অতি প্রাচীনকালে সংস্কৃতে ও সাঁওতালীভাষায়, অথবা সাঁওতালীর পূর্ব্বগামী ভাষার সঙ্গে সংঘর্ষিত হইয়াছিল। এমন সম্ভব, যে সংস্কৃত সাঁওতালী হইতে কতকগুলি অনার্য্যের উচ্চার্য্য বর্ণ গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক স্বীয় অসম্পূর্ণ বর্ণমালায় নিবিষ্ট করিয়াছিল। ইহা নিশ্চয় যে সংস্কৃত কথিত ভাষা হইতে কতকগুলি কথা লইয়াছিল, আর প্রাচীন প্রাকৃতে এবং আধুনিক সাঁওতালীতে সেই সকল শব্দগুলি আজি বিকৃতিশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের পক্ষে যেমন প্রাকৃত, প্রাকৃতের পক্ষে তেমনি বাঙ্গালা, মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে, সেই বাঙ্গালাও সাঁওতালী হইতে অনেক শব্দ লইয়াছে। ইত্যাদি।"*

হণ্টর সাহেবকে সংস্কৃতজ্ঞ বা বাঙ্গালার সুপণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উপরে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইল, তাহার সকলগুলির সমর্থনও করা যায় না। তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এতটুকু অবশ্য স্বীকার করা যায়, যে বাঙ্গালাভাষায় অসংস্কৃতমূলক কতকগুলি শব্দ সাঁওতালি হইতে প্রাপ্ত। অনুসন্ধান হইলে আরও কতকগুলির মূল সেইরূপ সাঁওতালি বা অন্য কোলবংশীয় ভাষাতেই পাওয়া যাইতে পারে। তবে সকলগুলিই কোলবংশীয়দিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে, এ কথাই বা না মানিব কেন? অথবা এ কথা না মানিয়া অনর্থক আর একটা তৃতীয় অনার্য্যবংশ স্বীকার করিব কেন? কোলবংশ ও দ্রাবিড়বংশ ব্যতীত অন্য কোন অনার্য্যবংশ যে আর্য্যদিগের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

তবে, বাঙ্গালাসম্বন্ধে কল্ডওয়েল সাহেবের মতের মধ্যে এইটুকু গ্রহণ করা যায়, যে কোলবংশীয়েরা দ্রাবিড়বংশীয়দিগের পূর্ব্বগামী। অতএব প্রথমে কোলবংশীয়দিগের কথা বলিতেছি।

---

* *Annals of Rural Bengal* P. 180.

বাঙ্গালা সাহিত্য।*

বর্ত্তমান শতাব্দীর।

ইদানীং ইংরেজদিগের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে নিঃশব্দে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নূতন ধর্ম্মপ্রচার নাই, বলপ্রকাশ নাই অথচ আমাদের মন ক্রমশঃ ফিরিয়া আর একরূপ হইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র চলিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালায় সেই পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদুর আর কোথাও হয় নাই। এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজিশিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ-উন্নতি ও সাহিত্য-উৎপত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙ্গালার সমাজ-উন্নতি অধিক ও সাহিত্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আজি সেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব। বঙ্গীয়সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়, কিরূপে এই বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিরূপে লোকের মন পূর্ব্বপথ হইতে ঘুরিয়া নূতন পথে দাঁড়াইয়াছে তাহা লিখিতে হয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল নেতার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্ত ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর ইতিহাস লিখিতে হয়, এবং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে সমাজে কেমন করিয়া পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহার সময় নাই। তবে যতদূর পারা যায় চেষ্টা করিব।

১৭৯৯ সালের শেষ দিন অতীত হইল। ১৮০০ সালের প্রথম দিন উপস্থিত। ভারতবর্ষের এমন অদিন, বোধ হয় আর কখন হয় নাই। ভারতের কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ, মারামারি, লাঠালাঠি, কাহাকেও বিশ্বাস নাই, যাহার গায়ে জোর সেই অন্যের উপর অবিবাদে অত্যাচার করিয়া যায়। সমস্ত দেশে রাজা নাই। যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা লুঠেড়ার সর্দ্দার। পরধন অপহরণ, পরপীড়ন, পরের প্রাণনাশ, তাঁহাদের নিত্য-কর্ম্ম। এই সময়ে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্তের কিরূপ অবস্থা তাহারদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

কাবুলের দুরাণীবংশ পতনোন্মুখ, সেখানে দুরাণী ও বেরুকজীদিগের পর-

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক উপলক্ষে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াছিলেন।

ন্দের বিদ্বেষভাব জন্মিতেছে, দুরাণীদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশসকলে সুতরাং গোলযোগ চলিতেছে, ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর, পেশোর প্রভৃতি প্রদেশে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে মুসলমানশাসন ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শীখরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে; এই রাজগণ পরস্পরের উপর আপনপ্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ধুতে আমীরদিগের রাজ্য এখনও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, সেখানেও মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ। সরহিন্দপ্রদেশে একজন ইংরেজ এই ঘোরতর অত্যাচারের সময় আপনার জন্য এক রাজ্য করিয়া লইয়াছেন. এবং মুসলমানের ন্যায় বহুসংখ্যক মুসলমানউপপত্নীতে পরিবৃত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন। রাজপুতগণের আর সে প্রতাপ নাই; যে প্রতাপে তাঁহারা একদিন সমবেত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সে প্রতাপ নাই; হিংসা দ্বেষ তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; সিন্ধিয়া, হোলকার, যখন ইচ্ছা তাঁহাদের দেশ লুঠ করিতেছে ও যখন ইচ্ছা তাঁহাদের নিকট হইতে অগাধ টাকা লইতেছে; দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে, আজিও সম্ভ্রম আছে। কিন্তু বাদশাহ নিজে বন্দী, শত্রুরা তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছে। তাঁহার নিজের অন্ন কে যোগায়—তাহারও ঠিক নাই। পেরোঁ নামক সিন্ধিয়ার একজন ফরাসিস সেনাপতি হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহারও শমরুর মত, কিছু নিজ উদ্দেশ্য আছে কি না কে বলিতে পারে? অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত কিন্তু তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি নিজপ্রাসাদে উপপত্নীপরিবৃত হইয়া বাস করেন; সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসম্মুখস্থ লাল বারদোয়ারীনামক অভিষেকস্থানও বিদ্রোহীদিগের করকবলিত থাকে, তাঁহার রাজ্য অপেক্ষা অরাজকতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাঁহার রাজ্যে ওমরাগণ করদরাজাগণ, জায়গীরদার ও তালুকদারগণ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে। বিনাযুদ্ধে কেহই খাজানা দেয় না, প্রতিবারই কর আদায়ের সময় আসিলে, ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক টাকা না দিলে সে সাহায্যও প্রায় পাওয়া যায় না। ইংরেজেরা আরও অধিক কিছু আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে রাজউপাধি দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। মধ্যভারতবর্ষে বুন্দেলখণ্ডে ক্ষুদ্র রাজাগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহারও দক্ষিণে গোন্দয়ানার বড় বড় ডাকাইতের দল তৈয়ারি হইতেছে। ইহারা একসময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ উলট পালট করিয়া দিবে।

সিন্ধিয়া ও হোলকার বড় শান্তিপ্রিয় নহেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর স-প্রীতি নাই, করদলার যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহারা জয়ী ও যাঁহারা জিত হন, উভয়পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। নিজাম হারিয়া অবধি হৃদয়মধ্যে ইংরেজ ও মহারাষ্ট্রাদিগের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষকে লালন পালন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীরা করদলা হইতে সেই যে আপন আপন ভবনে গিয়াছে, তার পর আর একত্র হয় নাই, উহারা যে যাহার আপন আপন রাজ্যবৃদ্ধি ও শত্রুনিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মহারাষ্ট্রাদিগের মধ্যে বড় রাজা আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীজিরাব যেখানকার ওমরাহগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বময়কর্ত্তা; উন্মত্ত যশোবন্তরায় যেখানকার শাসনকর্ত্তা, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কুসংস্কারাপন্ন অবিমৃষ্যকারী বাজীরাও যেখানকার পেশোয়া, সে রাজ্যে কি সুখ সম্ভব? সেখানে কি শান্তি থাকিতে পারে? সেখানে কি লোকের সাহিত্যানুরাগ থাকিতে পারে। মহারাষ্ট্ররাজ্যের দক্ষিণে ইংরেজরাজত্ব সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিটীসরাজত্বের প্রথম অংশে, যেরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; তাহাতে আবার যখন টীপু তৃতীয়বার হারিয়া মরিয়া হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহীসুরের গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়া দেন, বিনাপরাধে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ করেন। দক্ষিণে অন্যান্য স্থানে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব ছিল সত্য, কিন্তু মান্দ্রাজে যে সকল ইংরেজ কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা দেশীয় জঘন্য রাজাও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহারা কর্ণাটের নবাবের দেনা লইয়া যে জঘন্য কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া ইংরেজনাম কলঙ্কিত করা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে হিমালয়প্রদেশে, যে উত্তরাখণ্ডে, কখন মুসলমান যাইতে পারে নাই, গোর্খাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষায়, রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় সেখানেও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, পাহাড়মধ্যেও অরাজক। গ্রামবাসীরা লুঠের ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর।

এরূপ অরাজকসময়ে যখন কালি কি হইবে, কেহই বলিতে পারে না, যখন পরের উপর অত্যাচারই রীতি; যখন কাহার প্রাণ, মান, ধন রক্ষা হয় না, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতাশালী একজনও লোক সমস্ত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া মিলে না। তখন কি সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে; তখন কি লোকের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে? যখন ভয়েই লোকে অভিভূত, তখন কে লেখাপড়া শিখিবে, কে লিখিতে বসিবে? বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্যলোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন বাঙ্গালা-সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিভোগ করিতেছিল। এটী লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোল-যোগ থাকিলে বাঙ্গালির মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই। প্রথম ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হইবে তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর আমরা যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি তখন বাঙ্গালা বলিলে ইহা বুঝাইত না। বাঙ্গালার গবর্ণরের কর্তৃত্ব উড়িষ্যায় ছিল না। উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র-করকবলিত ছিল। উড়িষ্যার করদ ও মিত্র রাজগণ নিরন্তর মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠ পাঠ করিত। বীরভূম, বরাহভূম, সবেমাত্র ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছে। আসাম, কাছার, তখনও ইংরেজদিগের নয়। অতি অল্প পরেই মাঘেরা (ব্রহ্মদেশীয়গণ) অরাজক আসাম দখল করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। ভূটান শত শত বৎসর ধরিয়া নিরন্তর অরাজকতায় ভুগিতেছিল। ভূটানে সুবেদারেরা তংশো পেন্‌লো, পেরো পেনলো, প্রভৃতি সকলে আপন আপন ধর্ম্মরাজা ও দেবরাজা খাড়া করিয়া আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিত। সময়ে সময়ে তাহাদের যুদ্ধ গড়াইয়া রংপুর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত। যদিও মুসলমানেরা ভিন্ন আর কেহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতেই আসে নাই তথাপি বাঙ্গালার সীমা প্রদেশে শান্তি সুখ একেবারে ছিল না। আর বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা নৃত্য করিত। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা শ্মশানকালীর রঙ্গভূমি হইয়াছিল। Double Government এর সময়ে রণদুর্ম্মদ ইংরেজগণ কাহাকেও মানিত না, তাহারা না করিয়াছে এমন কার্য্যই নাই, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, ক্ষমতা, কিছুতেই তাহাদের মন বিচলিত করিতে পারিত না। Double Government এর সময় যেমন ছিল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ছিল। ইংরাজেরা তিন চারিবৎসর থাকিয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন। আর তাঁহাদের বাঙ্গালি প্রিয়পাত্রগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় স্বজাতীয়গণের মুণ্ডপাত করিয়া বড় লোক হইয়া উঠিতেন। ৫৬ হইতে ৯৩ পর্য্যন্ত যাহা ছিল, ৯৩ সাল তাহার চূড়ান্ত হইয়া গেল। দেশের যা কিছু ছিল কর্ণওয়ালিশপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীতে তাহাও গেল। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বে তিন শক্তি ছিল, এই তিন শক্তির মূল তিন; মুসলমান গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় জমীদার, ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত। এই ৩৭ বৎসরে মুসলমান গবর্ণমেণ্টেরও শেষ হইয়াছিল। নবাব বহুলক্ষ টাকা পেন্সন পাইয়া উপপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া নিজ-

প্রাসাদে বাস করিতেন ও যতদূর তাঁহার সম্পর্কের গন্ধ থাকিত ততদূর দূষিত বায়ু চরিত্রদোষরূপ সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি করিয়া দিত। বড় বড় জমীদারগণ সাহেবের শোষণে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিলেন। মীরকাসিম অনেকগুলির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা বন্দোবস্তে অনেকগুলির উচ্ছেদ হয়। দেশের লোক যাহাদিগকে আপনাদের কর্ত্তা বলিয়া বহুকাল আদর ও ভক্তি, মান্য ও ভয় করিয়া আসিতেছিল, যাহারা প্রথম স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ, শেষ অধীন রাজা ছিল, তাহাদিগের এইরূপ পরিণাম হইতে লাগিল। তার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল ; ইহার সঙ্গত নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে। ইহার আসল নাম চিরঅস্থায়ী বন্দোবস্ত, কারণ ইহাতে কেহই বলিতে পারেন না যে আমার জমীদারী স্থায়ী হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারগোষ্ঠীর শেষ হইল। বড় বড় রাজপরিবার ঠিক সময়ে টাকা না দিতে পারায় জমীদারীচ্যুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর, চাঁচড়া প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারদিগের সম্পত্তি হুহুস্বরে নীলাম হইতে লাগিল। কিনিল কে? মাজিষ্ট্রেটের প্রিয়মুহুরী—জাতিতে নাপিত, Foreign Department এর নায়েব—জাতিতে সদ্গোপ, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী গোমস্তা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা অধিক নহে। জমীদারের কর্ম্মচারীরাই এ বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ, তাঁহারা প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেন। দূরস্থ জমীদার তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার পর জমীদারী খাজনার দায়ে নীলামে উঠাইয়া দিয়া আপনি ক্রয় করিয়া লইলেন। একস্থানে এমন হইয়াছে যে জমীদারের খাজানা লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ নৌকা ডুবি রটাইয়া দিয়া সেই টাকায় গোমস্তা আপনি জমীদারী কিনিয়া লইলেন। একস্থানে একজন ডাকাইতের সর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের খাজনা লুঠ করিয়া নগদ টাকার জোরে জমীদার হইলেন। অনেক স্থলে লাঠির জোরে জমীদার হইতে লাগিল। একজনের লাঠির জোর থাকিলে দশ পনর ক্রোশের মধ্যে কাহারও রক্ষা থাকিত না। যাহারা সাহিত্যসংসারের উন্নতি করিত, যাহারা পণ্ডিত প্রতিপালন করিত, যাহাদের কল্যাণে আমরা অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহাদের এই দশা হইল। যাঁহারা তাহাদের স্থানপ্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা আর একসম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা ঘোরতর কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা গুরু পুরোহিতের একান্ত ভক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র কচকচি তাঁহাদের চক্ষুঃশূল।

মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার ভিন্ন বাঙ্গালার আর এক শক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এই অরাজকের সময়, ঘোরতর অত্যাচারের সময়, ভয়ানক বিশৃঙ্খ-

ল্যার সময় যদি কেহ দেশের জন্য যথার্থ ভাবিত তবে সে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। এই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্ম্মিক ইষ্টনিষ্ট ভট্টাচার্য্যকে আদর করিত, লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দু-ধর্ম্মের হিন্দুসমাজের আর্য্যজাতির চূড়া বলিয়া জানিত। তাঁহারাও আজিকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় লোভী ক্ষমতা-প্রত্যাশী ও স্বার্থপর ছিলেন না। ধর্ম্ম-বলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন, তাঁহাদের সাহস ও অকুতোভয় ছিল। তাঁহাদের এই সাহসের সূক্ষ্ম হেতুও ছিল। তাঁহা-দের সঙ্গে সর্ব্বদাই ৬০। ৭০ জন ছাত্র থাকিত। ছাত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ ও গুরুকার্য্যে আত্মসমর্পণেও কৃতসংকল্প। এই সময়ের জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গোঁসাই ভট্টাচার্য্য বলরামশ্চ শঙ্করঃ মাণিক তর্কভূষণ প্রভৃতি লোকের নাম কাহার অবিদিত আছে? তাঁহারা এই গোলযোগের সময় ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, অধ্যাপক ও সময়ে সময়ে সমাজের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কত কত পরিবারকে যে তাঁহারা কত উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ইংরেজ যথার্থ বিচার করিতে চাহিতেন, এই ভট্টাচার্য্যগণ যে তাঁহাদের কত বিষয়ে সাহায্য করিয়া-ছেন, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি তাঁহাদের ব্যবসায় নহে। তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্য-ব্যবসায়ী ছিলেন না। বিশেষ তাঁহা-দের উপর এত কার্য্যভার পড়িয়াছিল যে তাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা থাকি-লেও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহা-দেরই কি পরিণাম হইল। ১৭৯৩ শালে হুকুম হইল, আইন হইল, যে ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। আবার ১৮২৮ ও ১৮৩৩ অব্দে বাজেয়াপ্ত আইন পুনরায় বিধিবদ্ধ হইল। তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইল। যে ব্রাহ্মণকুল নির্ব্বিবাদে স্বাধীন উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাদের তেজে সাহসে ও নির্ভীকতায় অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলাও কাঁপিতেন, তাঁহারা এই অবধি বড়মানুষের আশ্রিত হইতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড়মানুষের সভাশোভাবিধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে এক্ষণে তোষামোদ ভট্টাচার্য্যদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে, তাহাও এইরূপ ব্রহ্মোত্তর-ভোগীদিগের লিখিত, সুতরাং আর নূতন ব্রহ্মোত্তর হইবে না এবং অনেক পুরাতন ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হইবে, আইন করায় বঙ্গীয় বিদ্যা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল। উন-বিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্য্যন্ত ভট্টা-চার্য্যদিগের প্রাধান্য ছিল সত্য; কিন্তু চিন্তাশীলব্যক্তিমাত্রই জানিতে পারিয়া-ছিলেন যে, সে প্রাধান্য অধিক দিন থাকিবে না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদির

পর যে সকল পণ্ডিত হইয়াছিলেন সকলেই জানে যে, তাঁহারা উক্ত মহাত্মাদিগের অপেক্ষায় অনেক অংশে নিকৃষ্ট; তাহার পর আরও নিকৃষ্ট, তাহার পর আরও নিকৃষ্ট শেষ এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ভূমিকায় খ্যাতনামা ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননমহাশয় বলিলেন, যে, ভট্টাচার্য্যগণ চারি পাঁচখানি ব্যতীত পুস্তক পড়েন না, এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতিমহাশয় বলেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ন্যায়শাস্ত্রের ৬৪ ভাগের একভাগমাত্র পড়িয়া পাঠসমাপ্ত করেন। ১৯ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভট্টাচার্য্যদিগেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উচ্ছেদ হইতে লাগিল।

যে তিনশক্তিতে বঙ্গসমাজ চলিত, তিনেরই ক্রমে ধ্বংস হইতে লাগিল, অথচ নূতন সমাজ গঠিত হইল না। সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হন। Double Governmember সময়েই ৬৫ হইতে ৭২রের মধ্যেই প্রাচীন কবিগণ গত হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রামবসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন? ইহাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার অনেক উপাসক আজিও আছেন, তাঁহার নাম হরুঠাকুর, ইনি কবির দল সৃষ্টি করেন; কবির দল স্থায়ী কার্য্য কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তৎকালীন হঠাৎ অবস্থার জমীদার ও বাবুদিগকে প্রীত করিবার জন্য উপযুক্ত মত গান বাঁধিতেন, তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ঘোর অত্যাচার অরাজক ও বিশৃঙ্খলার সময় তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশ না হইয়া ঐরূপেই বাহিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন বাঙ্গালায় সৃষ্টি, বাঙ্গালির গৌরবের ধন, কিন্তু কীর্ত্তনরচয়িতা উনবিংশশতাব্দীর প্রথমে কেহই জীবিত ছিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ আপনাদিগকে ভূমিকা লইয়া কষ্ট দিয়াছি; বোধ হয় আপনারা আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হইবে যে, প্রাচীন বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন বিদ্যা লোপ হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে সাহিত্য কে করিল? সে সূত্রপাত কে করিল? বঙ্গবাসী এইবার তোমার বড়ই লজ্জার কথা। বিদেশীয়দিগের উৎসাহে বিদে-

শীয়দিগের উপকারার্থ বিদেশীয়দিগের যত্নে বিদেশীয় পণ্ডিতকর্ত্তৃক তোমাদের সাহিত্য আরম্ভ হইল। সিবিলিয়ান্‌দিগের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ানদিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েল্‌স্‌লিদ্বারা বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল, তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টর ও কেরী, আর একজন তিনি জাতিতে উড়িয়া, তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। উড়ে ও সাহেবে বাঙ্গালায় সাহিত্য আরম্ভ করিল। আরও লজ্জার কথা এই যে, যে দুই একজন বাঙ্গালি এই সময় পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুস্তক কদর্য্য ও জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র রায়চরিত্র ও প্রতাপাদিত্যচরিত্র বাঙ্গালির লেখা। দুইখানিই অপাঠ্য।

এইরূপে বাঙ্গালায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের সূত্রপাত হইল, সাহেবেরা নিজজাতিস্বভাবসুলভ অধ্যবসায়সহকারে বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্যের উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব রহিল। ১৮০১ অব্দ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, যেরূপ শান্তিস্থাপন হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোকে কতকটা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালার অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল; ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, গঙ্গার দুইধার ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল; বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার কত কত পরিবার যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানে বাস করিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। ক্রমে এই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থানেই সাহিত্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইতে লাগিল। এই স্থানে লোকে সর্ব্বদা ইংরেজদিগের সংসর্গে আসিত, সর্ব্বদা নানাদেশীয় লোকের সংসর্গে আসিত, তাহাদের ভাব সকল হৃদ্গত করিত, ক্রমে এই সকল দেশে সভ্যতার আবির্ভাব হইতে লাগিল; ক্রমে ব্রিটিসদিগের প্রতাপও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, আমরা এই সময়ের নাম transition period বা পরিবর্ত্তনসময় বলিব। যেদিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন, সেইদিন হইতে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, সেইদিন হইতে নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল, এই পরিবর্ত্ত এখনও চলিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনসময়ের যে যে দোষ গুণ তাহা আর বড় একটা দেখিতে

পাওয়া যায় না; এখন আর ঠিক পরিবর্ত্তসময় নহে, এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইংরেজেরা এই জন্য অধুনাতন সময়কে ইয়ং বেঙ্গলের সময় বলেন, আমরাও সংক্ষেপে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলি।

পরিবর্ত্তসময়ে বহুসংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হয়, যাহাতে সমাজ নূতন পথে নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে, তাহাই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরুতর কার্য্যে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনসময়ে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালা ও ইংরেজি এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়, যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া যান, তাঁহাদের অনেকের নাম না করিয়া, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের নাম করিতে সকল বাঙ্গালিরই মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হওয়া উচিত। তাঁহারা আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতারূপ করলাভের বিলক্ষণ উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, ইনি ইংরেজি ও বাঙ্গালায় শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমস্থাপনকর্ত্তা, ইনি সর্ব্বপ্রথম সমাজসংস্কারক, ইনি সর্ব্বপ্রথম ইয়ং বেঙ্গল, ইহার ক্ষমতা অপার, ইহার বিদ্যা অগাধ, ইহার মত দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেহ ছিল না। ইনি, সমাজ যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্ব্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালিলেখক, ইহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য, বাঙ্গালির অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্ব্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয়, গৌরীশঙ্কর—বাঙ্গালায় রামমোহন রায়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙ্গালা গদ্যের একজন শিক্ষাগুরু, রামমোহন রায়ের—তাঁহার মতের এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের—ঘোরতর বিদ্বেষী, এবং হিন্দুসমাজের মহামান্য অগ্রণী। প্রথম নাই হউক, তখনকার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদক।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত, তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান সম্বাদপত্রের সম্পাদক, নানা রসপরিপূর্ণ কবিতালেখায় চমৎকারশক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু ইহাঁর আর এক গুণ ছিল, লেখকবর্গের সে গুণ প্রায় থাকে না; এ জন্য লেখকদিগের সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তিও প্রায় লোপ হয়। ইনি অল্পবয়স্ক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ভদ্রসন্তানগণকে লেখা শিখাইতে যত যত্ন করিতেন, এত বোধ হয়, কখন কোন দেশে কোন কালে কোন লেখক করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অধিক কি বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

তাহার পর রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদিগের দেশের আজিকার সমাজের নেতৃ। পরিবর্ত্তন সময়ের মূর্ত্তিমান ইতিহাস। এই প্রাচীন বয়সেও ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, আর কয় জনের তাহা আছে? ইনি যাহাতে ইংরেজিভাব দেশীয়লোকের মনে প্রবেশ করে, তাহার জন্য যে কত চেষ্টাই করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইঁহার সঙ্কলিত, রচিত ও অনুবাদিত গ্রন্থাবলী একত্র করিলে একটি পুস্তকালয় হয়, ইঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম একখানি Cyclopedia; বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইংরেজিশিক্ষার উন্নতি ইঁহার জীবনের মন্ত্র। ইনি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ্।

তাহার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ইঁহার বিবিধার্থসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বপ্রথম সাময়িকপত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ইনি নিজে অগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটীর অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজি লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন, এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এ জন্য আমরা দুঃখিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা আর কোন একজন লোক বা একটি সোসাইটিদ্বারা হয় নাই।

পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরলগদ্যের জন্মদাতা; যখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাটি বাঙ্গালার কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর। ইনি কে আমি জানি না, জানিবার বুঝি উপায়ও নাই; কিন্তু ইঁহার রচিত পুস্তকাবলী আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়া যে কত উপকারলাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তন সময়ের ইনিও একজন প্রধান লেখক ও সংস্কারক। ইঁহার সম্বন্ধে মহা-

বর্ত্তি বীম্‌স্ বলিয়াছেন "He has had many imitators and certainly stands very high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language for wit spirit and clever touches of nature."

হুতোমপেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদি-পুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

ইঁহাদের পর সংস্কৃতকালেজের দল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, বহুসংখ্যক উত্তম নাটকের প্রণেতা, অম্বু বাদক শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক লেখক এই সময়ে সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইংরেজিভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেন না। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালিকে উপহার দিতেন। ইঁহাদের কত লোকের নাম করিব? সকলেই পূজ্যপাদ, সকলেরই নিকট বাঙ্গালা নানাকারণে বাধ্য। ইঁহারাই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে ও সিংহ মহোদয়কে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বাঙ্গালি পাঠককে অগাধ রত্নরাশির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দলের সর্ব্বাগ্রণী এমন কি পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধাননেতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এখনও করা হয় নাই। ইনি একা একশত, ইনি যে বাঙ্গালিকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিবার সময় যে গবর্ণমেণ্টকে কত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। ইনি সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিখাইয়াছেন, ইঁহার কথামালা ও চরিতাবলীর ভাষা যদি বঙ্গীয় সর্ব্বপ্রধান লেখকও পড়েন, অনেক উপকার লাভ করেন। তাহার পর ইঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা, ইঁহার স্বভাবসিদ্ধীকতা, স্বাধীনভাব, দেশীয় সমস্ত যুবকবৃন্দের আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত।

পরিবর্ত্তন সময়ের লোকে যে, শুদ্ধ নিজে নিজে সকল কার্য্য করিতেন এমত নহে, তাঁহাদের সমবেত কার্য্যও ছিল। এই সমবেত কার্য্যের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রধান। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকা প্রচার হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, ও দেশের বহুবিধ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত

একটীমাত্র সভার কাগজ হয় নাই, উহা তখন সমস্ত বাঙ্গালায় ইয়ুরোপীয়ভাব প্রচারের মিসনরি ছিল, উহা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে কত যে নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। বাঙ্গালির ছেলেদের মধ্যে ইংরাজীভাব প্রবেশ করান সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্তদ্বারা সাধিত হয়। তিনিই বাঙ্গালির সর্ব্ব প্রথম নীতিশিক্ষক; তাঁহার চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থ বিজ্ঞলোকেও পাঠ করিয়া নীত্যাদিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। বালকেরা এইসকল গ্রন্থ পাঠে কতদূর উপকৃত হয়, তাহা বলা যায় না।

এই সময় কবিওয়ালারা, যাত্রাওয়ালারা বিশেষ পাঁচালীওয়ালা দাশরথী রায়, বাঙ্গালাভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন সময়ের প্রধান প্রধান নেতৃগণের নামকীর্ত্তন করিলাম, ইঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক ও মহৎ, ইংরাজীভাব বাঙ্গালিকে বুঝান; ইংরাজীভাব বাঙ্গালির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করান। একালের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই কার্য্যে এত খেপিয়াছিলেন যে, একজন অতিসুশিক্ষিত যুবক—তাঁহার নাম আমার স্মরণ নাই, তিনি ইস্কুলের মাষ্টার ছিলেন, এবং ইংরেজি বিদ্যায় বৃহস্পতি ছিলেন—রাস্তায় চলিবার সময় মুটে, মজুর, মুদী, ভদ্রলোক, যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "গোরু খাবি," "গোরু খাবি?" তাহারা গালাগালি দিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "ওরা ত খাবেনা জানিই, তবে রোজ রোজ শুনিতে শুনিতে শেষ idea টা আর অত shocking হইবে না।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ ইউরোপীয় ভাব সকল দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। পরিবর্ত্তনসময়ের লোক আজিও অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি সেকালের লোকের মনের কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাঁহারা অনেক অধিক বলিতে পারিবেন।

তবে মূলতঃ পরিবর্ত্তন সময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দুকালেজের ছাত্রগণকর্ত্তৃক ইংরাজী ভাবের প্রচার, ও সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণকর্ত্তৃক সংস্কৃতঅনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালান, বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ও উন্নতি, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। এখন দেখা যাউক এইসকলের ফল কি হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে; পরিবর্ত্তন সময়, অনুবাদের সময়, শিক্ষার সময়, জিনিয়সের সময়, বড় বড় চিন্তাশীলগণের সময়, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি তাঁহাদেরই কৃপায়, তাঁহাদেরই অধ্যবসায়ের গুণে তাঁহাদেরই উচ্চকামনার ফল। কিন্তু তাঁহারা

পরিবর্ত্তসাধন করিয়া তুলিয়াছেন, এমন পরিবর্ত্তন কি আর কখন হইয়াছিল, তাঁহারা যে সমাজ, যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, এমন কি আর কখন হইবে? যত ভাব তাঁহাদের সমবেত পরিশ্রমে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এত কি আর কখন কোন দেশে কোন কালে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? অদ্যকার যুবকগণ এই পরিবর্ত্তন সময়ের দরুণ যত উপকার পাইয়াছেন, এত কি কোন দেশে কোন কালে কোন যুবকদল পাইয়াছেন? এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত ইউরোপে একবার হইয়াছিল; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা করিলে সে অতি সামান্য। যখন ১৪৫৪ শালে রণদুর্ম্মদ ওসমান্‌অলি মহম্মদ নূতন রোম দখল করিয়া কাইসরের উত্তরাধিকারিগণকে সাম্রাজ্যচ্যুত করিল, সেণ্ট সফির গির্জ্জাকে মস্‌জীদ করিল সেই সময়ে যখন নূতন রোমের পণ্ডিতবৃন্দ বিনিস-সাগরপারস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিজের বিদ্যা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন একবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ইউরোপে ঘটিয়াছিল, এইরূপ নূতনভাবে লোকে উন্মত্ত হইয়াছিল, লোকের মনে এইরূপ একটা ভীষণ গোলমাল হইয়াছিল, এইরূপ উৎসাহের সহিত লোকে নূতন বিদ্যা শিখিতে এবং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এ পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। তখন শুদ্ধ গ্রীকদিগের সাহিত্য পুনঃপ্রচার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এখন বাঙ্গালায় কি হইয়াছে একবার দেখ দেখি? প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমস্ত বিদ্যা বাঙ্গালির সম্মুখে আপনাদের গুপ্তভাণ্ডার প্রকাশ করিতেছে। এখনকার ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে তখনকার গ্রীক সাহিত্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার উপর আবার সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আছে, বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনরুদ্ধার আছে। দেখ দেখি একবার কত অগাধ ভাণ্ডারের আমরা একেবারে অধিকারী হইয়াছি! এত সম্পদ কাহার ভাগ্যে ঘটে? একদেশে আর একদেশের সাহিত্য প্রচারে মহাবিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ফ্রান্সে গিয়া গতশতাব্দীতে এতকাণ্ড করাইয়াছে, আর আজি আমাদের দেশে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জর্ম্মনির, ইতালির, প্রাচীন হিন্দুদের ও প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সাহিত্য উপস্থিত। আমরা এক এক সময়ে এই অগাধ সাহিত্যরাশি চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এইসকল সাহিত্যের সকল পুস্তক ভাল করিয়া পড়া অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের যদি চারি পাঁচ খানি করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা "মাষ্টার পিস" পড়ি তাহা হইলে দশবৎসর কাটিয়া যায়। বাস্তবিক এত সাহিত্যও কখন একেবারে এক অন্ধতমসাচ্ছন্ন দেশে উপস্থিত হয় নাই, আর এই সাহিত্য লইয়া আয়ত্ত করিতে পারে, ইয়ংবেঙ্গল

ভিন্ন এমন জাতিও আর কখন হয় নাই। আর এই সকল নানাদেশীয় ভাব এক করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার বিষয়ে ইয়ং বেঙ্গলের যত সুবিধা, বোধ হয় আর কোন দেশের লোকের কখন এত হয় নাই। প্রধান সুবিধা, সমস্ত দেশে শান্তিস্থাপিত আছে, কোথাও কোন গোলযোগ নাই, প্রাণ ও ধন সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের লেশমাত্রও নাই, জমীদারের অত্যাচার নাই, কুসংস্কারাপন্ন গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য নাই, স্বাধীন চিন্তার ব্যাঘাত দেয় এমন কিছুই নাই। স্বাধীন দেশে, দেশশাসন, শান্তিরক্ষা, বিচার কার্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হেতু কত কত মহাপ্রতিভাশালী লোকের প্রতিভাবিকাশ হইতে পারে না। বাঙ্গালির অদৃষ্টে এ সকল কার্য্যের জন্য ইংরাজ আছেন। বাঙ্গালি ইচ্ছা করিলে নির্ব্বিবাদে নিরাপদে দেশের সমাজের ও সাহিত্যের উন্নতিতে সমস্ত মানসিকশক্তি ব্যয় করিতে পারেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে। ৩০। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশমাত্র সভ্য ছিল। এই প্রদেশেমাত্র নূতন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইস্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সে সভ্যতা, সে নূতন সমাজ সে সাহিত্য সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়াছে, অতি নিভৃত জঙ্গলমধ্যে নূতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণ দেখিতে হইবে, বাঙ্গালি ইয়ংবেঙ্গল এমন সুবিধার কি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা নূতন সাহিত্যগঠনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নূতন চিন্তাস্রোতঃ কতদূর চলিয়াছে, আর যাহা হইয়াছে তাহা হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে।

আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। তিলোত্তমা ১৮৬০ সালে প্রচার হয়, তাহার পর বিশবৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে। এই কুড়িবৎসরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাকে সাহিত্য বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। এই সাহিত্যের যেরূপ বৃদ্ধি, যেরূপ দ্রুত উন্নতি, তাহাতে ইহার পরিণামসম্বন্ধে অসীম উন্নতি আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। আমাদিগের এই বাল সাহিত্যকে সাহিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার ও ইহার ভাবী পরিণামসম্বন্ধে নানারূপ আশা করিবার বিশেষ কারণও আছে, এটি শুদ্ধ আমার নিজের কথা নহে, অন্ধবিশ্বাস নহে, বৃথা আশা নহে, যখন আটবৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল, তখন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময় হইয়াছে। তাহার আটবৎসর পরে কতই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা সেই সাহিত্যের আরও গর্ব্ব করিব, আশ্চর্য্য কি? তার

তীয় আর্যাভাষা সমূহের তুলনিতব্যা-করণকার মহামতি বীমস্ সাহেব দশ-বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমালোচনাস্তে বলিয়াছেন। "That the Bengalis possess the power, as well as, the will to establish a national literature of a very sound and good character cannot be denied." আরও পুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ফল কথা সত্যযুগে সরস্বতীসন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথীসন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্বপিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

এই কয়বৎসর মধ্যে কত নূতন পুস্তক হইয়াছে, কত নূতন পরিবর্ত্ত হইয়াছে, এবং এই সকল পুস্তক ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইতেছে, পরিবর্ত্তে ক্রমেই দেশের অধিক মঙ্গল হইতেছে।

আমার বোধ হয় সকলে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি, আমি নিয়ে অনেক কথা ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি, যাঁহারা এই দশবৎসর মধ্যে নানা সংস্কৃত ও ইংরেজি পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা নানাবিধ স্কুলবুক লিখিয়া উজ্জ্বলমতি বালকবৃন্দের মনে নানাবিধ ভাবের উদ্রেক করিতেছেন, তাঁহাদের কথা কিছু বলিতে পারিব না। যাঁহারা ইংরেজি বিজ্ঞান অনুবাদ করিয়া দেশের মহতী শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও বলিতে পারিব না। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা নূতন মত আবিষ্কার করিয়া, অনুবাদ করিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয়দিগকে নানাপ্রকার হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরনিরপেক্ষ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা বলিতে পারিব না, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যেসকল মহোদয়গণ বঙ্গীয়সম্বাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহাদের নামও করিতে পারিব না। কিন্তু যেমন শিব বিষ্ণু ও দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজায় পূর্ব্বে "আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ" "ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ" ফুলচন্দন দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অবতীর্ণ হইব। এরূপ সংক্ষেপ করিবার আরও একটি কারণ আছে; আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি তাঁহাদের ও তাঁহাদের কার্য্যের সহিত পরিচিতও নহি; আর আমি তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিও বিশেষরূপে অবগত নহি। অতএব তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমার নিজ বক্তব্যপথে গমন করি।

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঁহার জীবনে-

ও ইহাঁর পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্তকল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইহাঁর মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য, না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য, না হয় বলি উহা উন্মাদের কাব্য? তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার বীরাঙ্গনা গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুইবৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকালমৃত্যুহেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার জীবন শোকান্ত-মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা এক একটি রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইজন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। মাইকেল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও জীবিত আছেন। হেমচন্দ্র গীতিমালায় দেশীয় লোকের মধ্যে প্রথম উচ্চতর ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার কবিতাবলী অতুল্য পদার্থ; উহাতে সত্য সত্যই মন গলাইয়া কবির অভিলষিতপথে চালাইয়া দেয়। তাঁহার বৃত্রসংহার স্বদেশহিতৈষায় পরিপূর্ণ। তিনি মাইকেলের শিষ্য, বৃত্রসংহারে মাইকেল তাঁহার আদর্শস্থল। মাইকেলের মেঘনাদ অপেক্ষা তাঁহার বৃত্রসংহার কোন কোন অংশে নিকৃষ্ট হইলেও উহা বঙ্গ-

বাসীর অধিকতর আদরের জিনিস, উহাতে মাইকেলের উদ্দামকল্পনা না থাকিলেও উহার আদ্যন্ত একভাবে সুন্দররূপে গ্রথিত। হেমচন্দ্রের বৃত্র ও কবিতাবলী বহুকাল বাঙ্গালার প্রধান পুস্তকমধ্যে গণ্য থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের নাশ নাই। হেমচন্দ্র ইংরেজি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যগুলির অনুকরণ বাঙ্গালায় করিতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, বোধ হয় অনেকস্থলে তিনি কাব্যগুণে তাঁহার আদর্শকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার উৎপত্তি উদ্দাম অথচ সুগঠিত প্রতিভার সুন্দর বিকাশ।

মাইকেলের সমসাময়িক দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল, ইহাঁর পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনীশক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না; কিন্তু ইহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি নীতিকুসুমাঞ্জলিনামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মত পরিষ্কার ইংরেজিতে যাহাকে smart, বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার, ঠিক অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বহুসংখ্যক কবিতা লিখিয়াছেন, ইহাঁর পলাশীর যুদ্ধ বীররসপূর্ণ কবিতামালায় পরিপূর্ণ। তাঁহার রাণীভবানীর চরিত্র আমাদিগের হৃদয়প্রস্তরে চিরঅঙ্কিত থাকিবে।

ইহাঁদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বরগুপ্তের ছাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের হাতের তৈয়ারি; ইহার উপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত আর কাহার উপর পারেন নাই। সমাজচিত্র অঙ্কনে ইনি অদ্বিতীয়, ইঁহার সধবার একাদশী ও জামাইবারিক সমাজের উৎকৃষ্ট চিত্র। সমাজে দোষ দেখাইয়া সেই দোষকে ব্যঙ্গ করিতে হইলে যত দূর সম্ভব, ইনি ততদূর অতিরঞ্জিত করিতে পারেন। ইহার লীলাবতী অপূর্ব্ব পদার্থ। ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজের উৎকৃষ্ট নিয়মাদি অনুকরণে অক্ষম হইয়া অথচ প্রাচীন সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তৎকালের যুবকগণ কিরূপে অধঃপাতে যাইতেছেন, দীনবন্ধু সে সকল বর্ণনায় অদ্বিতীয়। তাঁহার নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ, তাঁহার অটল ও নিমেদত্ত কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তাঁহার নীলদর্পণে সমাজের কত উপকার করিয়াছে, কিরূপে অত্যাচারী পাপাশয় নীলকরগণের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে পুঁথি অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

ইহার পর বঙ্কিমবাবু. ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর,* এক একখানি এক এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয়পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র দেখান এবং আরও সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান, তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা, যেমন কর্ম্মক্ষমতা, তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, আবার তেমনি ধর্ম্মপথে মতিমান্। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গীয়যুবককে যে সকল শিক্ষা দিত, আজি এই পরাধীন দেশে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি ঠিক সেই শিক্ষা দেয়; তাঁহার কমলাকান্ত আর কেহ নহে, একজন সুশিক্ষিত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়স্থ অনন্ত শোকসাগরের গভীর সমুদ্গীরণমাত্র; "তুমি এস এস বঁধু এস," এই গীতের ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলাকান্তের মুখে যে নানা, রসপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যকলাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমরা, ললিত-লবঙ্গলতা, এমন কি তাঁহার রূপসী, বীর, রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি। নীতিশিক্ষা কাব্যে অতি অল্প প্রশংসা, উহার রুচি অতি চমৎকার, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে সুরুচিবিরুদ্ধ বর্ণনা অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়। কিন্তু এই কয়খানি বই লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা করিলে, তাঁহার উপর শুদ্ধ অবিচার করা হয় মাত্র। তিনি যেরূপ নিজদেশের জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কেহই করে নাই। তাঁহার বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যত উন্নতিসাধন করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কেহ কখন করেন নাই, ইহাতেও বঙ্কিমবাবুর সব বলা হইল না। ইনিও ঈশ্বরগুপ্তের অনুকরণকরতঃ সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বঙ্গভাষায় লিখাইবার জন্য বিহিত যত্ন করেন। এখনকার লেখকবৃন্দ বঙ্কিমবাবুর নিকট যত ঋণী এত বোধ হয় আর কাহারও নিকট নহে। এই প্রাচীনবয়সে নানারূপ শারীরিক মানসিক, সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গুরুতর পরিশ্রমের উপরও বঙ্গসাহিত্যের জন্য ইঁহার চিন্তা ও পরিশ্রমে বিরতি নাই। 'বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালি যে ইংরেজিশিক্ষায় কি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালি যে চিন্তাশীলতায় সুরুচিশীলতায় কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কথা লইয়া আর অধিক আন্দোলন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়। বঙ্কিমবাবু দেশের উপকারার্থ

যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন ও ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন, তাহা অন্যে বলিলে বড় সাজিবে, নানা কারণে আমার বলিলে তত সাজিবে না।

বঙ্গদর্শনের দেখাদেখি আমাদের দেশে আর চারি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আর্য্যদর্শন কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালিদিগের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্য দর্শনে দেশের মনে পরনিরপেক্ষতাবুদ্ধি উদ্দীপনের জন্য নানাপ্রকার যত্ন করা হইয়াছিল। ইহার প্রধান লেখক সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নিজে এবং পূর্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদক মিল ও মাট্‌সিনির জীবনচরিত লিখিয়া বঙ্গবাসীকে ইউরোপের দুইজন প্রধান নেতার মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বসু বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলির চরিত্র পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া যথার্থ উচ্চতর সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় দ্বিতীয় সাময়িকপত্রিকা বান্ধব, ইহার প্রভাব আমাদের এ অঞ্চলে তত অধিক নাই, কিন্তু ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে পত্রিকাসম্পাদনকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজিতে যাহাকে learned man বলে, আমাদের এ অঞ্চল অপেক্ষা পূর্ব্বাঞ্চলে একরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, আর কালীপ্রসন্ন বাবু এই সকল learned লোকের অগ্রণী, তাঁহার লেখার জীবন্তভাব জ্বলন্ত রচনা। তাঁহার সহযোগিগণকে আমরা বিশেষ জানি না, যাহা জানি, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে যে কালীপ্রসন্নবাবুর সহযোগিগণের মধ্য হইতে অনেক উৎকৃষ্ট লেখক উৎপন্ন হইবেন। আর একখানি সাময়িকপত্র ভারতী, এখানি যোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরপরিবারকর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহার রুচি মার্জ্জিত, ভাষা ললিত। ইহার কার্য্যপ্রণালী সুন্দর, ইহা কখন বাকী পড়ে না, সকল কাগজ একবৎসর দুইবৎসর বাকী পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতীর বাকী নাই। এই পত্রের সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইহাঁর নিজের গ্রন্থাবলী অতি সুন্দর। স্বপ্নপ্রয়াণে ইহার কল্পনাশক্তির অনেক দূর দৌড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর ও সহকারী কে কে আমরা জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। যেখান হইতে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সরোজিনী, পুরুবিক্রম, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি দশ বারোখানি সুরুচিসম্পন্ন সুললিত পাঠ্য ও উপাদেয় গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অল্পক্ষমতাশালী বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য

হইয়াছেন। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ, ইংরেজি, সংস্কৃতসাহিত্যে যাহা কিছু মহান্ সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলীপরিপূর্ণ। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সাধারণীর সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। দশমহাবিদ্যা, গ্রাবু প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাঁহার লেখনীপ্রসূত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমবাবুকে সহায়তা করিতেন, এক্ষণে তিনি বাঙ্গালার একটি মোহিনীময় রচনাপ্রণালীর জন্মদাতা, তাঁহার লিখিত উদ্ভ্রান্তপ্রেম বহুকালাবধি বঙ্গীয়যুবকদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিবে। বঙ্গদর্শনের আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার প্রধান সহায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমবাবু, আর চন্দ্রনাথবাবু।* চন্দ্রনাথবাবু চিন্তাশীল, তিনি বহুকাল কলিকাতা রিবিউয়ের সমালোচক ছিলেন, এক্ষণে ইংরেজি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। আমরা আর্য্যদর্শনের আর একজন লেখকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইঁহার নাম ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি এক্ষণে সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ইঁহার কল্পতরু ও ভারতউদ্ধার না পড়িয়াছে বঙ্গীয়পাঠকের মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল। ইঁহার ভারত উদ্ধার নামক mock heroic কাব্য অতুল্য পদার্থ। ইনি এক্ষণে পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িকপত্রিকার সম্পাদক।

আমার প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমি সকলের নিকট আবার একটু ধীরতা ভিক্ষা করি। এই সময়ে আমরা আর কয়েকটী লোকের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাটক দুইখানিতে ইয়ংবেঙ্গলের দোষ ও গুণের অতি সুচারু চিত্র দেওয়া আছে। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতেছেন, যতদূর আমরা পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুভব করিতে পারি, বইখানি সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালায় একখানি অপূর্ব্ব পাঠ্যগ্রন্থ হইবে। তাহার পর বাবু রাজকৃষ্ণ রায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ও নিজ ভাষাকে যথেষ্টপরিমাণে সমৃদ্ধ

* প্রস্তাবলেখকও বটে। বং সং।

করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা নাই। সাহিত্যবিষয়ে তাঁহার অসীম মতলবের শেষ নাই, তাঁহার বয়স অল্প বোধ হয়, তিনি অনেক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। আর সম্প্রতি কয়েকটি যুবক কল্পনানামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার আর বিশেষ সন্দেহ দেখিতেছি না।

বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি তিন চারিখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সম্প্রতি যোগেশ নামক অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালির কৃতজ্ঞতালাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার নন্দা ও নর্ম্মদা স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর নির্ব্বাসিতের বিলাপ একখানি সুপাঠ্য বাঙ্গালা কাব্য। তাঁহার পুষ্পমালায় বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।

মিষ্টার আর, সি, দত্ত চারি পাঁচখানি সুন্দর ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট চিত্র লিখিয়া বঙ্গবাসীকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে, আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উৎকৃষ্টসমাজচিত্র দেখিতে পাই, তাঁহার ভাষা সুললিত এবং তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজনমনোরম।

আর দুইখানি গ্রন্থের কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক। দুইখানিতে গ্রন্থকার নাম দেন নাই, একখানি বঙ্গাধিপপরাজয় আর একখানি স্বর্ণলতা। বঙ্গাধিপপরাজয়ের গ্রন্থকার সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বর্ণনায় যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাঁর নরনারীচরিত্রগুলিও উজ্জ্বল। স্বর্ণলতা ইংরেজিতে যাহাকে নবেল বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম নবেল। বাঙ্গালিসমাজের এরূপ সুন্দর চিত্র অতি বিরল।

হরলাল রায়ের হেমলতা বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যে সকল গুণ থাকিলে নাটক হয়, তাহা উহাতে ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায়।

আমরা এই বঙ্গীয়লেখকসমালোচনার সর্ব্বশেষে পুস্তকগুলির সমালোচনা করিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিব। পুস্তকগুলি বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মহাগ্রন্থ। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুকরণ ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভাষা তাঁহার নিজের। রামগতি ন্যায়রত্নমহাশয়েরও ভাষা তাঁহার নিজের। কিন্তু ভূদেববাবুর ভাষা প্রাচীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কথকসমাজে যে ভাষা কথিত হইত, তন্মধ্যে যাহা কিছু মহীয়ান্ ছিল, সে সমুদয়ের সারসংগ্রহ, অনুকরণাতীত। ইহার ভাবাবলী বঙ্গ-

বাসীর অস্থিমজ্জায় গ্রথিত থাকা উচিত। পুষ্পাঞ্জলি একখানি অদ্ভুত পদার্থ। ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালায় ইংরেজিওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।

আমরা আর অধিক লোকের গ্রন্থসমালোচনা করিয়া সকলের অধীরতা বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে চিহ্নিত সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুলমাষ্টার পর্য্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে লোকে ইংরেজি লিখিত, কিন্তু আধুনিক যুবকগণ ইংরেজি পড়িয়া বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিতেছেন। অনেকে ইংরেজি লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়। ইহার প্রমাণ ভারতীতে প্রকাশিত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি। তাঁহার পত্রাদি বাঙ্গালার লিখিত, তাঁহার মন বাঙ্গালার জন্য আকুল। তিনি সেণ্টপিটর্সবর্গ হইতে যখন বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালির জন্য কাঁদিয়াছেন, তখন আর এ কথার বিশেষ প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। যখন সকল অবস্থাপন্ন সকল ব্যবসায়ী লোকের মধ্যেই সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন সাহিত্যের যে মহতী শ্রীবৃদ্ধি অচিরাৎ সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন, তাঁহাদেরই অন্য ব্যবসায় আছে, কেহ চাকুরী করেন, কেহ জমীদার, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায় করেন অথচ পুস্তক লিখেন। অতএব সকলেই amateur কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটী ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই; এখনও শুদ্ধ সাহিত্য ব্যবসায় করিয়া কেহ জীবননির্ব্বাহ করিতে পারেন না। যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বোধ হয় রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে লাভ আছে, আজিও একজন ভাল গ্রাজুয়েট গবর্ণমেণ্ট চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্ততঃ ৭৫ কি ১০০ টাকা পাইতে পারেন। যত দিন সাহিত্য ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্যব্যবসায়ে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না। এই নূতন সমাজে সমস্ত ইউরোপীয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যরাশি উদ্ঘাটিত হইয়াও যে বঙ্গীয় সাহিত্যের আজিও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ স্বাধীন সাহিত্য

ব্যবসায় না থাকা। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ যে কেন অনবরত বাহির হয় না, যাহাও বাহির হয়, তাহাও দেরিতে দেরিতে হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুস্তকরচনা ব্যবসায়ান্তরাবলম্বী গ্রন্থকারদিগের খুসী ও অবসরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে Profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব। সাহিত্য ব্যবসায় করিতে হইলে, আমাদিগের কি করিতে হইবে? কোন ভাল নূতন পুস্তক বাহির হইলেই যদি সেগুলি কতক কতক বিক্রয় হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা থাকে, এবং সাহিত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারে, এরূপ বহুসংখ্যক লোক থাকে, যদি গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য গ্রন্থকারগণকে অলস, মৎসর, ব্যঙ্গপ্রিয় সমালোচকের লেখনীর উপর নির্ভর না করিতে হয়, আর বহুসংখ্যক লাইব্রেরী থাকে, যাহাতে সকলপ্রকার গ্রন্থই ক্রীত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আমরা একপরিবারের গুণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; সে কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্য্যদিগের উৎসাহদাতা, ঠাকুরপরিবারও তেমনি এই নবাঙ্কুরিত সাহিত্যের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। নূতন সাহিত্য প্রচারের সময় অন্যান্য প্রসিদ্ধ পরিবারগণ যদি উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন সাহিত্য ব্যবসায় অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ন্যায় লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, লেখকগণ স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্যের যে অদ্ভুত উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের সাহিত্যের প্রকাণ্ড ভাণ্ডার অচিরাৎ প্রস্তুত করিবার যেমন আশ্চর্য্য সুবিধা হইয়াছে এমন অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটে, আমাদের দেশে যে কোন নবোৎসাহ জন্মাক, সকলেই সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে: ব্রাহ্মদিগের নবোৎসাহে সাহিত্যসংখ্যা যে কত বৃদ্ধি করিতেছে তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সে সাহিত্যের বিষয় বড় কেহ অবগত নহেন। তাহার পর ইংরেজী আমাদের bread winning language আমাদের ইংরেজি পড়িতেই হইবে। সুতরাং ইংরেজি পড়ার দরুণ আমাদের সাহিত্যের যে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিতে হয়। তাহার পর আমাদের এত বিদ্যানুরাগের সময় সংস্কৃত এখনও অনেকে পড়িবে, প্রাচীন আর্য্যভাষা কোন বাঙ্গালি অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না, সুতরাং সংস্কৃত পাঠ হেতু সাহিত্যের যে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা সেও চিরস্থায়ী। এখন কেবল চিরস্থায়ী সাহিত্যমাত্রব্যবসায়ী একদল

লেখক চাই, তাহা হইলে আমরা অল্প দিনে পৃথিবীর আর সমস্ত সাহিত্যকে কাণা করিয়া দিতে পারিব, সকলকে হারাইয়া দিতে পারিব, যাহা এই বিশ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে, অন্য দেশে তাহা দুইশত বৎসরে হয় না। আর বিশ বৎসরে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে, নিশ্চয়; কারণ, লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক, ইহাঁদের বয়োবৃদ্ধিসহকারে লেখার গুণও অধিক হইবে, আর সংখ্যাও অধিক হইবে। সাময়িকপত্রিকাগণ প্রতিবৎসরই দুই একটি করিয়া লেখক তৈয়ারি করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে; এই সকল লেখক যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা অন্য সর্ব্বিসে নাগিয়া কেবল সাহিত্য লইয়া কাল কাটাইতে পারে, তাহার যোগাড় করিয়া দিলেই বাঙ্গালাসাহিত্যের জয়ধ্বনি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি পৃথিবীমধ্যে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। অনেকে বলেন বঙ্গভাষার অবস্থা বড় হীন; কিন্তু এই বঙ্গীয় লেখকমণ্ডলীমধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। যখন প্রতি তিনমাসে পাঁচ ছয় শত নূতন পুস্তকের রেজিষ্টরি হয়, যখন এক কলিকাতায় পাঁচশত প্রেস অনবরত চলিতেছে, যখন উচ্চ, নীচ, বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলেই বাঙ্গালা লিখিবার ও পড়িবার জন্য উৎসুক, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় নহে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভঙ্কর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত ভাবী লেখক ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত মহাকাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশ দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যৎবাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে তাহা বলিতে পারি না। এই সকলের পশ্চাতে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, একটি গৌরবান্বিত মহাশক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়গণের গুণগান করিতেছে; আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।

পালামৌ।

দ্বিতীয় অংশ।

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোন একজন মিলিটারি সাহেব "পেরেড" বৃত্তান্ত, "ব্যাণ্ডের" বাদ্যচর্চ্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম পালামৌ প্রবল সহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগণামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কি অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা "কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার কৃত" পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালপ্রশস্তিসংবাহক ভাঁটভেরাণ্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছে। সকলের অনুভবশক্তি ত সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই একক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষ আরও কতকদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত

নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি এক-দিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিম-দিকে নামে নাই; এইরূপ অর্দ্ধ-পাহাড় লাতেহারগ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কালপাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমকহারাম ফরাসিস কুকুর (poodle) আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কন্‌ডক্‌টার (conductor) যে পর্য্যন্ত ননকন্‌ডক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয় সে পর্য্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে

এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন, এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

একক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উত্তরপার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল তমাল, হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ববৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্ণকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটী মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্পবিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল; সেরূপ কৃষ্ণবর্ণকান্তি আর কখন দেখি নাই, সকলের গলায় পুতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকীর পরিবর্ত্তে এক একখানি গোল আরসী; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে: কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে: কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাতুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাতুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এইস্থলে বলা আব

শ্যাক এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্যজাতি; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্ তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; সকলেরই কক্ষ, বক্ষ আবরণশূন্য। সেই নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি তাহা কেহই দেখিল না। আমাদের বাঙ্গালায়ও দেখিয়াছি পল্লীগ্রামে বালক বালিকারা প্রায় পাল্কী আর বেহারা দেখিয়া ক্ষান্ত হয়। তবে যদি সঙ্গে বাদ্য থাকে, তাহা হইলে "বরকনে" দেখিবার নিমিত্ত পাল্কীর ভিতর দৃষ্টিপাত করে। যিনি পাল্কী চড়েন, সুতরাং তিনি দুর্ভাগ্য, কিন্তু গ্রাম্যবালক বালিকারাও অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্দ্দয়।

তাহার পর আবার কতকদূর গিয়া দেখিলাম পথপ্রান্তে যুবতীরা মদের ভাঁটিতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। গ্রামমধ্যে যে যুবতীদের দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাও আকারে অলঙ্কারে অবিকল সেইরূপ, যেন তাহারাই আসিয়া বসিয়াছে। যুবতীরা উভয় জানুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া দুই হস্তে শালপত্রের পাত্র ধরিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর ঈষৎ হাস্যবদনে সঙ্গীদের দেখিতেছে। জানুস্পর্শ করিয়া উপবেশন করা কোলজাতির স্ত্রীলোকদিগের রীতি; বোধ হয় যেন সাঁওতালদিগেরও এই রীতি দেখিয়াছি। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে মদের ভাঁটি দেখিলাম; কিন্তু বাঙ্গালায় ভাঁটিখানায় যেরূপ মাতাল দেখা যায়, পালামৌপরগণায় কোন ভাঁটিখানায় তাহা দেখিলাম না। আমি পরে তাহাদের আহার ব্যবহার সকলই দেখিতাম, কিছুই তাহারা আমার নিকট গোপন করিত না, কিন্তু কখন স্ত্রীলোকদের মাতাল হইতে দেখি নাই, অথচ তাহারা পানকুণ্ঠ নহে। তাহাদের মদের মাদকতা নাই এ কথাও বলিতে পারি না।

সেই মদ পুরুষেরা খাইয়া সর্ব্বদা বাতাল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কয়েকবার কেবল যুবতীর কথাই বলিয়াছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিয়াছি এমন নহে। বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতিঅল্প, তাহারা অধিকবয়ঃ হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্ম্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য্য, কৃষিকার্য্য সকল কার্য্যই তাহারা করে, পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তানরক্ষা করে, কখন কখন চাটাই বুনে। আলস্যজন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থিরযৌবনা থাকে।

লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর, মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধ হয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠা ও আশ্চর্য্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয় কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনীশক্তি যেরূপ কমিয়া যায়, জাতিবিশেষেরও জীবনীশক্তি সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। মনুষ্যের মৃত্যু আছে, জাতিরও লোপ আছে।

এই পরগণার পর্ব্বতে স্থানে স্থানে অসুরেরা বাস করে, আমি তাহাদের দেখি নাই, তাহারা কোলদের সহিত বা অন্য কোন বন্যজাতির সহিত বাস করে না। শুনিয়াছি, অন্যজাতীয় মনুষ্য দেখিলে তাহারা পলায়; পর্ব্বতের অতি নিভৃত স্থানে থাকে বলিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করা কঠিন। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন তখন অসুরগণ অতি প্রবল ও তাহাদের সংখ্যা অসীম ছিল। অসুরেরা আসিয়া আর্য্যগণের গোরু কাড়িয়া লইয়া যাইত, ঘৃত খাইয়া পলাইত, আর্য্যরা নিরুপায় হইয়া কেবল ইন্দ্রকে ডাকিতেন, কখন কখন দলবল জুটিয়া লাঠালাঠিও করিতেন। শেষে বহুকাল পরে যখন আর্য্যগণ উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেন, তখন অসুরগণকে তাড়াইয়াছিলেন। পরাজিত অসুরগণ ভাল ভাল স্থান আর্য্যদের ছাড়িয়া দিয়া আপনারা দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া বাসস্থাপন করেন। অদ্যাবধি সেই পাহাড় পর্ব্বতে তাহারা আছে, কিন্তু আর তাহাদের বলবীর্য্য নাই, আর সে অসীম সংখ্যাও তাহাদের নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে অসুরকুল ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না; যে দশ পাঁচ জন এখানে সেখানে

বাস করে, আর কিছু দিনের পর তাহারাও থাকিবে না।

জাতিলোপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, অনেক আদিম জাতির লোপ হইয়াগিয়াছে অদ্যাপি হইতেছে। জাতিলোপের হেতু দর্শনবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যে পরাজিত জাতিরা বিজয়ীকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া অতি অযোগ্য স্থানে গিয়া বাস করিলে, পূর্ব্বস্থানে যেসকল সুবিধা ছিল তাহার অভাবে ক্রমে তাহারা অবনত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কথা অনেক স্থলে সত্য সন্দেহ নাই, অসুরগণের পক্ষে তাহাই খাটিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু সাঁওতালেরাও একসময় আর্য্যগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দামিনীকোতে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি অনেক কাল তথায় বাস করে, অদ্যাপিও তথায় থাক সাঁওতালেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের যে কুলক্ষয় হইয়াছে এমত শুনা যায় না।

মারকিন ও অন্যান্য দেশে যেখানে সাহেবেরা গিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন, সেখানকার আদিমবাসীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, তাহার কারণ কিছুই অনুভব হয় না। রেড ইণ্ডিয়ান, নাটিক ইণ্ডিয়ান, নিউ জিলাণ্ডর, নিউ হলাণ্ডার, ভাণ্ডাননির প্রভৃতি কত জাতি লোপ পাইতেছে। মৌরিনামক আদিম জাতি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, বলিয়া পরিচিত, তাহারাও সাহেবদের অধিকারে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ১৮৪৮ সালে তাহাদের সংখ্যা একলক্ষ ছিল, বিষবৎসর পরে ৩৮ হাজার হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সে জাতির অবস্থা কি তাহা জানি না। বোধ হয় এতদিনে লোপ পাইয়া থাকিবে, অথবা যদি এতদিন থাকে, তবে অতি সামান্য অবস্থায় আছে। মৌরি দুর্ব্বল নহে, তৎসম্বন্ধে একজন সাহেব লিখিয়াছেন "He is the noblest of savages, not equalled by the best of the Red Indians." তথাপি এজাতি লোপ পায় কেন? তুমি বলিবে সাহেবদের অত্যাচারে? তাহা কদাচ নহে, ক্যানেডার অধিবাসীসম্বন্ধে সাহেবেরা কতই যত্ন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাদের কুলক্ষয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডাক্তার গিকি লিখিয়াছেন যে, "In Canada for the last fifty years the Indians have been treated with paternal kindness but the wasting never stops * * * The Government has built them houses, furnished them with ploughs, supplied them constantly with rifles, anumunition, and clothes, paid their medical attendants * * * but the result is merely this that their extinction goes on more slowly than it otherwise would." সবাজোপযোগী ভাল স্থান ত্যাগ করিয়া বিপরীত স্থানে ত এই জাতিদের বা-

ইতে হয় নাই, তবে তাহাদের কুল-লোপ হইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, সাহেবদের সংস্পর্শে দোষ আছে। প্রধান জাতির সংস্পর্শে আসিলে সামান্য জাতিরা অবশ্য কতকটা উদামভঙ্গ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। একথার প্রত্যুত্তরে একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কতই সামান্য জাতি বাস করে, কিন্তু শ্বেতকায় জাতির সংস্পর্শে তাহাদের ত কুলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় না।

আমরা একথা সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের কুলক্ষয় অনেক দিন আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইংরেজদের সমাগমের পর কোন জাতির ক্ষয় ধরিয়াছে এমত নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে কোলদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করা যাইতে পারে, তাহার কারণ আর একসময় সমালোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে, কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয় তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক আগামী বারে সতর্ক হইব। কিন্তু যে কথার আলোচনা আরম্ভ করা গিয়াছিল তাহা শেষ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে বাঙ্গালির কথা কিছু বলি। কিন্তু চারিদিকে বাঙ্গালির উন্নতি লইয়া বাহবা পড়িয়া গিয়াছে, বাঙ্গালি ইংরেজি শিখিতেছে, উপাধি পাইতেছে, বিলাত যাইতেছে, বাঙ্গালি সভ্যতার সোপানে উঠিতেছে, বাঙ্গালির আর ভাবনা কি? এ সকল ত বাহ্যিক ব্যাপার। বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরিক ব্যাপার কি একবার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয় না? শুনিতেছি গণনায় বঙ্গবাসীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। বড়ই ভাল!

প্র, না, ব।

৩১

পরদিবস প্রাতে একজন ভৈরবী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়া যাইতেছিল, প্রান্তরের এখানে সেখানে কেবল শরগুচ্ছ, কোন স্থানই কর্ষিত নহে, সর্ব্বত্র বালুকাময়, সুতরাং সর্ব্বত্র পথ, অথচ কেহ সে পথ দিয়া যাতায়াত করে না, প্রান্তরের যেখানে দাঁড়াইয়া দেখ, চারিদিকে শরগুচ্ছের পরিখা, অথচ বন নিবিড় নহে, শরগুচ্ছ দূরে দূরে বিযুক্তভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দেখিতে সংযুক্ত বোধ হয়। সকল স্থানই পরিষ্কার এবং পরিসর। যেদিকে যতদূর যাও,সেই দিকেই পূর্ব্বমত শরগুচ্ছ আর বালুকাময় ভূমি, তাহা অতিক্রম করিলে আবার সেইরূপ শরগুচ্ছ এবং বালুকাময় ভূমি। চতুর্দ্দিক দেখিয়া বুঝা যায়না যে আমি পথ অতিক্রম করিতেছি। যাহা ছাড়াইলাম আবার অবিকল তাহাই সম্মুখে।

লোকে বলে তথায় দস্যুভয় আছে, কেহবলে ভৌতিক ভয় আছে। জনশ্রুতি যে, একবার একজন পীড়িতব্যক্তি যুবতী ভার্য্যা সমভিব্যাহারে এই প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে পিপাসাপীড়িত হইয়া স্ত্রীকে জলাহরণের নিমিত্ত পাঠাইয়া আপনি একস্থানে বসিয়া থাকে, কিন্তু অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত স্ত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিল না দেখিয়া পীড়িতব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিল যে আমি রুগ্ন বলিয়া বিশ্বাসঘাতিনী আমায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অতএব আর স্ত্রীর অপেক্ষা না করিয়া আপনি একা প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিল। পরদিবস প্রাতে আকাশ হইতে শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি শবভুক্ পক্ষীরা বায়ুবেগে প্রান্তরের দুইস্থানে নামিতে লাগিল। একস্থানে রুগ্ন স্বামীর মৃতদেহ আর একস্থানে যুবতীর শব পড়িয়াছিল। উভয়েই কিরূপে মরিয়াছিল বা কে তাহাদের মারিয়াছিল, তাহা কিছুই প্রকাশ নাই সুতরাং ভৌতিক ভয়ের কথা রাষ্ট্র হয়; সেই অবধি প্রান্তরের নাম "যুগলমারি" হইয়াছিল।

এই ভয়ানক প্রান্তরে কেহ যে একা যাইতে সাহস করে না তাহা ভৈরবী জানিতেন। প্রাতে প্রবেশ করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রান্তর যে অতিক্রম করা যায় না, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; অথচ কোন বিপদ আশঙ্কা না করিয়া সেই ভয়ানক প্রান্তর দিয়া যাইতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভৈরবী উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন; বৃক্ষতলে এক ভগ্নমন্দির, তাহার সম্মুখে

এক পুরাতন পুষ্করিণী। প্রান্তরমধ্যে এই বৃক্ষ ও মন্দির অথচ প্রান্তর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় না। যেখানেই দাঁড়াইয়া দেখ শরগুচ্ছসমূহ পরিখাস্বরূপ দৃষ্টি অবরোধ করে।

মন্দিরের পশ্চাতে ইষ্টকনির্ম্মিত কতকগুলি পুরাতন কুটীর আছে, পূর্ব্বে তাহা অতিথির নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল; এক্ষণে তথায় এই ভৈরবী অন্য দুইজন অনাথা বিধবার সহিত একত্র বাস করেন। বিধবাদের গৃহীর ন্যায় বেশভূষা, গৃহীর ন্যায় আহার ব্যবহার। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে এই সময় তাঁহারা উভয়ে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

প্রথমা। আমার অনেকদিন অবধি ইচ্ছা কাশীতে গিয়া বাস করি।

দ্বিতীয়া। তবে যাওয়া হয় নাই কেন?

প্রথমা। যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই কি হয়?

দ্বিতীয়া। আমার শুনা আছে যে, তাহা নিশ্চয়ই হয়,—অর্থাৎ যদি একান্ত মনন থাকে।

প্রথমা। তবে তাহা সকলের কপালে হয় না কেন? ভাল, তোমার আপনার মানস সিদ্ধ হয় না কেন?

দ্বিতীয়া। আমার কোন্ সাধ আছে?

প্রথমা। সে কি কথা! সাধ না কি আবার লোকের থাকে না?

দ্বিতীয়া। আমার এখন সাধ মরণের। তাহাও আন্তরিক নহে, এখনও বাঁচিতে সাধ আছে।

প্রথমা। আমাদের মত লোকের বাঁচতে সাধ কেন? এই তুমিই বলেই বলি, তোমার বাঁচা কেন, তুমি রাজার ভগিনী, এখন পথের ভিখারিণী; তোমার আবার বাঁচা কি সুখে?

দ্বিতীয়া। দিদি! আপনি ভুলে গেছেন, আমার পরিচয়সম্বন্ধে কথা মুখে আনিতে আপনাকে ভৈরবী বিশেষ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমা। আমি আর কাহার কাছে পরিচয় দিতে গিয়াছি, তোমার কথা তোমারই কাছে বলিতেছি।

এই সময় ভৈরবী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। যাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া ভৈরবীর হস্ত হইতে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু লইলেন; অপরা মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিলেন। বসিবার সময় ভৈরবী হাসিয়া বলিলেন, এ আমাদের বেশ আসন; গত কল্য এক জায়গায় আমায় বাঘছাল বসিতে দিয়াছিল, অমনি আমার মনে হঠাৎ কেমন একটা ভয় হইয়াছিল।

প্রথমা। কেন? আপনার হাতে ত ত্রিশূল ছিল?

ভৈরবী নিঃশব্দে হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অতি সুন্দর রহস্য করিয়াছ। বাঙ্গা-

লির মেয়ে না হলে এ মিষ্ট কথা আর কেহই বলিতে পারে না।

প্রথমা। কেন? আপনাদের হিন্দুস্থানে কি এরূপ রহস্য কেহ করে না?

ভৈরবী। আমি ত হিন্দুস্থানী নহি, আমার জন্ম হিমালয় পর্ব্বতে।

প্রথমা। তবে আপনি পাহাড়ে মেয়ে।

ভৈরবী। (ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) পর্ব্বতে জন্ম বলিয়া কেহ কেহ আমায় পার্ব্বতী বলেন।

প্রথমা। কোথায় লোকে তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে যায়। আপনি হিমালয় হইতে বাঙ্গালায় তপস্যা করিতে আসিয়াছেন।

ভৈরবী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন দেখিয়া, অপরা বিধবা সঙ্কোচিতভাবে বলিলেন, বাঙ্গালিকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আর একবার হিমালয় হইতে আর একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন।

প্রথমা। কে?

দ্বিতীয়া। ভাগীরথী গঙ্গা।

ভৈরবী। এ রহস্যও মন্দ নহে; একেই ত খোষামোদ বলে?

প্রথমা। এ খোষামোদ ভাল নহে। দেবতার সহিত মনুষ্যের তুলনা।

দ্বিতীয়া। আমি যাই পাকের উদ্যোগ করিয়া দিই।

ভৈরবী। থাক, ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমি আপনিই উদ্যোগ করিয়া লইব।

প্রথমা। আমি থাকিতে আপনি সে কষ্ট কেন পাইবেন? এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধি কতদূর করিয়া আসিয়াছেন তাহা আপনি পরিচয় দিন, আমি গিয়া পাকের উদ্যোগ করি।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলে ভৈরবী অপরা বিধবার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

ভৈরবী। আমি শান্তিশতগ্রামে গিয়াছিলাম। রাজা ভাল আছেন, রাজকুমার ভাল আছেন, দেওয়ানও রাজধানীতে আসিয়াছেন।

প্রথমা। রাজরাণী কেমন আছেন?

ভৈরবী। ভালই আছেন, তবে রাজার সহিত তাঁহার মনান্তর বোধ হয়। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম তোমারই নিমিত্ত মনান্তর হইয়াছে, পরে দেখিলাম তাহা নহে।

ভৈরবী যাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা জ্যোৎস্নাবতী।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে কাহার নিমিত্ত মনান্তর?

ভৈরবী (হাসিয়া) সপত্নীর নিমিত্ত। রাণী মনে করিয়াছেন, তাঁহার একটি সপত্নী আছে, এতদিন তাহা জানিতেন না।

জ্যোৎস্নাবতী। এই যা! আবার কার কপাল পুড়লো?

ভৈরবী। কে একটি ব্রাহ্মণকন্যা আছেন লোকে তাঁকে মাধবীলতারূপা বলে।

জ্যোৎস্নাবতী। পোড়াকপাল! রাজ-মহিষী তবে খেপেছেন। ব্রাহ্মণকন্যা বড় সাধ্বী, বড় ভাল মানুষ। মাধবীলতা তাহার কন্যা নহে, রাণীর কন্যা!

ভৈরবী। সেই ত কাল হয়েছে। রাণীর বিশ্বাস যে রাজার কলঙ্ক ঢাকিবার নিমিত্ত তুমিই যমজসন্তানের গল্প রচনা করিয়াছ। অতএব কেমন করিয়া তিনি সেই সপত্নীসন্তানকে মারিবেন এই এখন তাঁহার চেষ্টা।

জ্যোৎস্নাবতী। সর্ব্বনাশ!

ভৈরবী। দুই একদিনের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হইবে, সকল প্রস্তুত।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে এখন উপায়?

ভৈরবী। মহাদেব জানেন।

জ্যোৎস্নাবতী। আমার যে মন বুঝে না। আমি একবার যাই।

ভৈরবী। যাইতে বারণ করি না, কিন্তু তুমি বাটী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

জ্যোৎস্নাবতী। আপনি কোন্ উপায়ে এ সকল জানিলেন?

ভৈরবী। রাজভগিনী পথে পথে বেড়াইতেছেন যে উপায়ে জানিয়া তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম সেই উপায়ে এ সকল জানিয়াছি।

জ্যোৎস্নাবতী। আপনি কি তবে আমায় আনিতে গিয়াছিলেন? আমি মনে করিয়াছিলাম যে হঠাৎ আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আপনি আমায় দয়া করিয়াছিলেন।

ভৈরবী। আমি এইখানে পঁচিশবৎসর পড়িয়া আছি, কখন বাহির হই না, আমি কেমন করিয়া জানিব যে, রাজভগিনী কোথা পথে পথে বেড়াইতেছেন।

জ্যোৎস্নাবতী। তবে কে আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন?

ভৈরবী। আমার ইষ্টদেব।

জ্যোৎ। আপনার ইষ্টদেব কোনরূপে মাধবীলতাকে রক্ষা করিতে পারেন না?

ভৈরবী। বোধ হয় পারেন না। তিনি ত সকলই জানেন, রক্ষার উপায় থাকিলে আমায় বলিতেন। আমিও তাঁর কাছে এ কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম তিনি আমার কথায় বড় চঞ্চল হইয়া বলিলেন, "সর্পী আপনার সন্তান খায়, কে সে সন্তানকে রক্ষা করবে? প্রকৃতির নিয়ম এই। প্রকৃতি নিজে কি? নিজে ছিন্নমস্তা।" আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

জ্যোৎ। আপনার ইষ্টদেব কে?

ভৈরবী। কি বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিব? রাজপুরীতে তোমার বাস, তুমি কাহাকে দেখিয়াছ যে চিনিবে? আমার ইষ্টদেব নামজাদা নহেন, যে নাম করিলে বুঝিবে? পাগলাপ্রভু বলিলে চিনিতে পার?

জ্যোৎস্নাবতী। বুঝি পারি।

৩২

সেই রাত্রে জ্যোৎস্নাবতী বড় অস্থির

হইলেন; মাধবীলতার নিমিত্ত মন কাতর হইয়াছিল কি রাণী এই মহাপাপ করিবেন বলিয়া তিনি অধিক ব্যস্ত হইয়াছিলেন ইহা নিশ্চয় বলা যায় না; উভয় কারণেই তাঁহার অন্তর চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অনেকবার মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, রাজা থাকিতে বা দেওয়ান্ থাকিতে রাণী কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বিশেষতঃ রাণী স্ত্রীলোক, শিশুর প্রতি তাঁহার দয়া কোথা যাইবে। অতএব মাধবীলতার কোন ভয় নাই। এই কথায় মনকে অনেকবার বুঝাইলেন, মনও অনেকবার বুঝিল অথচ চিত্তচাঞ্চল্য গেল না; বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেন আর একটা কি বিপদ আছে, মন সেই অস্পষ্ট ভয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে; শেষ যখন তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রন্দন হইয়া উঠিল তখন ভৈরবীর নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভৈরবী প্রথমে নানা প্রবোধবাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইলেন, তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতি! তোমায় কি বুঝাইব, আমি নিজে অবুঝ হইয়াছি, আমি এইমাত্র বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।"

জ্যোৎ। কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন?

ভৈরবী। তাহা আর এখন বলিব না; আমি কল্য প্রাতেই একবার গুরুদর্শনে যাইব।

জ্যোৎ। আমি তবে আপনার সঙ্গে যাব, একবার শান্তিশতগ্রামে গিয়া দাদার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে পারিলেই আমার অনেক যন্ত্রণা যাবে।

ভৈরবী। তুমি কিরূপে একা যাইবে? আমি ত সে পথে যাইব না।

জ্যোৎ। আপনি কোথা যাবেন? যতদূর পারি আপনার সঙ্গে যাইব, তাহার পর যাহা হয় করিব।

এইরূপে কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইলে, উভয়ে যাত্রা করিলেন। সূর্য্য উঠিয়াছে, অগ্রে অগ্রে ভৈরবী চলিতেছেন, যুগলমারীর পরিষ্কার বালুকাক্ষেত্রে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতেছে, তৎপশ্চাতে জ্যোৎস্নাবতী যাইতেছেন, তাঁহার পদভার বালুকা অনুভব করিতেছে না। জ্যোৎস্নাবতীর পদনখ শরপত্রের হিমকণার ন্যায় জ্বলিতেছে। জ্যোৎস্নাবতী আপনার সেই নখভাতি দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছিলেন, কতকদূর আসিয়া ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাত্রে কি কুস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন?"

ভৈরবী কতকদূর অন্যমনস্কে গিয়া বলিলেন, "আমার গুরু ভিন্ন এ জগতে আর কেহ নাই।"

জ্যোৎ। বোধ হয় গুরুসম্বন্ধে কোন কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন?

ভৈরবী দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না। জ্যোৎস্নাবতী কোন কথা উল্লেখ না করিয়া ভৈরবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভৈরবী

কতকদূর গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার গুরুদেবকে দেখেছ? তিনি বহুকালাবধি শান্তিশতগ্রামেই আছেন।"

জ্যোৎ। রাজবাটীতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহাদের কখন কখন অন্তঃপুরবাসীনীরা দেখিতে পায়।

ভৈরবী। আমার গুরুদেব কখন রাজবাটীতে গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

জ্যোৎ। কেন?

ভৈরবী। তাঁর বুঝি কি ব্রত আছে, সেই জন্য তিনি কখন কোন গৃহপ্রবেশ করেন না।

জ্যোৎ। তাঁহার নাম কি পাগলা প্রভু?

ভৈরবী। তাঁহার নাম জানিনা, জানিলেও আমি স্ত্রীলোক তাহা মুখে আনিতে পারিতামনা, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা কেহ তাঁহাকে পাগলাপ্রভু বলে, কেহ পাগলাবাহাদুর বলে।

জ্যোৎ। বাঙ্গালিরা তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকে? তাহারাও কি পাগলা প্রভু বলে?

ভৈরবী। বাঙ্গালিরা তাঁহাকে পিতম পাগলা বলে। কিন্তু তাঁহার আসল নাম আর কি হইবে।

জ্যোৎ। তবে তিনিই কি আমায় আশ্রয় দিবার নিমিত্ত আপনাকে পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। তিনিই পাঠাইয়াছিলেন।

জ্যোৎস্নাবতী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভৈরবী মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন, জ্যোৎস্নাবতী তাহা শুনিতে পাইলেন না। অন্যমনস্কে পথ চলিতেছিলেন, যুগলমারীর মাঠ অতিক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ভৈরবী। আমি ত বলিয়াছি গুরুদর্শনে।

জ্যোৎ। আপনি তবে শান্তিশতগ্রামে যাবেন। তিনি ত শান্তিশতগ্রামেই থাকেন।

ভৈরবী। এক্ষণে বুঝি আর সেখানে থাকেন না।

জ্যোৎ। তবে কোথায় থাকেন?

ভৈরবী। ঠিক্ জানি না, দুইদিন হইল এই অঞ্চলে একস্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, এক্ষণে পথে পথে তাঁহার সন্ধান করিব, কোথায় তাঁহার দর্শন পাইব কিছুই বলিতে পারি না।

এই সময় সম্মুখে অশ্বত্থবেষ্টিত এক দীর্ঘিকা দেখিয়া উভয়ে তথায় গিয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বসিলেন। ভৈরবী নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, স্থানটী অতি পবিত্র।

জ্যোৎ। শীতলও কম নহে। তাই দেশের পাখী এই অশ্বত্থবৃক্ষে এসেছে। এরা ত গ্রীষ্ম বুঝিতে পারে?

ভৈরবী। কিন্তু পরের ভাবনাও ভাবে না, দুঃস্বপ্নও দেখে না।

জ্যোৎ। স্বপ্নসম্বন্ধে আবার আমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রকাশ করিলে দুঃস্বপ্ন ফলে না, এইজন্য লোকে দুঃস্বপ্ন গোপন করে না, বিশেষতঃ সাণ্ডিল্যগোত্রের নিকট বলিলে কুস্বপ্ন একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। আমি সাণ্ডিল্যগোত্র।

ভৈরবী। তবে একবার কাণে স্থান দেও। কাল স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন আবার সেই হিমালয়ে আছি, আবার যেন আমার বালিকাকাল উপস্থিত। আবার যেন সেই দেবমূর্ত্তি আমার পিতার দ্বারে পড়ে অজ্ঞান অভিভূত :—

জ্যোৎ। কোন্ দেবমূর্ত্তির কথা বলিতেছেন?

ভৈরবী। আমার গুরুদেবের কথা বলিতেছি। বহুকাল হইল, গুরুদেব একদিন মরণাপন্ন হয়ে আমার পিতার দ্বারে পড়েছিলেন, তখন আমার বয়স দশবৎসর; আমি জানি না যে তাঁহার কি পীড়া, কিন্তু পীড়া তাহা বুঝিয়াছিলাম। সেই একদিন গেছে। কল্য স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তিনি আবার পিতার দ্বারে পড়িয়া আছেন এবার চক্ষু চাহিয়া আমায় বলিতেছেন, "পার্ব্বতি! আর উপায় নাই, মন্ত্রঔষধে আর আমি বাঁচিব না; একবার আমায় বাঁচাইয়াছিলে, এবার আর পারিবে না। এই দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেছে।" আমি যেন দেখিলাম, তাঁহার পায়ে স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়াছে।

জ্যোৎস্নাবতী কাষ্ঠপুতুলিকার ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন। এই সময় দুইজন পথশ্রান্ত ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। জ্যোৎস্নাবতী, বৃক্ষ অন্তরালে গিয়া বসিলেন; বৃদ্ধব্রহ্মচারী প্রথমে ভৈরবীকে সম্ভাষণ করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন, ভৈরবী তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় পরমাপ্যায়িত হইয়া শেষ বেদান্তের বিচার উপস্থিত করিলেন; স্ত্রীলোকের অসাধারণ বিচারশক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ একেবারে চরিতার্থ হইলেন, অল্পবয়স হইলে হয় ত মোহিত হইতেন। বাঙ্গালায় ভারতচন্দ্র মালাকরের বিদ্যা লইয়া প্রেম গড়িতে গিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বেদান্তের বিদ্যায় যে কিছু হয় না এরূপ কোন্ হিন্দু বলিবে।

যখন ভৈরবীর সহিত বৃদ্ধব্রহ্মচারী শাস্ত্রালাপে অন্যমনস্ক ছিলেন, তখন অপর ব্রহ্মচারী—বয়স অল্প, একটু চঞ্চল—জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ ভৈরবী তাহা দেখিতে পাইলেন, একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া আবার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, যুবা তখনও ঈপ্সিত-লোচনে জ্যোৎস্নাবতীর দিকে চাহিয়া

আছেন, ভৈরবীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী যুবার এই আশ্রমবিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে বসাইয়া বেদান্তের গুণব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যুবা তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, আবার মুখ ফিরাইয়া এক একবার জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। একবার যুবার প্রতি জ্যোৎস্নাবতীর দৃষ্টি পড়িল, যুবা হঠাৎ প্রফুল্লবদনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, জ্যোৎস্নাবতী অনিমিক্‌লোচনে যুবার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ভৈরবীর তাহা অসহ্য হইল, বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হাসিতে লাগিলেন। ভৈরবীর আরও অসহ্য হইল, তিনি তিরস্কার আরম্ভ করেন এমত সময় যুবা বিদ্যুৎবেগে জ্যোৎস্নাবতীর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর তাঁহার পাদমূলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাবতী সস্নেহলোচনে তাহার মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "আমার মাতঙ্গিনী?"

ভৈরবী বিস্ময়াপন্নলোচনে একবার জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি, একবার বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন; মাতঙ্গিনী যাঁহার পাদমূলে গিয়া পড়িল তিনি রাজভগিনী জ্যোৎস্নাবতী, ইহা বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী প্রথমে অনুভব করেন নাই।

জ্যোৎ। মাতঙ্গিনি! তোমার এ বেশ কেন?

মাত। স্ত্রীবেশে পথ চলা বড় বিপদ।

জ্যোৎ। কোথা গিয়াছিলে?

মাত। একটা মকোদ্দমা করিতে গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। তোমার আবার কি মকোদ্দমা।

মাত। ছিল একটা।

জ্যোৎ। আমায় বলিয়া যাও নাই কেন।

মাত। বলিলে হয় ত আপনি আমায় ছাড়িয়া দিতেন না।

জ্যোৎ। মকোদ্দমায় কি হইল?

মাত। কিছু হলো না। অদৃষ্ট ভিন্ন সকলেই আমার স্বাপক্ষ ছিল, এখনও আশা যায় নাই। একজন প্রতিবাদী ফেরার হইয়াছেন তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছি।

জ্যোৎ। তবে কি এখনও তোমায় পাব না?

মাত। দিন কতকের জন্য পাবেন না।

জ্যোৎ। তোমার আসামী কোথা?

মাত। তা ত জানি না, পথে পথে খুঁজিব। তাঁহার দেখা না পাই আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।

জ্যোৎ। কোথা যাবে?

মাত। যেখানে সকলে যায়। মকোদ্দমা হারিলে আর আমি বাঁচিব না। কি সুখে বাঁচিব?

জ্যোৎ। কে জানে বাছা, এতদিনের পর তোমার এমন কি মকোদ্দমা পড়িল যে তুমি তাহার নিমিত্ত প্রাণ বাহির করিবে। কই এত দিন ত তোমার মকোদ্দমার কথা কিছুই শুনি নাই।

[illegible]। তুমিয়াও কাজ নাই। এখন আপনি বাড়ি চলুন, আপনাকে বাড়ি রাখিয়া আমি পথে পথে বেড়াই।

জ্যোৎ। আমার বাড়ি কোথা? আমি কোথা যাব? আমিও এখন পথে পথে বেড়াইব। আর আমার ভয় নাই ক্লেশ নাই। তুমিও সঙ্গী পাইয়াছ, আমিও সঙ্গী পাইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গী এখন আপনার নিজের কর্ম্মে যাইতেছেন, আমার ইচ্ছা যে দিন কতক তোমাদের সঙ্গে থাকি।

মাত। তবে তাহাই ভাল।

এই সময় ভৈরবীর সহিত ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে জ্যোৎস্নাবতীর কথা কহিতেছিলেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাদের কি বলিলেন, তাহার পর চারিজনে একত্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

যে সময় ব্রহ্মচারী, জ্যোৎস্নাবতী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় অপর পথ দিয়া একজন সন্ন্যাসী সেই গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হয়; তিনি একজন ভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে এক দেবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তথায় পিতম পাগলা মন্দিরপ্রস্তরে অঙ্কিত একটি শ্লোক পাঠ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। পিতম একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিল; পরে সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী হইলে, পিতম মুখ অবনত না করিয়া বলিল, "জনার্দ্দনভায়া, সন্ন্যাসী কবে অবধি।" সন্ন্যাসী একটু চঞ্চল হইয়াই তৎক্ষণাৎ সাবধান হইলেন, হাসিমুখে কি বলিবেন উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময় পিতম বলিলেন, "বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তান্ত্রিক, মুসলমানদিগের অক্ষর সামরিক, ফিরিঙ্গীদিগের অক্ষর গৃহী, সেইরূপ সন্ন্যাসীও গৃহী, তান্ত্রিক, সামরিক আছে। তুমি কোন জাতি সন্ন্যাসী? বুঝি সামরিক?"

সন্ন্যাসী। আমি তোমার কথা বুঝিলাম না।

পিতম। বুঝিলে না? ফারসি অক্ষরগুলি কেবল তরবারি, ছোট তরবারি, বড় তরবারি, ভগ্ন তরবারি, বিনমিত তরবারি, তাই বলিতেছিলাম ফারসি অক্ষর সামরিক। আর একদেশের অক্ষর তীরের মত ছিল, বাঁকা তীর, সোজা তীর, তীর্য্যাকৃতীর; তাহাও সামরিক। ফিরিঙ্গীর অক্ষর, গৃহদ্রব্যের অনুরূপ, কোচ, কেদারা, বাসনকোসন ইত্যাদি। তাহাই সে অক্ষর গৃহী। আর আমাদিগের অক্ষর পূজ্যাঙ্গের অনুরূপ; যন্ত্র, মুদ্রা, নরকপাল ইত্যাদি, তাই তান্ত্রিক। অক্ষরসৃষ্টির সময় যে জাতির যে দিকে দৃষ্টি অধিক থাকে সে জাতির সেই মত অক্ষর হয়। যদি বৈষ্ণবেরা অক্ষর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে তিলক তুলসীর আকারে তাঁহাদিগের অক্ষর হইত। আর তুমি যদি এখন অক্ষর প্রস্তুত করিতে, তাহা হইলে কাহার আকৃতি লইয়া অক্ষর করিতে। মাধবীলতার? কিন্তু শাস্ত্রে লিখিয়াছে যে তোমার হাতে আমার মৃত্যু। অতএব তুমি এখন মলে আমার দশা কি হবে। আমি তবে কার হাতে মরিব? আমি তোমার কোষ্ঠি গণনা করিয়াছি, স্ত্রীহত্যার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু।

সন্ন্যা। তবে তুমিই আগে মরিবে, তোমার পাগলামি ছলনায়, তোমায় যমনকবন না পাঠাইলে আর আমার কোন সুখ নাই।

এই বলিয়া জনার্দ্দন রাগভরে ফিরিয়া গেল, আর মন্দিরে দাঁড়াইল না। পিতম প্রসন্নবদনে মন্দিরের শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিল।

বঙ্গদর্শন

সপ্তমবৎসর।

৮৪ সংখ্যা।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যীকরণ।

(১) সাঁওতাল (২) হো (৩ ভূমিজ (৪) মুণ্ড (৫) বীরহোড় (৬) কড়ুয়া (৭) কুর্ বা কুর্কু বা মুয়ার্সি (৮) খাড়িয়া ৯ (জুয়াং) এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙ্গেরা উড়িষ্যার ঢেঁকানাল ও কেঁওঝড়প্রদেশে বাস করে। কুর্ বা মুয়ার্সির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাড়িয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে বাস করে; মানভূমের পাহাড়েও তাহাদের পাওয়া যায়। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত "অসুর" নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুরকু জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে—কোথাও কম কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন "সাঁওতাল পরগণা" বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন, ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বালেশ্বর; এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হোজাতিকে লড়্কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি। * মনুতে "কোলি সর্প" দিগের পুনঃপুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই, হো নামক কোন আদিমজাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। † তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূরবিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলিভাষায় মনুষ্য বুঝায়। একসময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্ণেল ড্যাল্টন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্ব্বে মগধাদি অনুগাঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধপ্রদেশে বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে ঐ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল।

ঋগ্বেদসংহিতায় কীকত নামে এক-জাতির প্রসঙ্গ আছে। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন যে, কৈকতেরা অনার্য্যজাতি ছিল, এবং ভাগবতপুরাণ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, গয়াপ্রদেশকে কীকতরাজ্য বলিত। অতএব কীকত মগধান্তর্গত ছিল এমত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কর্ণেল বিলফোর্ড বলেন যে, জরাসন্ধের পূর্ব্বে মগধদেশকেই কীকতরাজ্য বলিত। জরাসন্ধ প্রথম মগধনাম প্রচার করেন। কৈকতেরা গো-পালন করিত, কিন্তু গোরুর দুগ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলেরা অদ্যাপিও গোরুর দুগ্ধ ব্যবহার করে না। এই সকল কারণে অনুমিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে মগধে কোলদিগেরই বাস ছিল। এই সকল কথার মৌলিকতা আমি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। আর সেই প্রাচীন কোল রাজ্যের অন্য কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না।

কথিত আছে যে কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্য্যজাতিকর্ত্তৃক মগধ

* Asiatic Researches Vol. IX P. 91 & 92

† Non-Aryan Dictionary, Linguistic Dissertation P. 25 et &c.

হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্য্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সবর অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্ত ভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে।

কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে, যে তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল ডাল্টন বলেন যে কোচেরা অনুগাঙ্গ বিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় একলক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালি বলা যাইবে কি না?* কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালির সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালি হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য্য, কে অনার্য্য? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায় ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয়ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে; পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্য্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয় বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না, যে পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্ত্তমান ভাষা লাটিনমূলক, কিন্তু ফরাসিজাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নির্ম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণকর্ত্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয়

* "The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of Kanauj and the half civilized (? Koch or Palya of Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali. *Bengal Census Report* 1871.

সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয়ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমক-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গলদিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্ত্তমান ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফরিদাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয়ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আর্য্য-ভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

সকলেই জানে যে আর্য্যেরা ককেশীয় বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে এমন আর্য্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গৌরবর্ণ দীর্ঘশরীর মস্তক সুগঠন হনূদ্বয় অনুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্ব্বাকার মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ হনূদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহারা আদৌ অনার্য্যজাতি, আর্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার

* ভারতবর্ষেও এই আর্য্য অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেক স্থানে অনার্য্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল ড্যালটন বলেন যে তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল ড্যালটন আরও বলেন যে চুটীয়া নাগপুর প্রদেশে ওঁরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ওঁরাওয়েরা জাতীয়ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দি বা মুণ্ডাদিগের ভাষায় কথা কহে। Ethnology of Bengal P. 115.

যদি দেখি যে সেই অনার্য্যজাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে আর্য্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে একজাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে এই বিমিশ্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয় কি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে সে কখন হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎজাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে না। মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান কখন হিন্দু হইতে পারে না, কেন না যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে, পাওয়া যায় না। মনে কর হিন্দুপ্রবল কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে আর্য্যেরা সমাজের বড় অনার্য্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্য্যেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বেরদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্ব্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি এমনও নহে। কিন্তু অনার্য্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয়

ধর্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্য্যসমাজ প্রভু আর্য্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে ঠাকুরের পূজা করে তাহারাও সেই ঠাকুরের পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্ব্বাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্রজাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নামধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল এখনও তেমনি পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে হিন্দুধর্ম্ম "proselytizing নহে অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয় হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে হিন্দু ধর্ম্ম proselytizing অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূল মর্ম্ম উপরে বুঝান গেল। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদিগের proselytism এইরূপ যে তাহারা অন্যকে ডাকায়, "তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।" আহুত ব্যক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য সকলেই করিয়া থাকে, বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের proselytization সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, "তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।" যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিলে তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্ম পালন করিলে সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের proselytism এই প্রকার। ঐ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্য্য ভাষায় কোন শব্দও নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দু হইতেছে। কি প্রকার হইতেছে তাহা বেঙ্গাল সিবিলসার্ব্বিসে রিজলি সাহেব মানভূমের বৃত্তান্তে নিম্ন লিখিতমত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন "এই ঘটনা কিয়দংশে হিন্দু ও অহিন্দু পরস্পরে বিবাহ অথবা উপপত্নী পালন করার প্রথা বলে, কিয়দংশে অনার্য্যেরা হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুনাম ধারণ করায়, এবং কিয়দংশে হিন্দু রাজপুরুষদিগের ইচ্ছা-প্রচারিত আজ্ঞাক্রমে ঘটিয়াছে। কখন কখন হিন্দুরাজগণ অনার্য্য প্রজাবর্গকে অমূলক জাতিবাচক উপাধি দিয়া হিন্দু-সমাজ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় কিম্বদন্তীতে এরূপ জাতিসৃষ্টির কথা অনেক পাওয়া যায়। উত্তর হাজারিবাগ প্রদেশে ভূম্যধিকারীদিগের পরিচারক কাহাঁর জাতি যে অনার্য্যবংশীয় তাহা তাহাদের বাহ্য প্রকৃতিতে বুঝা যায়।"*

অনার্য্য জাতি যে আপনাদিগের অনার্য্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্যা নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। বিদ্যা মাহাত্ম নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দিভাষা কয় এবং হিন্দু মধ্যে গণ্য কিন্তু এই বিদ্যাগণ মুণ্ডজাতীয় কোল তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র দেখা যায়, বিদ্যাগণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ—এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিদ্যাগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী। আর মুণ্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের কিলীর যে যে নাম বিদ্যাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে বিদ্যাগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। কোন আসামীবুরুঞ্জীতে কর্ণেল ড্যাল্টন দেখিয়াছেন যে, উত্তরপ্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া সুবলেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্রুনদীর উপরে এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা

* Statistical Account of Bengal Vol. VII P. 213

সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্য্যজাতি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দুচুটীয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দুচুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে ম্লেচ্ছ চুটীয়া ছিল বা আছে।*

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসামপ্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্য্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছ কাছাড়িভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিশু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচ বেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল।†

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়িলোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।‖

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে।¶

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সর্গুজায় কিসাম বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।§

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (উরাঁও)। কিন্তু এ দেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণদ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে বাঙ্গালির বাহিরে এমন অনেক অনার্য্যবংশ পাওয়া যায় যে

* Statistical Account of Bengal Vol. XVI P. 82-3

† Dalton's Ethnology P. 78.

‖ Buchanan Hamilton—Rungpur Vol. III P. 419 Hodgson I. A. S. B. XXXI. July 1849.

¶ Dalton's Ethnology P. 130.

§ Dalton's Ethnology P. 132.

তাহারা আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালির মধ্যে এরূপ অনার্য্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না তাহার বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে পাশ্চাত্য-দিগের সাধারণ মত এই যে প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এই রূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে, জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভেদ। এটী ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এখন আমরা ইউরোপে, দেখিতে পাই, যে কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য বা মজুরী করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে যাহার পিতৃ পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে সে সেই ব্যবসায়েতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীরা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটী আর্য্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তির দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠব্যবসায় সকল আর্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল নীচব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্য শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয় প্রথম, কেবল আর্য্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে। কেন না এ ভেদ স্বাভাবিক, শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্‌বর্ণ বলিয়া, আর্য্য হইতে তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে আর্য্যেরা গৌর, অনার্য্যেরা "কৃষ্ণত্বচ।" তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম, আর্য্য ও শূদ্র এই দুইটী বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্য্যদিগের হস্তে, ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটী শ্রেণী পৃথক্ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বপরিচিত

"বর্ণ" নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্য্যে আর্য্যে আর্য্যে অনার্য্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে শঙ্করজাতি সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। শঙ্করে শঙ্করে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

পূর্ব্ব পীঠিকাস্বরূপ এই কয়টি কথা বলিয়া আমরা বাঙ্গালি শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব।

আনন্দ মঠ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

উপক্রমণিকা।

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্তসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমসময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার। কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননু-

ভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল। তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি।"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"

"আর কি আছে? আর কি দিব।"

তখন উত্তর হইল, "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।"

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল, কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা,—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়— সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, দ্বার রুদ্ধ, মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখেও মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা একসন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাইল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিনমাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে, কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এককাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পরে দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, একে বাঙ্গালি তাহাতে মুসলমান, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে, কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কেনে? খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া, প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, তার সকল গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহু পরিবার মধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাহাদেরই কথা বলিতেছিলাম। নিকটে এমন একটি প্রতিবেশী নাই; যে একটু জল দিয়া যায়।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাওয়াইয়া, গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে ?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যতদিন চলে; আমি যতদিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটী লইয়া, নগরে* যাইও।" নগরে মহেন্দ্রের পিতৃস্বসা বাস করেন।

মহেন্দ্র। নগরে যদি যাইতে হয় তবে, তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুইজনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। নগরে গেলে কি কিছু বিশেষ উপকার হইবে ?

ম। সেস্থান হয় ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য, হইয়াছে।

ক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এস্থান ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুইজনে রাখিতে পারিব। প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে ? চল, এখনও বন্ধ সন্দ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি ? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটীকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র

* নগর বা রাজনগর—সাবেক বীরভূম রাজ্যের রাজধানী

বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত, লুঠেড়া ফিরিতেছে। শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?" এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার পাছু পাছু গৃহপ্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী একখানা রূপাবাঁধা ছোরা কোথা হইতে বাহির করিয়া আবার তাহা রাখিল। বলিল, "এ অস্ত্র স্ত্রীজাতির নয়।" এই বলিয়া আর কি খুঁজিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বলিল—"আবার কি?"

কল্যাণী বলিল, "কিছু না।" এই বলিয়া কল্যাণী একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কবে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফূলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুরগাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জলপান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটী মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামল-পত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হস্তে, পদে, কপালে, জলসেক করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটীর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষসকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক,

দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব। এই বলিয়া একটা মাটীর কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্যস্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন চারিদিকের দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিমাংসাবশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলিদ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। একজন তাঁহাকে ধরিল। কল্যাণী মূর্চ্ছিতা। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমলশষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা ক-

ল্যাণী ও তাহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাহাদিগকে ঘেরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোণারূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে একমুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও," "চাল দাও," "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, শৃগাল কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই। তখন সকলে জয় কালি বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। বম কালি! আজ নরমাংস খাইব, এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া, চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতির শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ ভাই রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই। আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি তাহাই খাইব; এস ঐ কচিমেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলেই লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সেস্থান

শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময়ে সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া, মার্ মার্ শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তুমাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মেয়েটীর গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেকদূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায়, সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া, আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের কোণের ভিতর লুকাইতে লাগিল। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময়স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি, যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" সেই সময়ে ভয়ে ভক্তির প্রগাঢ়তায় ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয়স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণ শুনিয়াছিলেন, যে দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই

কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহা শরীর, মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গাইতেছেন,

" হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

" হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্র শরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বৃহৎ মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণীদ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকা সকল অনেক স্থানেই ভগ্ন কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারী মধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর শুভ্রবসন মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিত-লোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে তুমি খাও তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন,

"মা কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।" কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ "আমি যতক্ষণ না আসি কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে; কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে, আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে, আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না। আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এপর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসম্বাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?" ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পূরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী

সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন "আমি অমৃতপান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সম্বাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর, পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোকে মাঠের এপা'র ওপার দেখা যাইতেছে না, মাঠে কি আছে, কে আছে দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদিবৃক্ষ। গাছের মাথা সকল, চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর্সর্ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার ছায়া কালপাথরের উপর কাল হইয়া পড়িয়া তর্তর্ করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মরশব্দ। একস্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল, বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকারতলদেশে সারি সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকার, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধ সকল জ্বলিতেছে। এমন দুইশত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ শুম্ফশ্মশ্রুতে

তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-শোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্রসিংহের কোন সম্বাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদের পথে যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানি। সন্তানের একাজ নহে। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজ কাল কে ডাকাত নয়? আমরাই আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দেও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইল। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া, কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। রাজনগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে। "রাজনগর, বা নগর" কি তাহা বুঝাইতে হইতেছে।

১১৭৬ সালে বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হইয়াও হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান্। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে। মীরজাফর গুলিখায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌লেখে। বাঙ্গালি কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

বাঙ্গালার পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই। কিন্তু বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বীরভূম

প্রদেশ বীরভূমের রাজার অধীনে। রাজনগর বা নগর—তাঁহাদেরই রাজধানী। বীরভূমের রাজারা পূর্ব্বে স্বাধীন ছিলেন, সম্প্রতি মুরশিদাবাদের অধীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বীরভূমে হিন্দুরাই স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক রাজবংশ মুসলমান। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার পূর্ব্বে রাজা আলিনকি খাঁ বাহাদুর সিরাজ উদ্দৌলার সহায়তায় কিছু লম্বাই চৌড়াই করিয়া কলিকাতা লুটিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর ক্লাইবের পাদুকাস্পর্শে মুসলমানজন্ম সার্থক করিয়া, বেহেস্তে যাত্রা করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার অন্যান্য অংশের ন্যায় বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদিগের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরভূম প্রদেশে এ পর্য্যন্তও কালেক্টার নিযুক্ত হয় নাই। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন।

অতএব বীরভূমের খাজনা কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। সে কোম্পানীর চাকর নহে। দেশীয় রাজগণের সৈন্যগণমধ্যে তখন অনেক গোরা অধ্যক্ষতা করিত। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথ চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথরুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন। তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায়—দেখিয়া, এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া, তিনি পথপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হ্যায়।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল। এবং শালা—চোর—বলিয়াই এক ঘুসা সহসা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিল। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। ঘুসাটি খাইয়া সিপাহীমহাশয় ঘুরিয়া অচে-

তন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন, "শালাকো পাকড়্‌কে সাদি করো।" সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কিপ্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে বিবেচনায় তিন চারিজন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে। স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

পাঠক এইস্থানে দিঙ্নিরূপণ করুন। সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। রাজনগর হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, যাহাকে এক্ষণে সাবেক বেণারস রোড্ বলে সেই রাস্তায় পড়িয়া আসিতে হইবে। প্রধানতঃ রাজনগর হইতে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আসিতে হইবে। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে রাজনগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এইজন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল, যে এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে তাতে আবার পথমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পথে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল, যে এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেম বাপু।"

সিপাহী বলিল, "তোম শালা ডাকু হো।"

ভবা। "দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়া-বসন পরা ব্রহ্মচারী আমি। ডাকাত কি এই রকম।"

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতী করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা, মাথে পর একঠো মোট লেও।" এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্পী চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না, পলাবে, আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল; যে কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্পী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্পী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিল। সুতরাং সিপাহীরা ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিল যে মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ীর চাকার কচ্‌কচ্‌ শব্দ হইতে লাগিল; তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমায় সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপরে রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধন-রজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটি কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ির উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলে, যে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিবির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত

নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, "উহাকে, ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন একজন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট লইয়া আসিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এহি শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্‌টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘেরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া লাইন ফরম করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখনই সিপাহীবা চারিদিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এই সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসিকে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবার হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়াছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছিল সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ সার্থক ব্রত-গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিল, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক!" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করণে

জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে ইহারাই দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল. "মহাশয় আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিল, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনারদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে এমন ত বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাত রহিলে—তুমি কি কাপুরুষ যে যুদ্ধে ভয় পাও?

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন "যুদ্ধ কই—এ যে ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রীকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল এরা দস্যু না দেবতা?

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করি

লেন। সে স্থিরমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সে রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই—এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তরকানননগনদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।*"

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে, তা ত বুঝিতে পারিল না—জিজ্ঞাসা করিল "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিল।

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং—
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা অন্য মা মানি না—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিল, তবে আবার গাও।

ভবানন্দ আবার গাইল:—

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কেবলে মা তুমি অবলে
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

০ • ১ × ১

*মল্লার—কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কান্দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান?

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজা বেটা কে? এই যে টাকাগুলি সে লইবে এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। হিন্দুর রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্‌লাম, একবার বই ত দুবার মর্‌ব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও তা। দেখ সাপ মাটীতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। দেখ যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম

রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে শোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণপর্য্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি কি একা তাড়াবে? এক চড়ে না কি?

দস্যুগায়িল :—

"সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে—"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা?

ভবা। কেন এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান?

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে?

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের কজন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজে আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কি সে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজে মুসলমানে এত ফারাক কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর তার পর, ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস,—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের কি এসব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে ? যে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না, বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে ?

মহে। আমার স্ত্রীকন্যার সম্বাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল। ভবানন্দ আবার "বন্দেমাতরং" গাইতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গাইল—দেখিল যে গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে।

মহে। যদি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ না করিতে হয় তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও ?

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে না। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

গৃহসন্ন্যাস।

যে স্বাধীন, নিশ্চয়ই সে সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ছিল সেই জন্য সন্ন্যাসীও ছিল। সন্ন্যাসীরা অনেকেই গৃহী, স্বাধীন গৃহী। জনকরাজা ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী।

স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ধন। জর্ম্মণীরা ইদানীং স্বাধীনতার অর্থ কতকাংশে বুঝিয়াছে, এইজন্য জর্ম্মানীতে সন্ন্যাসী সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় আর আর জাতিরা অসার, অনেকে আবার বাচাল; তাহাদের স্বাধীনতা অতি দূরে। ইংরেজদের কেবল দাম্ভিকতা, ফরাসিসদের কেবল বাগাড়ম্বর। অদ্যাপি তাঁহারা অধীনতা স্বাধীনতা কেবল রাজসম্বন্ধে উল্লেখ করেন; যে বধির সে কেবল নৃত্যকেই সঙ্গীত বলে; গীত, বাদ্য, তাল, লয় কখন তাহার কর্ণকুহরে যায়নাই। যখন ভারতাকাশ হইতে স্বাধীনতা খসিয়া পড়ে, পতনে তাহা শতধা হইয়াছিল, ম্লেচ্ছরা তা-

হারই দুই একখণ্ড কুড়াইয়া লয়; সেই ভগ্নখণ্ড তাহাদের এখন পূর্ণখণ্ড। আমরা তাই হাসি। ভগ্নখণ্ডের দুই চারিটী অদ্যাপি ভারতবর্ষে পড়িয়া আছে; সেগুলি এক্ষণে মহাপীঠ। এই জন্য ভারতবর্ষ অদ্যাপি স্বাধীন; সকল দেশ অপেক্ষা স্বাধীন। ক্ষুদ্রেরা এ কথায় হাসিবে, রাজা দেশী কি বিদেশী এই লইয়া তাহারা স্বাধীনতার মীমাংসা করে।

মনুষ্য প্রথম হইতেই পরাধীন—জড়ের অধীন, জীবের অধীন, প্রকৃতির অধীন, নিজ প্রবৃত্তির অধীন। এ অধীনতার সীমা নাই।

মনুষ্যের প্রথম বেগ—উদ্ধারের চেষ্টা। জড়ের শাসন, জঙ্গমের শাসন, আপনার শাসন। জড়ের শাসন প্রথমতঃ ইউরোপ অঞ্চলে আরম্ভ হয়। আপনার শাসন প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়। এই শেষ শাসন বড় কঠিন, ভারতবর্ষ বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বাহ্যিক আভ্যন্তরিক সকল যুদ্ধই হইয়া গিয়াছে। যেখানে কুরুক্ষেত্র, সেইখানেই ঋষিদিগের তপস্যাশ্রম। প্রত্যেকের পুরাতন কথা মহাকথা; সকলগুলিই স্বাধীনতার যুদ্ধবার্ত্তা।

বৌদ্ধদিগের সময়ে আত্মশাসনের বিশেষ বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের শাক্যসিংহ ভীরু ছিলেন, সংসারকে ভয় করিয়া, সংসারকে ফেলিয়া তিনি পলাইয়াছিলেন। স্বাধীনতা সাহসিকের ধন; ভীরু কখন স্বাধীনতা পায় না, সন্ন্যাসীও হয় না।

তান্ত্রিকেরাও স্বাধীনতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কেবল মায়াসম্বন্ধে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে মনুষ্যেরা কেবল মায়ার নিমিত্ত পরাধীন। কিন্তু মায়া পরাধীনতার আংশিক কারণ মাত্র।

কেহ বা যোগশিক্ষা দিয়া, দৈহিকশাসন আরম্ভ করাইয়া, স্বাধীনতার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের পরাধীনতা সম্বন্ধে ক্ষুৎপিপাসাই বিশেষ কারণ।

সম্প্রদায়বিশেষের এইরূপ আংশিক চেষ্টায় পূর্ণ স্বাধীনতার উৎপত্তি হইয়াছিল। কেহ কেহ সেই স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অতি ভয়ানক, ও অদ্ভুত হইয়াছিল। "জড়-জঙ্গমের অধীন হইব না; জরার অধীন হইব না; ক্ষুধার অধীন হইব না; মায়ার অধীন হইব না; দেবতার অধীন হইব না; বরং ঈশ্বরের সমান হইয়া তাঁহার শরীরে মিলিয়া যাইব।" এই আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় স্বাধীনতার বীজ।

ভারতীয় স্বাধীনতা অতি কর্কশ, অতি ভয়ানক; কিন্তু সম্পূর্ণ। ভারতবাসীরা মৃত্যুরও অধীন হইতে চাহিত না। স্বাধীনতার এরূপ মূর্ত্তি আর কোথাও অনুমিত হয় নাই! মৃত্যু আইসে, পার্শ্বে দাঁড়ায়, যোড়হাত করে, অনু-

মতি চায়, অনুমতি কখন পায় কখন পায় না। এই চিত্র কেবল স্বাধীনতার সংস্করণ। অদ্যাপি অনেক পরমহংস গোপনে আহার করে, পাছে ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী দেখিয়া লোকে পরাধীন মনে করে। অনেকে উলাঙ্গ বেড়ায়, পাছে সমাজপ্রথার অধীন ভাবিয়া লোকে অশ্রদ্ধা করে। অনেকে দারাপুত্রত্যাগ করে, পাছে লোকে মায়ার অধীন মনে করে। এই সকল ব্যবহার অনর্থক নহে। প্রতিধ্বনি পূর্ব্বধ্বনির পরিচয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায় নাই, এখনও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী আছে, আমি ভস্মমাখা ভিক্ষুকদের কথা বলিতেছি না; মহাপুরুষদের কথা বলিতেছি।

স্বাধীনতার আর এক মূর্ত্তি জর্ম্মাণদেশে কল্পিত হইয়াছে। তথাকার পণ্ডিতেরা বলেন যে নিজে উন্নত হইয়া জড়জঙ্গম প্রভৃতি সকলের অধিকার অতিক্রম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু কার্য্যত সম্পূর্ণ অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; যাহা সাধ্যাতীত তাহা কেবল মনের দ্বারা অতিক্রম করিতে হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা অলঙ্ঘনীয়, যাহার উপায় নাই, তাহার নিমিত্ত কাতর কেন হইব, কেন তাহার অধীন হইয়া পড়িব? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সুতরাং হইতে দিব; হইতে দেওয়াই জিত, প্রভুত্বের কার্য্য।

এইরূপ জর্ম্মাণ স্বাধীনতা নীতিসম্ভূত। এত কাল নীতিকে কেহ স্বাধীনতার প্রসূতি বলিয়া চিনিত না, এক্ষণে চিনা যাইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিলে অনিবার্য্য অত্যাচারকে আর অত্যাচার বলিয়া বোধ থাকে না, মৃত্যুরও ভয়ানকতা কমিয়া যায়।

মনকে অধীন করিয়া আপনি স্বাধীন হইব ইহা ভারতীয় মন্ত্র। মনকে উন্নত করিয়া আপনি স্বাধীন হইব ইহা জর্ম্মাণীর মন্ত্র। পরস্পর প্রভেদ বিস্তর।

ভারতীয় স্বাধীনতায় মনকে দমন করিতে হয়, শাসন করিতে হয়, পীড়ন করিতে হয়, অনেক সুখপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তিরোধ করিতে হয়; মনকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু "when you regulate a man, you narrow him." এই স্বাধীনতার আর এক বিশেষ দোষ যে এতদ্দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ হয়; যে সকল মনোবৃত্তির প্রাবল্যে সমাজের উন্নতি, সে সকল মনোবৃত্তি একেবারে থাকে না। এই জন্য এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসমাজের উন্নতি লোপ হইয়া গিয়াছিল। ব্যক্তিগত গুণে সমাজ গুণবন্ত হয়, কিন্তু এই স্থলে সে নিয়ম খাটে নাই। সমাজের পরাধীনতা ব্যক্তিগত পরাধীনতা নহে, যাঁহারা স্বাধীন তাঁহারা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাই লোকে তাঁহাদের স্বতন্ত্র নাম দিয়াছিল—সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর বাক্যার্থ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ন্যাসধর্ম্ম সমাজের অনিষ্টকর, বিশেষতঃ প্রথমতঃ অবস্থায়। পরাধীনতা সমাজের মজ্জা। পরাধীনতা ভিন্ন সমাজ গঠে না, সমাজ থাকে না। পরাধীনতা পরতন্ত্রতা নহে।

সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য থাকিলে আর একপ্রকার স্বাধীনতার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালায় সে সামঞ্জস্য একেবারে নাই। এখানে মায়া মমতার প্রাধান্য অতিশয়, এইজন্য আমরা পরাধীন।

বাল্মীকির জয়।

চতুর্থ খণ্ড।

শরৎকালের পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে, অগণ্য তারকাপুঞ্জের মধ্যে সময়ে সময়ে সাদা মেঘের মত কিছু কিছু দেখা যায়। দুরবীণ দিয়া দেখিলে, ঐ সকল আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নয়, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড গড়া হয় নাই। উহাদের ইংরেজি নাম নেবুলা।

যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে উঠেন, সে দিন ঐ সকল নেবুলায় তাঁহার চোখ পড়ে; তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হন। বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তীরের ন্যায়, তাড়িতগতির ন্যায়, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র গমন করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমে পাতলা হইতে লাগিল, ক্রমে শীতল হইতে লাগিল, ক্রমে নিশ্বাস বহে না এইরূপ হইয়া উঠিল। অমনি বিশ্বামিত্র পৃথিবীবায়ু স্মরণ করিলেন, স্মরণ করিয়া সঙ্গে লইলেন, নিশ্বাস ফেলিবার কিছুই ক্লেশ হইল না। বাইশ ক্রোশ পরেই স্থির বায়ু, সেই বায়ুতে ক্রমাগত উল্কা ঘুরিতেছে, ব্রহ্মার আদেশে সমস্ত উল্কা আজি বিশ্বামিত্রের গাত্রে পড়িতে লাগিল, বিশ্বামিত্র আরও বেগে শূন্যপথ পার হইতে আরম্ভ করিলেন, ধূমকেতুগণ তাঁহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া গেলেন, সমস্ত শূন্যে ইথর নামে যে পদার্থ আছে, তন্মধ্যস্থ জীবসকল তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিতে লাগিল; তাহারা এত সূক্ষ্ম যে, দূরবীণদ্বারাও দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমে শরীর গুরুতর হইয়া উঠিল, তাহাতেও বিশ্বামিত্রের দৃক্‌পাত নাই। বিশ্বামিত্র ত মানুষবলে উঠিতেছেন না, যোগবলে উঠিতেছেন। তিনি ক্রমে

অসংখ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া নেবুলার নিকট উপস্থিত হইয়া, অনন্ত গগনস্থ সমস্ত নেবুলা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে নেবুলা-সমূহ সংগ্রহ হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িতে লাগিল। কত অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশিমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? ক্রমে আকাশের এক কোণ নেবুলায় পূরিয়া গেল। বিশ্বামিত্র তাহার উপর দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুলি ঘুরাইতে লাগিলেন, আর সেই অনন্ত, অগঠিত পদার্থরাশি ঘুরিতে লাগিল, ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে একত্র হইতে লাগিল; ক্রমে পরস্পর নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিল, ক্রমে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আটিয়া বসিয়া গেল। আরও—ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্নি সে সকল উদ্গম হইল, প্রকাণ্ড পরমাণুরাশির চারিদিকে অগ্নিময় Atmosphere হইল, খানিক জ্বলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বুধ হউক," অমনি সেই জ্বলন্তপদার্থ হইতে একখণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক" অমনি সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর এক খণ্ড ছটিয়া গিয়া উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক" অমনি আবার সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছটিয়া গিয়া পাহাড় পর্ব্বত-নদ-নদী-দ্বীপ—সাগরবতী-পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি আমাদের সৌরজগতে যাহা যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটী গুণে বড় হইল, সূর্য্য কোটী গুণে বড়, পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল তৃণ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, নদী, বন, বৃক্ষ, বরফ যেমন যেমন এ পৃথিবীতে আছে, সব ঠিক তেমনি তেমনি হইল; অধিকের মধ্যে নারিকেলগাছ তখন এখানে ছিল না তাহা হইল। তাঁহার জগতে হিংস্র জন্তু রহিল না: বিচিত্র পক্ষী পক্ষচ্ছটায় নয়ন মন রঞ্জন করে, এইই অধিক বিচিত্র পশু, দেখিতে অতি মনোহর সমস্তই সুগন্ধিপুষ্পের বৃক্ষ—বৃক্ষের পত্র সুগন্ধি, কাষ্ঠ সুগন্ধি, ফুল সুগন্ধি, আস্বাদ সুগন্ধি—যে তৃণদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আচ্ছাদিত তাহাও আতর অপেক্ষা সুগন্ধি। আকাশ হইতে যে বৃষ্টি হইত তাহা গোলাব। বায়ু, ধূপ-ধূনা-গন্ধামোদিত। আহারীয় পদার্থ উৎপাদন করিতে হয় না—বন, জল, বায়ু আহারীয় প্রদান করে, এবং ইহার পরও সহ

সহস্র বৎসর দিতে পারিবে, তাহারও কৃষিকর্ম্মের শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না; লোকসংখ্যা যদি অগণ্য বর্দ্ধিত হয়, তবেই যাহা হউক। বাড়ী ঘরদ্বার বিছানা রহিবে না, সুগন্ধি সুস্পর্শ অতি কোমল তৃণই শয্যা, সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্র পর্ব্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময় থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাস্তার উপর দারুণ সূর্য্য-উত্তাপ এ জন্য সমস্ত রাস্তার উপর শেড দেওয়া, তাহার উপর দুইপ্রহরের সময় বরফ দেওয়া হয়, মাঠে যখন দারুণ গ্রীষ্ম রাস্তার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়। বিশ্বামিত্র নিজে স্বভাব সৌন্দর্য্যের জন্য বড়ই পাগল, এইজন্য পাহাড়ে উঠিবার উপায় করিয়া দিলেন। লোকে যাহাতে সর্ব্বদা পর্ব্বতের ডগা হইতে সমদয় তলা পর্য্যন্ত সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার নানা উপায় করিয়াছিলেন।

২

আর মনুষ্য—নূতন জগতে নূতন মনুষ্য, হইল। সৃষ্টি আপনার মনোমত, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতে মনুষ্য সুখময়, দুঃখভোগের প্রবৃত্তি সকল আদৌ রহিল না। অতি উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইবার উপায় রহিল। বিশ্বামিত্রের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কেবলমাত্র মনের উচ্চতর বৃত্তিসকল চালনা করিয়াই তাহারা ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর স্বার্থসাধন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একেবারে চক্ষু-লজ্জাশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব যাহাতে সকল লোকেরই বুদ্ধিবৃত্তি সমানরূপে পুষ্ট হয়, বিশ্বামিত্র তাহার জন্য চারিদিকে বিদ্যালয়, কালেজ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। উচ্চনীতিশিক্ষা, উচ্চশাসন, প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র লোক রহিল না; সকল লোক একত্র হইয়া এ সকল কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। যুক্তি একমাত্র উপাস্যদেবতা, তদ্ভিন্ন আর উপাস্য দেবতা একেবারে রহিল না। সকলে নিত্য নিত্য যুক্তিদেবীর মাত্র উপাসনা করিত।

আর প্রেম? সকলই প্রেমময়, মানুষ সব সমান। যদি কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি হয়, তবে সে তাহাদ্বারা অন্য লোকের উপকার করিবে, সব সমান করিয়া লইবে। বিশ্বামিত্রের জগতে সব মানুষ সুন্দর, কাল কুৎসিত দুই একটা কদাচ কখন মিলিত কি না সন্দেহ। সকলেরই মুখে এমনি মোহিনীময় ভাব যে, মুখ দেখিলেই পরস্পর মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সেখানে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে, সেকহ্যাণ্ড বা নড বা নমস্কার করিত না, একেবারে কোলাকুলি ও গাঢ় আলিঙ্গন। সকলেই ব্যস্ত every thing onward & forward. নূতন জগতে, নূতন উৎসাহে, লোকে এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, কখন পর্ব্বতে

উঠিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, কখন নদীগর্ভে গিয়া তথাকার গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে, কখন আকাশপথে উড্ডীন হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনুষ্যোন্নতি সাধনার্থ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।

বিশ্বামিত্রের সংসারে বিবাহ নাই; কিন্তু প্রণয় এমনি পদার্থ, বিবাহ না থাকিলেও একবার মনোমিলন হইলে প্রায় আর বিচ্ছেদ হইত না। বিচ্ছেদ হইলেও তিনবৎসরকাল ভগ্ন প্রণয়ের জন্য শোক না করিয়া কেহ বিবাহ করিত না। এরূপ করিলেও কেহ দোষ বলিত না; লোকে জিতেন্দ্রিয় ছিল; ব্যভিচারাদি ভয়ানক দোষ কিছুমাত্র ছিল না। গীতবাদ্যাদি কলায় সমস্ত লোকই পটু ছিল, সকলে মিলিয়া সকল স্থানে হয় গান, নয় বাজনা, নয় অভিনয়, না হয় নৃত্য প্রত্যহই হইত। প্রত্যহ পৃথিবীময় নূতন উৎসব হইত, কোনপ্রকার রাজা, সেনাপতি, বা কিছুর ভয় ছিল না। সকলে মিলিয়া যাহা করে, তাহাই হয়। পদার্থের গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান, আর প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন, এই বিশ্বামিত্রপৃথিবীতে লোকের নিত্যকর্ম্ম হইল।

উল্লাস—উল্লাস—উল্লাস, মনের উল্লাসে পৃথিবীস্থ লোক নৃত্য করে। আহা! এমন পৃথিবী যদি আমাদের হইত, তবে না জানি কতসুখই হইত। যে সকল কারণ থাকায় পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল, বিশ্বামিত্র মানুষের মন হইতে সেগুলি অতি যত্নে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যশের আশা, টাকার তৃষ্ণা ও আধিপত্যের আশা কাহারও ছিল না। কেবল আমোদ; আজি আমার আমোদে তুমি যোগ দিলে, কালি তোমার আমোদে আমি যোগ দিলাম। বিশ্বামিত্রের দেশে মানুষ মরিত না, উহারা এক পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে চলিয়া যাইত; এইরূপে সাত আটবার ঘুরিয়া আবার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইত। বিশ্বামিত্রপৃথিবীতে জন্ম দুইপ্রকার; পুনরাবর্ত্তন জন্ম আর নূতন জন্ম; নূতন জন্ম সংখ্যায় সংখ্যিত ছিল, রোজ সেই কয়টি করিয়া নূতন জন্ম হইত; বাকি পুনরাবর্ত্তন জন্ম। বিশ্বামিত্রের পৃথিবী অল্পকাল ছিল, অধিক নূতন জন্ম হইলে কি হইত বলা যায় না।

৩

ওদিকে বাল্মীকি হিমালয়জঙ্গলমধ্যে কেবল রোদন করিয়া বেড়ান, রোদনের বিরাম নাই, অন্তর্দাহেরও বিরাম নাই, কি পাপই করিয়াছি, কেমন করিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যত ভাবেন ততই হৃদয় উদ্বেল হয়, ততই একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। দস্যুদলের সহিত আর দেখা করেন না। তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়, দেখা পায় না। মানু

দেখিলে হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠে, জঙ্গলে পশু পক্ষীর সহিত বাস হইতে লাগিল, পশু পক্ষীও তাঁহার কাতর ভাবে কাতর। তিনি কোন পশুকে আহার দেন, কাহার গলা চুল্কাইয়া দেন, কাহাকেও স্নান করাইয়া দেন, এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে একদিন এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন বড় আদর করিয়া পরস্পর বসিয়া খেলা করিতেছে, এ ওর গায় পড়িতেছে, এ ওকে ঠোকরাইতেছে, এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেসিয়া যাইতেছে। এ একবার উলটিয়া উহার ঘাড়ে পড়িতেছে, ও আবার উলটিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতেছে। আবার উড়িয়া উড়িয়া পাখা নাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ করিয়া আর এক ডালে বসিতেছে, বাল্মীকি একতান মনে উহাদের ক্রীড়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, "ইহারা আমা অপেক্ষা কত সুখী, আমি কেন অমনি করিয়া আমোদে মত্ত হইয়া বেড়াই না। আমারও ত কত সঙ্গী আছে।" আর ভাবিতে পারিলেন না। পূর্ব্ব কথা আবার নূতন হইয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া একটি পক্ষীর প্রাণ সংহার করিল। পক্ষী পড়িয়া ভূমে লুটাইয়া ছটফট করিতে লাগিল। ব্যাধ দৌড়িয়া পাখী লইতে আসিল। বাল্মীকি বলিলেন, রে পাপাত্মা—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনা দেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বলিবামাত্র বাল্মীকি দেখিলেন, নির্ঝরমধ্য হইতে একটি কন্যা কানন-পথ আলো করিয়া আসিতেছে, তাহার কান্তি অপ্সরা-বিনিন্দিত, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও স্নিগ্ধ মন্দ ও হৃদয় মুগ্ধকর। কামিনীর কমনীয় কান্তি দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ব্যাধ ক্রৌঞ্চ সংগ্রহ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতে ছিল, সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পশু, পক্ষীগণ নীরব হইল। কন্যা বাল্মীকির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাল্মীকির কথা সরিল না, কন্যাও বাল্মীকিকে কথা কহিবার অবকাশ দিলেন না। বলিলেন, "বাল্মীকি, বিস্মিত হইও না, আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার মত কোমল হৃদয় দেখি নাই এজন্য তোমায় এই বীণা দিতে আসিয়াছি। এই বীণা তোমার ও তোমার মত লোকের হাতে চিরদিন থাকিবে, তোমরা পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়া কেবল পরের জন্য ইহার ব্যবহার করিবে।" বাল্মীকি চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বীণাগ্রহণ করিলেন, কিন্তু বীণা তাঁহার হাতেই রহিল; সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

বিশ্বামিত্র পৃথিবী হইতে নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্থান করিলে পুরাতন সৃষ্টির কি হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

পৃথিবীময় গোলমাল, অরাজক, লুঠপাট, সর্ব্বদা শোণিতস্রোত-প্রবাহ। আমরা ইতিহাসে অনেক অরাজক সময়ের বিষয় পাঠ করিয়া থাকি। যবন-সাম্রাজ্য বিনাশ হইলে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন পর্য্যন্ত ভারতে যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এমন বোধ হয় পৃথিবীর কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের স্বর্গার্থগমনের পর যাহা ঘটে, উহা তাহার শতাংশের একাংশও নহে। মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাক্ষস ও বানর এই চারিটী প্রধান রাজত্ব ছিল। যবন ম্লেচ্ছ, চীন, হূনাদির রাজ্য, বিশ্বামিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের রাজারা অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকে পলাইয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, অনেকে যে, কে কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই. তাঁহাদের রাজ্যেও ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। লুঠেরা দল বাঁধিয়া দিনে লুঠ করে, নগর দাহ করে, নগরকে নগর কাটিয়া ওয়ার করিয়া দেয়। এই সময় বাল্মীকি সর্ব্বপ্রধান লুঠেরা-দলের আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই, তাহারা গুহক নামক চণ্ডালকে কর্ত্তা করিয়া সমস্ত হিন্দুস্থান লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আজি যমুনোত্রী, কালি প্রয়াগ, অদ্য শতদ্রু সংগম, পরশ্বঃ সরযূতীরে লুঠ করিতে লাগিয়াছে। এই সময়ে লুঠের দল দেখিলে কলির একাকার বোধ হইত, বড় বড় দলে ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সব একত্র আহার, একত্র শয়ন, এক ব্যবসায় এক আমোদে মত্ত হইয়া মহাধূমধামে বাস, এক নরহত্যা ও দেশ লুণ্ঠনকার্য্যে সব ব্রতী, তাহারা একেবারে দেবেরও দুর্দ্দম হইয়া উঠিল। এই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময় যদি একটি রাজত্ব প্রবল থাকিত, তাহা হইলে হইত, যদি এক জাতির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত, তাহা ছিল না। সকল রাজ্যেই দুইটি করিয়া দল ছিল। সকল জাতির মধ্যেই অনৈক্য ছিল, যে দলের হস্তে রাজক্ষমতা ছিল, তাহারা ঘোর অত্যাচারী, তাহাদের দারুণ অত্যাচার অপেক্ষা লুঠেরাদিগের অত্যাচার সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। লুঠেরারা খুন করিত, উহারা দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিত। এই সময়ে রাবণ প্রবল পরাক্রম নরপতি। পরস্ত্রীহরণ, পরধন অপহরণ, পরদেশ লুণ্ঠন, পর পীড়ন, ক্রীড়ার্থ পরের যন্ত্রণাপ্রদান, তাঁহার প্রধান আমোদ। তাঁহার দেশে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার ভ্রাতা বিভীষণ। রাবণ বিভীষণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বিভীষণের স্বপক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান মন্ত্রীর নাসাকর্ণ ছেদ করিয়াছিলেন। বানররাজ্যস্থ সুগ্রীবের দলের সহিত বিভীষণের মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য খর দূষণ নামক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ও অগ্নিমুখ,